তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

জুঁইকে দিলাম

অবশেষে তালপাতার পুঁথি শেষ হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। একটা যুগে
কাহিনী তালপাতার পুঁথি—কিন্তু ইতিহাস নয়।

ঐতিহাসিক দিনের কথা—মানুষের কথা—তাদের সুখ দুঃখ বেদনার কথা
সংগ্রামের-পরাজয়ের কথা, কিন্তু ইতিহাস নয়।

আমার অগণিত গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সবিনয় নিবেদন—আমা
তালপাতার পুঁথি একমাত্র তাঁদেরই জন্য রচনা করেছি। তাই তাঁরা যদি প্রীত
হন, তবেই আমার আনন্দ, তবেই আমার সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার—আর অন্য
পুরস্কারে আমার লোভ নেই।

উল্কা
২৬এ গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা ১৯

—লেখক

কথামুখ

॥ ১ ॥

অন্ধকার।

অন্ধকার শুধু অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে প্রবহমান জলস্রোতও মনে হচ্ছিল যেন কালো কালির মত।

[illegible], দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে ছেদহীন অন্ধকার শুধু।

[illegible] জলদস্যু রোজারিও তার বিশমাল্লাবাহী নাওয়ের পাটাতনের উপরে নিঃশব্দে একাকী অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। ছয় ফুটের কাছাকাছি প্রায় দৈর্ঘ্যে, বিরাট পেশীবহুল দেহ। পরিধানে পাতলুন ও কামিজ। বুকের ওপরে আঁটা বর্ম। কটিবন্ধে ঝুলন্ত খাপসমেত তরবারি ও গাদা পিস্তল। পিঙ্গল দুটি শ্যেন চক্ষুর তারা দূর অন্ধকারে স্থির নিবদ্ধ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই রোজারিও মাল্লাদের নোঙ্গর ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিল। সাগর-সঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান ও মেলা আসন্ন। নানা দিক থেকে এই সময় বহু যাত্রী ঐ পথ দিয়ে সাগর-সঙ্গমের দিকে যায়। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে অবিশ্যি সোনাদানা খুব বেশী থাকে না। সেদিক থেকে তাদের লুণ্ঠন করে খুব বেশী লাভবান হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু রোজারিওর এবারকার অভিযানের উদ্দেশ্য ঠিক লুণ্ঠন নয়। একটি শিশু সন্তানের তার প্রয়োজন।

ভায়লার একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষা তীব্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত তার একটি সন্তান হলো না। মাতা মেরীর কাছে সন্তান কামনায় অনেক প্রার্থনাই সে জানিয়েছে, কিন্তু মাতা মেরী ভায়লার সে মনস্কামনা অদ্যাপি পূর্ণ করে নি।

রোজারিও ভায়লাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বলেছে, কি হবে তোর ছেলে নিয়ে ভায়লা?

ভায়লা ঘাড় নেড়ে বলেছে, বা রে, একটা ছেলে থাকবে না আমার, কেমন কথা বলো তুমি। ছেলে আমার একটা চাই। আজো একটা ছেলে হলো না আমার কি কম দুঃখ।

তা ছেলে হবার বয়স তো তোর এখনো পার হয়ে যায় নি রে!

বয়সটা বুঝি কম হলো। দেড় কুড়ি প্রায় বয়স হতে চললো না, আর কবে হবে!

তা সত্যি। দেড় কুড়ি ঠিক ঠিক না হলেও কাছাকাছি প্রায় বয়স হতে চললো বৈ কি ভায়লার। ভায়লার ছেলে হলো না আজ পর্যন্ত বলে রোজারিওরও কিছুটা ভয় ছিল বৈ কি! ভায়লায় বয়েসের তুলনায় তার বয়স অনেক বেশী। সে কোন্ না দেড় কুড়ি বছর বয়সের পার্থক্য হবে দুজনার মধ্যে। অটুটযৌবনা ভায়লা, আর তার দেহে বার্ধক্যের চিহ্ন ইতিমধ্যেই অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। গত আট বছরেও ভায়লাকে সে একটি সন্তান দিতে পারে নি। আর যত দিন যাচ্ছে রোজারিওর মনে হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও বুঝি তার লোপ পাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাপারটা যেন আরো বেশী উপলব্ধি করে রোজারিও যখনই ভায়লাকে সে দু বাহু বাড়িয়ে ইদানীং বক্ষের ওপরে টেনে নেয়।

আগেকার দিনের সেই উদ্দাম কামনা যেন সে আর দেহের কোথাও খুঁজে পায় না এবং পেলেও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয় তা।

একটুতেই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। অবশ হয়ে আসে সব কিছু। ঝিমঝিম করে স্নায়ুগুলো। সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে যেন রোজারিওর মনের পাতায় ভেসে ওঠে ঐ মুহূর্তে আর একখানি মুখ। তরুণ ডি'সুজা।

তার অর্ধেকেরও কম বয়েস সেই শয়তান ইবলিশের বাচ্চাটার। প্রশস্ত বক্ষপট। শালপ্রাংশুসম দুটি বাহু। থুতনির নীচে সামান্য কটা দাড়ি। ওষ্ঠের উপরে সরু চিকন গোঁফের রেখা।

রোজারিও জানে, ভায়লার প্রতি তার নজর আছে এবং যেদিন থেকে সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে, রোজারিওর সুখশান্তি সব গিয়েছে। দুশ্চিন্তায় ভাল করে রাত্রে আজকাল সে ঘুমোতে পর্যন্ত পারে না। কতবার ইচ্ছা হয়েছে চুপি চুপি এক রাত্রে গিয়ে ঘুমন্ত ডি'সুজার বক্ষে সমূলে তার কটিদেশের ছোরাটা বসিয়ে দেয়। কিন্তু সাহস হয় নি।

ঘুমোলেও ডি'সুজা সর্বদা সতর্ক থাকে। তাছাড়া ইবলিশের বাচ্চাটার গায়ে অসুরের মত শক্তি। যদি যুদ্ধে ওর শক্তির কাছে ও পরাভূত হয়?

আবার মনে হয়েছে এই বোধ হয় জগতের রীতি। মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে—এই দুনিয়ার কানুন!

সেও তো তার প্রথম বয়সে একদিন গভীর রাত্রে তার কমাণ্ডারের বুকে ছোরা বসিয়ে তার অঙ্ক থেকে তার আদরিণী ডায়নাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ভায়লার আগে এসেছিল ডায়না তার জীবনে। নীলনয়না স্বর্ণকেশী বিদ্যুল্লতা। ষোড়শী ডায়না! ডায়না! কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ডায়না!

পঁচিশ কি ত্রিশ বছর হবে। তারপর এলো আজকের ভায়লা।

কিন্তু যৌবনের সেই সিংহ রোজারিও আজ আর সে নেই। তিন কুড়িরও বেশী বয়স হয়ে গিয়েছে আজ তার। বার বার দুবার অসুখ হয়ে সারা গায়ে ঘা ফুটে বের হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করে আজকাল রোজারিও। নইলে রোজারিও কি ঐ ইবলিশের বাচ্চাটাকে জ্যান্ত রাখত এতদিন? কবে ও তরোয়াল দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে দরিয়ার ক্ষুধার্ত হাঙ্গরদের মুখের সামনে ছড়িয়ে দিত।

ঐ ইবলিশের বাচ্চা ডি'সুজা যে সেটা জানে না তা নয়। কিন্তু আজ আর রোজারিওর সে ক্ষমতা নেই। কথাটা ডি'সুজা জানে এবং বোঝেও।

নইলে আড়চোখে অমন করে রোজারিওর দিকে চেয়ে চেয়ে যখন তখন হাসত না ইবলিশের বাচ্চাটা। বড় বড় মুলোর মত লালচে দাঁতগুলো বের করে হাসতে হাসতে গোঁফে তা দেয় শয়তানটা।

খোলা নদীবক্ষে পৌষের হিমশীতল বাতাসে যেন চোখে-মুখে ছুঁচ বিঁধায়। আজকে যদিও এখনো কুয়াশা নামে নি তবু রোজারিও জানে কুয়াশা ঠিক নামবেই। প্রত্যহ আজকাল রাত্রে কুয়াশা নামে।

কুয়াশা নামলেই মুশকিল, কিছু দেখা যায় না তখন আর। দু-চার হাতের মধ্যেও নজর চলে না। ঝাপসা কুয়াশায় দৃষ্টি সামনে থেকে মুছে যেন সব একাকার হয়ে যায়।

ভায়লা একটা বাচ্চা চায়। রোজারিও ভায়লাকে বাচ্চা দেবে এবারে। হঠাৎ তার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছে।

এই সময়টা এই মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে এসে কোন কোন হিন্দু নারী নাকি দরিয়াতে তাদের প্রথম জাত সন্তানকে গঙ্গামাঈকে নিবেদন করে তাদের মানসিক শোধ করে। প্রায় প্রতি বছরই ঐরকম মানসিক শোধ করতে দু'চারজন আসে।

এবারেও কি দু'একজন আসবে না? দরিয়া থেকে নিবেদিত বাচ্চাকে ওরা তুলে নিতে দেবে না। বাধা দেবে। গোলযোগের সম্ভাবনাও আছে। আর কাকদ্বীপের কাজী সাহেবটা অত্যন্ত হারামজাদা। কাজ কি হাঙ্গামায়, তার চাইতে পথেই সে লুঠ করে নেবে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে সে রকম কোন বাচ্চা থাকলে।

সেই বাচ্চা নিয়ে গিয়ে তুলে দেবে সে ভায়লার হাতে। নে, বাচ্চা নে ভায়লা। তোর বাচ্চার এত শখ।

ওদেরও বলবার কিছু থাকতে পারে না। ওরা তো সে বাচ্চাকে দরিয়াতে

বিসর্জন দিতেই এসেছে। অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে থাকে রোজারিও, কোন যাত্রীদের নাও দেখা যাচ্ছে কি না।

দুদিন ধরে আশে-পাশে অপেক্ষা করছে সে তীর্থযাত্রীদের আগমনের জন্য।

হঠাৎ একসময় নজরে পড়ে রোজারিওর, বহু দূরে অন্ধকারে একটা আলোর মালা যেন কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ করে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে রোজারিও। বুঝতে কষ্ট হয় না রোজারিওর, ঐ আলোর মালা তীর্থযাত্রীদেরই নৌকার আলো। সার বেঁধে নৌকা আসছে সাগরযাত্রীদের—তারই আলো।

ক্রমশঃ জলের ছল-ছল শব্দকে ছাপিয়ে ছপ-ছপ ছপ-ছপ একটানা একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ ওর কানে আসে।

ছপ-ছপ ছপ-ছপ—দাঁড়ে জলকাটার শব্দ। স্পষ্ট—আরো স্পষ্ট হয় নৌকার আলোগুলো। আরো স্পষ্ট শোনা যায় দাঁড়ে জল কাটার শব্দ। একটানা জলকল্লোলের সঙ্গে জলকাটার সেই শব্দটা যেন মিশে যাচ্ছে।

কি করবে রোজারিও, হামলা দিয়ে পড়বে কি ঐ নৌকাগুলোর উপর? তীর্থযাত্রীদের নৌকা হলেও একেবারে নিরস্ত্র নয় ওরা। রোজারিওদের ভয়েই ওরা এই ধরনের তীর্থযাত্রার পথও একেবারে নিরস্ত্র অসহায়ভাবে পাড়ি দিতে সাহস পায় না।

লাঠি, সোঁটা, বল্লম, সড়কী তো থাকেই সঙ্গে, দু-চারটে গাদা বন্দুকও যে থাকে না তাও নয়।

সে কারণে অবিশ্যি রোজারিওর কোন ভয় নেই। কারণ ঢের বেশী সশস্ত্র সে এবং সকলেই তার দলের প্রয়োজন হলে বন্দুক হাতে দাঁড়াতে পারে। একদল তীর্থযাত্রীর তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

সেদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু কথাটা তা নয়। যুদ্ধ সে চায় না। প্রাণহানিও করতে চায় না সে কারো আজ। সে কেবল চায় একটি বাচ্চা ছেলে তার ভায়লার জন্য।

ভায়লা ইদানীং যে ভাবে বাচ্চা বাচ্চা করে ক্ষেপে উঠেছে ভয় তো তার সেই কারণেই। আর সেও চায় আজ একটু বিশ্রাম।

হ্যাঁ, দরিয়ায় দরিয়ায় নাও ভাসিয়ে ঘুরে ঘুরে, অনেক হামলা, অনেক যুদ্ধ করে করে ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আজ সত্যিই রোজারিও।

কবে কোন্ সেই কৈশোরকাল থেকে দরিয়ায় দরিয়ায় ভাসতে শুরু করেছে, ভাল করে বুঝি মনেও পড়ে না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ, লোনা পানি আর লোনা

হাওয়ায় পুড়ে ঝলসে দেহটা তামাটে হয়ে গিয়েছে।

শুধু দরিয়ার পানি আর পানি। ডাঙা-বন্দরের সঙ্গে কতটুকুই বা পরিচয় তার। তবু আজ সেই ডাঙাতেই ফিরে যেতে চায় রোজারিও।

সাতগাঁর নদীর ধারে এমানুয়েল গীর্জাটার কাছাকাছি একটা বাড়ি তৈরী করেছে। একা মানুষটা, সংসারে তার কেউ নেই। ভায়লাকে সে আপন বিটির মতই স্নেহ করে, সে বার বার বলেছে রোজারিও আর ভায়লা সেখানে গিয়ে যদি থাকতে চায় তো তাদের ঘর দেবে।

ভায়লারও একান্ত ইচ্ছা এই দরিয়ায় ভেসে ভেসে আর না বেড়িয়ে সেখানে গিয়েই থাকে। রোজরিওকেও অনুরোধ জানিয়েছে অনেক বার। দরিয়ায় নয় এবারে মাটিতে ঘর বাঁধবার অনুরোধ। কিন্তু দরিয়ার পানির এমনি নেশা যে রোজারিওর পক্ষে সে নেশা কাটিয়ে ওঠা আদৌ সম্ভবপর হয় নি। মাটির মেয়ে ভায়লা, দরিয়ার মর্ম সে বুঝবে কেমন করে?

মাথার উপরে ঐ খোলা আকাশ। দিক-দিগন্ত বিস্তৃত শুধু জল আর জল। সেই জল কখনো শান্ত, কখনো উদ্দাম ভয়াল আথালি-পাথালি, কখনো শব্দহীন, কখনো গর্জনমুখর।

প্রখর সূর্যালোক ঝিলিক হেনে চোখ ঝলসে দেয় দিনের বেলায়, আবার রাত্রে ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌ চাঁদের আলোয় গা ঢেলে ঘুমায়।

কখনো অস্তগামী সূর্যালোক লাল আবির গুলে দেয়, কখনো মেঘের ছায়ায় শ্যামলা হয়ে ওঠে। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। ক্ষণে চেনা, ক্ষণে অচেনা। ক্ষণে ভয়ঙ্করী, ক্ষণে মনোহারিণী, ক্ষণে চমৎকারিণী।

রোজারিওর কাছে দরিয়া প্রাণ, সম্পদ, আশ্রয় আর বিশ্বাস। মাটির মেয়ে ভায়লা এ দরিয়ার মর্ম বুঝবে কি করে?

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হলো রোজারিওর। ডি'ক্রুজ কখন এসে ইতিমধ্যে তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, অন্যমনস্ক রোজারিও টেরও পায় নি।

কাপ্তান!

কে, ডি'ক্রুজ—

ঐ দূরে জলের মধ্যে একটা কি দেখ তো? চাপা গলায় ডি'ক্রুজ বললে।

কোথায়?

হুই। হুই যে। দেয়ার ইউ সি—

ডি'ক্রুজের নির্দেশমত এবারে রোজারিও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাল করে চেয়ে দেখে। সত্যিই, ঐ দূরে কি যেন একটা জলের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে আসছে।

দেখবো কাপ্তান, কি ওটা?

হুঁ, চল তো দেখি।

দুজনে তাড়াতাড়ি মাঝি এমামুল্লাকে নিয়ে নৌকা থেকে ভাসমান ছোট জালি বোটটা খুলে নিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে দাঁড় বেয়ে সেই দিকে এগিয়ে চলে।

ওদিকে তখন তীর্থযাত্রীবাহী সার বাঁধা নৌকাগুলো ডাইনে বাঁক নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। কিছুদূর বোট নিয়ে এগুতেই সহসা ওদের কানে ভেসে এলো একটা কচি শিশুর কান্না।

ওঁয়া—ওঁয়া—

অন্ধকার জলের ভিতর থেকে কান্নার শব্দটা ভেসে আসছে।

নদীবক্ষে শিশুকণ্ঠের কান্না শুনে সত্যিই চমকে উঠেছিল প্রথমটায় মাঝি এমামুল্লাই। কেমন বুঝি মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। আপনা হতে হাতের দাঁড় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু একা এমামুল্লারই নয়—রোজারিও, ডি'ক্রুজেরও হাতের দাঁড় বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা বুঝি মুহূর্তের জন্যই।

কারণ, পরক্ষণেই আবার শিশুকণ্ঠের সেই কান্না ওদের সচকিত করে তোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে দাঁড় ফেলে কয়েকটা ক্ষিপ্র টানে একেবারে ভাসমান বস্তুটির সামনে গিয়ে পৌঁছায় মাঝি এমামুল্লা।

স্তিমিত তারার আলোয় এবারে রোজারিওর নজরে পড়ে পিঠের উপরে একটা বাচ্চা শিশু নিয়ে কে একজন ব্যর্থ চেষ্টা করছে জলে ভেসে থাকবার। পিঠের বাচ্চাটাই কাঁদছে।

জলের উপর ঝুঁকে পড়ে তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্রহস্তে এমামুল্লাই বাচ্চা সমেত মানুষটাকে ছোট ডিঙ্গিটার উপর তুলে নিতেই আশ্চর্য হয়ে দেখলো রোজারিও, এক নারী—তার পিঠের সঙ্গে বছর দেড়েকের একটি শিশু শক্ত করে তারই পরিধেয় বস্ত্রের অংশ দিয়ে বাঁধা।

ডিঙ্গিতে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু নারীর জ্ঞান লুপ্ত হলো। বাচ্চাটা তখনো কাঁদছে।

তাড়াতাড়ি সেই জ্ঞানহীন নারীর দেহের বাঁধা থেকে ক্রন্দনরতা বাচ্চাটাকে মুক্ত করে বুকে তুলে নেয় রোজারিও।

গায়ের ছোট্ট কুর্তাটা ভিজে গিয়ছে—ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে ঠাণ্ডায়।

ইতিমধ্যে চারিদিকে নদীবক্ষে একটু একটু কুয়াশা নামতে শুরু করেছিল।

নৌকায় তুলে এনে কেবিনের পাটাতনে ডি'ক্রুজ ও এমামুল্লা দুজনে শুইয়ে

দিল স্ত্রীলোকটিকে। তখনো তার জ্ঞান ফেরে নি। বাচ্চাটা তখনো কাঁদছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবিত। বাচ্চাটা একটা ছেলে। সুন্দর মোমে গড়া যেন শিশুটি। কালো কষ্টিপাথরের মত দেহের বর্ণ, একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

গায়ে কোন আভরণ নেই, একমাত্র দুপায়ে সরু সরু দুটো রুপোর মল। আর—ভিজে জামাটা গায়ে। কি ভেবে রোজারিও একটানে ভিজে জামাটা গা থেকে খুলে—মল দুটোকে পা থেকে খুলে ফেলে দিল নৌকার পাটাতনের উপরেই, এমাদুল্লা ঐখানেই তখনো দাঁড়িয়ে—মল দুটো ও কুর্তাটা তুলে নিল হাত বাড়িয়ে পাটাতনের উপর থেকে, রোজারিও তার কুর্তার তলায় বাচ্চাটাকে ঢেকে নিয়ে বুকের উপর তুলে ধরে আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটার কান্না থেমে যায়।

ঠিক ঐ সময় কেবিনের খোলা দরজাপথে এসে বাইরে দাঁড়াল ভায়লা—রোজারিও!

এই যে ভায়লা, আয়—এই দেখ কি এনেছি তোর জন্য—

অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে নৌকায় শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনেই ভায়লা কেবিনের বাইরে বের হয়ে এসেছিল।

একটা বাচ্চার কান্না শুনলাম। ভায়লা বলে।

হ্যাঁ হ্যাঁ—বাচ্চা ছেলে। এই নে—

দুহাতে বাচ্চা ছেলেটাকে ভায়লার সামনে তুলে ধরলে রোজারিও।

নৌকার আলোয় বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে উত্তেজনায় যেন একেবারে বোবা হয়ে যায় ভায়লা। কয়েকটা মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ পর্যন্ত বের হয় না।

তারপরই দুবাহু অধীর আবেগে প্রসারিত করে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কোথায়, কোথায় পেলি—আহা রে—দে, দে—

রোজারিও বাচ্চা ছেলেটাকে ভায়লার প্রসারিত দু'হাতের ওপরে তুলে দিতেই ভায়লা বাচ্চাটাকে বুকের উপর চেপে ধরে।

বাচ্চাটা আর একবার কেঁদে ওঠে।

বুকের ওপরে ধরে দোলা দিতে দিতে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে ভায়লা বাচ্চাটাকে।

কোথায় পেলি রে?

দরিয়ায়।

এটা, এটা কিন্তু আমার—

তোরই তো।

কাউকে কিন্তু আর দেবো না।

দিস না।

না দেবো না। এ বাচ্চা আমার, আমার—বলতে বলতে কেবিনের ভিতরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই এতক্ষণে হঠাৎ পাটাতনের ওপরে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল ভায়লা।

স্ত্রীলোকটির জ্ঞান তখনো ফেরে নি।

সিক্তবস্ত্র, আলুলায়িতকুন্তলা, পাটাতনের ওপরে তখনো পড়ে আছে স্ত্রীলোকটি। পূর্ণ যুবতী। যৌবনপুষ্ট দেহে সিক্ত শাড়ি লেপটে আছে, কিছুটা স্থানচ্যুতও হয়ে গিয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ভায়লা ভূলুণ্ঠিতা সেই জ্ঞানহীনা নারীর দেহের দিকে তাকিয়ে। কয়েকটা মুহূর্ত কোন বাক্য সরে না তার মুখ থেকে।

তার পর এক সময় মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে, ও কে?

রোজারিও বলে, জানি না, দরিয়ায় ভেসে যাচ্ছিল তুলেছি। ওরই পিঠে বাচ্চাটা বাঁধা ছিল।

কেমন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে ভায়লা চেয়ে থাকে সেই ভূলুণ্ঠিতা নারীর দিকে। ঐ সময় বুকের মধ্যে বাচ্চা ছেলেটা আবার কেঁদে ওঠে।

॥ ২ ॥

ভায়লা তাড়াতাড়ি সেই শিশুটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

ভিজে জামায় এতক্ষণ ছিল, তায় আবার পৌষের সেই প্রচণ্ড শীতে দেহে কাঁপুনি ধরেছে তখন বাচ্চাটার, তাই আবার কেঁদে ওঠে।

বুকের মধ্যে দোলাতে দোলাতে ক্রন্দনরত বাচ্চাটাকে ভায়লা রোজারিওর দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কেবিনে যাচ্ছি—বাচ্চাটাকে ভাল করে গা মুছিয়ে কিছুক্ষণ অন্তত আগুনের তাপ দিতে হবে। ভায়লা নিজের কেবিনের ভিতরে চলে গেল।

অচেতন সেই নারীদেহ তখনো তেমনি নাওয়ের কাঠের পাটাতনের ওপরে অসহায়ভাবে পড়ে ছিল। রোজারিও সেই অচেতন দেহটার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল।

কাপ্তান!

অ্যাঁ। ডি'ক্রুজের ডাকে চমকে ওর মুখের দিকে তাকায়।

কাপ্তান!

ইয়েস্ ডি'ক্রুজ।

এটাকে তাহলে দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দিই?

দরিয়ার জলে? না, না—

তবে কি করবে ওকে নিয়ে?

কি করবো? অন্যমনস্কের মতই যেন নিজেকে নিজে প্রশ্নটা করে রোজারিও।

হ্যাঁ, জ্ঞান ফিরে এলেই তো বাচ্চাটার খোঁজ করবে, তারপর হয়ত চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। তার চাইতে টেনে দরিয়ার জলে ফেলে দিই, লেঠা চুকে যাবে।

না। মৃদুকণ্ঠে বলে রোজারিও।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই রোজারিওর মুখের দিকে তাকাল ডি'ক্রুজ। মৃদুকণ্ঠে শুধাল, তাহলে—

এক কাজ কর ডি'ক্রুজ।

কি?

ছোট ডিঙ্গিতে করে এমানুল্লাকে নিয়ে গিয়ে বালুর চরে ফেলে রেখে আয়।

আসলে রোজারিওর মনের মধ্যে অচেতন ভূলুণ্ঠিতা ঐ নারী কেমন যেন একটা মমতা জাগায়। চিরদিনের নিষ্ঠুর মনটা যেন তার হঠাৎ নরম হয়ে যায়।

বাচ্চাটাকে তো ছিনিয়েই নেওয়া হলো, আবার প্রাণে মারা কেন।

কাপ্তান রোজারিওর প্রস্তাবে ডি'ক্রুজ কিন্তু একটু অবাকই হয়। একে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার উপর ওকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই ভবিষ্যতের জন্য একটা জট পাকিয়ে রাখা।

কিন্তু আমি বলছিলাম কাপ্তান, ওটাকে একেবারে শেষ করে দিলেই হতো না?

না রে না। যা বলছি তাই কর। চল, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। বলতে বলতে রোজারিও নিজেই নীচু হয়ে সেই সিক্তবস্ত্রে ভূলুণ্ঠিতা নারীর অচেতন দেহটা কাঁধের উপরে তুলে নিল দু'হাত দিয়ে।

চল ডি'ক্রুজ।

পূবের অন্ধকার আকাশটায় তখন একটু একটু করে আলোর ছোপ ধরছে। বালুর চরে এসে ডিঙ্গি লাগালো এমানুল্লা। সেই নারী তখনো অচেতন। রোজারিও অচেতন নারী-দেহটা ডিঙ্গির খোল থেকে তুলে নিল কাঁধের ওপরে।

ঢেউয়ের তালে তালে ছোট ডিঙ্গিটা এমনভাবে দুলছে যে, কাঁধের ওপরে অমন একটা ভারী বোঝা নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা সত্যিই কঠিন, রোজারিও তাই কোন

মতে টলতে টলতে ডিঙ্গি থেকে জলের মধ্যে নামল, তারপর এগিয়ে গেল পাড়ের দিকে।

জলের কিনারা থেকে বেশ কিছুদূর গিয়ে বালুর উপর ধীরে ধীরে অচেতন নারী-দেহটা নামিয়ে সযত্নে শুইয়ে দিল। বোধ হয় তখন সেই নারীর লুপ্ত চৈতন্য ক্রমশঃ ফিরে আসছে।

বালুর ওপরে শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায় রোজারিও।

অত্যাসন্ন রাত্রিশেষের আবছা আলো-আঁধারে আর একবার তাকাল সেই বালুর ওপরে শায়িত অচেতন নারীর মুখের দিকে। গায়ের সিক্ত বস্ত্র জায়গায় জায়গায় লেপটে আছে, আবার জায়গায় জায়গায় এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। মাথার কালো চুলের রাশি অযতনে বালুর ওপরে লুটিয়ে পড়েছে।

ডিঙ্গি থেকে ডি'ক্রুজের আহ্বান শোনা গেল, কাপ্তান—

হ্যাঁ, যাই।

রোজারিও দ্রুত পায়ে গিয়ে ডিঙ্গিতে উঠে বসল। এবং রোজারিও ডিঙ্গিতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই এমাহুল্লা হাতের ছোট দাঁড়টা দিয়ে জলের তলায় মাটিতে একটা সবল হাতের ধাক্কা দিয়ে ডিঙ্গিটা পুনরায় স্রোতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল এবং আরো কিছুক্ষণ পরে দেখতে দেখতে রাত্রিশেষের আলো-ছায়ায় ছোট ডিঙ্গিটা যেন নদীর বুকে মিলিয়ে গেল।

আরো মিনিট দশেক পরে 'আঃ মাগো' অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করে পাশ ফিরল সুলোচনা।

সত্যিই লুপ্ত চেতনা ফিরে আসছিল নদীর ধারের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু একটু করে তখন সুলোচনার।

হতভাগিনী সুলোচনা।

বিবাহের পর দীর্ঘ ছয় বছর কোন সন্তান হলো না বলে, শ্বশুর ও স্বামীর বংশ রক্ষা হলো না বলে, কত লজ্জা অপমান ও তিরস্কারের ও লাঞ্ছনার গ্লানিই না তাকে সহ্য করতে হয়েছে।

তারপর গঙ্গাদেবীর কাছে মানত করে দীর্ঘ ছয় বছর বাদে যখন ছেলে হলো, তাও বুঝি নতুন করে সূচনা জাগালো আর এক মর্মন্তুদ অভিশাপের।

বেচারী! তখন কি করে জানবে, কি করে বুঝবে, দেবতার কাছে মুখের একটা তার সামান্য প্রতিশ্রুতিই শেষ পর্যন্ত আবার তার সমস্ত সৌভাগ্যকে, যে

সৌভাগ্যের আলো দীর্ঘ ছয় বছর পরে ক্ষণেকের জন্য মাত্র তার ভাগ্যাকাশে উঁকি দিয়েছিল, উঁকি দিয়েই সেটা মেঘে ঢাকা পড়বে।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল সুলোচনা মা গঙ্গার কাছে, মাগো, সন্তান দে মা, বন্ধ্যার এই কলঙ্ক থেকে আমাকে মুক্তি দে! আমি প্রতিজ্ঞা করছি মা, আমার প্রথম সন্তান তোকে আমি দেবো।

দেবতা বোধ হয় অলক্ষ্যে মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে হাসলেন।

বছর না ঘুরতেই সন্তানসম্ভাবিতা হলো সুলোচনা। এবং দীর্ঘকাল পরে বহু প্রত্যাশিত বহু আকাঙ্ক্ষিত হরনাথ মিশ্রের স্ত্রী সুলোচনার সন্তানসম্ভাবনায় এবং তারই আনন্দে মিশ্র-গৃহের সকলেই বুঝি ভুলে গেল দেবতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথাটা।

এবং আশ্চর্য দশমাস দশদিনের মধ্যে কারো একটিবার সে কথাটি তো মনে পড়লই না, এমন কি যে পুত্র জন্মাল সুলোচনার, সেই পুত্র ক্রমে দেড় বৎসর প্রায় বয়স হলো, তবু কারো মনে পড়ে না, যে পুত্রকে নিয়ে তারা সকলেই আনন্দে মেতে উঠেছে, সেই পুত্রের উপর তাদের কোন অধিকার নেই।

দেবতাকে উৎসর্গীকৃত সে সন্তান। দেবতার দেওয়া আশীর্বাদ দেবতাকেই তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। দেবতার কাছে অঙ্গীকার করা রয়েছে তাদের। নবদ্বীপে পণ্ডিত-অগ্রগণ্য রামানন্দ মিশ্রের একমাত্র পুত্র হরনাথ মিশ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। কালীতারা, নয়নতারা, জয়তারা প্রভৃতি পাঁচ কন্যার পর পুত্র হরনাথ। সেই একমাত্র পুত্রের জন্য রামানন্দ মিশ্র অনেক অনুসন্ধান করে কৃষ্ণনগরের এক গরীব ব্রাহ্মণের ঘর থেকে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী সুলোচনাকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন।

ঘর আলো করা পুত্রবধূ। যেমন রূপ তেমনি গুণ। বধূর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। কিন্তু একটি দুটি করে চারটি বছর গড়িয়ে গেল; সুলোচনা যখন মাতৃত্বের দ্বারা মিশ্র-বংশকে পুন্নাম নরক থেকে রক্ষা করবার কোন সম্ভাবনাই দেখাতে পারল না, গৃহে একে একে সকলেরই মুখে চিন্তার রেখা পড়ল।

চিন্তা শেষ পর্যন্ত অসন্তোষে পরিণত হতে লাগল। কিন্তু ভাগ্যের ওপরে তো কোন হাত নেই। মানুষ ভাগ্যের ক্রীড়নক। মিশ্রগৃহিণী জগদ্ধাত্রী দেবী পুত্রবধূর সন্তানলাভের কামনায় সত্যি সত্যিই যেন এবারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

জপ তপ, স্বস্ত্যয়ন, দেবতার আশীর্বাদী প্রসাদী ফুল, কবচ—চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না জগদ্ধাত্রী দেবী কিন্তু ক্ষীণতম আশার আলোটুকুও দেখা গেল না।

আরো একবছর অতিবাহিত হলো। অভাগিনী সুলোচনার সুন্দর মুখখানি

যেন ভয়ে, অপমানে, লজ্জায় ও ব্যর্থতায় এতটুকু হয়ে গেল।

জগদ্ধাত্রী বললেন, পুত্রের আবার বিবাহ দেবেন। এবং কথাটা অর্থাৎ তাঁর মনোগত বাসনা একদিন তিনি পুত্র হরনাথের কাছে প্রকাশ করলেন।

গৃহেই টোল রয়েছে। পিতা পুত্র সেই টোলেই অধ্যাপনা করেন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে টোলের অধ্যাপনা সাঙ্গ করে গৃহাভ্যন্তরে এসেছে হরনাথ, জগদ্ধাত্রী দেবী পুত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হর—

কি মা?

আমার এবং তোমার জন্মদাতার ইচ্ছা—তুমি আবার দার-পরিগ্রহ কর।

কথাটা বেশ কিছুদিন ধরেই যে গৃহমধ্যে নানাভাবে আলোচিত হচ্ছিল এবং হরনাথের কানেও যে আসে নি তাও নয়। এবং একদিন যে তার কাছেই সোজাসুজি প্রস্তাবটা আসবে তাও সে জানত। কিন্তু এতটুকু গুরুত্বও দেয় নি হরনাথ সেই আলোচনাকে। কারণ দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ যে সে এ জীবনে করতে পারবে না, তার পক্ষে চিন্তারও অতীত, এইটুকু হরনাথ জানত।

মায়ের প্রস্তাবে তাই হাসিমুখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতকণ্ঠে বললে—হঠাৎ এমন উদ্ভট ইচ্ছা তোমাদের মনে জাগল কেন মা?

বড়বোন কালীতারা কিছুদিন হলো পঞ্চমবার সন্তানসম্ভাবিতা হয়ে পিতৃগৃহে এসে অবস্থান করছিল। সে আড়ালেই ছিল। হরনাথের কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, উদ্ভট ইচ্ছাটা এর মধ্যে কোথায় দেখলে ভাই? সংসারে থাকতে গেলে ধর্ম শাস্ত্র সবকিছু মেনে চলতে হবে তো?

পূর্ববৎ মৃদু হেসে হরনাথ জবাব দেয়, ধর্ম ও শাস্ত্র বুঝি বলে, দিদি, সংসারে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে থাকতেই দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করা?

সে স্ত্রী রুগ্না বা নিষ্ফলা হলে বলে বৈকি। কালীতারা জবাব দেয়।

রুগ্না সে নয়, তাছাড়া সে যে নিষ্ফলাই—তার এই সতের বছর বয়সেই বা প্রমাণিত হয়ে গেল কি করে অবিসংবাদী ভাবে।

অ মা। দাদা কি বলে শোন। বৌয়ের ঐ বয়সে আমার দুর্গা, শ্যামা হয়ে গেছে মা। কালীতারা টিপ্পনী কেটে ওঠে।

জগদ্ধাত্রী বলেন, না হর, কালী ঠিক কথাই বলেছে। তাছাড়া এক গণ্ডূষ জলের অভাবে তোর ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষ কুম্ভীপাক নরকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সর্বক্ষণ পাক খেয়ে বেড়াবে—এই কি তুই চাস?

কিন্তু মা, এক স্ত্রী বর্তমানে শুধু তার সন্তান হলো না বলে আর এক স্ত্রী ঘরে

নিয়ে আসবো—এই বা কেমন যুক্তি তোমাদের।

তুমি তো সুখের জন্য, স্বার্থের জন্য করছো না বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ। ধর্মের জন্য করছো।

তাছাড়া এতে অন্যায়টাই বা কি আছে দাদা। কালীতারা যোগ দেয়, বাবার মুখেই তো শুনেছি বংশরক্ষার জন্য তাঁর পিতা চার-চারবার বিবাহ করেছিলেন। এ তো সংসারে আকছারই হচ্ছে।

হ্যাঁ, বাবা—তুই আর অমত করিস নে। আমি পাত্রী দেখেছি—হরিহর ন্যায়রত্নের সর্বসুলক্ষণা একটি কন্যা আছে—তার সঙ্গেই সামনের অগ্রহায়ণে আমি তোর বিয়ে দেবো।

হরনাথ মা বা ভগ্নীর সঙ্গে আর তর্ক করে না। সে তখনকার মত সেখান থেকে প্রস্থান করে, কিন্তু দু-চারদিন যেতেই হরনাথ বুঝতে পারে সহজে সে নিষ্কৃতি পাবে না। মাতা ও ভাগিনী বদ্ধ-পরিকর। এমন কি তার পিতা রামানন্দ মিশ্রও যে ব্যাপারটার পূর্ণ সমর্থন করেছেন তাও সে বুঝতে পারে। হরনাথ কি করবে বুঝতে পারে না। বেচারী নিরপরাধিনী সুলোচনা কি দোষ করেছে যে, হরনাথ তার উপরে এমন অন্যায় করবে। কিন্তু সেই সুলোচনাও যখন নিভৃতে শয়নকক্ষে গভীর রাত্রে স্বামীকে সেই কথাই বললে, হরনাথের বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না। কয়েক মুহূর্ত তার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বের হয় না। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে স্ত্রীর মুখের দিকে।

কি বলছো তুমি সুলোচনা?

কেন, অন্যায় কি বলছি?

অন্যায় নয়?

কেন, অন্যায় হবে কেন? মা, ঠাকুরদিদি তো ঠিকই বলেছেন। আমার জন্য তোমার উর্ধ্বতন সাত পুরুষ পুন্নাম নরকগামী হবেন আর অভাগী আমি জেনে শুনে সেই পাপের ভাগী হবো। না, না—তুমি বিবাহ কর—

সুলোচনা!

হ্যাঁ, তুমি বিবাহ কর।

পারবে তুমি সহ্য করতে?

কেন পারবো না?

কেন পারবে না তা নয়, আমি জিজ্ঞাসা করছি পারবে কি না। মুহূর্তকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হরনাথ বলে, তুমি পারলেও, জেনো আমি পারব না সুলোচনা। জেনে শুনে আমি আমার সহধর্মিণীর উপর এত বড় অন্যায় করতে

পারবো না।

কিন্তু হরনাথের সমস্ত দৃঢ়তা যেন বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে যায়, যখন শেষ পর্যন্ত পিতা রামানন্দ একদিন পুত্রকে ডেকে সামনে বসিয়ে বললেন, বসো হরনাথ।

রামানন্দ মিশ্র চিরদিন অত্যন্ত রাশভারী লোক এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলতে হরনাথ কখনো পারে নি। চিরদিন পিতার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনলেই হরনাথের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠতো। তাই পিতার সামনে এলেও পিতা তাকে বসতে বললেও সে বসতে পারে না। অল্পদূরে সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

নিজের কক্ষে একখানি ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসে সাংখ্যদর্শন পাঠ করছিলেন রামানন্দ মিশ্র। বইখানি মুড়ে রেখে পুনরায় পুত্রের দিকে তাকালেন।

তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা তুমি আবার দার-পরিগ্রহ কর।

হরনাথ জবাব দেবে কি সে তখন রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে।

আমি জানি হরনাথ, বধূমাতার দিক হতে এটা সত্যিই নিতান্ত অবিচার করা হচ্ছে, আমাদের কিন্তু সংসারে থেকে সংসারধর্ম পালন করতে হলে বহুক্ষেত্রে আমাদের অনন্যোপায় হয়েই এবং ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছুকে স্বীকার করে নিতে হয়।

হরনাথ যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল তেমনই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামানন্দ বলতে লাগলেন, এক্ষেত্রে তোমার মানসিক চাঞ্চল্যের কথাটাও যে আমার মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু কি করবে বলো! কত আশা করে নিজে পছন্দ করে একদিন মা লক্ষ্মীকে গৃহে এনেছিলাম, আজ বুঝি আমারও তার সামনে গিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াবার সাহস নেই। কি করবো, আমারও যে হাত পা বাঁধা। আমিও যে নিরুপায়। গাঢ় হয়ে আসে শেষের দিকে রামানন্দ মিশ্রের কণ্ঠস্বর। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। সাংখ্যদর্শনের পুঁথিখানা আবার খুলে তারই পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করলেন।

চিরদিন মিতবাক রামানন্দ মিশ্র। পুত্র হরনাথ বুঝতে পারে তাঁর যা বলবার ছিল পুত্রকে বলা হয়ে গিয়েছে।

হরনাথও তাই ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে এবং শেষ পর্যন্ত গৃহে বিবাহের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলোচনাকে বুঝি ভগবানই রক্ষা করলেন। বিবাহের সব যখন স্থির হতে চলেছে, সহসা এমন সময় আবিষ্কৃত হলো সুলোচনা সন্তানসম্ভবা। মিশ্র-গৃহে যেন একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

রামানন্দ মিশ্র নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিবাহ ভেঙে দিলেন। অনেকে নানা মন্তব্য করতে লাগল কিন্তু রামানন্দ কারো কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। তারপর নির্দিষ্ট দিনে সুলোচনা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। কালো কষ্টিপাথরের মতই অপূর্ব রূপলাবণ্যময় এক পুত্র।

রামানন্দ সানন্দে পৌত্র-মুখ দর্শন করে বললেন, গোপাল, আমার ঘরে স্বয়ং গোপাল এসেছে গিন্নী।

পৌত্রের নামকরণ করলেন নিজেই—গোপাল মিশ্র।

সকলেরই মনে আনন্দের হাসি, একমাত্র সুলোচনার মুখেই হাসি নেই। এত কষ্টের এত সাধের সন্তান, তবু তো এর ওপরে কোন অধিকারই নেই মা হয়েও তার। মা গঙ্গার কাছেই মানত করা প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ তার ঐ সন্তান। প্রথম সন্তানকে সে সাগরে বিসর্জন দেবে। সে যে নিজ মুখে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে।

কথাটা যে গৃহের অন্য সকলে জানত না তা নয়, সকলেই জানত। কিন্তু তথাপি আনন্দের মধ্যে কারো যেন সে প্রতিজ্ঞার কথা মনেই পড়ে না।

সকলের স্নেহ ও পর্যাপ্ত ভালবাসায় গোপাল বড় হতে লাগল। গোপাল বৃদ্ধি পাচ্ছে মিশ্রগৃহে যেন শশিকলার মত দিনে দিনে। ক্রমে সে হামা দিতে শেখে এবং আরো কিছুদিন পরে টলমল পায়ে হাঁটে। মায়ের চোখ জুড়িয়ে যায়।

গোপাল, আমার গোপাল। নন্দদুলাল, নন্দকিশোর। কিন্তু গোপালের যখন মাত্র চৌদ্দ মাস বয়েস, মিশ্র-গৃহে কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল।

হরনাথ কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। কবিরত্ন আসেন, ঔষধ দেন, কিন্তু কোন ফল দেখা যায় না। চিন্তায় সকলের মন কালো হয়ে যায়। এমন সময় একদিন এলেন মিশ্রদের কুলগুরু সর্বেশ্বর পাঠক। এবং কুলগুরুই একদিন যেন বজ্রনির্ঘোষে জানালেন—হরনাথের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

জগদ্ধাত্রী কেঁদে পড়লেন, কি বলছেন গুরুদেব!

হ্যাঁ, দেবতার কাছে তোমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছো।

সে কি!

কেন! মনে নেই তোমাদের মা গঙ্গার কাছে তোমার পুত্রবধূ সন্তান কামনা করে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তাঁর আশীর্বাদে সন্তান হলে সেই প্রথম সন্তানকে সে সাগরে বিসর্জন দেবে?

কুলগুরুর কথায় সকলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো সেই ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার কথা। এখন তাহলে উপায় ?

অবিলম্বে মানত পালন কর, তাহলেই হরনাথ সুস্থ হয়ে উঠবে।

জগদ্ধাত্রী যেন পাষাণ হয়ে যায়।

একি সর্বনেশে কথা। গোপাল তাদের এত আদরের বংশধর, গোপালকে সাগরের জলে বিসর্জন দিতে হবে! একি সমস্যা। একি সংকট! একদিকে তার প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রের জীবন, অন্যদিকে তার এত আদরের বংশধর।

সুলোচনাও শুনলো সব কথা। সে যেন পাথর হয়ে গেল।

গৃহদেবতার সামনে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো অভাগিনী জননী, দেবতা, তবে কি তাই তোমার মনোগত বাসনা ? আমার গোপালকে না নিয়ে তুমি কিছুতেই তৃপ্ত হবে না ? বল ঠাকুর, বল—মায়ের মুখের কথাটুকু কি কেবল তুমি শুনেছো দেবতা, অন্তরের কথা কি শোননি! নিজে দিয়ে আবার তুমি নিজেই কেড়ে নেবে!

হরনাথ কিন্তু বললে সুলোচনাকে, না, না—এ হতে পারে না সুলোচনা। গোপাল, আমাদের গোপালকে তুমি সাগরে বিসর্জন দিও না।

স্বামীর পায়ের উপরে উবুড় হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সুলোচনা বলে, দাও, তুমিই বলে দাও কি করি—এ যে দেবতার রোষ—

না, না—দেবতার রোষ নয়। এ আমাদেরই অন্ধ কুসংস্কার—কুসংস্কার!

কুসংস্কার!

হ্যাঁ, নইলে কেড়েই যদি নেবেন তো তোমাকে আমাকে ঐ সন্তান দেবেন কেন ? কারো কথায় তুমি কর্ণপাত করো না।

কিন্তু তুমি—

আমার যদি মৃত্যু এসে থাকেই—

সহসা দু'হাতে স্বামীর মুখ চেপে ধরে স্বামীর বুকের ওপরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সুলোচনা, বলো না, বলো না গো, ওকথা বলো না—বলো না—।

॥ ৩ ॥

সুলোচনার সেদিন মনে হয়েছিল সর্বেশ্বর পাঠক, মিশ্র-গোষ্ঠীর কুলগুরু যেন ভয়াবহ এক অভিশাপ হয়ে মিশ্রগৃহে এসে আবির্ভূত হয়েছেন।

মঙ্গল আনেন নি, এনেছেন অভিশাপের কালো ছায়া। মিথ্যা মনে হয় নি কথাটা সেদিন সুলোচনার, সত্যি তার জীবনে অভিশাপেরই সূচনা এসেছিল।

ব্যাধিগ্রস্ত হরনাথ, শয্যাশায়ী হরনাথ যাই বলুক না কেন, গৃহের অন্যান্য

যখন একমত, তার কথায় কেউই কর্ণপাত করলো না।

অত্যাসন্ন মকরসংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমে গোপালকে বিসর্জনের তোড়জোড় সব চলতে লাগল। কথা হয়েছিল পাড়ারই এক বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে গোপালকে পাঠানো হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলোচনা সে প্রস্তাবে বেঁকে বসল।

সে বললে, দেবতাকে দেওয়া জিনিস যদি ফিরিয়ে দিতেই হয়, দেবতার রাক্ষসীক্ষুধা যদি তার দেওয়া আশীর্বাদটিকেই গ্রাস করে না মেটে তো সে নিজে হাতেই বিসর্জন দিয়ে আসবে তার গোপালকে দেবতার মুখবিবরে। দেবতার গ্রাস নিজ হাতেই সে তুলে দিয়ে আসবে তার গোপালকে।

জগদ্ধাত্রী শুনে বললেন, না, না—সে কি করে হবে। বৌমা কি করে যাবেন।

কালীতারাও আপত্তি তোলে, কিন্তু সুলোচনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে যাবেই।

অবশেষে রামানন্দই বললেন, ঠিক আছে, বৌমা যখন যেতে চাইছেন, তাই হোক। সেই ব্যবস্থাই কর তোমরা। এবং রামানন্দের আদেশে সেই ব্যবস্থাই হলো।

নবদ্বীপ থেকে একদল যাত্রী যাবে, স্থির হলো সুলোচনাও গোপালকে নিয়ে তাদের সঙ্গেই যাবে।

ব্যাপারটার মধ্যে কাকতালীয় কি ছিল কে জানে, গোপালকে সাগরে বিসর্জন দেওয়া স্থির হওয়ার পর থেকেই দেখা গেল, আশ্চর্য—হরনাথ ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হয়ে উঠছে। এবং সাগর-যাত্রার দিন দুই আগে যে হরনাথ দীর্ঘদিন ধরে বলতে গেলে শয্যাশায়ী ছিল সে শয্যার উপরে উঠে বসেছে।

গৃহে সকলেরই মনে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে।

কেবল মুখে হাসি টেনে আনলেও সুলোচনার বুকের ভিতরটা কান্নায় গুমরাতে থাকে। গোপালকে নিভৃত রাত্রের শয্যায় বুকের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরে মনের মধ্যে কেঁদে কেঁদে বলে, ওরে সোনা, কেন এসেছিলি এই হতভাগীর গর্ভে। কেন এসেছিলি এমন রাক্ষসী মায়ের গর্ভে, যে মা তার পেটের সন্তানকে রক্ষা করতে পারে না। পেটের সন্তানকে যে মা সাগরের জলে ভাসিয়ে দেয়।

এমন কি আশ্চর্য, যে হরনাথ মাত্র কিছুদিন পূর্বেও স্ত্রীকে বলেছে, এ হতে পারে না সুলোচনা, সাগরে ওকে তুমি বিসর্জন দিও না, এ দেবতার রোষ নয়, এ আমাদেরই অন্ধ কুসংস্কার—সেই হরনাথই আজ দীর্ঘদিনের রোগ থেকে ক্রমশঃ মুক্তির আনন্দে গোপালকে সাগরে বিসর্জন দেওয়ার কথা আর মুখেও আনে না।

সুলোচনায় বুঝতে বাকী থাকে না, আজ তার স্বামীরও তাদের একমাত্র সন্তানকে সাগরে বিসর্জন দিতে আপত্তি নেই। বাপ হয়ে নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে সন্তানের প্রতি মমতাও বুঝি মন থেকে আজ তার মুছে যায়। কালীতারা

তো বারবারই বলতে থাকে, গাছ বেঁচে থাকলে কত ফল আবার ধরবে, তার জন্য দুঃখ কি।

হরনাথের মনে হয়, সত্যিই তো, কালীতারা তো মিথ্যা বলছে না।

বেশ, তবে তাই হোক। সুলোচনা মনে মনে বলে, গোপালকে সে সাগরেই দিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে সুলোচনা যাত্রা করে গোপালকে বুকে নিয়ে অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে নৌকায়। যাত্রীদের মধ্যে সবাই বয়স্ক এবং বয়স্কা। একমাত্র অল্পবয়সী বধূ সুলোচনা। যাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের ভালমন্দর ভার পড়েছিল সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ কুলদাচরণ শাস্ত্রীর উপরে।

কুলদাচরণের বয়স ষাট উত্তীর্ণ হলেও দেহের বাঁধন বেশ তখনো অটুট। দীর্ঘকায়। গৌরবর্ণ। রামানন্দ মিশ্রেরই দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী।

নিজগৃহে একটি চতুষ্পাঠী ও কিছু যজমান, তাইতেই তাঁর সংসার বেশ সচ্ছলভাবে চলে যায়। সংসারে একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী জগত্তারিণী। কোন সন্তানাদি হয় নি। ছাত্ররাই তাঁর সন্তানের মত।

কুলদাচরণকে যাত্রার পূর্বে বার বার বলে দিলেন রামানন্দ মিশ্র, বধূমাতাকে যেন সর্বক্ষণ চোখে চোখে তিনি রাখেন। এবং একমাত্র তাঁর ভরসাতেই তিনি তাঁর পুত্রবধূকে যেতে দিচ্ছেন অতদূরের পথ।

কুলদাচরণ মৃদু হেসে বললেন, কোন ভয় নেই তোমার মিশ্র, বধূমাতাকে নির্বিঘ্নেই এনে তোমার গৃহে পৌঁছে দেবো।

দীর্ঘ পথ। পথে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাই পাড়ার শ্রীমন্ত ঘোষালকে সঙ্গে নিয়েছিলেন কুলদাচরণ। দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলে শ্রীমন্ত ঘোষাল। অসুরের মত চেহারাটি যেমন তেমনি দেহের শক্তিও আসুরিক। চিরদিনের ডানপিটে স্বভাব। লেখাপড়া বিশেষ কিছু হয় নি। লাঠি খেলে, কুস্তি করে এবং বাঁশী বাজিয়ে দিন কাটে।

বাপ অবিশ্যি স্বনামধন্য একজন পণ্ডিত। রঘুনাথ বেদান্ততীর্থ।

রঘুনাথ বেদান্ততীর্থ অনেক চেষ্টা করেছিলেন ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে, কিন্তু সক্ষম হন নি।

আট-দশটি স্ত্রীলোক নিয়ে কুলদাচরণ মাঝিমাল্লা ও শ্রীমন্তর ভরসায় গঙ্গাসাগর তীর্থের উদ্দেশে তরী ভাসালেন। পথ বড় কম নয়, প্রায় দিন দশেকের পথ।

পথে বিশেষ কোন রকম বিপদ-আপদই দেখা দিল না। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলো

কুলদাচরণ যখন সাগর-সঙ্গমের কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছেন এবং মাত্র এক-রাত্রির পথ যখন উত্তীর্ণ হতে বাকী। এবং দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল তাঁর অজ্ঞাতেই।

শ্বশুর-গৃহের সকলের প্রতি এবং বিশেষ করে স্বামীর প্রতি একটা প্রচণ্ড অভিমানের বশেই তার গোপালকে নিয়ে সাগরযাত্রার পথে ভেসেছিল সুলোচনা। ঠিক আছে, তার গোপালকে কেউ যখন চায় না, গোপালকে সে সাগরের জলেই ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু সাগর-সঙ্গম যত নিকটবর্তী হতে থাকে, মনের মধ্যের সেই প্রচণ্ড অভিমানটা যেন মাতৃস্নেহের প্রাবল্যে কোথায় ভেসে যায়।

গোপাল বেশ সুলোচনাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে থাকে।

গোপালের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দু'চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। মনে হতে থাকে, কেন, কেন সে ঐ অন্যায়কে, জবরদস্তিকে মেনে নেবে। দেবতার কাছে সে ভিক্ষা চেয়েছিল একটি সন্তান এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু দেবতা কি সেদিন এক বন্ধ্যা নারীর ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্যে তার চিরন্তন মায়ের মনটিকে বুঝতে পারেন নি? দেবতা কখনোই এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। এ সবই মানুষের অন্ধ কুসংস্কার।

দেবে না কিছুতেই সে তার গোপালকে, সাগরজলে নিক্ষেপ করবে না। কথাটা যত সুলোচনা ভাবে ততই যেন সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়। দেবে না, কিছুতেই সাগরজলে ভাসিয়ে দেবে না তার নয়নের মণি গোপালকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যারা সঙ্গে এসেছে, তারা যদি জোর করে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয় তার গোপালকে—তখন সে কি করবে। অবশেষে হঠাৎ মনে হয় সুলোচনার, সে যদি পালিয়ে যায় গোপালকে নিয়ে কোথাও। দূরে, অনেক দূরে! তবে তো আর কেউ জোর করে তার গোপালকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

কিন্তু কোথায় পালাবে? চারিদিকে জল আর জল। তাছাড়া এতগুলো মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে সে পালাবেই বা কোথায়?

আবার মনে হয় সুলোচনার, জল—তাতে ভয়ের কি আছে! সে তো সাঁতার জানে। গোপালকে বুকে করে সে সাঁতরে কোথাও না কোথাও গিয়ে উঠতেই পারবে। তারপর কি সে একটা আশ্রয় খুঁজে পাবে না? তাই করবে সুলোচনা।

কিন্তু যেখানে আশ্রয় নেবে, তারা যদি তাকে না ক্ষমা করে? যদি বলে দেবতার জিনিস তুই কোন্ দুঃসাহসে ফিরিয়ে নিয়ে এলি, তখন? কি জবাব দেবে সে তখন? কিন্তু সে যদি তার গোপালকে সেখানে ফেলে রেখে চলে আসে গোপনে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা এত নিষ্ঠুর হবে না যে গোপালকে মেরে ফেলবে।

সুলোচনা অনেক ভেবে একটা চিঠি লিখল নৌকার মধ্যে বসে গোপনে। তারপর চিঠিটা একটুকরো ন্যাকড়ার মধ্যে বেশ করে জড়িয়ে বেঁধে দিল গোপালের কুর্তার সঙ্গে।

সুলোচনা তারপর সকলের দৃষ্টির অগোচরে এক রাত্রে কোন এক সময় যখন যাত্রীরা সকলেই ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন সে নিঃশব্দে নৌকা থেকে জলের মধ্যে ভেসে পড়ল।

কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে বুঝতে পারে নি সুলোচনা ব্যাপারটা কত দুঃসাধ্য। একে পৌষের নিদারুণ ঠাণ্ডা, তার উপরে পিঠের উপরে একটা বোঝা নিয়ে সেই ঠাণ্ডা জলে সাঁতরানো সত্যিই এক নারীর পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এবং সেটা সুলোচনা কিছুক্ষণ সাঁতরাবার পরেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। শুধু জল আর জল আর নিকষ কালো অন্ধকার।

ঠাণ্ডায় হাত পা সুলোচনার ক্রমশঃ যেন হিম-অসাড় হয়ে আসতে থাকে। হাত পা যেন আর চলে না। হাপরের মত শ্বাস নিচ্ছে সুলোচনা।

কিন্তু থামলে তো চলবে না। পিঠে বাঁধা যে তার গোপাল রয়েছে।

ইতিমধ্যে গোপাল ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল।

মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে সুলোচনার। অন্ধকার যেন আরো জমাট, আরো ঘনীভূত হয়ে তার দু'চোখের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিচ্ছে। পাথরের মতই যেন ভারী হয়ে ক্রমশঃ নিশ্চল হয়ে আসছে সুলোচনার হাত, পা, শরীর। পিঠের উপরে ঠাণ্ডা জলে ভিজে গিয়ে কাঁদছে গোপাল। তারপর আর মনে নেই কিছু সুলোচনার। সমস্ত চেতনার ওপরে যেন অন্ধকার নেমে এলো।

পাশ ফিরলো সুলোচনা। আর ক্রমশঃ একটু করে লুপ্ত চেতনা, লুপ্ত অনুভূতি ফিরে আসতে থাকে সুলোচনার।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চেতনা ফিরে আসতে থাকে সুলোচনার। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা স্মৃতি একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার পাশ ফেরে সুলোচনা। তারপরই অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকাল। অস্পষ্ট ভোরের আলোয় তাকাতে লাগলো সুলোচনা এদিক-ওদিক।

তাকালো, আরো ভালো করে তাকালো এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ মনে পড়লো গোপালের কথা। গোপাল? গোপাল কোথায়? উঠে বসেছে তখন সুলোচনা।

এ কি! পিঠের সঙ্গে যে শক্ত করে বাঁধা ছিল তার গোপাল। কোথায় গেল গোপাল? গোপাল?

পাগলের মতই যেন ভোরের আলোয় গোপালের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকায় সুলোচনা। গোপাল! কোথায় তার গোপাল! ভিজে কাপড়ে এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়ায় গোপালকে সুলোচনা। কিন্তু কোথায় গোপাল? ভোরের আলোয় চোখে পড়ে আশেপাশে শুধু ধু-ধু বালিয়াড়ী আর সামনে জল আর জল।

গোপাল! গোপাল! কেঁদে ফেলে সুলোচনা। কাঁদতে কাঁদতে বালুর উপরে লুটিয়ে পড়ে।

নেই। গোপাল তার নেই। নিশ্চয়ই কোন এক সময় বাঁধন আলগা হয়ে জলের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে গোপাল। হতভাগিনী সে জানতেও পারে নি। হায় রে! এত করেও তার গোপালকে সে বাঁচাতে পারল না।

জলের দিকে তাকিয়ে পাগলের মতই চেঁচিয়ে ওঠে একাকী সুলোচনা। রাক্ষসী, সত্যিসত্যিই তুই শেষ পর্যন্ত বাছাকে আমার ছিনিয়ে নিলি বুক থেকে। ছিনিয়ে নিলি মায়ের বুক থেকে তার সন্তানকে।

কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো সুলোচনা বালুর উপরেই। ফিরিয়ে দে, ওরে রাক্ষুসী, সর্বনাশী। ফিরিয়ে দে আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দে—।

ব্যাপারটা প্রথমে নৌকার মধ্যে জানতে পেরেছিল সৈরভী। শেষরাত্রের দিকে সহসা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ঠিক তার পাশেই সুলোচনা বা সুলোচনার সন্তানকে না দেখতে পেয়ে সৈরভীই প্রথমে ব্যাপারটা জানতে পারে।

সৈরভীর পাশেই ঠিক ক'দিন ধরে সুলোচনা তার সন্তান গোপালকে নিয়ে শুচ্ছিল। নৌকায় ওঠা অবধিই সুলোচনা যেন কেমন গম্ভীর শুব্ধ হয়ে ছিল। কারুর সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বলতো না। সর্বক্ষণই প্রায় বলতে গেলে ছেলে গোপালকে বুকের মধ্যে নিয়ে বসে থাকত চুপচাপ।

নৌকার মধ্যে দুটি কামরা। একটি বড়, একটি ছোট। বড়টির মধ্যে ছিল মেয়েরা এবং ছোট কামরাটায় থাকতেন শ্রীমন্তকে নিয়ে কুলদাচরণ। যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র সুলোচনা ছাড়া সকলেই বিধবা ও বর্ষীয়সী।

দিনে একবার করে নৌকা কোথায়ও পাড়ে লাগানো হতো। কোনমতে পাড়ে ইট-কাঠের সাহায্যে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার নৌকা ছাড়া হতো।

সকলেই একবেলা আহার করে, সাত্ত্বিক মানুষ কুলদাচরণও তাই। বিশেষ তাই

কোন অসুবিধা ছিল না। রাত্রে কোথায়ও নৌকা ভিড়াবার প্রয়োজন হতো না।

একমাত্র যাত্রীদের মধ্যে সধবা সুলোচনা, কিন্তু সে একবারই ভাল করে আহার করতো না তো দ্বিতীয়বার।

সৈরভী সুলোচনাদেরই পাড়ায় থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সুলোচনাকে জানত। অল্পবয়সে বিধবা। কুলীন-কন্যা সৈরভী। দশ বৎসর বয়সের সময় অকস্মাৎ এক রাত্রে সত্তর বৎসর বয়স্ক এক কুলীনরাজ স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিয়ের পরদিনই প্রত্যূষে স্বামী চলে যায়। তারপর আর চার বৎসর স্বামীর কোন সংবাদও পায় নি, স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূরের কথা। সংবাদ এলো একেবারে একদিন সন্ধ্যায়—স্বামীর মৃত্যুসংবাদ চার বৎসর পরে।

বিচিত্র জীবন সৈরভীর। কিন্তু আশ্চর্য, তবু সেজন্য সৈরভী কোনদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে নি বা নালিশ জানায় নি নিজের বিচিত্র ঐ ভাগ্যের জন্য কারো কাছে।

বাপ-মায়ের অনেকগুলি সন্তান এবং তার মধ্যে বোন ছিল ওরা পাঁচজন। সে পাঁচ বোনের মধ্যে তৃতীয়া। একে কুলীন-কন্যা, তার উপরে দারিদ্র্যের সংসার।

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পরিচয় তো জন্মাবধিই। নিজের বিচিত্র বিবাহ ও বৈধব্য তাই সৈরভীকে নতুন কোন দুর্ভাগ্যের স্বাদ দিতে পারে নি। তাছাড়া যে স্বামীকে সম্প্রদানের সময় মাত্র বারেকের জন্য স্পর্শ করলো, তারপর বার দুই ঘোমটার আড়াল থেকে বাসরঘরে দেখেছিল মাত্র এবং জীবনে যার সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার দেখাই হলো না, তার মৃত্যু—নারী-জীবনের তার যতবড় শোকাবহ ব্যাপারই হোক না কেন, সে শোক সৈরভীর মনের মধ্যে কোথায়ও যদি দাগ না কাটতেই পেরে থাকে তো সেজন্য সৈরভীকেও কি দোষ দেওয়া যায়?

সর্বাপেক্ষা বড় কথা হচ্ছে সমাজের কুসংস্কারগুলো নিজের জীবনের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় সৈরভীর মনের মধ্যে যেন একটা কঠিন ঘৃণা জমে উঠেছিল সমস্ত হিন্দু-সমাজ—তার ধর্মাধর্ম, সংস্কার ও বিধিবিধানগুলোর ওপরে এবং সেই ঘৃণাই সৈরভীর মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল নিবিড় একটা মমত্ববোধ অভাগিনী সুলোচনার প্রতি।

সুলোচনার সন্তানকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ও ধর্মের গোঁড়ামিতে সাগরজলে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে সৈরভী যেন কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ ঐ গোঁড়ামি ও অন্ধসংস্কারের যূপকাষ্ঠ থেকে সুলোচনার সন্তানকে বাঁচাবারও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

ঘুম ভেঙে শেষরাত্রের দিকে সুলোচনা ও তার সন্তানকে পাশে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল সৈরভী সত্যি, কিন্তু সেটা অন্য কোন কারণে নয়, কেন

যেন তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সুলোচনা নিশ্চয়ই তার সন্তানসহ জলে কোন এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন করেছে, সেই কারণেই।

নৌকার জানালা-পথে মুখ বাড়িয়ে দেখলো সৈরভী, নৌকা পালের হাওয়ায় তরতর করে বহে চলেছে। তাড়াতাড়ি সৈরভী নৌকার কামরার ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কুলদাচরণের খুব প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করে বাইরে এসে নদীর জলে হাত-মুখ ধুয়ে আহ্নিকে বসেছেন। সৈরভী এসে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, শাস্ত্রী ঠাকুর!

কে? চমকে তাকালেন কুলদাচরণ সেই কণ্ঠস্বরে।

সুলোচনা ও তার ছেলে গোপাল তো নৌকায় নেই।

সে কি!

হ্যাঁ, শাস্ত্রী ঠাকুর। তারা আমার পাশেই শুয়ে ছিল, কিন্তু এখন দেখছি তারা নেই।

নেই! নেই অর্থ কি? কোথায় যাবে তারা নৌকার মধ্যে থেকে?

তা বলতে পারছি না। তবে তারা নৌকার মধ্যে নেই।

না, না—এ যে অসম্ভব কথা। তুমি ভাল করে খুঁজে দেখেছো সৈরভী?

দেখেছি।

আর একবার দেখ। নিশ্চয়ই—

না, নেই তারা নৌকায়। তবু বলছেন যখন, আর একবার দেখছি। কথাটা বলে সৈরভী নৌকার কামরার মধ্যে আবার গিয়ে প্রবেশ করল। এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসতেই কুলদাচরণ ব্যগ্রকণ্ঠে শুধালেন, কি হলো?

না, নেই—

তবে কোথায় গেল তারা? আর গেলই বা কি করে? আমি যে ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না সৈরভী।

আমার মনে হয়—

কি? কি তোমার মনে হয়?

সে নিশ্চয়ই ছেলেকে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে—

আত্মহত্যা! রাধামাধব। রাধামাধব।

হ্যাঁ, আপনিই বলুন শাস্ত্রী ঠাকুর কোন মা কি তার নিজ সন্তানকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারে?

কিন্তু সেই জন্যই তো সে এসেছিল—

এসেছিল নয়, বলুন আপনারা তাকে ধর্মের দোহাই পেড়ে ভয় দেখিয়ে আপনাদের সঙ্গে আসতে বাধ্য করেছিলেন।

না, না—

তা ছাড়া কি! তার স্বামীর অমঙ্গল হবে, সংসারের অমঙ্গল হবে—এই সব সাত-পাঁচ বলেই না তাকে আপনারা ভয় দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু সে কথা যাক। এখন আমি মিশ্রের কাছে গিয়ে কি জবাব দেবো বল তো? সে যে আমারই ভরসায় পুত্রবধূকে তার সাগর-সঙ্গমে পাঠিয়েছিল। হে মাধব, এ কি দুর্বিপাকে ফেললে আমাকে! তারপর একটু থেমে কি যেন ভেবে বললেন, কিন্তু তবু—তবু আমাকে ভাল করে অনুসন্ধান করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তারণ মাঝিকে ডাকলেন কুলদাচরণ।

মাঝি তো কুলদাচরণের কথা শুনে অবাক। বললে, সে কি কর্তা, আমরা মাঝরাত্রে একবার কিছুক্ষণের জন্য নাও থামিয়েছিলাম বটে, জোয়ারের মুখে এবং বাতাস পড়ে গিয়েছিল বলে। কিন্তু সেও মাঝদরিয়ায়। তারপর তো সমানে বসে আছি হাল ধরে। নৌকায় তারা নেই যখন, কোন এক সময় নৌকা থেকে ঝাঁপিয়েই পড়েছে। জোয়ারের টান এখন—

তুমি এক কাজ করো তারণ, পাড় ঘেঁষে চল। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, চারিদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

কুলদাচরণের নির্দেশমত তারণ মাঝি পাড়ের দিকেই নৌকা টেনে নিয়ে চলল। ইতিমধ্যে নৌকার সমস্ত যাত্রীরাই ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিল।

নানা ধরনের মন্তব্য নানা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। ভোরের আলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চারিদিক বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নৌকা তীর ঘেঁষে ভেসে চলল। হঠাৎ একসময় হাল থেকে তারণ মাঝিই চেঁচিয়ে ওঠে—কর্তা, ঐ বালুর চরে কি দেখা যায় দেখেন।

কই, কোথায়?

ঐ—ঐ যে—আরে—ঐ তো আমাদের মা-ঠাকরুণ—

সত্যিই সে-সময় চোখের জল মুছে দাঁড়িয়ে উঠেছে সুলোচনা। গোপালই যখন তার জলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তখন কি হবে আর বৃথা জীবন রেখে।

সুলোচনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পায়ে পায়ে জলের মধ্যে নামতে শুরু করে। তারণ চেঁচিয়ে ওঠে, কর্তা, মা-ঠাকরুণ জলের মধ্যে নেমে যাচ্ছেন যে—

কুলদাচরণ চীৎকার করে ডাকেন—সুলোচনা! সুলোচনা!

কিন্তু কুলদাচরণের সে ডাক সুলোচনার কর্ণে প্রবেশ করে না। সে নেমে

চলেছে তখন গভীর জলের দিকে ক্রমশঃ।

সুলোচনা! সুলোচনা!

কুলদাচরণ ডাকেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাত্রীরাও চীৎকার করে ডাকতে থাকে, সুলোচনা সুলোচনা—

সুলোচনা কিন্তু তবু নেমে চলেছে।

সুলোচনার থেকে নৌকার ব্যবধান তখনও কিছুটা রয়েছে। কুলদাচরণ আর বিলম্ব করলেন না। নৌকা থেকে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঐ সময় সুলোচনাও জলের মধ্যে ডুব দিল। একেবারে সঙ্গমের কাছাকাছি বলতে গেলে জায়গাটা। একে জোয়ার তার উপরে জলের তীব্র স্রোত। বড় বড় ঢেউ। আথালিপাথালি করছে জল।

প্রায় মিনিট কুড়ি জলের সঙ্গে স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনমতে তারণ মাঝির সাহায্যে প্রায় হতচেতন সুলোচনাকে নৌকায় এনে তুললেন কুলদাচরণ। শুইয়ে দেওয়া হলো সুলোচনাকে নৌকার পাটাতনে। সব যাত্রীরা এসে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল।

॥ ৪ ॥

সুলোচনা চোখ মেলে তাকাল।

সৈরভীর চোখ দুটো আনন্দে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সে বলে, চেয়েছে চেয়েছে—

সুলোচনার সমস্ত দেহটা থর-থর করে কাঁপছে তখন। শাস্ত্রী ঠাকুর বললেন, একটা কম্বল এনে চাপা দাও ওর গায়ে।

সৈরভী তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে একটা কম্বল এনে সুলোচনাকে ঢেকে দেয় বেশ করে।

ক্রমশঃ তখন সকালের রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করে উঠছে। কম্বলটা চাপা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনা আবার চোখ বুজেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল।

শাস্ত্রী ঠাকুর তখন সৈরভী ও অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভিজে জামাকাপড়গুলো ওর গা থেকে খুলে শুকনো কিছু ওকে পরিয়ে দেওয়া দরকার। দেহেও কিছু আগুনের তাপ দিতে হবে। তোমরা ওকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে যেতে পার?

কথাটা বলে শাস্ত্রী ঠাকুর সকলের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু দেখা গেল সে ব্যাপারে একমাত্র সৈরভী ব্যতীত কারোরই যেন তেমন উৎসাহ নেই।

পৌষের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ে পর্যন্ত যেন কাঁপুনি ধরাচ্ছে।

শাস্ত্রী ঠাকুর প্রথমটায় কি করবেন যেন ভেবে পান না। তার পর বোধ হয় একটু ইতস্তত করেই মনস্থির করে ফেললেন, বললেন, সর দেখি তোমরা—সর—

সকলে একটু সরে গেল, যারা অচৈতন্য সুলোচনার চারপাশে তখন ভিড় করে ছিল।

সামনের দিকে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে পরম স্নেহে অতঃপর শাস্ত্রী ঠাকুর জ্ঞানশূন্য সুলোচনার শিথিল সিক্ত দেহটা বুকে তুলে নিয়ে নৌকার কামরার ভিতরে প্রবেশ করে কাষ্ঠ-পাটাতনের ওপরে শুইয়ে দিলেন।

সৈরভী সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। কুলদাচরণের কাণ্ড দেখে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সোমত্ত বৌকে কোথাকার কে এক নিঃসম্পর্ক পুরুষ বুকে করে তুলে নিল, ব্যাপারটা তাদের কাছে সত্যিই কল্পনার অতীত। কারো মুখ দিয়ে কোন সাড়া বের হয় না। কুলদাচরণ কিন্তু যেন ভ্রূক্ষেপই করলেন না। সৈরভীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ওর ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কিছু পরিয়ে দাও তো সৈরভী।

কথাটা বলে কুলদাচরণ কামরার বাইরে আবার চলে গেলেন। মাঝিরা তখনো নৌকা নোঙর করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারণকে নৌকা ছাড়বার নির্দেশ দিলেন এবারে কুলদাচরণ। তারণ নৌকা ছেড়ে দিল।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নৌকা গঙ্গাসাগরে এসে নোঙর করল। সুলোচনা তখন নৌকার মধ্যে প্রবল জ্বরে বেহুঁশ। সুলোচনার জ্ঞান ফিরল চার দিনের দিন, সন্ধ্যার দিকে প্রত্যাবর্তনের পথে।

সৈরভী মাথার কাছে বসেছিল সুলোচনার। এই কয় দিন সে সুলোচনার শিয়রের ধার থেকে কোথাও ওঠে নি। এমন কি দূরের পথ পাড়ি দিয়ে যে সাগর-সঙ্গমে স্নান করে অক্ষয় পুণ্যলাভের জন্য সে সঙ্গমে এসেছিল, সে স্নান পর্যন্ত করে নি সে।

নৌকার কামরার মধ্যে যে আলো জ্বলছিল সেই ম্লান আলোয় ও আব্‌ছা আঁধারে নৌকার কামরার ভিতরটা যেন থমথম করছিল।

সুলোচনা চোখ মেলে তাকাল। সুলোচনাকে তাকাতে দেখে সৈরভী তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে ডাকে, সুলোচনা!

কে ?

আমি সৈরভী।

একটু জল।

সৈরভী তাড়াতাড়ি ছোট একটা ঘটিতে করে জল এনে একটু সুলোচনার মুখে ঢেলে দিল। জলটা গিলে সুলোচনা আবার চোখ বুজলো। তারপর আবার মধ্যরাত্রে সুলোচনা চোখ মেলল। সৈরভী তখনো তার শিয়রের পাশে একই ভাবে বসে রয়েছে।

সৈরভী!

কি ?

গোপাল! সুলোচনার চোখের কোল দুটো জলে ভরে আসে। সে বলে, গোপাল, আমার গোপালকে বাঁচাতে পারলাম না সৈরভী!

সৈরভী সুলোচনার চোখের কোল দুটো সযত্নে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, ছিঃ, কাঁদে না। চুপ কর।

কিন্তু তোমরা কেন আমাকে জল থেকে তুলে বাঁচাতে গেলে ? কেন আমাকে মরতে দিলে না ? কেন—কেন ?

কত জন্মের পাপের ফলে মেয়ে হয়ে জন্মেছো। আত্মহত্যা করে কেন আবার নতুন করে পাপ বাড়াবে ?

কিন্তু সৈরভী বেঁচেই বা আমার কি লাভ হবে ?

ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে ? ভগবান যদি দেন তো আবার গোপাল আসবে তোমার কোলে।

না, না—আর আমি চাই না। আর আমি চাই না। আমি, আমি রাক্ষসী। আমার কাছে যেন আর কেউ না আসে। গোপালকে আমি খেয়ে ফেলেছি, তাকেও হয়ত খেয়ে ফেলবো। না, না—আর আমার কাউকে চাই না। কাউকে না—

ভায়লা কিছুতেই আর নাওয়ে থাকতে চাইল না। একপ্রকার জিদ করেই রোজারিওকে নিয়ে এসে সাতগাঁয়ে গীর্জার ধারে ফাদার এমানুয়েল যে ছোট বাড়িটা তৈরী করেছিল সেই বাড়িতেই উঠলো বাচ্চাটা বুকে করে।

দিন দশেকের মধ্যেই কিন্তু হাঁপিয়ে ওঠে রোজারিও। প্রথমে ভেবেছিল রোজারিও, কিছুদিন এখন সে সাতগাঁয়েই থাকবে ভায়লাকে নিয়ে। কিন্তু চিরদিন দরিয়ায় যে মানুষটা জলে ঝড়ে রৌদ্রে উন্মুক্ত আকাশের তলে ভেসে

ভেসে বেড়িয়েছে, ডাঙ্গা-বন্দরে তার মন টিকবে কেন? একবার যাদের রক্তে দরিয়ার নেশা ধরেছে, মাটি তাকে ধরে রাখতে পারবে কেন? তাই বুঝি দশ দিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে ওঠে রোজারিও।

মন তার উড়ু-উড়ু করে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আবার মনে পড়ে তার, সেই ইবলিশের বাচ্চা ডি'সুজার কথাটা। আরো মনে পড়ে ঐ ইবলিশের বাচ্চাটার তার ভায়লার প্রতি দৃষ্টি আছে।

তাছাড়া ভায়লা, ভায়লাকেই বা বিশ্বাস কি? দেহে তার যেন যৌবন আজও অটুট। ঘাঘরা ফুলিয়ে ভারী নিতম্ব দুলিয়ে ভায়লা যখন পাশ দিয়ে চলে যায়, মনে হয় যেন ভায়লার সর্বদেহে এখনো যৌবন-মদিরা উপচে পড়ছে।

তার নিজের বুকের ভিতরটা তখন কেমন ঝিম্-ঝিম্ করে, তা ডি'সুজার যদি করেই তো দোষ দেবে সে কাকে। আর ইদানীং যেন সেই ভয়টাই একটা ভূতের মত কাঁধে চেপে বসেছিল রোজারিওর। তাইতেই আরো ভায়লা বলাতেই তাকে নিয়ে সাতগাঁয়ে চলে এসেছিল রোজারিও এবং আসার সময় নাওয়ের সকল ভার সকল দায়িত্ব ঐ ইবলিশের বাচ্চা ডি'সুজার হাতেই তুলে দিয়ে এসেছিল।

এ যেন কতকটা ঘুষ দেওয়া, নাওয়ের কর্তৃত্বটা ডি'সুজার হাতে তুলে দিয়ে ভায়লাকে যেন তার ক্ষুধিত গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা রোজারিওর। কিন্তু ডাঙ্গার মাটিতে দশটা দিনও গেল না রোজারিওর, কেমন যেন একটা অস্বস্তি তাকে পীড়ন করতে থাকে।

মনটা কেমন বিশ্রী ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। দূর দূর, জলের মানুষ দরিয়ার মানুষ, ও কোন ডাঙ্গায় কখনো বাস করতে পারে! এর চাইতে দরিয়া ঢের ভাল। এমন কি ভায়লার আকর্ষণ, নেশাটাও যেন ঝিমিয়ে আসে।

দরিয়ার নেশার কাছে ভায়লার নেশাটা যেন কেমন পানসে মনে হতে থাকে রোজারিওর। তাছাড়া সাতগাঁয়ের বাড়িতে পা দেওয়া অবধি ভায়লার যেন দেখা পাওয়াই ভার হয়ে উঠেছে।

কোথাকার কার একটা কালো কুচ্ছিত ছেলে, ভায়লা সর্বদা তাকে নিয়েই ব্যস্ত। লাস্যময়ী রঙ্গিলা ভায়লা যেন ঐ ছেলেটাকে পেয়ে রাতারাতি ভারিক্কী এক মায়ে পরিণত হয়েছে। চোখের সেই বিলোল কটাক্ষ নেই, ঠোঁটের কোণে সেই মদির হাসি নেই, চলনে নেই সেই নৃত্য লাস্য, হঠাৎ যেন বয়স অনেক বেড়ে গিয়েছে ভায়লার।

যে যৌবন-মদিরা তার সর্বদেহ দিয়ে উপচে পড়ে প্রৌঢ় রোজারিওর চোখে সেদিনও নেশা ধরিয়েছে, সে যেন অকস্মাৎ ঝরে শুকিয়ে গিয়েছে।

কেবল ভায়লার ছেলে আর ছেলে। ছেলের নামও রেখেছে ভায়লা—এক বিচিত্র অদ্ভুত নাম। পর্তুগীজ পরিচিত নাম নয়। হেঁদুর নাম—সুন্দরম্।

সুন্দরম্ আবার নাম হয় নাকি। আপত্তি জানিয়েছিল রোজারিও, ও আবার কেমন নাম!

কেন, খুব ভাল নাম তো।

যাকগে মরুকগে, যা খুশি নাম রাখুক ভায়লা তার ছেলের, রোজারিওর কোন মাথাব্যথা নেই, কিন্তু রোজারিও নাও ছেড়ে এই ডাঙ্গায় আর যেন থাকতে পারছে না। কথাটা সেদিন রোজারিও রাত্রে ভায়লাকে বলেই ফেলল।

তুই তাহলে থাক ভায়লা তোর ছেলেকে নিয়ে এখানে—

ভায়লা ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘরের মধ্যে ঘুম পাড়াচ্ছিল। রোজারিওর কথাটা কানে যেতেই সে ঘুরে দাঁড়াল, আর তুই—

আমি!

হ্যাঁ—

আমি ভাবছি নাওয়ে ফিরে যাবো।

কেন?

কেন আবার কি। মরদ বাচ্চা হাত-পা গুটিয়ে আর কতদিন বসে থাকবো?

তার মানে আবার তুই লুঠতরাজ শুরু করবি?

তা করতে হবে বৈকি।

কিন্তু কেন?

বাঃ, টাকার দরকার নেই বুঝি?

টাকা তো অনেক আছে—

ও টাকা ফুরোতেই বা কত দিন!

আগে ফুরোক—

ফুরোবে। ও তো দু'দিনেই ফুরিয়ে যাবে।

সে ভাবনা তোকে না ভাবলেও চলবে।

না, না—আমি এমন করে বসে থাকতে পারবো না।

না, তোর আর নাওয়ে ফিরে যাওয়া হবে না।

তবে কি তোর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকব? বেশ ঝাঁঝালো স্বরেই কথাগুলো বলে রোজারিও।

ভায়লাও একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলো না, দরজায় ধাক্কা পড়লো।

কে ?

কাপ্তান্ ! বাইরে থেকে জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ডি'ক্রুজের গলা বলে মনে হচ্ছে! রোজারিও বলে।

তাই তো মনে হচ্ছে। ভায়লা জবাব দেয়।

রোজারিও উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই ডি'ক্রুজ টলতে টলতে এসে ঘরে ঢুকে থপ্ করে ওদের সামনে বসে পড়ল। ঘরের আলোয় ডি'ক্রুজের দিকে তাকিয়ে রোজারিও ও ভায়লা দুজনাই যেন চমকে ওঠে। ওর সমস্ত পোশাক রক্তে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে।

এ কি ডি'ক্রুজ, কি হয়েছে ? উদ্বেগাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে রোজারিও।

ডি'সুজা—,কোনমতে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে ডি'ক্রুজ।

কি ? কি হয়েছে ?

ডি'ক্রুজ ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে।

একটু জল।

একটা তামার পাত্রে জল এনে রোজারিও ডি'ক্রুজের মাথাটা হাঁটুর ওপরে তুলে নিয়ে কোনমতে ওর গলায় খানিকটা জল ঢেলে দিল। কিন্তু গিলতে পারল না জল ডি'ক্রুজ। তার কষ বেয়ে জলটা গড়িয়ে পড়ল।

ডি'ক্রুজ, ডি'ক্রুজ—

আমাকে ছোরা মেরেছে ডি'সুজা—কোনমতে কথাটা বলে ডি'ক্রুজ, তার পরই তার মাথাটা টলে পড়ে রোজারিওর হাঁটুর উপরে।

ডি'ক্রুজ, ডি'ক্রুজ—

কিন্তু ডি'ক্রুজের আর সাড়া পাওয়া গেল না। তার কষ বেয়ে খানিকটা রক্ত-মিশ্রিত গাঁজলা বের হয়ে এলো। পাথরের মতই কিছুক্ষণ বসে রইলো রোজারিও ডিক্রুজের মৃতদেহটা কোলে করে, তারপর একসময় ধীরে ধীরে ডি'ক্রুজের মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রোজারিও উঠে দাঁড়াল।

সমস্ত মুখটা তখন তার পাথরের মত শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। সে মুখের দিকে তাকিয়ে যেন চমকে ওঠে ভায়লা। রোজারিওর ঐ মুখের সঙ্গে যে বিশেষ ভাবে পরিচিত ভায়লা। মানুষ রোজারিওর ও মুখ নয়, দানব রোজারিওর ঐ মুখ।

দেওয়ালে ঝোলানো ছিল গুলিভরা গাদা পিস্তল সমেত ভারী চামড়ার মোটা কোমরবন্ধটা রোজারিওর। এগিয়ে গিয়ে রোজারিও সেই কোমরবন্ধটা নামিয়ে তখন কোমরে আঁটতে শুরু করেছে।

তাড়াতাড়ি ভায়লা এগিয়ে আসে রোজারিওর দিকে।

কোথায় যাচ্ছিস এই রাত্রে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় রোজারিও ভায়লার মুখের দিকে।

ভায়লা বলে, না, তোকে আমি যেতে দেবো না।

ভায়লা !

চাপা গর্জন করে ওঠে রোজারিও।

না, কিছুতেই না, তোকে আমি যেতে দেবো না।

বাঘের মতই যেন থাবা দিয়ে ভায়লার কাঁধটা ধরলো রোজারিও মুহূর্তের জন্য, তারপরই একটা হ্যাঁচকা টানে রোজারিও ভায়লাকে সরিয়ে দিয়ে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

সেই প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে নিজেকে সামলাতে পারে না ভায়লা। তাছাড়া সুন্দরম্ বুকের মধ্যে ধরা ছিল তার। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয়।

কিন্তু ততক্ষণে রোজারিও ঘরের বাইরে অন্ধকারে পা দিয়েছে।

তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে ভায়লা, রোজারিও—

রোজারিও একলাফে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

আকাশে বোধ হয় মেঘ করেছিল। মেঘঢাকা আকাশটা আচম্‌কা একটা বিদ্যুতের আলোর ঝিলিক হানে।

ভায়লা আবার চীৎকার করে ওঠে, রোজারিও, ফিরে আয় ফিরে আয়।

সুন্দরম্ ভায়লার বুকের মধ্যে কেঁদে ওঠে।

॥ ॥

প্রায় এক মাস পরে নবদ্বীপে আবার ফিরে এলো গঙ্গাসাগর-তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে সুলোচনা।

ফিরে এলো বটে কিন্তু সে যেন সম্পূর্ণ অন্য এক সুলোচনা।

এক মাসের মধ্যে যেন তার বয়েসটা দশ বছর এগিয়ে গিয়েছে। পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখ—দু চোখে অসহায় শূন্য দৃষ্টি এবং একেবারে যেন বোবা ! শুধু কি তাই ? মাথার রগের দু'পাশের চুল পর্যন্ত পেকে গিয়েছে। গৃহে প্রবেশ করে যথারীতি সুলোচনা গুরুজনদের পদধূলি নিল কিন্তু কারো সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বললে না।

ইতিমধ্যে ঐ এক মাসে সুলোচনার স্বামী হরনাথ সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠেছিল এবং একটু একটু করে তার পূর্বস্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি ফিরে পেয়েছিল।

সুলোচনাদের নৌকা যখন নবদ্বীপের ঘাটে এসে লাগে, হরনাথ তখন গৃহে ছিল না, পিতার টোলে ছাত্রদের নিয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিল।

গৃহে স্থানাভাববশতঃ এবং কিছুদিন যাবৎ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রামানন্দ নিজগৃহের কিছু দূরে অন্য এক গৃহে আর একটি টোল স্থাপনা করে পুত্র হরনাথের ওপরেই সেই টোলের ভার অর্পণ করেছিলেন।

হরনাথের অসুস্থ অবস্থায় সে সেখানে যেতে না পারায় রামানন্দকেই দুদিক বজায় রাখতে হতো। কিন্তু পুনরায় হরনাথ সুস্থ হয়ে ওঠায় সে-ই ইদানীং আবার কয়েক দিন ধরে টোলের ছাত্রদের শিক্ষাদান শুরু করেছিল।

দ্বিপ্রহরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে হরনাথ শুনলো সুলোচনারা গৃহে প্রত্যাগমন করেছে।

বাড়ির বধূ সুলোচনা, তখনকার দিনে দিবাভাগে স্বামী-স্ত্রীর দেখাসাক্ষাৎ হতো না। তথাপি আহারে বসে হরনাথ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়, কিন্তু যাকে একটিবার দেখবার জন্য তার সতৃষ্ণ দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘোরাফিরা করে তার ছায়াও সে দেখতে পায় না।

সত্যি কথা বলতে কি, সুলোচনা গোপালকে নিয়ে সাগরে বিসর্জন দিতে যাবার পর থেকেই তার মনের মধ্যে একটা অপরাধ-বোধ অহরহ যেন তাকে পীড়ন করতে থাকে।

কুৎসিত স্বার্থের একটা ক্লেদাক্ত গ্লানি যেন কোথায় তার মনের মধ্যে পীড়া দিতে থাকে। মনে হয়, সুলোচনার কাছে সে অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছে।

বহুবার তাই মনে হয়েছে, সুলোচনা ফিরে এলে কেমন করে সে তাকে মুখ দেখাবে। সুলোচনা ফিরে এসেছে এবং গোপালকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দিয়ে এসেছে কথাটা শোনার পর থেকেই সেই পীড়নটা যেন তার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং যত রাত হতে থাকে এবং সুলোচনার সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তটা ঘনিয়ে আসতে থাকে, কি একটা অস্বস্তিতে যেন হরনাথ ভিতরে ভিতরে তত ছট্‌ফট করতে থাকে।

রাত্রে আহারাদির পরই হরনাথ শয়নগৃহে প্রবেশ করতে পারে না। সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বহুক্ষণ সেখানে বসে থাকে। তারপর অনেক রাত্রে হরনাথ গৃহের আঙ্গিনায় যখন প্রবেশ করল, গৃহের সকলেই তখন নিদ্রাভিভূত।

সমস্ত গৃহ নিঝুম, স্তব্ধ। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু হরনাথ দেখতে পায়, তার শয়নঘরে তখনো আলো জ্বলছে। চোরের মতই যেন নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল হরনাথ নিজ শয়নকক্ষের দ্বারে।

কক্ষের দ্বার ভেজানো ছিল। তবু বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে

ধীরে ধীরে একসময় আলতো ভাবে দরজার কপাটে আঙুল দিয়ে ঠেলতেই কপাট খুলে গেল।

হরনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল এবং প্রবেশ করেই আবার যেন থমকে দাঁড়াল।

খোলা জানলার সামনে পিছনে ফিরে প্রস্তরমূর্তির মতই দাঁড়িয়ে ছিল সুলোচনা। স্বামীর পদশব্দে সে ফিরে দাঁড়াল। কক্ষের মধ্যে দীপাধারে দীপ জ্বলছিল।

সেই দীপালোকে হরনাথ অদূরে দণ্ডায়মানা স্ত্রীর দিকে তাকাল। সুলোচনা—ঐ কি তার স্ত্রী সুলোচনা? পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ি। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা তোলা। ঘোমটার দু'পাশ দিয়ে রুক্ষ তৈলহীন চুলের গোছা বক্ষের দু'পাশে নেমেছে। কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা এবং সিঁথিতে সিন্দুর।

দুজনা দুজনার দিকে অপলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। কারো মুখে কোন কথা নেই। তারপর ধীরে ধীরে সেই পাষাণপ্রতিমা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে হরনাথের পায়ের সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই হরনাথ বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই হাত বাড়িয়ে সুলোচনাকে স্পর্শ করতে যায়।

সুলোচনা—

কিন্তু তার পূর্বেই নিঃশব্দে ঈষৎ সরে দাঁড়িয়েছে সুলোচনা। মৃদুকণ্ঠে মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করে, না—

সুলোচনা।

না, তুমি—তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

সুলোচনা—

না। আমার দেহে পাপ, আমার সংস্পর্শে পাপ, আমার নিশ্বাসে পাপ—

পাপ! কি বলছো তুমি সুলোচনা?

হ্যাঁ, এ পাপশরীর আর তোমাকে স্পর্শ করতে দেবো না। সন্তান-হত্যার পাপ আমাকেই একা বহন করতে দাও।

পাপ! কে বললে? সাগরজলে সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে তুমি দেবতার মানত পালন করেছো—পুণ্য—

না, না—সুলোচনা আরো দূরে সরে দাঁড়াল, ক্ষমা করো তুমি আমাকে কথাটা বলে সুলোচনা আর দাঁড়াল না। ঘরের বাইরে পা বাড়ায়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে হরনাথ। পথরোধ করে দাঁড়ায় সুলোচনার—সুলোচনা!

হ্যাঁ, তোমাদের কাছে যা মানত—আমার কাছে তা হত্যা।

হত্যা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ। হত্যা ছাড়া সাগরে নিজের শিশুসন্তানকে বিসর্জন দেওয়াকে আর কি বলতে পারো। দেবতার কাছে মানত পালন নয়, ওটা হত্যা—মহাপাপ করেছি আমি। আর তার প্রায়শ্চিত্তও আমিই করবো।

কথাগুলো বলে শান্ত দৃঢ় পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল স্থলোচনা। আর ঘরের মধ্যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো হরনাথ। বাকী রাতটুকু হরনাথ পায়চারি করেই কাটিয়ে দেয়।

পরের দিন রাত্রে স্থলোচনা আর শয়নকক্ষেই এলো না। কক্ষের দরজা খুলে রেখে হরনাথ বৃথাই অপেক্ষা করলো। কিন্তু তৃতীয় রাত্রে হরনাথ কেবল স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষাতেই কাটাতে পারল না, গভীর রাত্রে একসময় স্থলোচনার অনু-সন্ধানে কক্ষের বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

মাঘের প্রচণ্ড শীতে হাড়ে কাঁপুনি ধরায়। এই প্রচণ্ড শীতে কোথায় গেল স্থলোচনা! এদিক-ওদিক তাকায় হরনাথ কিন্তু কোথাও দেখতে পায় না স্থলোচনাকে।

খুঁজতে খুঁজতে হরনাথ আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ায়। বিরাট আঙ্গিনাটা যেন মধ্য-রাত্রির স্তব্ধতায় একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

আশ্চর্য! কোথায় গেল স্থলোচনা?

আঙ্গিনা অতিক্রম করে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই হরনাথের নজরে পড়লো খিড়কির দুয়ারটা হা-হা করছে খোলা।

এত রাত্রে খিড়কির দুয়ার খোলা কেন?

বিস্মিত হরনাথ খিড়কির দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়। খিড়কির দুয়ার পার হয়ে হাত দশেকও নয় গঙ্গা। গঙ্গার ঘাটে যে বিরাট ঘোড়ানিমের গাছটা তারই নীচে বাঁধানো বেদীটার উপরে হরনাথের নজরে পড়ে একটি ছায়ামূর্তি। ত্রয়ো-দশীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে আবছা সেই ছায়ামূর্তি দেখা যায়।

কে! কে ওখানে?

হরনাথ দ্রুত এগিয়ে যায় ঘাটের দিকে এবং কয়েক পা অগ্রসর হতেই হরনাথ বুঝতে পারে, সেই ছায়ামূর্তি কোন নারীর। কিন্তু মাঘের এই প্রচণ্ড শীতে কে বসে ঐ নারী এই মধ্যরাত্রে গঙ্গার ঘাটে!

আরো একটু অগ্রসর হবার পর হরনাথের সেই নারীমূর্তিকে চিনতে কষ্ট হয় না।

সুলোচনা।

এবারে একেবারে পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ায় হরনাথ।

কিন্তু সুলোচনার কোন হুঁশ নেই। প্রস্তরমূর্তির মতই সে বসে আছে।

সুলোচনা!

কে?

ঘরে চল সুলোচনা।

ঘরে?

হ্যাঁ।

না।

চল সুলোচনা, ঘরে চল।

যেতে পারি এক শর্তে।

বল সুলোচনা, কি তোমার শর্ত?

তুমি আবার বিবাহ করবে বল?

বিবাহ! কি বলছো তুমি!

হ্যাঁ, এই গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে যদি তুমি কথা দাও যে তুমি আবার বিবাহ করবে, তবেই তোমার ঘরে আমি যাবো।

সুলোচনা!

বল।

তুমি আমার স্ত্রী বর্তমান থাকতে আবার আমি বিবাহ করবো? না, না—তা হয় না, হতে পারে না।

কেন হতে পারবে না? আমার শ্বশুরকুলের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না! না, এ হতে পারে না।

কে বলেছে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। আবার তো আমাদের সন্তান হতে পারে।

কিন্তু তার তো আর সম্ভাবনা নেই।

কে বলেছে সম্ভাবনা নেই?

না, নেই—আমার দিক থেকে তার আর কোন সম্ভাবনাই নেই—

সুলোচনা!

না। আমি তো বলেছি, তোমাকে আর আমি স্পর্শ করতে পারবো না।

তার মানে আমার সঙ্গে তুমি আর কোন সম্পর্কই সত্যি সত্যি রাখবে না, এই কি তুমি বলতে চাও সুলোচনা!

হ্যাঁ। শান্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় সুলোচনা।

হরনাথ যেন বোবা হয়ে যায়। কয়েকটা মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দই আর যেন নির্গত হয় না। অখণ্ড একটা স্তব্ধতা যেন থমথম করতে থাকে। একটানা গঙ্গাস্রোত বহে চলে কেবল। অনেকক্ষণ পরে হরনাথ মৃদুকণ্ঠে ডাকে, সুলোচনা!

বল।

সত্যিই কি এই তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ।

বেশ। তবে তাই হবে—

তাহলে প্রতিজ্ঞা করো।

তুমি যা বলছো তাই হবে। এবার ঘরে চল।

চল।

দুজনে অতঃপর ফিরে এলো ঘরে।

কিন্তু কথাটা কে বলবে? হরনাথও বলে না, সুলোচনাও বলে না। দুজনে একঘরে রাত্রিযাপন করে কিন্তু পৃথক শয্যায়। এমনি করেই আরো একটি মাস অতিবাহিত হয়ে যায়।

অবশেষে একদিন সুলোচনাই কথাটা কৌশলে কালীতারার কাছে সন্ধ্যার সময় গাত্রমার্জনা করতে এসে উত্থাপন করে, তোমার ভায়ের আবার বিয়ে দাও দিদি—

ও আবার কি কথা? কালীতারা বলে।

ঠিকই বলছি দিদি। শোন, একটা কথা ক'দিন ধরেই তোমাকে বলবো বলবো ভাবছিলাম—

কি কথা রে বৌ!

গঙ্গাসাগরের পথে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, শাস্ত্রী ঠাকুর তোমাদের বলেন নি?

কি?

গোপালকে নিয়ে নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম।

সে কি?

হ্যাঁ। সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখন হাত-পা শিথিল হয়ে ডুবে যাচ্ছি, তখন এক মুসলমান মাঝি আমাকে বাঁচায়—

সত্যি বলছিস ?

হ্যাঁ। এ দেহ মুসলমানের স্পর্শে কলঙ্কিত হয়েছে—এ দেহ তো আর দেবতার ভোগে লাগতে পারে না!

হরনাথ—হরনাথ এ কথা জানে? কালীতারা রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্নটা করে ভ্রাতৃ-জায়াকে।

জানে। তাই বলছিলাম দিদি, তোমার ভাইয়ের আবার বিবাহ দাও। তোমার দাদাকেও আমি বলেছি আবার বিবাহ করবার জন্য, তিনি—

কি, কি বলেছে সে?

সে বিবাহ করতে স্বীকৃত।

তারপর তোর—তোর কি অবস্থা হবে?

কি আবার হবে! দয়া করে যদি তোমরা স্থান দাও তো এ বাড়িতে থাকবো, নচেৎ—

নচেৎ ?

মা গঙ্গা তো আছেন।

কিন্তু মুসলমানস্পৃষ্টা কুলবধূ তুই যে এইভাবে সংসারে প্রবেশ করে অমঙ্গল ঘটালি এর কি হবে? বাবা জানতে পারলে—

তাই তো আমি মনে মনে স্থির করেছি, শ্বশুর মশাইয়ের কাছে অকপটে সব প্রকাশ করে যে প্রায়শ্চিত্ত বিধি তিনি দেন সেই প্রায়শ্চিত্তই মাথা পেতে নেবো।

কালীতারা যেন চমকে ওঠে। বলে, না, না—জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক এই পাপ এই অমঙ্গলের কথা বাবা একবার জানতে পারলে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করবেন।

কালীতারা মিথ্যা বলে নি। ব্যাপারটা এখন একবার তার বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামানন্দ মিশ্রর কানে উঠলে এই নদীয়া সমাজে আর কারোরই কথাটা জানতে বাকী থাকবে না এবং যার ফলে সারা সমাজে একটা বিশ্রী ঢি ঢি পড়ে যাবে। তার চাইতে এখন পর্যন্ত যা গোপন আছে তা গোপনই থাক।

প্রায়শ্চিত্ত যা কিছু করার তা গোপনেই করে যাবে।

অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোক ঐ কালীতারা। যে পাপের প্রায়শ্চিত্তর জন্য অন্য সময় হলে কালীতারা একটা হুলস্থূল বাধিয়ে তুলত, সেই কালীতারাই স্বার্থের জন্য সেই পাপকেই চাপা দিয়ে গেল।

সুলোচনা আবার প্রশ্ন করে, তা হলে কি হবে দিদি?

সে তোকে কিছু ভাবতে হবে না। যা ব্যবস্থা করবার আমিই করবো। তুই

কেবল ঠাকুরঘরে প্রবেশ করবি না আর—

স্থলোচনা কালীতারার মুখের দিকে তাকাল।

আর দাদাকে—দাদাকে স্পর্শ করিস না।

স্থলোচনার চোখের কোল দুটো জলে ভরে আসে।

সেই জলভরা দুটি চক্ষু কালীতারার মুখের দিকে তুলে বলে, সাগর থেকে ফিরে এসে আজ পর্যন্ত ছুঁইনি আর ছোঁবো না—যত দিন বেঁচে থাকবো।

পারবি ?

পারবো। পারবো। তুমি তার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করো দিদি—

ব্যবস্থা আমি করবো। কালীতারা মৃদুকণ্ঠে বলে।

কথাটা বলে কালীতারা আর দাঁড়াল না। গঙ্গার ঘাট থেকে উঠে গৃহের দিকে চলে গেল। আর সেই সন্ধ্যার ছায়া-ঘন গঙ্গার তীরে সহসা বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে স্থলোচনা—মা গঙ্গা, ক্ষমা করো মা, ক্ষমা করো। তোমার কূলে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলেছি—কিন্তু আর যে এ অভাগিনীর উপায় ছিল না মা, উপায় ছিল না।

পক্ষকাল-মধ্যেই মিশ্রগৃহে সাড়া পড়ে গেল, হরনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চলেছে কৃষ্ণনগরে। মেয়েটি স্থলক্ষণা—আয়ুষ্মতী।

॥ ৬ ॥

কালীতারা এবং স্থলোচনার মনোবাসনা কিন্তু পূর্ণ হলো না। যে সংকল্প নিয়ে তারা হরনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিল, দেখতে দেখতে বিবাহের পর দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু হরনাথের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হলো না।

কিন্তু ইতিমধ্যে হরনাথেরও মনের অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছিল। সন্তান না হওয়ায় তার মনে একটা প্রচণ্ড দুঃখ জমা হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়া স্ত্রী দাক্ষায়ণী বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে এসেই কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পেরেছিল এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বার কেন স্বামী তাকে বিবাহ করেছে।

সে কারণে অবিশ্যি দাক্ষায়ণীর কোন দুঃখ ছিল না মনে। কারণ দরিদ্র বাপের ঘরে জন্মেছিল দাক্ষায়ণী এবং জন্মাবধি দুঃখের সঙ্গে পরিচিত। এবং শিশু বয়েসেই মাকে হারিয়েছিল।

বিবাহের পর হরনাথের সচ্ছল সংসারে এসে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল, বর্তে গিয়েছিল। তার উপর স্বামীগৃহে পেয়েছিল সে স্থলোচনাকে।

সুলোচনা যেন জননীর মত, বড় ভগ্নীর মতই দাক্ষায়ণীকে দু'হাতে গভীর স্নেহে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল।

প্রথম প্রথম সব কথা জানার পর সুলোচনার দুঃখ, বঞ্চনা ও ব্যথা গভীর ভাবেই দাক্ষায়ণীর মনকে নাড়া দিয়েছিল।

চোখ তুলে দাক্ষায়ণী সুলোচনার দিকে যেন তাকাতেও পারত না।

কোথায় যেন কিসের একটা লজ্জা তাকে পীড়া দিত, সুলোচনা সামনে এলেই অসহায় একটা অপরাধ বোধ যেন তার মাথাটা নীচু করে দিত।

সুলোচনা প্রথম প্রথম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নি। কিন্তু বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই একদিন নদীর ঘাটে নিভৃতে সুলোচনা দাক্ষায়ণীর হাত ধরে শুধায়, আমার কাছে তুই অমন জড়সড় হয়ে থাকিস কেন বল্ তো ছোট? কিরে—আমাকে ভয় করে নাকি!

দাক্ষায়ণী কোন কথা বলতে পারে না।

সুলোচনা দাক্ষায়ণীকে দু হাতে এবারে বুকের মধ্যে টেনে এনে বলে, আমি তোর দিদি না? দিদির কাছে সংকোচ কিরে বোকা মেয়ে!

কি যে হয় দাক্ষায়ণীর। সে সুলোচনার বুকের মধ্যে কেঁদে ফেলে।

ও কিরে! কাঁদছিস কেন? ওই দেখ—আবার কাঁদে!

দিদি—

কি?

আমার বড় ভয় করে।

ভয়! কেন রে?

তা জানি না দিদি, বড় ভয় করে।

ছোট!

উঁ?

একটা কথার সত্যি জবাব দিবি?

কি?

ও তোকে ভালবাসে না?

জানি না।

জানি না কিরে?

জানি না। আবার বলে দাক্ষায়ণী।

সে কিরে, মেয়েমানুষ হয়ে বুঝতে পারিস না পুরুষমানুষটা তোকে ভালবাসে কিনা?

আমার সঙ্গে তো ভাল করে কথাই বলে না।

কথাই বলে না!

না।

আচ্ছা আমি বলে দেবো।

না, না—দিদি না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

এমন প্রতিমার মত রূপ নিয়ে এসেছিস তবু এতদিনে ঐ সামান্য কথাটা জানতে পারলি না হতভাগী!

কিন্তু সুলোচনা জানত না—হরনাথের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছিল। এবং সেই পরিবর্তনটাই আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দুই বৎসরের মধ্যেও দাক্ষায়ণীর গর্ভে কোন সন্তান এলো না।

হরনাথের কথায়বার্তায় কেমন যেন একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেতে থাকে।

সুলোচনা যদি কালীতারার সঙ্গে যোগসাজশ করে একপ্রকার জোর করেই হরনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ না দিত, তা হলে হয়ত হরনাথের মনটা দাক্ষায়ণীর প্রতি অমন করে বিষিয়ে উঠতো না।

সন্তান না হওয়াটা যেন হরনাথের মনে হয় সুলোচনার কাছে তার একটা নিদারুণ পরাজয়।

সুলোচনাই যে তার জীবন থেকে সরে গিয়েছে তাই নয়, তার জীবনে সন্তান-সম্ভাবনার ওপরেও যেন একটা নিদারুণ অভিশাপ এনে দিয়েছে।

হরনাথ শেষ পর্যন্ত স্থির করে আবার সে বিবাহ করবে। যেমন করে হোক সন্তান তার চাই-ই। মনের ঐ অবস্থায় দাক্ষায়ণীর প্রতি যেন আরো বিরূপ হয়ে ওঠে। এমনি সময় কলকাতা থেকে এলো হরনাথের দূর-সম্পর্কীয় ভাই সুধামাধব। সুধামাধব কলকাতায় চেতলা অঞ্চলে চালের কারবার করে, রীতিমত ধনী। বয়েসে সুধামাধব হরনাথের চাইতে কিছু বড়ই হবে। বলিষ্ঠ ও কর্মঠ যুবক। এবং কলকাতার তখনকার নতুন আমদানি বিলাতী শিক্ষার ও চালচলনের হাওয়া তার গায়ে লেগেছে। ধনী তো বটেই। কলকাতার একজন নব্য বাবুও।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন সুধামাধব বললে, টোল নিয়ে এখানে এমন করে পড়ে আছ কেন হরনাথ?

কেন, বেশ তো কেটে যাচ্ছে!

ছাই যাচ্ছে, কিছুই খবর রাখ না। যুগ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। চল, চল—কলকাতায় চল—ব্যবসা কর। দেখবে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে ছদিনও দেরি হবে না।

প্রথম প্রথম সুধামাধবের কথা হেসেই উড়িয়ে দেয় হরনাথ। কিন্তু একই কথা বারংবার সুধামাধব বলায় কথাটা মন থেকে একেবারে মুছেও ফেলতে পারে না।

অবশেষে এক মাস পরে সুধামাধবের যাত্রার আগের দিন হরনাথ বলে, তোমার সঙ্গে কলকাতাতেই যাবো কিনা ভাবছি সুধা—

অত ভাববারই বা কি আছে, সেখানে গিয়ে হালচাল দেখ, না পোষায় চলে এসো।

তা নয়—

তবে?

বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই ভাবছি—

জীবনে উন্নতি করতে হলে ওসব কথা ভাবলে চলবে না ভায়া। আর অত ভাবলে কোন দিনই কিছু করতে পারবে না।

বাবাকে একবার না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখি।

দেখ।

রামানন্দ মিশ্র কিন্তু আশ্চর্য, কথাটা শুনে বিশেষ কোন আপত্তি করলেন না।

নবদ্বীপের মত জায়গায় থাকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল কিন্তু অন্য রকম। তিনি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, বুঝতে পারছিলেন যুগের হাওয়া পাল্টাচ্ছে।

নতুন দিন নতুন সভ্যতা আসছে।

নতুনের সঙ্গে পা ফেলে চলতে না পারলে লোকসান বই লাভ হবে না, তাছাড়া টোলের অবস্থা দিনকে দিন যেমন হচ্ছে, তাতে করে সেদিক থেকেও আয়ের পথ কতদিন যে আর খোলা থাকবে কে জানে।

কলকাতার কথা তিনিও শুনেছিলেন।

তাই হেসে বললেন, বড় হয়েছো। আমি আর কি বলব। যা ভাল বোঝ কর।

যাই, না হয় ঘুরেই আসি।

যাও।

•

সুধামাধবের সঙ্গেই হরনাথ কলকাতায় চলে এল।

কলকাতা শহরে চেতলা অঞ্চলটি তখন একটি প্রধান বাণিজ্যের কেন্দ্র। বছরে

বছরে ঐ সময় ভারতবর্ষ থেকে যে চাল রপ্তানি হতো তারই হাট বসত তখন নিয়মিত চেতলায়।

শত শত চালের নৌকা, শালতি প্রতিদিন আসত। বাখরগঞ্জ, মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি জায়গা থেকে চাল আসত। কালীঘাটের লাগোয়া টালির নালা সেই সব নৌকা ও শালতিতে একেবারে ছেয়ে যেত। কাজেই ঐ চালের কারবারী ও আড়তদারদেরই ভিড় বেশী ছিল চেতলা অঞ্চলে। সুধামাধবের গৃহ চেতলাতেই—সেই গৃহেই এসে উঠলো হরনাথ। অবস্থাপন্ন ধনী সুধামাধব। বড় বাড়ি—কিন্তু পরিবারটি ছিল ছোট। সুধামাধব, তার স্ত্রী হরকালী, অনূঢ়া শ্যালিকা নয়নতারা আর চারটি সন্তান। পরিবারটি ছোট হলেও সুধামাধবের কারবারে বহু লোক খাটত, তাদের নিয়েই সুধামাধবের বাড়িটা সর্বক্ষণ যেন গমগম করতো। অনেক দাস-দাসীও ছিল সুধামাধবের গৃহে। খোলামেলা নবদ্বীপের ছোট জায়গায় আজন্ম কাটিয়ে এসেছে হরনাথ, কলকাতায় এসে চেতলার ঐ ঘিঞ্জি ও নোংরা আবহাওয়ায় যেন কেমন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়। টালির নালার কিছু দূরেই সুধামাধবের চালের কারবারের বিরাট আড়ত। বহু কর্মচারী সেখানে খাটে।

কলকাতায় এসে পৌছাবার পরদিনই সকালে যখন আড়তে যাবে সুধামাধব হরনাথকে ডেকে বললে, চল হরনাথ, কেমন কারবার হয় দেখবে চল।

দীর্ঘ নৌ-যাত্রায় শরীর ক্লান্ত ছিল হরনাথের—ইচ্ছা ছিল সেদিনটা বিশ্রাম নেয় কিন্তু সুধামাধবের আগ্রহে হরনাথ না বলতে পারল না।

বললে, চল।

তীর্থস্থানের সন্নিকটস্থ স্থান।

কত জাতের কত চরিত্রের নরনারীর যে সর্বক্ষণ ভিড় তার ইয়ত্তা নেই।

কত যে অজ্ঞ, অসাধু, অশিক্ষিত, প্রবঞ্চক নানা মতলবে নানা ফিকিরে সর্বদা সেখানে ঘোরাফেরা করছে তার যেন কোন হিসাব নেই। তাছাড়া আছে অসংখ্য বারাঙ্গনার ভিড়।

আড়তের দিকে যেতে যেতে চারিদিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে মন্থরগতিতে পথ চলছিল হরনাথ সুধামাধবের পাশে পাশে। ইতিপূর্বে কলকাতা শহরে কখনো আসে নি হরনাথ, তাই বুঝি তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সুধামাধব কিন্তু বেশ দ্রুতই হাঁটছিল।

হঠাৎ একসময় সুধামাধবের নজরে পড়ে হরনাথ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। তাড়া দেয় সুধামাধব।

পা একটু চালিয়ে এসো হে হরনাথ।

এই যাই।

হরনাথ চলার গতি দ্রুত করে।

আড়তে এসে হরনাথ যেন একেবারে 'থ' বনে যায়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে আড়ত। জায়গায় জায়গায় চাল স্তূপাকার করা রয়েছে। নানা রকমের চাল। বালাম—বাসমতী—হীরামতি—কত নাম সব চালের!

দাঁড়িপাল্লায় মণে মণে চাল মাপা হচ্ছে—চালান যাচ্ছে সব নৌকায়, শালতিতে।

কর্মচারীরা নানা কাজে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে। মজুররা মাথায় করে সব চাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আসছে।

গদিতে বসে সুধামাধব সব কিছু তদারক করছে। মুঠো মুঠো টাকা গদিতে ঝন ঝন করে পড়ছে—জমা হচ্ছে একধারে।

হাঁ করে চেয়ে থাকে হরনাথ। কত টাকা! এত টাকা ইতিপূর্বে সে কখনো চোখেও দেখে নি। হাজার হাজার টাকা।

গদিতে বসবার পর আর সুধামাধব হরনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না। তাকাবার ফুরসতও অবিশ্যি পায় না।

ফুরসত পেল সেই বেলা একটা নাগাদ। সূর্য তখন মাথার উপরে উঠেছে।

একসময় থলিভর্তি টাকা নিয়ে সুধামাধব উঠে দাঁড়াল, চল হে হরনাথ।

কোথায়?

বাঃ, ঘরে যাব না! স্নানাহার করতে হবে না! চল—ওঠো।

চল।

উঠে দাঁড়াল হরনাথ। পথে যেতে যেতে একসময় হরনাথ প্রশ্ন করে, অনেক রোজগার কর সুধামাধব কারবার থেকে, না?

মৃদু হাসে সুধামাধব। বলে, তা ভালই রোজগার। তাই তো বলছিলাম এখানে চলে আসতে। এখন তো দেখতে পাচ্ছো, মিথ্যা বলি নি!

না, ঠিকই বলেছিলে। কিন্তু—

কিন্তু আবার কি হে?

কারবার করতে হলে যে অর্থের দরকার, সে অর্থই যে আমার নেই ভাই।

সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

ভাবতে হবে না?

না। সে যা প্রয়োজন হবে যোগাড় হয়ে যাবে।

কিন্তু কেমন করে?

সে আমিই ব্যবস্থা করে দেবো।

তুমি?

হ্যাঁ। যদি মন স্থির করে থাকো তো আরো কিছুদিন চোখ মেলে সব দেখ, তারপর ব্যবস্থা হবে।

হরনাথ সেইদিন থেকেই নিয়মিত সুধামাধবের আড়তে গিয়ে বসে বসে সব দেখতে লাগলো। দেখতে লাগলো কি ভাবে ঠিক কারবারটা চলছে। এবং যত দেখতে থাকে হরনাথ, তার কেমন যেন একটা নেশা ধরে যায়।

অর্থের নেশা বড় মারাত্মক নেশা।

এক দিকে অর্থের নেশা, অন্য দিকে সুধামাধবের গৃহে আর এক নেশা হরনাথের দৃষ্টিকে রঙিন করে তুলছিল তখন একটু একটু করে, বুঝি তার নিজের অজ্ঞাতেই।

সে নয়নতারা।

সুধামাধবের স্ত্রী হরকালী হরনাথের সামনে বের হতো না।

কাজেই তার সব কিছু তদারক করতো কনিষ্ঠা নয়নতারা। হরকালী নয়নতারার উপরেই সে ভারটা দিয়েছিল। নয়নতারা রূপসী নয় কিন্তু দেহশ্রী ছিল তার সত্যিই অপূর্ব। উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ, সবে দেহে যৌবন দেখা দিয়েছে।

হরনাথ যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত।

সুধামাধব যে একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে হরনাথকে নবদ্বীপ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তা নয়। নবদ্বীপে হরনাথের গৃহে থাকাকালীন সময়েই কথাপ্রসঙ্গে সে শুনেছিল দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় হরনাথের মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়েছে। এবং বংশরক্ষা হেতু সে একটু উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ঐ সময় একাধিক বিবাহও গর্হিত কিছু ছিল না।

হরনাথই একদিন কথাটা বলেছিল সুধামাধবকে, শেষ পর্যন্ত হয়ত নরকস্থই হতে হবে।

কেন হে, নরকস্থ হবে কেন?

অপুত্রকের দুঃখ তুমি বুঝবে না সুধামাধব।

তা তোমার স্ত্রীর এমনই বা কি বয়স হয়েছে যে সন্তানাদি আর হবেই না তোমার মনে হচ্ছে?

হলে কি আর এই দুই বছরেও হতো না! তাই মাঝে মাঝে কি ভাবি জান?

কি ?

আবার বিবাহ করবো।

তা করলেই তো পারো।

তাই ভাবছি।

কথাটা শোনার পর থেকেই সুধামাধবের মনে হয়েছে স্কন্ধে তার একটি অনূঢ়া শ্যালিকা রয়েছে। এই সুযোগে যদি হরনাথের স্কন্ধে শ্যালিকাটিকে চাপানো যায় মন্দ কি ?

সেই মতলবেই ব্যবসার প্রলোভন দেখিয়ে হরনাথকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল সুধামাধব। এবং গৃহে এসে হরকালীকে গোপনে তার মনোবাসনা জানিয়েও ছিল।

হরকালী কিন্তু প্রথমটায় একটু কিন্তু করেছিল।

দুই স্ত্রী বর্তমান !

সুধামাধব বলেছিল, তাতে কি ? তারা তো নিঃসন্তান। তাছাড়া এখানে একবার কারবারের মধ্যে যদি ওকে ঢুকিয়ে দিতে পারি, আর ও নবদ্বীপ-মুখো হবে তুমি ভাবো ! এখানেই সংসার পেতে বসবে।

কিন্তু তারা যদি এখানে এসে হাজির হয় ?

হাজির অমনি হলেই হলো। আর হলেই বা—

মানে ?

মানে নয়নতারা তো তোমার বোন—সেও ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে।

কি জানি বাপু, বুঝি না অতশত। যা করবার ভেবেচিন্তে করো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরকালীর মনটাও ঐদিকেই ঝোঁকে। হরনাথের সুশ্রী চেহারাও তার মনকে কিছুটা আকর্ষণ করে।

মাসখানেক বাদেই একদিন সুধামাধব প্রস্তাবটা উত্থাপন করে বসে একটু ঘুরিয়ে, একটা কথা বলছিলাম হরনাথ !

কি ?

তোমার কারবারের ব্যবস্থা তো করে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে বিনিময়ে তুমিও যদি আমার কিছু উপকার করো।

ছি ছি, ওকথা বলছো কেন ! কি করতে হবে তাই বল ?

বলছিলাম দু'বার বিবাহ করলে কিন্তু কোন সন্তানাদি হলো না—তাই ভাবছিলাম এক কাজ করো না কেন ?

কি ?

আবার বিবাহ করো।

কিন্তু—

এর মধ্যে আবার কিন্তু কি হে। নয়নকে তুমি বিয়ে কর।

নয়ন ?

হ্যাঁ। কেন মনে ধরে না তাকে ?

একটু ভেবে দেখি।

ভাববে আবার কি—করে ফেল।

সপ্তাহ-অন্তে হরনাথের সঙ্গে নয়নতারার বিবাহ হয়ে গেল।

কথারম্ভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ভবানীচরণ রায় মহাশয়ের গৃহে কবির আসর বসেছে। প্রশস্ত চত্বর, চারিদিকে গোটাদশেক মশাল দপদপ করে জ্বলছে। মশালের আলোয় দেখা যায় বহু শ্রোতা মেয়েপুরুষ এসে ভিড় করেছে সেই আসরে। একদিকে ফরাসডাঙ্গাবাসী কবিয়াল এণ্টুনী অন্য দিকে ভোলা ময়রা নিজে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লাল বাবরি চুল। গলায় মোটা সুগন্ধী বেলের মালা। উদাত্ত কণ্ঠে এণ্টুনী গাইছিল :

ও মা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি জেতে আমি ফিরিঙ্গী।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দলপতি সাড়া দিয়ে ওঠে :

যীশুখৃষ্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে,
জাতফিরিঙ্গী জাবড় জঙ্গী পারবো নাকো তরাতে।

কালো কুচকুচে যেন কষ্টিপাথরে গড়া দেহ, বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী এক যুবক ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে কবিগান শুনছিল। গায়ে একটা কালো চাদর মুড়ি দেওয়া। চাদরটা খুলে ফেললে দেখা যেত, নীচে পরিধানে পর্তুগীজ নাবিকের পোশাক। পোশাক দেখলে মনে হবে, বুঝি লোকটা জাতে পর্তুগীজ নাবিকই। কিন্তু গায়ের কৃষ্ণবর্ণ দেখলে মনে হবে, তার দেহে বুঝি এক ফোঁটা পর্তুগীজ রক্তও নেই।

কোমরে চামড়ার কটিবন্ধে কুর্তার নীচে ঝুলছে একদিকে একটা গাদা পিস্তল, অন্যদিকে কালো মোষের সিংয়ের বাঁটওয়ালা ধারালো একটা ছোরা গোঁজা। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ হলে কি হবে মুখখানি কিন্তু ভারী কোমল। শান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি। ওষ্ঠের ওপরে একজোড়া পাকানো গোঁফ কোমল মুখখানিতে যেন বিশ্রী ভাবে বেমানান।

হঠাৎ লোকটার প্রতি নজর পড়লে মনে হবে বটে যে সে কবিগান শুনছে, কিন্তু শান্ত চোখ দুটি আসলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। অনুসন্ধানী দৃষ্টি।

সাধারণ বাঙ্গালীর বেশে পাশে যে দুটি লোক দাঁড়িয়েছিল ঐ লোকটির

দুপাশে, তারা পর্তুগীজ ডি-কুনহা আর ডি-মেলো। ঐ লোকটির বাম ও দক্ষিণ বাহু যেন ঐ ডি-কুনহা আর ডি-মেলো।

লোকটিকে যদিও সকলেই জানে পর্তুগীজ রমণী ভায়লা ও বিখ্যাত পর্তুগীজ দস্যু রোজারিওর সন্তান বলে, নামটা কিন্তু তার বিচিত্র—সুন্দরম্। না-পর্তুগীজ না-বাংলা—অদ্ভুত একটা নাম।

সুন্দরম্ এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। কানে এলো কবিয়াল ভোলা ময়রা এণ্টুনীর দিকে আঙুল দেখিয়ে মুচকি হেসে গাইছে :

পেদরু ফিরিঙ্গী ব্যাটা, পেরু কাটা,
ব্যাটা ছিলো ভালো, সাহেব ছিলো,
হলো বাঙ্গালী,
এখন কবির দলে এসে মিলে,
ব্যাটা পেটের কাঙ্গালী।
জন্ম যেমন যার, কর্ম তেমন তার,
এ ব্যাটা ভেড়ের ভেড়ে, নিমক ছেড়ে
কবির ব্যবসা ধরেছে।

শ্রোতারা হৈ-হৈ করে ওঠে। একজন বৃদ্ধ শ্রোতাদের মধ্য থেকে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, বাহবা, বাহবা—প্রাণ খুলে ময়রার পো প্রাণ খুলে গাও, বহু কণ্ঠ সায় দেয়।

ভোলা ময়রা নেচে নেচে উল্লাসভরে গেয়ে ওঠে :

কেউ বা কচ্ছেন ব্যারিস্টারী, কেউ বা ম্যাজিস্ট্রারী,
এলেমের জোরে কেউ বা হচ্ছেন জজগিরী
আর এ ব্যাটা পূজার বাড়ি, ভুজোর লোভে
নাচতে এসেছে॥

সুন্দরম্!

ডি'কুনহা কনুই দিয়ে ঈষৎ একটা ঠেলা দিয়ে চাপা কণ্ঠে ডাকে।

সুন্দরম্ বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল কবি-গান শুনতে শুনতে। চমকে ওঠে।

বলে, অ্যাঁ—

এই ঠিক মৌকা সুন্দরম্। সবাই এখন কবি-গান শুনতে ব্যস্ত—

হুঁ।

তাহলে আর দেরি নয়।

না।

পিছনে যে আমবাগানটা আছে সেখান দিয়ে আমি তাহলে ভিতরে চলে যাই!

যা—

ডি'কুনহা নিঃশব্দে শ্রোতাদের অলক্ষ্যে সরে পড়ল পশ্চাৎ দিক দিয়ে।

মস্ত বড় ব্যবসায়ী—ধনী ব্যবসায়ী ভবানীচরণ।

পান ও তামাকের ব্যবসা। তাছাড়া সুবিস্তীর্ণ জমিদারী সারাটা নদীয়া জুড়ে। সেই সব জমিতে ধান হয় প্রচুর।

বিরাট দু'মহলা বাড়ি।

দুটি সংসার। প্রথম স্ত্রী দক্ষবালা, দ্বিতীয় স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী।

দক্ষবালাই বড়। তবে বাতব্যাধিতে পঙ্গু শয্যাশায়ী। তাঁর তিনটি কন্যা, কন্যা তিনটিরই বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র সারদাচরণ ও রণদাচরণ। সারদাচরণ বয়েসে যুবক—কর্মঠ, বলিষ্ঠ, বাপের ব্যবসা দেখাশোনা করে। ছোট রণদাচরণ কলকাতায় পড়াশুনা করে। কন্যা মৃন্ময়ী ত্রয়োদশী।

মৃন্ময়ী শুধু নামেই মৃন্ময়ী নয়, সাক্ষাৎ যাকে বলে মৃন্ময়ী। যেমনি গাত্রবর্ণ যেমনি গড়ন তেমনি মুখশ্রী। সবাই বলে, রায় মশাইয়ের কনিষ্ঠা কন্যাটিকে দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

রায় মশাইয়ের যে ধনপ্রাচুর্যই শুধু আছে তাই নয়, তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যও অফুরন্ত। অতিথি-সমাগম গৃহে লেগেই আছে।

তাছাড়া আত্মীয় ও আশ্রিতের সংখ্যাও কি কম! দু'মহলা বাড়ি রায় মশাইয়ের সর্বদা গম-গম করে।

কিন্তু সেরাত্রে গৃহের সবাই কবি-গানের আসরে গিয়ে ভিড় করেছিল। সুন্দরম্ পূর্বেই সংবাদটা পেয়েছিল। তাই দুটি মাত্র অনুচর নিয়ে সে এসেছিল।

ডি-কুনহা পশ্চাতের আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে এসে একেবারে খিড়কির দরজায় উপস্থিত হলো। খিড়কির দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

লাফিয়ে প্রাচীর ধরে প্রাচীর টপকে নিঃশব্দে ডি-কুনহা ভিতরে প্রবেশ করল। খিড়কির দরজাটা খুলে পুনরায় ফিরে এলো কবির আসরে যেখানে সুন্দরম্ দাঁড়িয়েছিল।

সুন্দরম!

সুন্দরম্ ফিরে তাকাল ডি-কুনহার দিকে।

ঠিক আছে সব?

ঠিক আছে। দরজা খুলে রেখে এসেছি।

আমি আগে আগে যাচ্ছি, তুই আমার পিছনে পিছনে আয়।

কথাটা বলে সুন্দরম্ এগিয়ে যায়। নিঃশব্দে সুন্দরম্‌কে অনুসরণ করে ডি'কুনহা।

বিরাট আম-কাঁঠালের বাগানটা। প্রায় বিঘেখানেক হবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। কার্তিকের শেষ।

সবে লক্ষ্মীপুজো শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাত্রে শিশির ঝরতে শুরু হয়েছে। একটা বেশ মৃদু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব বাতাসে।

অন্ধকারে ঝরাপাতার উপর দিয়ে চলতে চলতে একসময় চাপাকণ্ঠে প্রশ্ন করে সুন্দরম্, ঘরে কেউ নেই নিশ্চয়ই এ সময়, কি বলিস ডি'কুনহা?

কে থাকবে, সবাই এখন কবির আসরে মশগুল!

আমারও তাই মনে হয়।

বলতে বলতে দুজনে অন্ধকারে অগ্রসর হয়।

খিড়কির দরজাপথে দুজনে এসে অন্দরমহলে প্রবেশ করল।

দূরে অলিন্দে একটা দেওয়াল-বাতি জ্বলছে। তারই ক্ষীণ আলোকে লক্ষ্য করে আগে আগে সুন্দরম্ ও পশ্চাতে পশ্চাতে ডি'কুনহা এগিয়ে চলে। অলিন্দের পরই টানা বারান্দা। বারান্দায় সার সার ঘর।

কোন্ ঘরটা রায় মশাইয়ের ডি-কুনহা, জানিস? চাপাকণ্ঠে সুন্দরম্ শুধায়।

হ্যাঁ, ঐ যে ডাইনের কোণের ঘরটা। ঐ—ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে জানালাপথে। ডি'কুনহা ফিস্ ফিস্ করে বলে।

ঠিক জানিস্ তো?

জানি। চল না দেখবে।

ঐ ঘরেই তো সিন্দুক?

হ্যাঁ।

কিন্তু এসময় তো ঘরে কেউ থাকার কথা নয়। ঘরে তবে আলো জ্বলছে কেন, ডি'কুনহা?

ঘরে কেউ না থাকলেও সারারাত ঘরে সেজবাতি জ্বলে রায় মশাইয়ের—

কিন্তু ডি'কুনহা বা সুন্দরম্ জানত না সেরাত্রে রায় মশাইয়ের ঘরে দুটি

প্রাণী ছিল।

একজন রায় মশাইয়ের বোন সুলোচনা। দ্বিতীয়জন রায় মশাইয়ের কনিষ্ঠা কন্যা মৃন্ময়ী। দিন দুই থেকে মৃন্ময়ীর জ্বর। তাই তার পিসি সুলোচনা তাকে নিয়ে ঘরে ছিল। তাই তাকে কার্তিকের হিমে ঠাণ্ডা রাত্রে কবির আসরে যেতে দেওয়া হয় নি। মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় কবি-গানের হল্লা অন্দরেও অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

দুজনে পায়ে পায়ে এসে ঘরের ভেজানো দরজাটার সামনে দাঁড়াল। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে সুন্দরম্, ঘরের ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসে কিনা। কিন্তু না, কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

কোমর থেকে গুলিভরা গাদা পিস্তলটা টেনে বের করে হাতে নিয়ে প্রথমে সুন্দরম্ ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল।

সেজবাতির মৃদু আলোয় ঘরটি স্বল্পালোকিত। ঘরের একধারে একটি দামী পালঙ্কে কে একজন শুয়ে আছে দেখা যায়। তার শিয়রের ধারে বসে এক বর্ষীয়সী নারী। পালঙ্কের বাজুতে মাথা দিয়ে নিদ্রাভিভূত। পায়ে পায়ে অগ্রসর হয় সুন্দরম্। ঘরের দক্ষিণ কোণে লোহার সিন্দুকটি। কিন্তু দু'পাও বুঝি অগ্রসর হয় নি—সুলোচনার ঘুমটা ভেঙে যায়। সে চোখ মেলে তাকায়। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় কালো বস্ত্রে আবৃত মূর্তিটার প্রতি নজর পড়তেই চকিতে সে পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ায়, কে?

চুপ, আস্তে! টু শব্দ করেছো কি fire করব!

চাপাকণ্ঠে সতর্ক করে দেয় সুন্দরম্।

সুলোচনা বোবাদৃষ্টিতে যেন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুন্দরমের দিকে।

॥ ২ ॥

ঘরের খোলা জানালাপথে মধ্যরাত্রির মৃদু একটা ঝাপটা এসে যেন সেজবাতির শিখাটা বারেকের জন্য কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

সুলোচনা তখনো ফ্যালফ্যাল করে ঘরের মধ্যে অদূরে দণ্ডায়মান সুন্দরমের দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

সুলোচনাই নয় শুধু, সুন্দরম্ও তাকিয়ে ছিল সুলোচনার মুখের দিকে।

সুলোচনার মুখের মধ্যে কি ছিল কে জানে, সুন্দরম্ যেন তার দৃষ্টি ফেরাতে পারে না কিছুক্ষণের জন্য।

অমনি আর একটি নারীর মুখ যেন সুলোচনার মুখখানির পাশে পাশে ভেসে

ওঠে সুন্দরমের দুই চোখের দৃষ্টিতে।

ঠিক অমনি আর দুটি চোখের দৃষ্টি। যে প্রীতি, যে স্নেহ, যে ভালবাসা দুর্দান্ত দস্যু কঠিনহৃদয় সুন্দরম্ আজও বুঝি ভুলতে পারে নি।

আজও ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে যে চোখের দৃষ্টি তাকে উন্মনা করে দেয়।

তার মা ভায়লা। কত দিন মাকে তার সে দেখে নি। তার মা। সেই মায়েরই চোখের দৃষ্টি যেন সুলোচনার চোখের মধ্যে দেখতে পায় সুন্দরম্।

হাতের গাদা পিস্তল হাতেই ধরে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরম্। বিহ্বল নির্বাক সুন্দরম্।

হঠাৎ পাশ থেকে ডি'কুনহার মৃদু সতর্ক কণ্ঠে সে যেন চমকে ওঠে।

কি করছো সুন্দরম্, কাজ সেরে নাও তাড়াতাড়ি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক আছে, সিন্দুকটা তুই ভেঙ্গে ফেল ডি'কুনহা। সুন্দর বলে।

ডি'কুনহা সুন্দরমের নির্দেশে অদূরে দেওয়ালের গায়ে দাঁড়-করানো লোহার সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু সিন্দুকটার কাছে পৌঁছাবার আগেই থমকে দাঁড়ায় ডি'কুনহা মৃন্ময়ীর কণ্ঠস্বরে।

কে! কে ওরা পিসি—

মৃন্ময়ীর যে ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, ওরা কেউই টের পায় নি।

মৃন্ময়ীর কণ্ঠস্বরে সুন্দরম্ও ফিরে তাকিয়েছিল মৃন্ময়ীর দিকে এবং তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি যেন আর ফেরে না।

অপলক দৃষ্টিতে সুন্দরম্ তাকিয়ে থাকে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে। মানুষের মুখ নয়, যেন দুর্গাপ্রতিমার মুখখানি একেবারে কেটে বসানো।

মৃন্ময়ী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, কে? কে তোমরা?

সুলোচনা যেন এতক্ষণ কি রকম বিমূঢ় হয়ে পাথরের মতই দাঁড়িয়েছিল। মৃন্ময়ীর চিৎকারে তারও যেন সম্বিৎ ফিরে আসে।

এবং সম্বিৎ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে সুলোচনা। বহির্মহলের সামনে প্রশস্ত অঙ্গনে ভরাট আসরে তখনো পুরোদমে কবিগান চলেছে।

শ্রোতাদের উল্লাসধ্বনি ও কবিয়ালদের উভয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক উচ্চ সুরেলা কণ্ঠস্বর ও বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

অন্দরের সমস্ত পুরুষ-নারীই কবিগান শুনতে অঙ্গনে গিয়ে ভিড় করেছে। ঐ মুহূর্তে একটি প্রাণীও অন্দরমহলে নেই। উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করলেও কেউ তাদের ডাক শুনতে পাবে না। এবং গৃহে যে ডাকাত পড়েছে তাও বুঝতে

পেয়েছিল সুলোচনা।

বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে সুলোচনা। হঠাৎ সুলোচনার চোখে পড়ে দেওয়ালে ঝুলছে খাপসমেত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভবানীচরণের তরবারিটা।

চক্ষের নিমেষে ছুটে গিয়ে সুলোচনা হাত বাড়িয়ে খাপসমেত তরবারিটা পেড়ে নিয়ে খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে ঘুরে দাঁড়াল।

সেজবাতির মৃদু আলোয় ধারালো তীক্ষ্ণ তরবারির ইস্পাতের ফলাটা ঝিলমিল করে ওঠে।

ডি'কুনহা তখন সবেমাত্র একটা ছোট লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সিন্দুকটা খুলবার জন্য সিন্দুকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ধারালো তরবারিটা হাতে নিয়ে সুলোচনা ডি'কুনহাকে আক্রমণ করতেই এগিয়ে যায়।

সামান্য ব্যবধান দুজনার মধ্যে—ডি'কুনহা ও সুলোচনা।

হাতের গাদা পিস্তলটা সুলোচনার দিকে তুলে লক্ষ্য করে সুন্দরম্ চিৎকার করে ওঠে, হুঁশিয়ার! সুন্দরমের কণ্ঠস্বরে ঘুরে দাঁড়ায় ডি'কুনহা। কিন্তু সুলোচনা সুন্দরমের কণ্ঠস্বরে এতটুকুও ভয় না করে ডি'কুনহাকে লক্ষ্য করে হাতের তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটা ডি'কুনহার বাম বাহুমূলের নীচে সজোরে বসিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে ডি'কুনহা।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরমের হাতের গাদা পিস্তল গর্জন করে ওঠে, দুড়ুম!

মৃন্ময়ীও চুপ করে ছিল না। শিয়রের ধারে যে পিতলের পিকদানীটা ছিল, সেটাই তুলে নিয়ে সজোরে সুন্দরম্‌কে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। পিকদানীটা গিয়ে সুন্দরমের গায়ে পড়ে। তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সুন্দরম্। তার হাতের নিক্ষিপ্ত গাদা পিস্তলের গুলি দেওয়ালে গিয়ে বিদ্ধ হয়।

মৃন্ময়ী চিৎকার করে ওঠে, ডাকাত, ডাকাত!

ডি'কুনহা যন্ত্রণায় মাটিতে বসে পড়েছিল।

সুলোচনা ততক্ষণে আবার তরবারিটা নিয়ে ডি'কুনহাকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সুন্দরম্ সেই সময় হঠাৎ ছুটে এসে মৃন্ময়ীর মুখটা চেপে ধরলো এবং কোমর থেকে একটা বস্ত্রখণ্ড বের করে ক্ষিপ্রহস্তে মৃন্ময়ীর মুখটা বেঁধে ফেললো।

মৃন্ময়ী আপ্রাণ বাধা দেবার চেষ্টা করেও তার চাইতে বহুগুণ ক্ষমতাশালী সুন্দরমের হাতে বন্দিনী হয়।

আহত ডি'কুনহার বক্ষে দ্বিতীয়বার আবার সুলোচনা তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটা বসিয়ে দেয়।

মৃত্যু-আর্তনাদ করে ওঠে ডি'কুনহা। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দু'হাত দিয়ে

মৃন্ময়ীর হাল্‌কা দেহটা স্কন্ধের ওপরে তুলে নিয়ে চোখের পলকে একলাফে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরে থেকে কক্ষের শিকলটা তুলে দিল সুন্দরম্।

সুলোচনা ছুটে এসে বাইরে থেকে বন্ধ দ্বারের ওপরে চিৎকার করে করাঘাত হানতে থাকে, ডাকাত, ডাকাত!

সুন্দরম্ আর মুহূর্ত কালক্ষেপ করে না। যে পথ দিয়ে সে অন্দরে প্রবেশ করেছিল সেই পথ দিয়েই সে মৃন্ময়ীকে কাঁধে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায়।

মুখ-বাঁধা মৃন্ময়ী কেবল হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। তার কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বর বের হয় না।

আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে, খিড়কির উন্মুক্ত দ্বারপথে সোজা এসে একেবারে পিছনের রাস্তায় পড়লো সুন্দরম্ মৃন্ময়ীকে কাঁধে নিয়ে। মধ্যরাত্রির নির্জন রাস্তা।

ছুটতে ছুটতে সোজা একেবারে সুন্দরম্ নদীতীরে এসে হাজির হলো। নদীর ঘাটে কিছুদূরে একটা নির্জন বটবৃক্ষের নীচে অন্ধকারে ছায়ার মত দাঁড়িয়েছিল বিশমাল্লাবাহী বিরাট নৌকোটা সুন্দরমের।

নৌকোর পাটাতনের উপরে স্তূপীকৃত তামাকপাতা। তামাকের ব্যবসায়ী সেজেই এসেছিল সুন্দরম্ তার বিশমাল্লাবাহী বিরাট নৌকাটা নিয়ে কৃষ্ণনগরে। এমনি করেই সুন্দরম্ নদীর ঘাটে ঘাটে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তার নাও নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার আসল ব্যবসা ডাকাতি করা।

সতর্ক মাঝি এমানুল্লা সজাগই ছিল। মৃন্ময়ীকে কাঁধে নিয়েই ডাঙা থেকে একলাফে সুন্দরম্ নৌকার পাটাতনের উপর গিয়ে পড়ল। নৌকাটা দুলে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে এমানুল্লার হাতের ধারালো বর্শাটা ঝিকিয়ে ওঠে সুন্দরম্‌কে লক্ষ্য করে।

তাড়াতাড়ি বলে সুন্দরম্, মাঝি আমি—

কাপ্তান—

হ্যাঁ। শীগগিরই নাও খুলে দাও।

নাও খুলে দেবো?

হ্যাঁ। জলদি।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই এমানুল্লা নাও একেবারে মাঝনদীতে নিয়ে গিয়ে ফেললো।

পুবে বাতাস আছে, পাল তোল—সব দাঁড় জলে ফেল।

ঝপ-ঝপ করে কুড়িটা দাঁড় জলে পড়ল। তরতর করে পাল খাটিয়ে দেওয়া হলো। তীরবেগে নৌকা পূবমুখো ভেসে চললো।

আরো ঘণ্টাখানেক পরে। বিশটা দাঁড়ের টানে নৌকা তীরবেগে তখন মাঝ-দরিয়ায় ছুটে চলেছে। ঝপ্-ঝপ্ দাঁড় টানার শব্দ একটানা শোনা যায়। সেই সঙ্গে নৌকার গায়ে আছড়ে পড়া জলতরঙ্গের শব্দ।

নিজের কামরার মধ্যে সুন্দরম্ একটা উঁচু চামড়ামোড়া আসনে বসেছিল। কামরার মধ্যে আলো জলছিল, সেই আলোয় কামরাটি আলোকিত।

সামনেই পুরু গালিচামোড়া কামরায় পাটাতনের উপরে হাত-পা-বদ্ধ অবস্থায় বসেছিল মৃন্ময়ী।

মুখের বাঁধনও তার খুলে দিয়েছিল সুন্দরম্। সুদীর্ঘ রুক্ষ কুন্তল পৃষ্ঠ ও বক্ষের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে।

অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল মৃন্ময়ী সুন্দরমের মুখের দিকে। সুন্দরম্‌ও তাকিয়ে ছিল মৃন্ময়ীর মুখের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে। ওষ্ঠপ্রান্তে তার মৃদু নিঃশব্দ হাসির একটা বঙ্কিম রেখা।

কেন, কেন আমাকে ধরে নিয়ে এলে? তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে মৃন্ময়ী।

সুন্দরম্ কিন্তু মৃন্ময়ীর প্রশ্নের জবাব দেয় না, কেবল মিটি মিটি হাসতে থাকে। আর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে কিশোরী মৃন্ময়ীর প্রতিমার মত সুন্দর ঢল-ঢল মুখখানা। চেয়ে চেয়ে যেন সুন্দরমের আশ মেটে না।

ডাকাত—শয়তান! কেন, কেন আমাকে ধরে নিয়ে এলে?

সুন্দরম্‌কে হাসতে দেখে আবার গর্জে ওঠে মৃন্ময়ী।

আশ্চর্য লাগে সুন্দরমের। মেয়েটাকে জোর করে ধরে নিয়ে এল, তার জন্য মেয়েটা তো ভয়ে সিঁটিয়ে নেই, কিম্বা কাঁদছেও না! মেয়েটার কি ভয়-ডর বলেও কিছু নেই?

সুন্দরমের মত তাগড়া পুরুষ, তার সঙ্গেও ঝাঁঝালো কণ্ঠে কথা বলছে!

ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও। সুন্দরম্‌কে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে মৃন্ময়ী।

কিন্তু সুন্দরম্ নিঃশব্দে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে তো হাসছেই। নাঃ, রায়বাড়ি থেকে ধন-দৌলত কিছু না আনতে পারলেও সে আজ ঠকে নি।

তুচ্ছ ধন-দৌলতের চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান সামগ্রী আজ ঈশ্বর তাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। দুহাত ভরে সে আজ নিয়েছে, খুশীর দোলায় মনটা যেন দুলতে থাকে সুন্দরমের।

কিন্তু দুর্ধর্ষ জমিদার ঐ ভবানীচরণ রায়। এবং এতক্ষণে নিশ্চয়ই রায়বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে। কোতোয়ালীতেও নিশ্চয়ই এতক্ষণে সংবাদ প্রেরণ করেছেন রায় মশাই।

কাজেই ভবানীচরণের নাগালের বাইরে যত দূর সে চলে যেতে পারে ততই মঙ্গল।

সুন্দরম্ এমানুল্লাকে বললে, রাত শেষ হবার আগে অন্তত পাঁচ ক্রোশ পথ পার হতে হবে এমানুল্লা—

এমানুল্লা কেবল মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। কারণ সে জানে পাঁচ ক্রোশ কেন, হাওয়া ঠিক থাকলে সে আরো বেশী পথ অতিক্রম করে যেতে পারবে।

সুন্দরম্ আকাশের দিকে তাকালো।

নিশি প্রায় ভোর হয়ে এলো। পূবের আকাশটা তারই অত্যাসন্ন ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটা চাপা আলোর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ডি'মেলোর জন্য ভাবনা নেই সুন্দরমের, সে ঠিক যেমন করেই হোক কলকাতায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু ডি'কুনহার কথাই ভাবে সুন্দরম্। আহত ডি'কুনহাকে ফেলে তাকে চলে আসতে হলো। কিন্তু উপায়ই বা কি আর ছিল?

ডি'কুনহাকে সঙ্গে নিয়ে আসাও তো কম ঝক্কি ছিল না। তাছাড়া মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ীকে আনা হতো না তার।

সুন্দরম্ আবার নৌকার কামরার মধ্যে এসে ঢুকল।

মৃন্ময়ী হাত-না-বাঁধা অবস্থাতেই পাটাতনে বিছানো গালিচার উপর কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুন্দরম্।

ভাসমান নৌকার দোলানিতে কামরার মধ্যে বাতিটাও দুলছে। বাতির আলো এসে ঘুমন্ত মৃন্ময়ীর মুখের ওপরে একবার পড়ছে, আবার সরে যাচ্ছে।

হাঁটু ভেঙে বসল সুন্দরম্ মৃন্ময়ীর সামনে।

বহুদিনের বিশ্বস্ত অনুচর, সাথী ডি'কুনহা গিয়েছে যাক, ক্ষতি নেই। মৃন্ময়ীকে সে পেয়েছে।

ঘুমন্ত মৃন্ময়ীর লাল টুক্‌টুকে গালটা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করবার লোভটা কেন না জানি সুন্দরম্ সামলাতে পারে না। আলগোছে অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজের বিশাল হাতের কর্কশ মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে স্পর্শ করে সুন্দরম্ মৃন্ময়ীর ডালিমফুলের মত রাঙা গালটা।

কিন্তু স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চমকে ওঠে সুন্দরম্। হঠাৎ যেন তার

আঙুলের ডগায় আগুনের স্পর্শ লেগেছে। ছ্যাক্ করে ওঠে আঙুলের ডগা। এবং তাড়াতাড়ি সে এবারে ঘুমন্ত মৃন্ময়ীর কপালটা ভাল করে হাত দিয়ে স্পর্শ করে।

ঠিক! যা ভেবেছে তাই। আগুনের মত তপ্ত। যেন পুড়ে যাচ্ছে।

সত্যিই মৃন্ময়ীর জ্বরে গা তখন যেন পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান।

প্রথমটায় হতচকিত সুন্দরম্ মৃন্ময়ীকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। বিহ্বলের মত এদিক ওদিক তাকায়। তার পর তাড়াতাড়ি হাত-পায়ের বাঁধনগুলো মৃন্ময়ীর খুলে দেয় সুন্দরম্।

কিন্তু মৃন্ময়ীর দিক থেকে কোন সাড়াই আসে না। জ্বরের ঘোরে মৃন্ময়ী বুঝি ব্যাপারটা টেরও পায় না। দু' হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীর জ্বরতপ্ত নিঃসাড় দেহটা বুকের ওপরে তুলে নিল সুন্দরম্, তার পর এনে তাকে নিজের শয্যার ওপরে সযতনে শুইয়ে দিল। একটা পাখা নিয়ে শিয়রের ধারে বসে হাওয়া করতে লাগল।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে সুন্দরমের নৌকা যখন এসে চেতলার ঘাটে ভিড়ল, মৃন্ময়ী তখন চোখ মেলে তাকাল।

ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকল, পিসি?

সুন্দরম্ ঝুঁকে পড়ল মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

আমি কোথায়? মৃন্ময়ী আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলে।

সুন্দরম্ ধীরে ধীরে সস্নেহে মৃন্ময়ীর মাথার রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে থাকে। কোন জবাব দেয় না। মৃন্ময়ী হঠাৎ ঐসময় তার হাতটা বাড়িয়ে সুন্দরমের রুক্ষ কর্কশ হাতটা চেপে ধরল।

আপনা থেকেই সুন্দরমের হাতটা থেমে যায়। সুন্দরমের হাতটা ধরা মৃন্ময়ীর নরম কচি মুঠির মধ্যে।

মৃন্ময়ী চেয়ে থাকে সুন্দরমের মুখের দিকে। সুন্দরম্ চেয়ে থাকে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

তুমি কে?

আমি সুন্দরম্।

॥ ৩ ॥

মৃন্ময়ী আবার চোখ বুজলো। চোখ খুলে রাখবার তখন তার সত্যিই কোন ক্ষমতা ছিল না। সুন্দরম্ কিন্তু রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কাল রাত থেকেই জ্বর। যাহোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে এবং সেটা

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কি করা যায়!

মনে পড়লো হঠাৎ সুন্দরমের চেতলার সেই কানা কবিরাজ ভিষগ্‌রত্নের কথা। লোকটা যেমন অর্থপিশাচ তেমনি খিটখিটে বটে, তবে তার বড়ি, পাচনচূর্ণগুলো খুব কাজ করে।

সেবারে হুগলী থেকে ফিরে তার গা-ভর্তি লাল ডুমো ডুমো কি সব বের হয়েছিল। মাথার মধ্যে যেমন অসহ্য যন্ত্রণা, তেমনি সমস্ত শরীরে ব্যথা।

ঐ কানা কবিরাজ ভিষগ্‌রত্নের ঔষধ খেয়েই তো মাসখানেকের মধ্যে সে ভাল হয়ে উঠেছিল।

ভিষগ্‌রত্ন আবার কালীর আরাধনা করে, সন্ধ্যার পর কারণের বোতল নিয়ে বসে। এ সময়টা সে কারো সঙ্গে দেখা করে না।

রাজা-উজির যে-ই হোক গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তবে সুন্দরম্‌কে সে ভয় করে।

বলে, তুই বেটা দৈত্য, তোকে দেখলেই বুক কাঁপে—

হাসতে হাসতে অবিশ্যি বলেছে সুন্দরম্, কেন গো ঠাকুর, আমাকে দেখলে তোমার বুক কাঁপে কেন?

দুম করে কখন হয়তো তোর ঐ পিস্তল চালিয়ে বসবি, নয়তো ঐ কোমরের ছোরাটা বুকে বসিয়ে দিবি—

খামকা পিস্তলই বা চালাবো কেন আর ছোরাই বা বুকে বসাতে যাবো কেন?

হার্মাদ তোরা, তোদের দ্বারা সবই সম্ভব। এই সেদিনও তো তোদের বাপ-দাদারা লুটতরাজ, হত্যা আর নারীধর্ষণ করে বেড়িয়েছিল। সেই খুনে দস্যুদের বংশই তো তোরা, ভাল হবি কোথা থেকে!

সুন্দরম্ স্থির করে ফেলে কানা কবিরাজের কাছেই একবার যেতে হবে। কামরার বাইরে এসে দাঁড়াল সুন্দরম্।

ইতিমধ্যেই চারিদিকে বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ভাঁটির সময় এখন।

টালির নালার দু'পাড়ে অনেকখানি কাদা জেগেছে, গিজ্‌গিজ্‌ করছে সব চালের কারবারীদের শালতি, বজরা, পানসী—নানা ধরনের নাও।

নৌকায় নৌকায় সব আলো জ্বলছে। ঘোলাটে জলে সেই আলো পড়ে থির থির করে কাঁপছে।

এমানুল্লা!

পাটাতনের একধারে বসে মাঝি এমানুল্লা হুঁকায় তামাক খাচ্ছিল। সাড়া

দিল, কাপ্তান!

আমি একটু ডাঙায় যাচ্ছি।

কখন ফিরবে?

তাড়াতাড়িই ফিরবো।

আজ রাত্রে কি নাও ছাড়তে হবে?

না। সাবধানে থেকো, আমি আসছি—

নৌকা থেকে নেমে কাদার উপর দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে সুন্দরম্ ডাঙার দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল সুন্দরমের। হাতে নগদ টাকা নেই। নগদ টাকা ছাড়া আবার কানা কবিরাজ কথাই শুনতে চায় না!

ফিরে গেল সুন্দরম্ আবার নৌকায়। কামরায় ঢুকে একটা বেতের পেটিকা থেকে কি যেন বের করে কুর্তার পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে আবার নৌকা থেকে নেমে এলো। একবার সুধামাধবের আড়তে ঘুরে যেতে হবে। ডাঙায় উঠে সুন্দরম্ সুধামাধবের চালের আড়তের দিকেই চলল।

সেদিনকার মত বেচা-কেনা শেষ হয়ে গিয়েছে, দু-একজন কর্মচারী ছাড়া সকলেই চলে গিয়েছে।

গদিতে বসে সুধামাধব ঐদিনকার বেচা-কেনায় যা পাওয়া গিয়েছে সব থাকে থাকে সাজিয়ে রাখছিল। অদূরে একটা ছোট চৌকির ওপর বসেছিল হরনাথ।

হরনাথের কিছু অর্থের প্রয়োজন, কথাটা বলতে তাই এসেছিল সুধামাধবের কাছে। নিজের কারবারটা একটু গুছিয়ে নেবার পরই হরনাথ সুধামাধবের গৃহ ছেড়ে চেতলা অঞ্চলেই ছোট একটি বাসাবাড়ি ভাড়া নিয়ে নবপরিণীতা স্ত্রী নয়নতারাকে নিয়ে উঠে এসেছিল। আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে তার মন চায় নি। তাছাড়া নয়নতারার সঙ্গে বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই সুধামাধব-গৃহিণী হরকালীর ব্যবহারটা যেন কেমন ঠেকছিল।

হরনাথের তো হরকালীর ব্যবহারটা ভাল লাগছিলই না, নয়নতারারও ভাল লাগছিল না—নিজের সহোদরা বোন হলেও। সুধামাধবের দিক থেকে অবিশ্যি কোন ত্রুটিই পায় নি হরনাথ। সাদাসিধে লোকটি, বিশেষ কোন ঘোরপ্যাচ নেই। নিজের ব্যবসা ও অর্থোপার্জন নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত।

তবে হরনাথ যখন পৃথক ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করেছিল, সুধামাধব বাধাও দেয় নি। কেবল কথাটা শোনার পর বলেছিল, বেশ তো!

কিন্তু ব্যবসা জিনিসটা সকলের জন্য নয়, সকলের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। অধ্যাপক-বংশের সন্তান—পণ্ডিত-বংশের সন্তান, যার পূর্বপুরুষরা ছাত্র-অধ্যয়নের ভিতর দিয়েই নিজেদের জীবনকে খুঁজে পেয়েছেন, সার্থক করে তুলেছেন, তার পক্ষে ব্যবসার মূল ব্যাপারগুলো আয়ত্ত করা অল্পদিনের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবেই কঠিন।

হরনাথের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আর সেই কারণেই বোধ হয় হরনাথ ব্যবসায় তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছিল না।

ব্যবসায় আরো কিছু অর্থের প্রয়োজন, তাই এসেছিল হরনাথ সুধামাধবের কাছে। কিন্তু কি ভাবে কথাটা পাড়বে তাই বুঝে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় সেখানে সুন্দরম্ এসে প্রবেশ করল।

সেলাম বাবুজী!

দীর্ঘকায় সুন্দরম্ সেলাম জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

আরে সুন্দর সাহেব যে! তার পর, অনেক দিন পর! কি সংবাদ বল?

আছে কিছু সংবাদ। বলতে বলতে বসলো সামনেই চৌকিটার উপর চেপে সুন্দরম।

হরনাথ আগন্তুকের দিকে চেয়ে যেন চোখ ফেরাতে পারে না।

দেহবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ হলেও, চেহারার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত পৌরুষ ঝলমল করছে।

পরিধানে পর্তুগীজের পোশাক।

সুন্দরম্ কিন্তু পাশেই হরনাথকে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন একটু ইতস্তত করে।

সুধামাধব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে, ওহো! সুন্দর সাহেব, ওকে তুমি চেনো না বটে, তবে ও আমার আত্মীয়। একদিকে ভাই—আবার ভায়রাও বটে—

তাই নাকি, সেলাম বাবুজী! সুন্দরম্ হরনাথকে হাত তুলে সেলাম জানায়।

হঠাৎ যেন একটা ব্যাপার ঐ সময় সুধামাধবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। কিছুক্ষণ ধরে একবার সে হরনাথ আর একবার সুন্দরমের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট ভাবে বলে, আশ্চর্য!

হরনাথ সুধামাধবের কথায় যেন একটু চমকে উঠেই বলে, অ্যাঁ, কি বলছিলে সুধা?

বলছিলাম—আশ্চর্য, সুন্দর সাহেবের সঙ্গে তোমার চেহারার মনে হচ্ছে যেন একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে!

সুন্দরম্‌ও কথাটা শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায় সুধামাধবের মুখের দিকে।

তোমার আজ বয়েস হয়েছে, চুলও পেকেছে বটে কিন্তু তোমার যৌবনের চেহারাটা যেন সুন্দর সাহেবের চেহারার মধ্যে হুবহু দেখতে পাচ্ছি।

সুন্দরম্‌ এবারে হাসতে হাসতে বলে, কি যে বলেন বাবুজী! আমি হচ্ছি পর্তুগীজ আর উনি বাঙ্গালী—no relation—

তা বটে। তবু মিলটা কিন্তু সত্যিই বিচিত্র। তা যাক, কি জন্য এসেছিলে বল?

আমার কিছু টাকার দরকার ছিল বাবুজী।

সঙ্গে এনেছো কিছু?

হ্যাঁ। সুন্দরম্‌ কুর্তার পকেটে হাত চালিয়ে একছড়া সোনার হার বের করে সুধামাধবের সামনে নামিয়ে রাখল।

লোভীর মতই যেন ছোঁ দিয়ে হারটা তুলে নিল সুধামাধব। তারপর অলোয় হারটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

আসল চীজ আছে বাবুজী।

হুঁ, তা কত চাও?

আপনি পাকা জহুরী আছেন বাবুজী, যেমন চীজ তেমনি দেবেন।

শেষ পর্যন্ত দর-কষাকষি করে একটা রফা হলো এবং সুধামাধব টাকাটা দিয়ে দিল সুন্দরম্‌কে।

সুন্দরম্‌ টাকা নিয়ে আবার সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

সুধামাধবের যে ঐ ধরনের কারবারও চালের কারবারের সঙ্গে চলে জানত না হরনাথ। এতদিন ভেবেছে হরনাথ, সুধামাধব চালের কারবার করে এত টাকা করলো কি করে!

আজ রহস্যটা যেন তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো। সুধামাধব চালের কারবারের সঙ্গে সঙ্গে তাহলে চোরাই মালের কারবারও চালাচ্ছে।

সুধামাধব বোধ হয় ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিল এবং ঝোঁকের মাথায় সুন্দরমের সঙ্গে ওর সামনেই লেনদেনটা করে ফেলে একটু যেন বিব্রতই বোধ করতে থাকে। মনে হয় কাজটা বোধ হয় ঠিক হলো না।

হঠাৎ ঐ সময় হরনাথ প্রশ্ন করে, লোকটা কে সুধা?

কে! কার কথা বলছো?

ঐ যে তোমার সুন্দর সাহেব না কি!

ও একজন—মানে ঐ চালেরই ব্যাপারী। বোধ হয় কিছু টাকার দরকার, তাই হারটা বাঁধা রেখে কিছু টাকা নিয়ে গেল।

মুখের ওপরে অমন একটা মিথ্যা কথা সুধামাধবকে অক্লেশে বলতে শুনে হরনাথের মনটা যেন কেমন ঘিনঘিন করে ওঠে। মনে হয় কি করে সুধামাধব অত বড় মিথ্যা কথাটা উচ্চারণ করল।

সহসা সুধামাধবের ওপরে হরনাথের মনটা যেন কেমন বিষিয়ে ওঠে। ঐ লোকের কাছেই কিনা হরনাথ অর্থসাহায্যের জন্য হাত পাততে এসেছিল।

উঠে দাঁড়ায় হরনাথ।

কি হে, উঠছো নাকি ?

হ্যাঁ, চলি।

কি যে কথা ছিল বলছিলে তখন ?

না, থাক।

নয়ন কেমন আছে ?

ভালই।

হরনাথ বের হয়ে পড়লো রাস্তায়।

বেশ অন্ধকার চারিদিকে। টালির নালা থেকে অপ্রশস্ত পায়ে চলা পথটা ধরে পূব-মুখো এগিয়ে চলে হরনাথ। পথের দু-পাশে ঘর-বাড়ি। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। অন্ধকারেও মানুষজনের যাতায়াতের বিরাম নেই রাস্তায়। অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলতে চলতে দু'চারজনের সঙ্গে ধাক্কাও লাগে।

পথ চলতে চলতে আবার হরনাথের মনের পাতায় সুন্দরমের চেহারা ও মুখখানাই ভেসে ওঠে অকস্মাৎ।

পর্তুগীজদের মধ্যে অমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা ইতিপূর্বে হরনাথের কখনো চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার চাইতেও বেশী আশ্চর্য, সুন্দরমের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হরনাথের মনের ভিতরটা যেন কেমন করছিল।

সুধামাধবও বলছিল বটে, সুন্দরমের মুখের সঙ্গে তার মুখের নাকি একটা অপূর্ব মিল রয়েছে।

কিন্তু তা নয়—

সে মিল আছে কি না সে বুঝতে পারে নি। সে দেখেছিল সুন্দরমের ডান কপালের ওপরে একটা কালো লম্বা জরুল-চিহ্ন।

ঠিক অমনি জরুল-চিহ্ন আর একজনের কপালেও ঠিক ঐ জায়গাতেই ছিল। আর সুলোচনা—হ্যাঁ, সুলোচনার কপালেও ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সুলোচনা!

অনেকগুলো বছরের ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে যেন একটা জলন্ত স্মৃতি—একখানি মুখ প্রৌঢ় হরনাথের মনের পাতায় ভেসে উঠলো।

অনেকদিন এবং অনেকগুলো বছর বই কি। তা প্রায় কুড়িটা বছর তো হবেই। এই কুড়িটা বছরে হরনাথের জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। দেহে বয়েসের চিহ্ন পড়েছে, চুলে পাক ধরেছে। জীবন-সূর্য অপরাহ্নের দিকে গড়িয়ে চলেছে।

হরনাথের জীবনে প্রথম নারী ঐ সুলোচনা। কত মধুযামিনীর স্মৃতি, কত তুচ্ছ মান-অভিমান, কত ভালবাসা ও বেদনার স্মৃতি সুলোচনাকে ঘিরে আজও যা মনের সবটাই প্রায় ভরিয়ে রেখেছে।

সে কি ভোলবার, না কেউ তা ভুলতে পারে! না জীবনে কেউ কোনদিন তা ভুলেছে!

জীবনে তারপর এসেছে তার দাক্ষায়ণী এবং নয়নতারা। কিন্তু তারা তার জীবনে আসা মাত্রই।

দেহের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে ঘটেছে, কিন্তু মনের সম্পর্ক তো কোনদিন ঘটে নি। মনের মধ্যে কোনদিনই বুঝি হরনাথের তারা স্থান পায় নি।

দূরের যেন অনেক দূরের তারা। সমস্ত মন জুড়ে আজও তার রয়েছে সুলোচনাই।

মনে পড়ে হরনাথের, সুলোচনার কপালেও ঠিক অমনি একটি জরুল-চিহ্ন ছিল, আর একজনেরও ছিল অমনি একটি জরুল-চিহ্ন কপালে, সুলোচনার পুত্র—তাদের বড় আদরের প্রথম সন্তান গোপালের। সাগরের কাছে মানত-করা সন্তান।

হরনাথের পিতা প্রথম দিন পৌত্রমুখ দর্শন করে বলেছিলেন সানন্দে, গোপাল—আমার ঘরে স্বয়ং গোপাল এসেছে গিন্নী!

পৌত্রের নামকরণ তিনিই করেছিলেন। রামানন্দ মিশ্রের পৌত্র গোপাল মিশ্র।

গোপালই বটে। কালো কষ্টিপাথরের মত অপূর্ব লাবণ্যময়। রামানন্দ মিশ্র

বলতেন, গোপাল। হরনাথ বলতো, কালো মাণিক। আর সুলোচনা আদর করে বলত, কালো সোনা। তাদের সেই বুকের নিধি, অনেক আকাঙ্ক্ষার নিধি নিঠুর দেবতা কেড়ে নিল। ছিনিয়ে নিল তার বুক থেকে। শুধু কি গোপালকেই ছিনিয়ে নিল, সেই সঙ্গে সুলোচনাকেও বুঝি ছিনিয়ে নিল চিরদিনের মত হরনাথের বুক থেকে।

সুলোচনা দূরে চলে গেল। পাথর হয়ে গেল যেন সুলোচনা।

সেই সুলোচনার কপালেই ছিল জরুর-চিহ্নটি।

আশ্চর্য, সুন্দর সাহেবের কপালেও ঠিক সেই জায়গাতেই ঠিক তেমনি একটি জরুল-চিহ্ন!

হরনাথের অজ্ঞাতেই বুঝি কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু ধীরে ধীরে যুবকে রূপান্তরিত হয়।

গোপাল!

হঠাৎ পথচলতি এক পথিকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তার কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে হরনাথ, মদ্যপান করে রাস্তায় চলছো নাকি হে! দেখতে পাও না?

হরনাথ তাড়াতাড়ি কুণ্ঠিত ভাবে ক্ষমাভিক্ষা করে। মনে মনে হাসেও বুঝি। কি পাগলের মত আবোল-তাবোল চিন্তা করছিল! তাড়াতাড়ি গৃহের দিকে অগ্রসর হয়। গৃহদ্বারে পৌঁছে বদ্ধদ্বারে ধাক্কা দিতেই কন্যা সুনয়না এসে দ্বার খুলে দিল, এত রাত হলো যে ফিরতে বাবা তোমার!

হ্যাঁ মা, একটু রাত হয়ে গেল।

সন্ধ্যা থেকে মার যে আবার জ্বর এসেছে। সুনয়না বলে।

আবার জ্বর এলো?

হ্যাঁ, বাবা। তুমি বরং এবারে একবার কানা কবিরাজ মশাইকেই ডেকে এনে মাকে দেখাও।

কানা কবিরাজ!

হ্যাঁ, সিধু কবিরাজের ঔষধ তো একমাসের ওপর বা খেলো। জ্বর তো কমল না। দু-চার দিন অন্তরই ঘুরে ঘুরে আসছে। ও-বাড়ির আন্নাপিসিও বলছিল—

কি?

চেতলার কানা কবিরাজের ঔষধ না খেলে ও জ্বর মা'র নাকি যাবে না।

তাহলে তুই দরজাটা বন্ধ করে দে, আমি বরং একবার এখনি সেখান থেকে ঘুরে আসি। বেশী দূর তো নয়—

এই রাত্রে কেন? কাল সকালেই যেও—

নারে না। ঘুরেই আসি একবার। ঘর থেকে আমার লাঠিটা দে তো মা। বাইরে বড্ড অন্ধকার।

সুনয়না ঘর থেকে লাঠিটা এনে বাপের হাতে দেয়।

হরনাথ বেরিয়ে যায়, সুনয়না দরজায় অর্গল তুলে দেয় ভিতর থেকে।

বেশ কয় পাত্র কারণ-বারি পেটে পড়বার পর কানা কবিরাজ তখন রঙেই ছিল বলতে হবে।

সুন্দরম্ এসে ডাকতে প্রথমটায় সুন্দরমের সঙ্গে দেখাই করতে চায় নি। ভৃত্য যাদবকে বলেছিল হাঁকিয়ে দিতে।

বিচিত্র চরিত্রের লোক কানা কবিরাজ ভিষগ্‌রত্ন।

চেহারাটাও বিচিত্র। যেমন লম্বা তেমনি রোগা। ঘোড়ার মত লম্বা মুখ। সে মুখখানাও বসন্ত চিহ্নে ক্ষতবিক্ষত।

একটি মাত্র চক্ষু—বাকী চক্ষুটি শূন্য একটি কোটর মাত্র। বসন্ত রোগেই নাকি বাল্য বয়সে ঐ চক্ষুটি কবিরাজ করালীচরণ সান্যাল ভিষগ্‌রত্ন হারিয়েছিল। একটি চক্ষুর জন্যই তার নাম হয়েছিল কানা কবিরাজ।

ছোট ছোট ছেলেরা বলতো কানা ব্রহ্মদৈত্যি। তা ব্রহ্মদৈত্যের মতই লোকটা দেখতে বটে।

চেতলা অঞ্চলেই দীর্ঘদিনের বসবাস। সংসার করে নি কানা কবিরাজ।

করালীচরণের মা বেঁচে থাকতে অনেকবার ছেলেকে বিবাহ দিয়ে সংসারী করে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুখ বিকৃতি করে করালীচরণ জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ, বিয়ে করি তারপর মাগী আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিক বা গৃহত্যাগিনী হোক। রামোচন্দ্রঃ! অমন অবিমৃষ্যকারিতা আর যেই করুক, করালীচরণ করবে না।

কিন্তু সংসার না করলেও, বিবাহ না করলেও একটি রক্ষিতা বরাবরই পোষণ করে এসেছে করালীচরণ।

মায়ের জীবিতাবস্থায় তাকে গৃহে আনে নি—মৃত্যুর পর মায়ের শ্রাদ্ধশান্তির পরদিনই জগদম্বাকে গৃহে এনেই তুলেছিল।

করালীচরণের যোগ্য রক্ষিতাই বটে। এবং সার্থক নামটি জগদম্বা। করালীচরণ যেমন রোগা ডিগডিগে, জগদম্বা তেমনি প্রস্থে গোলাকার একটি জালাবিশেষ। এবং কণ্ঠস্বর অপরূপ, কাংস্য-বিনিন্দিত। দুজনে চুলোচুলি ও লাঠালাঠি প্রায়ই হতো বটে, তবে দুজনার পরস্পরের মধ্যেই, যাকে বলে অন্তরের

একটা টান, তাও ছিল।

একে সেদিন দ্বিপ্রহরে জগদম্বা ও করালীচরণের মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঝগড়া হওয়ায় করালীচরণের মেজাজটা তেমন যাকে বলে প্রসন্ন ছিল না, তার উপর সবে তখন সে সন্ধ্যাআহ্নিক সমাপ্ত করে কারণের পাত্রটি নিয়ে বসেছিল। ঐ সময় সুন্দরম্ এসে হাজির।

খিঁচিয়ে উঠেছিল করালীচরণ সঙ্গে সঙ্গে, যাবো না যা শালারা। বেরো, বেরো এখান থেকে।

করালাচরণের মেজাজের সঙ্গে সুন্দরমের পূর্ব হইতেই কিছুটা পরিচয় ছিল, তা ছাড়া মেয়েটা জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, দায় তারই। তাই খিঁচুনি সত্ত্বেও বলে, দয়া করুন ঠাকুর মশাই। Have mercy, একটিবার চলুন—

দয়া! কেন রে শালা ভূত? দয়া করবার আর আমার পাত্র নেই? ভাগ্ এখান থেকে—

যা টাকা চান আমি দেবো কবরেজ মশাই। একটিবার চলুন—

শালা টাকা দেখাচ্ছিস আমাকে, বোম্বেটে ডাকু—থু—থু—, যা যা—

একরাশ থুথু ছিটিয়ে দেয় কানা কবিরাজ।

নাছোড়বান্দা সুন্দরম্ বলে, তবু একটিবার আপনাকে যেতে হবেই কবরেজ মশাই।

ও, কি আমার বাপের সাক্ষাৎ শ্যালক এলেন রে—যেতে হবেই! যাবো না, যাবো না, যাবো না।

ওপাশের অন্ধকারে চুপটি করে বারান্দায় বসে ছিল জগদম্বা। সে এবারে খন্‌খনে গলায় বলে ওঠে, কেন রে অলপ্পেয়ে মিন্‌সে—যাবি না কেন। মানুষের অসুখ-বিসুখে যাবি না তো কখন যাবি রে ঘাটের মড়া—

চেঁচিয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে করালীচরণ, দেখ জগা, তোকে আমি খুন করবো।

কি বললি। খুন করবি! আয়—আয় দেখি তোর কত বড় বুকের পাটা! বলতে বলতে বারান্দার একপাশে ছিল তরকারী কাটার বঁটিটা সেটা তুলে রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে এগিয়ে আসে জগদম্বা, আয়—আয়—

করালীচরণও উঠে দাঁড়ায়, ভাল হবে না, ভাল হবে না বলছি জগদম্বা। আমি না তোর সোয়ামী!

ওরে আমার সাতপাকের ভাতার রে!

করালীচরণের নেশা তখন ছুটে গিয়েছে। ঠক-ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। জগদম্বাকে বিশ্বাস নেই, হয়ত একটা ঝপ করে কোপ্ বসিয়ে দেবে।

সব পারে ঐ দজ্জাল মেয়েমানুষটা।

কই আয়। আয়—খুন কর—। জগদম্বা তখনো আস্ফালন করছে।

ঠিক ঐ সময়ে হরনাথের গলা শোনা গেল, কবিরাজ মশাই আছেন নাকি?

সহসা হরনাথের কণ্ঠস্বরে জগদম্বার বোধ হয় চেতনা ফিরে আসে। সে তাড়াতাড়ি বারান্দার অন্য প্রান্তে সরে যায়।

কে?

আমি, হরনাথ মিশ্র। হরনাথ এগিয়ে এলো।

কি চান?

আমার স্ত্রীর অসুখ, আপনি যদি একটিবার অনুগ্রহ করে—

সুন্দরম্ দেখলো আর একজন প্রার্থী এসে উপস্থিত, সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ঠাকুর মশাই, আমার ওখানে একবার যেতে হবে যে—

সুন্দরমের কণ্ঠস্বরে সহসা যেন চমকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখতে পেল হরনাথ সুন্দরমের দীর্ঘ দেহটা। অন্ধকারে প্রথমটায় ঢোকবার মুখে নজরে পড়ে নি।

না, আমি পারবো না। কারো সঙ্গেই আমি যেতে পারবো না—করালী-চরণ বলে ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদের সুরটা এবারে অনেকটা যেন মিইয়ে এসেছে। তীব্রতা নেই তত।

ঠাকুরমশাই দয়া করুন একটিবার—সুন্দরম্ আবার বলে, মেয়েটা না হলে মরে যাবে—she will die—

মেয়ে! তোর আবার মেয়ে এলো কোথা থেকে রে বোম্বেটে—

আমার স্ত্রী—my wife—

কি বললি!

আমার বৌ।

তুই বেটা যমরাজ, তোকে আবার কোন্ মেয়ে বিয়ে করল?

চলুন না দেখবেন।

হরনাথ ঐ সময় বলে ওঠে, কবিরাজ মশাই আমার ওখানে একবার—

করালীচরণ আবার খিঁচিয়ে ওঠেন, আমি কি পবননন্দন, লাফিয়ে লাফিয়ে যাবো এখান থেকে ওখানে!

বেশ, তাহলে ওর স্ত্রীকে দেখেই না হয় আমার স্ত্রীকে দেখতে যাবেন। হরনাথ বলে।

এক কুড়ি টাকা লাগবে—

এক কুড়ি টাকা! হরনাথ যেন হাঁ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, দিতে পারেন যাবো নচেৎ নয়। সাহেব, পারবে দিতে?

সুন্দরম্ বলে, আমি তাই দেবো, চলুন—

তবে চল—

করালীচরণ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে ঘর থেকে লাঠিটা নিয়ে বের হয়ে এলো।

চল—

সুন্দরমের সঙ্গে করালীচরণ বের হয়ে গেল।

আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো হরনাথ।

পথে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় করালীচরণ শুধায়, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস এই রাত্রে?

টালির নালায়। আমার নৌকায়।

তবে আরো এক কুড়ি টাকা লাগবে।

তাই দেবো ঠাকুর মশাই চলুন।

চল বেটা। দেখি তোর গলায় কে মালা দিল। কার এমন মতিচ্ছন্ন হলো।

কিন্তু নৌকায় এসে—কামরায় ঢুকে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান মৃন্ময়ীর দিকে কামরার আলোয় তাকিয়েই করালীচরণ যেন একেবারে বোবা হয়ে যায়, কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে মৃন্ময়ীর দিকে চেয়ে থেকে সুন্দরমের দিকে ফিরে শুধায়, কে?

আমার স্ত্রী। My wife—

॥ ২ ॥

ডাকাত! ডাকাত!

মধ্যরাত্রিতে সুলোচনার সেই ডাকাত, ডাকাত—চিৎকারটা দীর্ণ একটা ভাঙা ক্রন্দনের মতই যেন ভবানীচরণ রায় মশাইয়ের কানে এসে বাজলো।

কয়েকদিন থেকেই শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না বলে কবির আসর ছেড়ে উঠে এক সময় রায় মশাই গৃহাভ্যন্তরের দিকেই চলেছিলেন। হঠাৎ সেই চিৎকারটা তাঁর কানে প্রবেশ করতেই রায় মশাই থমকে দাঁড়ান।

সুলোচনা তখনো বন্ধ দরজার গায়ে পাগলিনীর মত করাঘাত হানতে হানতে চিৎকার করছে, ডাকাত, ডাকাত!

প্রথমটায় বুঝতে পারেন না রায় মশাই, অন্দর মহলের কোন্ দিক থেকে চিৎকারটা আসছে। তাই শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে চিৎকারটা শোনবার চেষ্টা

করেন এবারে এবং নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি অন্দর ও বহির্মহলের মধ্যস্থিত চত্বর দিয়ে আরো দু'পা এগিয়ে যান। এবং ঠিক সেই সময় সুলোচনার চিৎকারটা এবারে আরো স্পষ্ট শোনা যায়, ডাকাত, ডাকাত!

এবারে কিন্তু বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় না কোন্ দিক থেকে চিৎকারটা আসছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্দরের দিকে চত্বরের পরেই যে অলিন্দ, সেই দিকে দ্রুত ছুটে যান।

কিন্তু অলিন্দপথ অন্ধকার।

সুন্দরমের পরামর্শ মত ডি'কুনহা আগেই অলিন্দের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেছিল।

তবু অন্ধকারের মধ্যে কোন মতে হোঁচট খেতে খেতে পাগলের মতই এগিয়ে যান রায় মশাই। সুলোচনার চিৎকারটা আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তখন এবং শোনা যাচ্ছে সেই সঙ্গে তার ঘরের বন্ধ দুয়ারের ওপরে এলোপাথারি দুম্‌দাম্ শব্দটা।

ছুটতে ছুটতেই অন্ধকারে অলিন্দপথে কিসে এক সময় পা বেধে হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়ে গেলেন ভবানীচরণ।

প্রচণ্ড আঘাত পেলেন হাঁটুতে! আঘাতের আকস্মিকতায় ও ব্যথায় কিছুক্ষণ উঠে দাঁড়াতেই পারেন না। তার উপরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধ হয়ে যায়।

সুলোচনা চিৎকার করছে আরো উচ্চকণ্ঠে তখন। বহুকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন ভবানীচরণ এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতেই এবারে অন্ধকারে অলিন্দপথে অন্দর মহলের দিকে এগিয়ে চললেন।

এবারে আর ভবানীচরণের বুঝতে কষ্ট হয় না, সুলোচনার কণ্ঠস্বর। সুলোচনাই চিৎকার করছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতেই এগিয়ে এলেন ভবানীচরণ সুলোচনার ঘরের দরজার সামনে। ঘরের শিকলটা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই সুলোচনা চেঁচিয়ে ওঠে, কে! ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার।

সুলোচনা!

কে? দাদা?

সুলোচনা—

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে দাদা, ডাকাত—মৃন্ময়ী—

কি—কি হয়েছে মৃন্ময়ীর? অধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ভবানীচরণ।

ডাকাতে মৃন্ময়ীকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

সে কি?

হ্যাঁ, এখনো—এখনো বোধহয় বেশীদূর যেতে পারে নি। দেখো তুমি, শীঘ্র দেখো—

তুই আলোটা জ্বালা আমি দেখছি—

কথাটা বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই ভবানীচরণ ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে ডাকলে, রঘু! রঘুনন্দন!

কিন্তু ডাক দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো রঘুনন্দন কবির আসরে দাঁড়িয়ে কবিগান শুনছে। অন্দর-মহল থেকে তাঁর ডাক কবিগানের আসবে রঘুনন্দনের কানে গিয়ে পৌঁছবে না। ঐ মুহূর্তে পায়ের ব্যথাটাও যেন ভুলে যান ভবানীচরণ। বহির্মহলের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেন।

ভিড়ের একপাশে সামিয়ানার একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কবিগান শুনতে শুনতে এক সময় বুঝি রঘুনন্দন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুমের অবিশ্যি দোষ ছিল না, সন্ধ্যার দিকে এক ঘটি সিদ্ধি পান করেছিল রঘুনন্দন।

হাজার শ্রোতা তন্ময় হয়ে কবির লড়াই শুনছে। গানের মধ্যে তারা সবাই তন্ময়।

রঘুনন্দনের গায়ে হাত দিয়ে মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকলেন রায় মশাই, রঘু!

প্রথম ডাকে সাড়া না দিলেও দ্বিতীয় ডাকেই সাড়া দেয় রঘু।

নেশা ও ঘুমে জড়ানো রক্তাক্ত চোখ দুটো কোন মতে মেলে তাকাল রঘুনন্দন তার মনিবের দিকে।

রঘু!

কর্তা।

শিগ্‌গিরি আয় আমার সঙ্গে—

আসর থেকে এসে বহির্মহলের দ্বারপথে দাঁড়ালেন রায় মশাই।

রঘু!

কর্তা—

ডাকাত!

অ্যাঁ! ভূত দেখার মতই যেন চমকে ওঠে রঘুনন্দন। ঘুম আর নেশা তখন তার ছুটে গিয়েছে বলতে গেলে।

ডাকাত! কোথায়?

শিগ্‌গিরি আয় ভিতরে। মৃন্ময়ীকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কি, কি বললেন কর্তা! ছোট দিদি—

হ্যাঁ, চল আগে সুলোচনার ঘরে। ব্যাপারটা আগে তার কাছে শুনতে হবে।

প্রভু আর ভৃত্য দুজনে এগিয়ে যায় অন্দরমহলের দিকে।

ঘরের আলোটা ইতিমধ্যে জ্বেলে ফেলেছিল সুলোচনা।

এবং আলো জ্বালতেই তার নজরে পড়েছিল ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত নিশ্চল ডি'কুনহার মৃতদেহটা ঘরের মেঝেতে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। বুঝতে পারে সুলোচনা তার তরবারির মোক্ষম আঘাতেই ঐ শয়তানটার মৃত্যু ঘটেছে। মৃতদেহটার দিকে চেয়ে থাকে সুলোচনা। এবং সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় মনে পড়ে যায় তার, মৃন্ময়ী নেই।

মৃন্ময়ীকে ডাকাতেরা তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এবং অকস্মাৎ এতক্ষণ পরে যেন তার দুই চক্ষুর কোল অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যায়।

মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ী নেই।

ভবানীচরণ এসে পুনর য় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই সুলোচনা পদশব্দে চমকে তাঁর মুখের দিকে অশ্রু-ঝাপসা দৃষ্টি তুলে তাকায় এবং ভবানীচরণ কিছু বলবার আগেই সুলোচনা বলে, থানায় একটা খবর পাঠিয়েছো দাদা?

না।

এতক্ষণে ভবানীচরণের ভূপতিত রক্তাক্ত দেহটার প্রতি নজর পড়ে, এটা কে!

দুজন ঘরে ঢুকেছিল। ওটাকে শেষ করেছি কিন্তু আর একটাকে পারি নি। আমার বিশ্বাস সেটাই দলপতি ছিল। সেই লোকটাই মৃন্ময়ীকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

কোন্ পথে গেল?

বলতে পারি না। তবে মনে হয় খিড়কির বাগান-পথেই পালিয়েছে। কিন্তু এখনো তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো দাদা! রঘুকে অন্ততঃ খোঁজ করতে লাগাও!

ঘটনার আকস্মিক উত্তেজনায় ব্যাপারটা এতক্ষণ সব দিক দিয়ে বিচার করতে না পারলেও ভবানীচরণ ইতিমধ্যে কিন্তু ভাবতে শুরু করেছিলেন।

ডাকাত তাঁর ত্রয়োদশী কুমারী কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

ব্যাপারটা এখনো জানাজানি হয় নি বটে কিন্তু রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

ব্রাহ্মণের ঘরের ত্রয়োদশী কুমারী কন্যা। ডাকাতের হাত থেকে আজ তাকে উদ্ধার করে আনলেও সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। ঘরে আর তাকে স্থান দেওয়া যাবে না। ডাকাতের স্পর্শে সে আজ জাতিচ্যুতা, সমাজচ্যুতা।

সুলোচনা ভবানীচরণকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুনরায় শুধায়, দাদা, কথা বলছো না কেন? চুপ করে এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন?

ভগিনীর ডাকে কোন সাড়া দিলেন না ভবানীচরণ। কেবল এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে ভূপৃষ্ঠ হতে ডি'কুনহার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা তুলে নিয়ে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজার গোড়াতেই রঘু দাঁড়িয়ে ছিল।

রঘু!

কর্তা—

এই লাশটা রাতারাতি বাগানের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে দে।

বিনা বাক্যব্যয়ে রঘু প্রভুর হাত থেকে লাশটা নিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভবানীচরণের ব্যবহারে সুলোচনা সত্যিই যেন কেমন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে এবারে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জ্যেষ্ঠের পাশে দাঁড়ায়।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখনো ভবানীচরণ।

মৃদু কণ্ঠে ডাকে সুলোচনা, দাদা।

ঘরে যা সুলোচনা।

দাদা।

গোলমাল করিস না। যেন কেউ না জানতে পারে।

বিস্ময়ের যেন অবধি নেই সুলোচনার। সে আবার ডাকে, দাদা—

হ্যাঁ, আজ থেকে মনে করবি মৃন্ময়ী --হ্যাঁ—মৃন্ময়ী মরে গিয়েছে।

দাদা।

কি?

এ, এ—তুমি কি বলছো?

হ্যাঁ, সে মরে গিয়েছে।

কথাটা বলে আর দাঁড়ালেন না ভবানীচরণ। অন্ধকারে অলিন্দপথে এগিয়ে

গেলেন। অন্ধকার থেকে অস্ফুট কণ্ঠে শুধু দুটি কথা উচ্চারিত হতে শোনা গেল, নারায়ণ, নারায়ণ—

সুলোচনা আর দাঁড়াতে পারলো না। দোরগোড়াতেই বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

সে কালরাত্রি প্রভাত হলো।

অন্দরমহলে ভবানীচরণ তাঁর শয়নকক্ষে পালঙ্কের ওপরে পাষাণমূর্তির মতই যেন বসেছিলেন। মুখে যাই বলুন সুলোচনাকে, মৃন্ময়ীর খোঁজ সাধ্যমত তিনি করেছিলেন রঘুকে নিয়ে সারাটা রাত ধরে কিন্তু কোন সন্ধানই করতে পারেন নি। ইচ্ছা ছিল খোঁজ পেয়ে একই বন্দুকের গুলিতে দুটোকেই শেষ করে দেবেন, কিন্তু পান নি খোঁজ। হতাশ হয়েই অতঃপর এক সময় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সুলোচনা ভবানীচরণের সামনেই মাটিতে বসেছিল, পাশের ঘরে মৃন্ময়ীর মাতা অজ্ঞান হয়ে আছে, সন্তান-সম্ভাবিতা সে, এমনিতেই অসুস্থ ছিল। ঐ সংবাদ পাওয়ার পর সেই যে জ্ঞান হারিয়েছে আর জ্ঞান ফেরে নি। দুটো দিন আরো যেন পাথর চাপা শোকের মধ্যে দিয়ে কাটলো। তারপর একদিন সুলোচনা এসে জ্যেষ্ঠের সামনে দাঁড়াল। মৃন্ময়ীর ব্যাপারে নিজেকেই তার সর্বক্ষণ যেন সবচাইতে বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল, কিছুতেই যেন সে মুখ তুলতে পারছিল না।

দাদা—

কী?

আমি ভাবছি কলকাতাতেই যাবো—

সেকি!

হ্যাঁ।

কলকাতায় মানে হরনাথের কাছে?

হ্যাঁ—

কিন্তু সে তো নতুন করে আবার সংসার করেছে—

করুক না, তাতে ক্ষতি কি।

কিন্তু তার দরকারটাই বা কি?

তুমি আর অমত করো না দাদা, আমাকে যেতে দাও—মৃন্ময়ী-শূন্য বাড়িতে আমি যেন আর টিকতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে—

কিন্তু সুলোচনা—

না দাদা—অনেক দিন থেকেই কথাটা আমি ভাবছিলাম, মন স্থির করতে পারি নি—

॥ ৩ ॥

আমার স্ত্রী, my wife—

সুন্দরমের কণ্ঠোচ্চারিত আমার স্ত্রী কথাটা যেন ভিষগ্‌রত্নকে একটা ধাক্কা দেয়। কয়েকটা মুহূর্ত সুন্দরমের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে পুনরায় হতচেতন মৃন্ময়ীর রোগতপ্ত, রক্তিম, শীর্ণ মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত করেন ভিষগ্‌রত্ন।

নেশার ঘোরটা বুঝি অনেকটা তখন তাঁর কেটে এসেছে।

সন্তর্পণে মৃন্ময়ীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন ভিষগ্‌রত্ন।

কোমল রোগতপ্ত হাতখানি।

বামহস্তের ওপরে মৃন্ময়ীর হাতখানি রেখে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জনী সহযোগে মণিবন্ধের নাড়ীটা চেপে ধরলেন।

নাড়ীর গতি দ্রুত এবং চঞ্চল।

নাড়ী ধরে বেশ কিছুক্ষণ দুটি চক্ষু মুদ্রিত করে গভীর মনোযোগ সহকারে নাড়ীর গতি অনুধাবন করতে লাগলেন।

রোগিণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ও নাড়ীর গতি থেকে ভিষগ্‌রত্নের বুঝতে কষ্ট হয় না—বক্ষে শ্লেষ্মা জমেছে।

ধীরে ধীরে এক সময় রোগিণীর হাত নামিয়ে রেখে ভিষগ্‌রত্ন সুন্দরমের মুখের দিকে তাকালেন।

কেমন দেখলেন কবিরাজ মাশই? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুন্দরম্।

বুকে শ্লেষ্মা জমেছে।

ভয়ের কোন কারণ নেই তো? সেরে উঠবে তো?

সেরে উঠবে তো? মুখ ভেংচে উঠলেন সহসা ভিষগ্‌রত্ন, আমি কি ভগবান যে বাঁচবে কি মরবে বলে দেবো? চিকিৎসার প্রয়োজন, চিকিৎসা কর—

চিকিৎসা তো করবোই, কিন্তু—

সত্যি বল তো সুন্দরম্, মেয়েটি কে?

বললাম তো আমার স্ত্রী!

থাম বেটা দৈত্য। তোকে আমি চিনি না! কারো তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তোর মত একটা দস্যু বোম্বেটের হাতে জেনেশুনে অমন ফুলের মত একটা

মেয়ে তুলে দেবে! হ্যাঁ-রে, মেয়েটার জাত কি?

আজ্ঞে, ব্রাহ্মণের কন্যা।

বলিস কি? ব্রাহ্মণ-কন্যা! বেটা বিধর্মী, একটি নিরপরাধিনী ব্রাহ্মণ-কন্যার জাত মেরেছিস? নরকেও যে তোর স্থান হবে না রে?

হ্যাঁ, তোমাদের হিন্দুর স্বর্গে স্থান হবে না সত্যি বটে কবিরাজ মশাই; কিন্তু আমাদের ক্রেস্তানদের হেভেনে (Heaven) ঠিক দেখো জায়গা পাবো। যাক গে ও-সব কথা, ওর এখন চিকিৎসার ব্যবস্থা কর তো।

বাড়িতে চল, ঔষধ নিয়ে আসবি।

তবে আর দেরি কেন, চল—

ফেরার পথে দুজনার মধ্যে একটি কথাও আর হলো না।

নিঃশব্দে দুজনে অন্ধকার নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ভিষগ্‌রত্নের গৃহদ্বারে এসে উপনীত হলো।

ইতিমধ্যেই সমস্ত পাড়াটা যেন একেবারে নিঃসাড় হয়ে গিয়েছে।

গৃহে গৃহে আলো নিভে গিয়েছে।

রাত এমন কিছু বেশী হয় নি; কিন্তু ইতিমধ্যেই যেন মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে।

গৃহের দ্বার খোলাই ছিল। এবং উন্মুক্ত দ্বারপথে গৃহে পা দিতেই অদূরে আব্‌ছা অন্ধকারে দাওয়ায় উপবিষ্ট হরনাথের প্রতি ভিষগ্‌রত্নের নজর পড়লো।

হরনাথ যায় নি, তখনো ভিষগ্‌রত্নের জন্য অপেক্ষা করছে দাওয়ায় বসে।

সারাদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমে বসে থাকতে থাকতে বোধ করি তার দুই চোখের পাতা নিদ্রায় ভারী হয়ে বুজে এসেছিল।

নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল হরনাথ।

কল্যাণীচরণ ভিষগ্‌রত্ন কল্পনাও করতে পারেন নি, তার প্রত্যাবর্তনের আশায় অত রাত পর্যন্ত সত্যি সত্যিই হরনাথ বসে অপেক্ষা করবে। তাই আঙিনায় পা দিয়ে একটু যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করেন, কে ওখানে বসে?

ভিষগ্‌রত্নের কণ্ঠস্বরে হরনাথের ঘুম ভেঙে যায়।

সে চোখ মেলে তাকিয়ে বলে, আমি।

আমি! আমি কে?

আমি হরনাথ মিশ্র।

মানে! ওখানে বসে কি করছো?

আপনার জন্য বসে অপেক্ষা করছি।

কৃতার্থ হলাম। তা কেন বল তো?

আজ্ঞে আমার স্ত্রী অসুস্থ।

তাই বলে আপনি মনে করেছেন নাকি এই রাতদুপুরে আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনার সেই অসুস্থ স্ত্রীকে দেখে নিজেকে কৃতার্থ করতে যাবো!

পুনরায় কথা তো নয়, যেন ভেংচে উঠলেন ভিষগ্‌রত্ন।

হরনাথের দিক থেকে কোন প্রত্যুত্তর আসবার পূর্বে এবারে সুন্দরমই কথা বললে, নিশ্চয়ই ওর স্ত্রী খুব অসুস্থ ঠাকুর মশাই। আমাকে ঔষধপত্র যা দেবার দিয়ে একটিবার না হয় যান না—

আহা, কি আমার দয়ার অবতার রে, নিজের জোটে না শঙ্করাকে ডাকে—

তাহলে কবিরাজ মশাই আমি কি ফিরে যাবো? কথাটা বলে এবারে হরনাথই।

না। এসেছেন যখন দয়া করে বসতে আজ্ঞা হোক, আসছি আমি। তবে হ্যাঁ, দু'কুড়ি টাকা চাই। বলতে বলতে ভিষগ্‌রত্ন অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে শুষ্ক কদলীপত্রে জড়ানো ঔষধ নিয়ে এসে সুন্দরমের সামনে দাঁড়ালেন, এই নে রে—দশটি বটিকা আছে—আর প্রলেপ আছে এর মধ্যে। প্রহরে প্রহরে একটি করে বটিকা মধু ও পানের রস অনুপান সহযোগে খাওয়াবি —আর প্রলেপটা দিবি বুকে—

সুন্দরম্ ঔষধগুলো নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিষগ্‌রত্ন নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে বলেন, দাঁড়া শালা, টাকা দে আগে—

ও হো, ভুল হয়ে গিয়েছে—

শালা বোম্বেটে আসলেই ভুল। দে—

কুর্তার জেব থেকে সুন্দরম্ একমুঠো টাকা বের করে ভিষগ্‌রত্নের দিকে দেয়, নিন—

ভিষগ্‌রত্ন টাকাগুলো গুনে নিয়ে বলেন, কম আছে, আরো দে—

কত কম? শুধায় সুন্দরম্।

দশ।

সুন্দরম্ আবার এক মুঠো টাকা বের করে ভিষগ্‌রত্নর হাতে দেয়। আবার টাকাগুলো গুনলেন ভিষগ্‌রত্ন এবং দুটি টাকা ফেরত দিলেন, নে—দুটো বেশী আছে—

থাক্। ও আপনিই নিন।

খিঁচিয়ে উঠলেন ভিষগ্‌রত্ন, কেন, কেন রে শালা, তোর টাকা আমি নেবো

কেন ? ব্রাহ্মণ হাত পাতবে ম্লেচ্ছ শূদ্রের কাছে ! তোর স্পর্ধা তো কম নয় ।

আহা চটেন কেন ঠাকুর মশাই । না নেন, দিন ফিরিয়ে—

সুন্দরম্ টাকা দুটো গ্রহণ করে ।

সুন্দরম্ ঔষধ নিয়ে বের হয়ে যেতে উদ্যত হতেই ভিষগ্‌রত্ন হরনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, চল হে—

কিন্তু কবিরাজ মশাই—

আবার কি হলো ?

যে টাকা আপনি চাইলেন অত দেবার মতো তো সামর্থ্য আমার নেই । আপনি অনুগ্রহ করে দয়া না করলে—

হরনাথের কথা শেষ হলো না । দরজার গোড়া থেকে চলতে চলতে ততক্ষণে সুন্দরম্ ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং মুহূর্তের জন্য যেন কি ভাবে সুন্দরম্ । তারপর এগিয়ে আসে ওদের দিকে ।

ভিষগ্‌রত্ন ততক্ষণে চিৎকার করে উঠেছেন, বিনা অর্থে পাদমেকং ন গচ্ছামি ! ন গচ্ছামি !

সহসা ঐ সময় সুন্দরম্ তার কুর্তার জেব থেকে এক মুঠো টাকা বের করে হরনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, নিন ঠাকুর, নিয়ে যান ওকে—

হরনাথ বিস্মিত হতবাক ।

সামান্য কিছুক্ষণের পরিচয়ে যে কেউ এমনি করে অযাচিত ভাবে এতগুলো টাকা কাউকে দিতে পারে, বিশেষ করে একজন বিধর্মী দস্যু, হরনাথের যেন কল্পনারও অতীত ছিল ।

বিহ্বল হরনাথ চেয়ে থাকে সুন্দরমের মুখের দিকে । বাক্যস্ফূর্তি হয় না তার ।

নিন ঠাকুর ধরুন, আমায় আবার অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে ।

কবিরাজ ভিষগ্‌রত্নও এতক্ষণ ব্যাপারটা দেখছিলেন, তিনি বলে ওঠেন, ওঃ শালা আমার শাহেনশা বাদশা এলেন—যা যা- নিজের কাজে যা ! তারপর হরনাথের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, চল হে ঠাকুর—

কথাটা বলে ভিষগ্‌রত্ন আর দাঁড়ালেন না, বহির্দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন ।

হরনাথ তাঁকে অনুসরণ করে ।

কিন্তু হরনাথ মিশ্র জানতো না যে স্ত্রী নয়নতারার সময় ফুরিয়ে এসেছে, নয়নতারার অঙ্গে দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধি ধরেছে এবং সেই ব্যাধির বীজ দেহের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে ।

সুনয়না তার পিতার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় তখনো জেগেই ছিল।

হরনাথ এসে বন্ধ দুয়ারে আঘাত দিতেই সুনয়না এসে দুয়ার খুলে দিল, এত রাত হলো যে বাবা?

কবিরাজ মশাই এসেছেন—তোমার মা কি ঘুমোচ্ছেন!

না। জেগেই আছে বোধহয়।

দেখ তো—

সুনয়না ঘরের মধ্যে গিয়ে একটু পরে ফিরে এলো, কবিরাজ মশাইকে নিয়ে এসো বাবা।

আসুন কবিরাজ মশাই—

ছোট অপ্রশস্ত একটি ঘর।

এক পাশে পিলসুজের ওপরে প্রদীপ জ্বলছে।

অস্বচ্ছ আলো-আঁধারি ঘরের মধ্যে।

ভূশয্যায় শায়িতা ছিলেন নয়নতারা। ওদের পদশব্দে তাকালেন।

কবিরাজ এসে শয্যাপার্শ্বে বসে নয়নতারার হাতটি তুলে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে এবং চক্ষু মুদিত করে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

প্রায় মিনিট দশেক চক্ষু মুদিত করে নাড়ী ধরে বসে রইলেন।

তারপর এক সময় হাতটি নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, চলুন ঠাকুর, বাইরে যাওয়া যাক।

ঘরের বাইরে উভয়ে অপ্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

অন্ধকার রাত্রি। স্তব্ধ সমাহিত যেন। মাথার ওপরে রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের একটা অংশ যেন নির্নিমেষে বহু নিম্নে শান্ত ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে।

কবিরাজ মশাই!

মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন হরনাথ মিশ্র।

উঁ।

কেমন যেন নির্বাক করালীচরণ।

আমার স্ত্রীকে কেমন দেখলেন?

কিছুই করবার নেই আর, মানুষের চিকিৎসার বাইরে উনি এখন।

কবিরাজ মশাই!

একটা আর্ত ব্যাকুলতা যেন হরনাথের কণ্ঠ চিরে অস্ফুটে নির্গত হয়।

দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধি! মৃত্যু অবধারিত আর তারও বিলম্ব নেই—

আজকের রাতটা অতিবাহিত হলেও কালকের সন্ধ্যা পেরুবে না।

না, না—কবিরাজ মশাই, এ আপনি কি বলছেন? দয়া করে আপনি আর একবার ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন—

পরীক্ষা করে দেখবার আর কিছু নেই। আমি চলি—যাবার জন্ত পা বাড়ালেন করালীচরণ।

কবিরাজ মশাই! কিছুই ঔষধ দেবেন না?

করুণ কণ্ঠে কথাটা বলে দু'পা এগিয়ে এলেন হরনাথ।

কোন ফল হবে না—

করালীচরণের কথা শেষ হলো না—সহসা ঐ সময় পশ্চাৎ থেকে সুনয়না ছুটে এসে একেবারে করালীচরণের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেঁদে উঠলো, আমার মাকে বাঁচিয়ে দিন কবিরাজ মশাই। আমি জানি, আমি শুনেছি—আপনি পারবেন, আপনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী—

সুনয়নার কাতরোক্তিতে করালীচরণের মত হৃদয়হীনেরও চোখে বুঝি জল এসে যায়। প্রথমটায় কি বলবেন, কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না, তারপর বলেন, ওঠো মা—পা ছাড়ো—

না, না—আগে বলুন, আমার মাকে আপনি বাঁচিয়ে দেবেন—

ভগবানকে ডাকো মা।

না, না—না—

বেশ মা, তুমি পা ছাড়ো, আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি—তারপর হরনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন ঠাকুর মশাই—

হরনাথ মিশ্র বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

করালীচরণের কথায় তিনি কেবল একবার তাঁর মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকালেন।

যাও মা—তুমি ঘরে তোমার মার কাছে যাও—

করালীচরণ আবার বললেন।

বিচক্ষণ কবিরাজ করালীচরণের ভুল হয় নি।

নয়নতারার নাড়ীর গতি তাঁকে প্রতারণা করে নি। অনুমান তাঁর মিথ্যা হয় নি।

পরের দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে নয়নতারার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে সজ্ঞানে সতী-সীমন্তিনী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামী হরনাথের চোখে জল দেখে নয়নতারা

বললে, কাঁদছো কেন!

নয়ন।

বলো।

আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে কিনা জানি না, তবু ক্ষমা চাইছি—

ছি, ছি ও কথা বলো না—গত জন্মে কত পাপ হয়তো করেছিলাম, তাই তোমাকে এবারে পেয়েও পেলাম না আবার এ জন্মে—

হয়তো সত্যিই তুমি পাপ করেছিলে, হরনাথ বলে, নচেৎ আমার ঘরে তুমি আসবে কেন—

না, না—কত পুণ্যে তোমার পায়ে স্থান পেয়েছিলাম এ-জন্মে—আশীর্বাদ কর, পরজন্মে যেন তোমার পায়েই আমার স্থান হয় আর—

নয়ন—

আর যেন তোমাকে পেয়েও না হারাতে হয় এ জন্মের মত এমনি করে।

হরনাথের চোখ দিয়ে তখনো জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি আর কোন কথাই বলতে পারেন না।

নয়নতারা বলে, সুনয়নাকে দেখো—একটি ভাল পাত্র দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দিও—

দেবো।

দেখো—

কী।

দিদিকে কি আবার একবার আনবার চেষ্টা করতে পার না?

নয়ন—

চেষ্টা করো—আমার ধারণা কেন জানি না, ডাকলে সে হয়তো এবারে আসবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সুলোচনা ভবানীচরণ বা তাঁর স্ত্রীর কোন অনুরোধেই কান দিল না।

এবং ভবানীচরণ যখন দেখলেন সুলোচনা হরনাথের কাছেই কলকাতায় যাবার জন্য একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কারো কোন কথাতেই সে কান দেবে না, তখন ভবানীচরণ আর কোন আপত্তি তুললেন না। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, তবে তাই হোক।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ও যখন থাকবেই না, যাবেই বলে প্রতিজ্ঞা করেছে—যাক। স্বামীর কাছেই যাক।

বিন্ধ্যবাসিনী বলে, কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্ছে। সেই কলকাতায় যাওয়া অবধি ঠাকুরজামাই একটা খবর নেয় নি আজ পর্যন্ত—

সে তো আছেই—আমি বিশেষ করে ভাবছি হরনাথের বর্তমান পক্ষ অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের কথা। সে কি ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবে?

আমি না হয় আর একবার বুঝিয়ে বলি ঠাকুরঝিকে—

কোন ফল হবে না। ওকে আমি চিনি। মনে মনে একবার যখন ও সেখানে যাওয়াই স্থির করেছে, কারো সাধ্য নেই ওকে নিবৃত্ত করে।

যাই হোক ভবানীচরণই সুলোচনাকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

যাত্রার দিনও পুরোহিত মশাই পঞ্জিকা দেখে নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ব্যবস্থা হলো গৃহ-সরকার বৃদ্ধ রমাপ্রসন্ন সুলোচনাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

যাত্রার দিন সকালে, নদীর ঘাটে নৌকা প্রস্তুত।

গুরুজনদের প্রণাম করে এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করে প্রস্তুত হয়েছে সুলোচনা। সেই সময় বিন্ধ্যবাসিনী আবার বলে, অজ্ঞানত বা জ্ঞানত কোনও অন্যায় আচরণ যদি তোমার প্রতি করে থাকি ঠাকুরঝি—ছোট বোন বলেও কি ক্ষমা করতে পার না?

ছি ছি, ওকথা বলো না বৌঠান। মহাপাপ হবে আমার, একে তো গতজন্মের না জানি কি গুরুপাপে এ জন্মে এই ফল ভোগ করছি, তার উপরে আর যেন পাপের ভাগী না হই। তোমাদের স্নেহের কথা কি জীবনে ভোলবার! এ অভাগিনীকে যে স্নেহ দিয়েছ তোমরা—

তবে? তবে কেন চলে যাচ্ছো ভাই? কেন সাধ করে এ বয়েসে সতীনের ঘর করতে চলেছো।

সুলোচনা মৃদু হেসে বলে, সতীনের ঘর তো আমার নতুন নয় বৌঠান। শ্বশুরগৃহেও তো সতীন নিয়েই বাস করে এসেছি। তোমার মত ভাগ্যবতী এ সংসারে কজন স্ত্রীলোক? চেয়ে দেখো তো, কার ঘরে আজকের দিনে সতীন নেই। না বৌঠান—সে জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। তাছাড়া এ তো আমার স্বেচ্ছাকৃত। এ বিষ তো আমি নিজে স্বেচ্ছায় কণ্ঠে ধারণ করেছি। এখন বিষের জ্বালায় ব্যাকুল হলে চলবে কেন।

কথাটা বলতে বলতে সুলোচনার দুটি চক্ষু বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।

উদ্গত অশ্রু অঞ্চলপ্রান্তে মুছে সুলোচনা আবার বলে, বয়েসে না হলেও সম্পর্কে তুমি আমার বড় বৌঠান। আশীর্বাদ করো, শুধু যেন স্বামীর পায়ে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস নিতে পারি। এ জীবনে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা নেই, আর কিছু নেই—

বিন্ধ্যবাসিনী আর কি বলবে, চুপ করে থাকে।

ভ্রাতৃবধূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভবানীচরণের কক্ষে এসে প্রবেশ করে সুলোচনা।

জ্যেষ্ঠের পদধূলি নিয়ে বলে, তবে চলি দাদা—

এসো। একটা কথা শুধু মনে রাখিস সুলোচনা।

কি দাদা?

যদি কোনদিন প্রয়োজন বোধ করিস তো এখানে সোজা চলে আসতে বা খবর দিতে যেন কোন দ্বিধা করিস না। জানবি, পৃথিবীর সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও তোর জন্য তোর দাদার গৃহের দরজা চিরদিন খোলা থাকবে—

তা কি আমি জানি না দাদা। প্রয়োজন হলে আসবো বৈকি। নিশ্চয়ই আসবো। আসবো—আসবো।

চোখে অঞ্চল দিয়ে সুলোচনা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই দিন ও দুই রাত্রির পথ নৌকায় পাড়ি দিয়ে সুলোচনার নৌকা অপরাহ্ণে টালির নালায় এসে সুন্দরমের নোঙর করা নৌকারই খান দুই নৌকার পরে নোঙর ফেলল।

সুলোচনা একটা ভারী চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে নৌকার ছইয়ের মধ্যে বসে ছিল, বৃদ্ধ সরকার মশাই রমাপ্রসন্ন গলা বাড়িয়ে বললেন, কলকাতায় পৌঁছলাম

পিসিমা। তাহলে আপনি একটু বসেন, আমি ডাঙ্গায় গিয়ে মিশ্র মশাইয়ের গৃহটা খোঁজ করে এসে আপনাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবো—

তাই যান।

সরকার মশাই মাঝিদের সাবধানে থাকতে বলে নৌকা থেকে নেমে গেলেন।

ভবানীচরণ বলে দিয়েছিলেন রমাপ্রসন্নকে, সুধামাধবের আড়তে খোঁজ করলেই হরনাথের গৃহের সন্ধান সে-ই দিতে পারবে।

সুধামাধবের চালের আড়তটা সরকার মশাইয়ের অপরিচিত নয়।

সরকার মশাই সেই আড়তের দিকেই দ্রুত পা চালালেন।

সুলোচনা মুখ ফুটে বলতে পারে নি কত বড় মর্মান্তিক দুঃখ আর লজ্জায় তাকে ভবানীচরণের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে চলে আসতে হলো।

সুলোচনার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় মৃন্ময়ীকে বুকে আঁকড়ে ধরে অনেক দিন পরে বুঝি তার সেই দুঃখের সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল, গোপালকে হারানোর যে দুঃখটা তার হৃদয়ের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল। মৃন্ময়ীও তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছিল।

কিন্তু সেই মৃন্ময়ীকেই যখন অকস্মাৎ সে রাত্রে ডাকাত এসে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, সুলোচনার পক্ষে সে আঘাতটা সত্যিই মর্মান্তিক হয়েছিল।

সুলোচনার কাছে সমস্ত জগৎটাই যেন অন্ধকার হয়ে যায়।

সব যেন তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়।

তাই তার পক্ষে মৃন্ময়ীর শত-স্মৃতি বিজড়িত ভবানীচরণের গৃহে আর একটা দিনও থাকা সম্ভবপর হয় নি।

কোন মতে যে ভাবেই হোক, ভবানীচরণের গৃহ ছেড়ে চলে যাবার জন্য যেন সুলোচনা পাগল হয়ে উঠেছিল।

শুধু কি মৃন্ময়ীকে বুক থেকে হারানোর দুঃখ? ভবানীচরণ ও তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকেও যেন সুলোচনা তাকাতে পারছিল না আর।

মুখে না বললেও মনের মধ্যে কি তাঁদের একবারও উদয় হয় নি; তার বুক থেকেই তাদের আদরিনী কন্যা মৃন্ময়ীকে ডাকাতে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে?

আরো একটা চিন্তা কিছুকাল যাবৎই সুলোচনার মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। তার স্বামীর কথা।

আজ জীবনের প্রায় প্রান্তসীমায় এসে কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল সুলোচনার, প্রথম জীবনে সেদিন সে ভাল করে নি।

সন্তানের ব্যাপার নিয়ে স্ত্রী হয়ে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করাটার মধ্যে

সেদিন সত্যিই তার বুঝি কোন যুক্তি ছিল না।

অভিমানে অন্ধ হয়ে সেদিন সে স্বামীর প্রতি সুবিচার করতে পারে নি। শুধুই কি অভিমান? প্রচণ্ড একটা অহংকারও তার সমস্ত শুভবুদ্ধিকে বুঝি সেদিন আচ্ছন্ন করেছিল। নইলে স্ত্রীলোক হয়ে এত বড় কথাটা সে স্বামীর মুখের ওপরে বলতে কেমন করে দুঃসাহসী হয়েছিল।

ইহকাল-পরকালের যিনি একমাত্র দেবতা সেই স্বামী, তার সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখবে না, কথাটা নিছক প্রলাপোক্তি ছাড়া কি, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে?

ছি ছি, এত বড় দুর্মতি তার কেমন করে হলো! কত বড় গর্হিত পাপই না সে করেছে!

মন বলেছে—সুলোচনা, এখনো যা। স্বামীর পায়ে পড়ে গিয়ে মাথা কুটে ক্ষমা চা।

সেই ক্ষমা। সেই ক্ষমারও যে আজ তার প্রয়োজন। মৃন্ময়ী তার বন্ধন কেটে দিয়ে গিয়ে যেন সেই কথাটাই তাকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

কলকাতায় ছুটে আসার সে-ও একটা কারণ বৈকি। ক্ষমা।

স্বামীর পায়ে ধরে যে সে ক্ষমা তাকে চেয়ে নিতেই হবে।

অন্যমনস্ক সুলোচনা নৌকার পাটাতনে বসে অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

অপরাহ্নের ম্লান আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিকে গিস্‌গিস্‌ করছে শুধু ছোট বড় নানা আকারের নৌকা আর নৌকা।

পাড়ে ব্যস্ত মানুষজনের যাতায়াত।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চমকে ফিরে তাকায় সুলোচনা। কালো কষ্টিপাথরে গড়া যেন এক বলিষ্ঠ পেশলদেহী তরুণ।

পরিধানে পর্তুগীজ নাবিকের পোশাক। কোন এক নৌকার মাঝিকে তরুণ সম্বোধন করে বলছে, এই মাঝি, নৌকা সরে গিয়ে ভেড়া।

একজন নৌকার মাঝি বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয়, সুন্দর সাহেব, মাঝি ডাঙ্গায় গেছে, সে ফিরে এলেই নাও আমাদের ছেড়ে দেবো।

সুন্দর সাহেব মনে সুন্দরম্‌।

ছেড়ে দেবো নয়, এখুনি সরিয়ে নৌকা লাগাও, না হলে নৌকা ডুবিয়ে দেবো।

সুন্দরম্‌ সাহেবের কথা যে মিথ্যে আস্ফালন নয়, নৌকার মাঝিরা সকলেই

জানে এবং জানে লোকটা মুখে এবং কাজে এক।

তবু মাঝি কাকুতি করে বলে, গোঁসা করছো কেন সুন্দর সাহেব? একটু পরেই তো আমরা চলে যাবো।

না না—এখুনি সরিয়ে নিয়ে যাও নৌকা তোমাদের।

মাঝি আর দ্বিরুক্তি করে না। হাঁটুর ওপরে কাপড় গুটিয়ে নিয়ে জলে নেমে পড়ে নৌকাটা ঠেলে সরিয়ে নেবার জন্যই।

নিজের নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকে সুন্দরম্ কোমরে হাত রেখে। অপরাহ্নের সূর্যালোক তার কালো কষ্টিপাথরের মত মুখখানার ওপরে পড়ে চক্ চক্ করছে যেন। কালো পাত্‌লুন ও লাল সোনালি জরি বসানো ভেলভেটের কুর্তা পরনে। কোমরবন্ধে ঝুলছে এক পাশে খাপে ভরা ছোরাটা, অন্য পাশে গাদা পিস্তলটা। মাথায় ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ। রুক্ষ, এলোমেলো।

সুলোচনার থেকে সুন্দরমের ব্যবধান মাত্র হাত দশেকের। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সুন্দরম্‌কে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সুলোচনা যেন সুন্দরমের মুখের দিকে।

কত পরিচিত, কত পরিচিত যেন ঐ মুখখানি। কতকালের পরিচয় যেন আছে সুলোচনার ঐ কালো কষ্টিপাথরের মত মুখটার প্রতিটি রেখার সঙ্গে। বুকের মধ্যে যেন দাগ কেটে কেটে বসে আছে।

সুলোচনা যেন সব ভুলে বুভুক্ষিত তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুন্দরমের মুখখানার দিকে। বুকটার মধ্যে যেন কি একটা বিচিত্র আকর্ষণ মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে।

কে! কে?

হঠাৎ ঐ সময় নৌকাটা দুলে উঠলো। সুলোচনা চমকে চেয়ে দেখে রমাপ্রসন্ন নৌকায় এসে উঠছেন।

সন্ধান পেয়েছি পিসিমা।

কার সন্ধান? অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করে সুলোচনা।

মিশ্র মশাইয়ের—

সুলোচনা কথা বলে, কিন্তু তার দৃষ্টি তখনো স্থিরনিবদ্ধ সুন্দরমের মুখের ওপরে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। ঐ মুখটাই তো দেখেছিল সুলোচনা সে রাত্রে তার ঘরে। সেই ডাকাতটা না? যে ডাকাতটা সে রাত্রে মৃন্ময়ীকে তার

বুক থেকে চুরি করে এনেছিল? ঠিক। সেই, সেই মুখই তো। সেই ডাকাতটাই তো।

কিন্তু যে লোকটা ডাকাত, দস্যু, ঘৃণ্য, একটা মহাপাপী, যে মানুষটা তার এত বড় ক্ষতি করেছে তার প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাবই তো সুলোচনা এই মুহূর্তে মনের মধ্যে কোথাও অনুভব করছে না।

বরং—বরং বিচিত্র একটা অনুভূতিতে বুকের ভেতরটা তার কাঁপছে। কিসের এ অনুভূতি, কেনই বা এ অনুভূতি?

বুকটার ভিতরে যেন কি একটা টন্‌টন্ করছে।

পিপিমা!

রমাপ্রসন্নর কণ্ঠস্বরে দ্বিতীয়বার যেন চমক ভাঙলো সুলোচনার।

মিশ্র মশাইয়ের গৃহ এখান থেকে একটু দূরই হবে। একটা ডুলি কি নিয়ে আসবো, না পদব্রজেই—

আমি হেঁটেই যাবো সরকার মশাই। চলুন—

সুন্দরম্‌কে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। সে নৌকোর ভিতরের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করছে।

অপরাহ্নকাল, দিক্-দেশাগত চাউলের ব্যাপারীদের আনাগোনা ও মিশ্র কল-গুঞ্জনে আশপাশের সমস্ত স্থানটি তখন যেন রম্ রম্ করছিল।

নিম্নকণ্ঠে সুলোচনা রমাপ্রসন্নকে শুধাল, কোন মেলা বসেছে নাকি এখানে সরকার মশাই?

না পিসিমা, মেলা নয়—শহরের এই অঞ্চলটি চালের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। এরা সব চালের ব্যাপারী।

গঞ্জ?

তা বলতে পারেন।

মায়ের মন্দির এখান থেকে কতদূর সরকার মশাই?

ঐ যে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে—হাত তুলে অদূরে কালীমাতার মন্দিরচূড়া দেখালেন সরকার মশাই।

হাত জোড় করে প্রণাম জানাল সুলোচনা।

পথের চারিপাশে আবর্জনা এখানে-ওখানে স্তূপাকার হয়ে আছে। একধারে কাঁচা প্রণালী—কর্দম ও আবর্জনায় ভর্তি। মাছি ভন্ ভন্ করছে। এখানে-ওখানে মানুষ মলত্যাগ করে রেখে গিয়েছে। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়াচ্ছে।

নাকে কাপড় তুলে দেয় সুলোচনা দুর্গন্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। নানা জাতের মানুষের ভিড়। গায়ের ওপর দিয়ে যেন সব ঠেলে চলে যায়।

কোনমতে তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে এগিয়ে চলে সুলোচনা সরকার মশাইয়ের পিছনে পিছনে।

সরকার মশাইয়ের পিছনে পিছনে এসে সুলোচনা সংকীর্ণ এক গলির মধ্যে অবস্থিত জীর্ণ একতলা একটি গৃহের সামনে দাঁড়ালো। দুয়ার বন্ধ।

সরকার মশাই বললেন, এই মিশ্র মশাইয়ের গৃহ।

সুলোচনা মাথার গুণ্ঠন একটু টেনে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

ইতিপূর্বে এসে রমাপ্রসন্ন গৃহটি কেবল চিনে গিয়েছিলেন, গৃহস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করে উচ্চকণ্ঠে রমাপ্রসন্ন ডাকলেন, মিশ্র মশাই, গৃহে আছেন নাকি? মিশ্র ঠাকুর—

বার দুই দুয়ারে আঘাত করবার পরই, একটি অল্পবয়স্কা শ্যামাঙ্গী দাসী এসে গৃহদ্বার খুলে দিলো।

কাকে চাই গা?

মিশ্র ঠাকুর গৃহে আছেন?

না। তিনি তো এ সময় গৃহে থাকেন না।

কোথায় তিনি?

আড়তে পাবেন তাঁকে।

গৃহে আর কেউ নেই?

আছে।

কে?

তাঁর কন্যা।

সুলোচনাই এবারে প্রশ্ন করে, কেন, তাঁর স্ত্রী? তিনি নেই?

তিনি তো দিন পনের হলো মারা গেছেন।

মিশ্র মশাইয়ের স্ত্রী গত হয়েছেন?

হ্যাঁ।

॥ ২ ॥

নয়নতারা নেই!

নয়নতারা মৃত।

সংবাদটা যেন সুলোচনাকে আকস্মিক একটা আঘাত দেয়। কয়েকটা

মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন বাক্যই সরে না। সে স্তব্ধ অনড় হয়ে দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে।

রমাপ্রসন্নও তার পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

অবশেষে দাসী ক্ষীরোদাই প্রশ্ন করে, আপনারা কে গা? কোথা থেকে আসছো!

রমাপ্রসন্নই এবারে মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন, আমরা কৃষ্ণনগর থেকে আসছি।

ও। তা ঠাকুর মশাইয়ের আপনারা কেউ হও বুঝি? তা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিতরে এসো না।

রমাপ্রসন্নও এবারে বলেন, ভিতরে চলুন পিসিমা।

ওরা অন্দরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে সুনয়নার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কে রে ক্ষীরোদা দিদি?

বাইরে এসো না দিদি, কেষ্টনগর থেকে কারা এয়েছেন দেখোসে।

সুনয়না তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসে। এবং সুলোচনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় সুনয়না।

কে আপনারা? মৃদু কণ্ঠে শুধায় সে।

সুলোচনা ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা প্রস্তুত করে নিয়েছে। সুনয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাকে তো তুমি চিনবে না মা। তুমি তো আমাকে কোন দিন দেখ নি। আমি—

কে আপনি! আপনি কি কেষ্টনগরের বড়-মা!

হ্যাঁ মা।

বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম—বলতে বলতে এগিয়ে এসে সুনয়না সুলোচনার পদধূলি নিতেই সুলোচনা সাগ্রহে দু'বাহু প্রসারিত করে তাকে বক্ষে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলে, বেঁচে থাকো মা, সুখে থাকো। রাজ-রাজেশ্বরী হও—

মায়ের কাছেই একদিন সুনয়না শুনেছিল তার আরও দুজন মা আছেন। একজন থাকেন নবদ্বীপে, অন্য জন তাঁর ভাইয়ের কাছে কৃষ্ণনগরে।

কৃষ্ণনগরের মা-ই তার পিতার প্রথমা পত্নী।

চলুন মা, ভিতরে চলুন!

সুনয়না হাত ধরে সুলোচনাকে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হয়।

রমাপ্রসন্ন তখন বলেন, আমি তাহলে আসি পিসিমা।

না, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। মা নয়না. সরকার মশাইকে ঐ বারান্দায় একটা আসন পেতে বসতে দাও।

সুনয়না তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে একটা কম্বলাসন এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিল।

রমাপ্রসন্ন আসনটির উপর উপবেশন করলেন।

সুনয়নার সঙ্গে সুলোচনা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

ক্ষীরোদা বারান্দার একধারে বসে একটা কুলোয় চাল নিয়ে বাছছিল।

রমাপ্রসন্ন তার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, ওগো মেয়ে, শুনছো!

আমাকে বলছো?

হ্যাঁ গা। কি নামটি তোমার?

ক্ষীরোদা—সবাই ক্ষীরি বলে ডাকে।

এ বাড়িতে তামাকের ব্যবস্থা আছে?

তা থাকবে না কেন? তামুক ইচ্ছা করো নাকি?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধূমপান করি নি, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

আপনি কি ব্রাহ্মণ?

না গো মেয়ে, কায়েত।

বসো, আসছি—ক্ষীরোদা কুলোটা এক পাশে নামিয়ে রেখে রন্ধনশালার দিকে চলে গেল।

রমাপ্রসন্ন সেই শ্যামাঙ্গী তরুণীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে দেখেন। স্বাস্থ্য ও যৌবন মেয়েটির কালো অঙ্গে যেন ঢল ঢল করছে। পরিধানে একটি খাটো শান্তিপুরী ডুরে শাড়ী। কিন্তু পরিচ্ছন্ন।

উদলা গায়ে শাড়ীর আঁচলটি বেষ্টন করে কটিতে বাঁধা। কটিতে এক ছড়া রূপার গোট। পুরুষ্টু নিতম্বে রূপার চওড়া গোটছড়া বড় চমৎকার মানিয়েছে।

হাতের বাজুতে অনন্ত। হাতের মণিবন্ধে একগাছি করে জলতরঙ্গ চুড়ি।

সিঁথিতে বা কপালে সিন্দুর নেই। মেয়েটি বিবাহিত নয় বলেই মনে হয়।

একটু পরেই মেয়েটি হুঁকার মাথায় কলিকাটি বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে এলো, নাও গো।

হাত বাড়িয়ে রমাপ্রসন্ন ক্ষীরোদার হাত থেকে হুঁকাটি নিলেন। গুড়ুক গুড়ুক শব্দে তামুক সেবন করতে লাগলেন।

ক্ষীরোদা আবার গিয়ে চাল বাছতে শুরু করে।

হ্যাঁ গা মেয়ে!

বলেন গো।

এই বাড়ির কাজকর্ম করো বুঝি তুমি?

হ্যাঁ।

এখানেই থাকো নাকি?

আগে তো থাকতাম না, কিন্তু গিন্নীর কাল হবার পর থেকে এখানেই থাকি। একা এক সোমত্ত মেয়ে বাড়িতে থাকবে, তাই ঠাকুর বললে, ক্ষীরো, এবার থেকে তুমি এখানেই থাকো। রয়ে গেলাম।

রমাপ্রসন্ন আর কোন কথা বললেন না।

পরিপূর্ণ যৌবনা মেয়েটি তাহলে এখানেই থাকে। কথাটা শুনে রমাপ্রসন্নর কেমন ভাল লাগে না, ঠিক যেন প্রসন্ন হতে পারলেন না।

রমাপ্রসন্ন চিরদিনের অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও নির্মল চরিত্রের মানুষ। নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক না করে জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন না। কদাচ মিথ্যা কথা বলেন না। সংসারে একটি মাত্র স্ত্রী। যদিচ কুলীন কায়স্থ।

রমাপ্রসন্ন জানতেন ঐ সময় ঐ অঞ্চলের সামাজিক নীতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, অন্যান্য তীর্থস্থানের নিকটবর্তী স্থানসমূহের মতই।

অস্থায়ী ভাবে নানা কাজে ও ব্যবসায় খাতিরে বহু নরনারী ঐ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করে। বেশীর ভাগই তাদের মধ্যে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। এবং সেই সব অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদের ঠকিয়ে উপার্জন করবার নানাবিধ ফন্দি-ফিকির সর্বক্ষণ খুঁজছে। আর তাদের ভিড় বেশী যেখানে, সেখানেই যত দুশ্চরিত্রা নারী এসে জোটে।

ঐ সব দুশ্চরিত্রা নারীরা তাদের ঘরে তীর্থকামী যাত্রীদের বাসা দেয় ও রাত্রে বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করে। দুই দিক দিয়েই তারা উপার্জন করে।

আবার ঐ সব নারীদেরই যখন রূপ যৌবন গত হয় তখন গৃহস্থের ঘরে দাসীবৃত্তি করে। ক্ষীরোদা যে ঐ শ্রেণীরই একজন, বিচক্ষণ রমাপ্রসন্নর বুঝতে কষ্ট হয় না।

ক্ষীরোদার দেহে রূপ ও যৌবন টলমল করছে, আর হরনাথ মিশ্রর ঘরে গৃহিণী নেই। বয়েস হয়েছে বটে হরনাথের, কিন্তু সে পুরুষ। কথায় বলে নারী ও পুরুষ, ঘি আর আগুন।

উহুঁ! ব্যাপারটা ভাল নয়।

পিসিমাকে একটু সাবধান করে দিয়ে যেতে হবে।

রমাপ্রসন্নর চিন্তাতে বাধা পড়লো সুলোচনার ডাকে, সরকার মশাই—

এই যে পিসিমা। তাড়াতাড়ি হাতের হুঁকাটা নামিয়ে রাখলেন রমাপ্রসন্ন।

আজই আপনার কৃষ্ণনগরে ফেরা হবে না।

কেন? কেন? এদিকে কি কিছু—

না। সে কথা নয়। অন্য একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য আমি চাই—

বলুন!

টালির নালায় দেখে এলাম সুন্দর সাহেব বলে এক ব্যক্তির নৌকা বাঁধা আছে—

সুন্দর সাহেব! কে সে?

সে রাত্রে যে ডাকাত আমাদের ঘরে ঢুকে মৃন্ময়ীকে ডাকাতি করে এনেছিল ঐ সুন্দর সাহেব হুবহু তারই মত দেখতে।

বলেন কি!

হ্যাঁ, সরকার মশাই। আপনাকে তার সমস্ত খবর গোপনে নিতে হবে। লোকটা কে? কি ওর সত্য পরিচয়, এখানে কি করে? সব জেনে আসতে হবে যে ভাবেই হোক।

আপনি ঠিক বলছেন পিসিমা? আপনি লোকটাকে ঠিক চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ পেরেছি বলেই তো বলছি।

তবে তো একবার কোতোয়ালীতে গিয়ে খবরটা দিতে হয়—

না, না—এখন নয়। আগে আপনি গোপনে খবরটা সংগ্রহ করুন।

তাহলে আমি এখুনি সেখানে যাই?

হ্যাঁ, যান।

কিন্তু সুলোচনা জানত না বা ঘুণাক্ষরে বুঝতেও পারে নি, সে যেমন দূর থেকে সুন্দরমকে দেখে চমকে উঠেছিল, সুন্দরমও ঠিক তেমনি নৌকার পাটাতনে উপবিষ্টা গুণ্ঠনবতী সুলোচনাকে দেখে চিনতে পেরেই চমকে উঠেছিল।

অজানিত একটা আশঙ্কায় বুকটা তার দুর-দুর করে কেঁপে উঠেছিল।

সর্বনাশ। উনি এখানে কেন?

তবে কি কৃষ্ণনগর থেকে নৌকা করে মৃন্ময়ীর খোঁজেই উনি এখানে এসেছেন? সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই যদি হয় অর্থাৎ ঐ মহিলাটি যদি মৃন্ময়ীর খোঁজেই এখানে এসে থাকে—আর তো এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায় না।

কারণ মহিলাটি যে একদৃষ্টে তারই মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সুন্দরমের দৃষ্টিতে সেটা এড়ায় নি। এবং তার চোখের দৃষ্টি দেখে সুন্দরমের মনে হয় খুব সম্ভবত মহিলাটি তাকে চিনতে পেরেছেন।

কি করা যায়।

কানা কবিরাজের ঔষধে মৃন্ময়ীর আজ জ্বরের উপশম হয়েছে বটে তবে অন্য এক বিপদ দেখা দিয়েছে।

একদিকের অঙ্গ তার অবশ হয়ে গিয়েছে। কথাও কিছুটা জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট ভাবে বলে।

কানা কবিরাজ অবিশ্যি বলেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে রোগের বীজ ছড়িয়েছিল, এ তারই ফল।

এখনও কানা কবিরাজের ঔষধ চলছে এবং তৈল মালিশ চলছে। এ অবস্থায় কানা কবিরাজের কাছ থেকে মৃন্ময়ীকে অন্য কোথাও সরিয়েও নেওয়া যায় না। হয়তো তাতে হিতে বিপরীতই হবে।

তা কিছুতেই হতে দেবে না সুন্দরম্। সুন্দরমের কঠিন প্রতিজ্ঞা যেমন করেই হোক, মৃন্ময়ীকে সে সুস্থ করে তুলবেই।

এ কথা মিথ্যা নয় যে মৃন্ময়ীকে রায়বাড়িতে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়েই সুন্দরম্ সে রাত্রে তার আসল কাজটা ভুলে শেষ পর্যন্ত মৃন্ময়ীকে ডাকাতি করে নিয়ে এসেছিল।

মৃন্ময়ীর অসামান্য রূপের আকর্ষণ ব্যতীত সে মুহূর্তে অন্য কোন চিন্তাই সে রাত্রে সুন্দরমের মনে উদয় হয় নি। কিন্তু ক্রমশ তারপর অসুস্থ মৃন্ময়ীর রোগ-শয্যার পাশে বসে দিবারাত্র প্রায় সর্বক্ষণই বলতে গেলে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে করতে সুন্দরমের মনের মধ্যে বিপরীত একটা ভাবের উদয় হয়েছিল।

রূপের আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আজ মৃন্ময়ীকে ছেড়ে দেওয়া সুন্দরমের পক্ষে কেবল দুঃসাধ্যই নয় চিন্তারও অতীত বুঝি। বরং আজ সে মৃন্ময়ীর জন্য বুঝি সর্বস্ব ত্যাগ করতেও পারে। মৃন্ময়ী যেন আজ তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসেছে।

অসুস্থ মৃন্ময়ীর রোগশয্যার পাশে বসে আরো একটা কথা যা সুন্দরমের বহুবার মনে হয়েছে, মৃন্ময়ী তাকে ঘৃণা করে। সে ডাকাত দস্যু, মৃন্ময়ী তাই তাকে ঘৃণা করে।

মৃন্ময়ীর সেদিনকার সেই কথাটা : ডাকাত, শয়তান, কেন—কেন আমাকে ধরে নিয়ে এলে ?

কথাটা যেন সুন্দরম্ কিছুতেই ভুলতে পারে না। তার কানের পাশে বারংবার ধিক্কার দিয়ে দিয়ে ফেরে : সে ডাকাত, সে শয়তান।

সত্যিই তো, সে ডাকাত, শয়তান তো।

মিথ্যা তো বলে নি মৃন্ময়ী। সে ডাকাত, সে শয়তান।

প্রচণ্ড একটা ধিক্কার যেন তার সমস্ত অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

মৃন্ময়ীর মুখের দিকেও যেন সে চাইতে পারে নি।

অবশেষে সুন্দরম্ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর না, আর সে ডাকাতি করবে না। ডাকাতির জীবনে এইখানেই ইস্তফা।

ডাকাতির এইখানেই ইতি।

নতুন কোন এক জীবন এবার সে বেছে নেবে। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন এবার থেকে সে যাপন করবে, তবে—তবে তো মৃন্ময়ী আর তাকে ঘৃণা করবে না।

জননী ভায়লা—তারও কোনদিন ইচ্ছা ছিল না, এই পথ সে জীবনে নেয়।

বৃদ্ধা কতবার তাকে নিষেধ করেছে কিন্তু ভায়লার কোন কাতর প্রার্থনাতেই সুন্দরম্ কর্ণপাত করে নি। কতবার ভায়লা তার হাত ধরে মিনতি জানিয়েছে, এ পথ ছেড়ে দে বেটা! এ আচ্ছা পথ নেই—কিন্তু সে সেকথায় কর্ণপাতও করে নি।

হ্যাঁ, সে জীবনের অন্য পথই এবারে বেছে নেবে, ডাকাতি আর করবে না। কিছু জমানো সোনাদানা, হীরে জহরৎ তার হাতে আছে। কোন একটা ব্যবসাই সে করবে।

হয় চালের ব্যবসা, নয় সুন্দরী কাঠের ব্যবসা।

সেই মতই সে চেতলার একজন পূর্ব-পরিচিত ব্যবসায়ী অরিন্দম সরকারের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে।

অরিন্দম সরকার কলকাতার কায়স্থ সমাজের একজন নামী ব্যক্তি। ধনী, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি। কুমোরটুলীতে তার বিরাট প্রাসাদোপম বাটী।

সুন্দরী কাঠ ও চালের বিরাট ব্যবসা চেতলা এবং কালীঘাট অঞ্চলে। তাছাড়া গোপনে সে চোরাই মালেরও বেচা-কেনা করে।

শেষোক্ত ব্যাপারেই একদা বৎসর দু'তিন পূর্বে সুন্দরমের সঙ্গে অরিন্দম সরকারের পরিচয় ঘটে এবং ক্রমশ সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

কিন্তু বেচা-কেনার ব্যাপারে লোকটা অত্যন্ত কঠিন বলে, ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে সুন্দরম্ তার সঙ্গে মালের বিশেষ বেচা-কেনা করে নি। ঐ ব্যাপারে বরং সুধামাধবকেই তার বেশী পছন্দ।

যদিও লোকটা কিছু কম দেয় তবু অরিন্দম সরকারের মত একেবারে পথে

বসায় না। কিন্তু সে তো পরের কথা, সর্বাগ্রে মৃন্ময়ীকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু কোথায়, অসুস্থ মৃন্ময়ীকে এখন সে কোথায় সরাবে রাতারাতি? এমন জায়গায় মৃন্ময়ীকে সরাতে হবে যেখানে রেখে মৃন্ময়ীর চিকিৎসা চালাতে পারে সে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে সুন্দরমের।

কাছেই কুলীর বাজারে একেবারে গঙ্গার তীরে অরিন্দম সরকারের একটা বাগানবাড়ি আছে। মধ্যে মধ্যে অরিন্দম সরকার বাঈজীদের নিয়ে সেই বাগানবাড়িতে দু-চার দিনের জন্য ফুর্তি করতে যায়, বাকী সময়টা বাগানবাড়িটা খালিই পড়ে থাকে।

অরিন্দম সরকার যদি সে বাগানবাড়িটা ভাড়া নিয়েও তাকে কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দেয় তো অনায়াসেই সেখানে নিয়ে গিয়ে মৃন্ময়ীকে সে তুলতে পারে। আপাতত সেখানে মৃণ্ময়ীকে তুলে একটা পাকাপাকি আশ্রয় সে তো খোঁজ করে নিতে পারে। তাহলে সব দিক দিয়েই সুন্দরমের সুবিধা হয়।

ঠিক। তাই সে করবে। কিন্তু তার আগে নৌকাটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সুন্দরম্ আর দেরি করে না। ডাকে, এমামুল্লা!

সাহেব।

এমামুল্লা এগিয়ে এসে সেলাম দেয়।

নৌকা এখুনি খোল।

নোঙর তুলবো?

হ্যাঁ।

কোন্ দিকে যেতে হবে?

বড় গঙ্গার দিকে নৌকা নিয়ে চল।

এমামুল্লা সঙ্গে সঙ্গে মাল্লাদের ডেকে নোঙর তুলে নৌকা ছেড়ে দেয়।

সুন্দরমের নৌকা ভেসে চলে টালির নালা ছাড়িয়ে বড় গঙ্গার দিকে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রমাপ্রসন্ন যখন এসে টালির নালায় পৌঁছালেন সুন্দরমের নৌকা তখন দৃষ্টির বাইরে অনেকদূর চলে গিয়েছে। আশেপাশের দু-চারজন মাঝিমাল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন কথাটা।

তারা বললে, সাহেবের নৌকা তো অনেকক্ষণ ঘাট ছেড়ে চলে গিয়েছে।

যে কথাটা বললে তাকেই শুধালেন রমাপ্রসন্ন, তোমার নামটি কি বাপু!

এজ্ঞে হারাণ।

একটু ঐ ধারে আসবে! তোমার সঙ্গে আমার গুটিকতক কথা আছে।

কি কথা?

এসোই না হে বাপু—

হারাণ একটু যেন কৌতূহলী হয়েই এগিয়ে যায়।

একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দুজনে এসে দাঁড়ায়। ওপারে একদল শিয়াল হুক্কা-হুয়া করে চিৎকার করে ওঠে। কালীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠে।

বলেন কর্তা? হারাণ শুধায়।

জামার পকেট থেকে প্রথমেই দশটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে হারাণের দিকে এগিয়ে ধরেন সরকার মশাই, নাও হে, ধর—

কি কর্তা?

নাও না হে!

হারাণ হাত পেতে মুদ্রাগুলো নেয়, ব্যাপারটা কি বলেন তো কর্তা?

আরো কিছু দেবো, ঐ সুন্দর সাহেবটির সমস্ত সংবাদ আমার চাই।

তা আগে বলতে হয়। নেন—কর্তা নেন। মুদ্রাগুলো এগিয়ে ধরে হারাণ সরকার মশাইয়ের দিকে।

আহা, রাখো রাখো ওগুলো। আরো কিছু চাও দিচ্ছি—

না কর্তা, ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

বেশ তো, কত চাও বলই না হে—

না কর্তা, কিছুই চাই না। ওনার খবর কিছুই আমি আপনাকে দিতে পারবো না। শুধু আমি কেন, এ তল্লাটে কেউ কিছু বলবে না ওনার সম্পর্কে। আর আপনাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—ঐ সাহেবটিকে আপনি হয়তো চেনেন না। দুম করে গুলি চালাতে ওর এতটুকু দেরি হবে না। সাধ করে পৈতৃক পরাণটা কে দেবে বলেন!

হারাণ।

বলেন—

কোন উপায়ই কি নেই?

কিন্তু ওনার খবরে আপনার প্রয়োজনটা কি বলেন তো কর্তা?

দরকার একটু আছে—

দরকার থাকেও যদি তো চেপে যান। ওর ত্রি-সীমানাতেও ঘেঁষবেন না কর্তা। সাহেব এমনিতে মাটির মানুষ, কিন্তু রাগলে কেউটে সাপ। সাক্ষাৎ যম—কেন বেঘোরে প্রাণটা দেবেন।

সরকার মশাই বুঝতে পারেন অন্তত হারাণের কাছ থেকে কোন সুবিধা হবে না। পীড়াপীড়ি করে ওকে কোন লাভ নেই। কাজেই সরকার মশাই আর কোন কথা বললেন না। স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন বোধ করলেন। বুঝতে পারলেন যে সুন্দরমের সম্পর্কে স্থানীয় মাঝি-মাল্লাদের কাছ থেকে এখানে অন্তত কোন সংবাদ তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন না, সরকার মশাই পুনরায় হরনাথ মিশ্রের কুটীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইতিমধ্যে অন্ধকার চারদিকে রীতিমত চাপ বেঁধে উঠেছিল। মধ্যে মধ্যে দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে বটে কিন্তু পথ তাতে করে আরো দুর্গম মনে হয়। সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগুতে থাকেন সরকার মশাই। সুলোচনাকে অন্তত সংবাদটা তো দিতে হবে।

॥ ৩ ॥

সাধারণতঃ হরনাথের গৃহে প্রত্যাগমন করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যেতো, কিন্তু সেদিন ফিরতে তার একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে সুলোচনা সুনয়নার সঙ্গে বসে গল্প করছিল। অন্যান্য দিন সুনয়নাই রান্না করতো, আজো সে-ই রান্না করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুলোচনা দেয় নি তাকে রন্ধনশালায় ঢুকতে। নিজেই রান্না করেছিল।

হরনাথ সন্ধ্যার আগেই গৃহে প্রত্যাগমন করে সুনয়না বলেছিল, কিন্তু সেদিন ফিরতে বিলম্ব দেখে কেবল ভাতটা চড়ায় নি, বাকী রান্না সব যদিও হয়ে গিয়েছিল।

ইচ্ছা ছিল হরনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করলে উনুনে ভাতটা চড়িয়ে দেবে। ভাতের হাঁড়িতে জল দিয়ে উনুনের ওপরে বসিয়ে রেখে সুনয়নার সঙ্গে গল্প করছিল সুলোচনা ঘরের মধ্যে বসে তাকে কোলের কাছটিতে বসিয়ে।

ক্ষীরোদা বাইরের দাওয়ায় অন্ধকারে একাকী বসেছিল। ক্ষীরোদার মনটা প্রসন্ন ছিল না। সুলোচনার চোখের দৃষ্টিটা যেন আদৌ তার ভাল লাগে নি।

সুলোচনা অবিশ্যি ক্ষীরোদাকে বিশেষ কোন কথা বলে নি, কেবল বলেছিল, আমি যখন এসে পড়েছি, আজ থেকে আর রাত্রে তোমার এখানে থাকবার

দরকার নেই। রাত্রে খাওয়া হয়ে গেলে বাড়ি চলে যেও।

সুলোচনা কথাটা বলে কোন প্রকার জবাবের প্রত্যাশায় দাঁড়ায় নি। এবং কথাটা যে কেবলমাত্র কথা নয়, হুকুম, সেটা তার কণ্ঠস্বর ও বলবার ভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। ক্ষীরোদাও অবিশ্যি কোন জবাব দেয় নি কথাটার। কিন্তু জবাব না দিলেও রাগে তার যেন পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। এবং মনে মনে সুলোচনার মুণ্ডুপাত করছিল তখন থেকে হরনাথের আসবার প্রতীক্ষায়।

দিব্যি আসর জাঁকিয়ে বসেছিল সে, কোথা থেকে আবার ঐ আপদ এসে জুটলো। যাই হোক, যাও বললেই সে যাচ্ছে আর কি। কেন, কেন যাবে!

বস্তুত নয়নতারা যেদিন থেকে অসুস্থ হয়ে শয্যা নিয়েছিল সেই সময় থেকেই ক্ষীরোদা ধীরে ধীরে ঐ গৃহে নিজের আসনটি সুদৃঢ় করে নিয়েছিল। তাই সে জানত তার জোর কোথায় এবং কতখানি, তাই সে মনে মনে ভাবে—আসুক ঠাকুর।

আসুক কত্তাবাবু, সেও জানে তার জোর কোথায় এবং কতখানি।

সদর দরজায় ঐ সময় করাঘাত শোনা গেল ও হরনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ক্ষীরো দরজাটা খোল।

ক্ষীরোদা তড়িৎপদে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল রে। একটু তামাক সেজে দে তো তাড়াতাড়ি—আঙ্গিনায় পা দিতে দিতে হরনাথ বলে।

যে আক্রোশে আর অভিমানে এতক্ষণ মনে মনে ফুঁসছিল ক্ষীরোদা সেটা আর চাপা থাকে না। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেয়ে যায় অকস্মাৎই যেন। বলে, আর আমাকে কেন, তামাক সেজে দেবার তো লোক নিয়েই এসেছে—তাকেই বল তামাক সেজে দিতে।

মানে! তামাক সেজে দেবার লোক এসে গিয়েছে, কি বলছিস কি?

ন্যাকামি আর কেন ঠাকুর!

বলি, কি হলো কি? কি বলছিস মাথামুণ্ডু—

ভিতরে যাও না, ভিতরে গেলেই তো দেখতে পাবে।

আঃ, তবু ঘ্যানর ঘ্যানর করে, বলি বলবি তো কথাটা স্পষ্ট করে!

স্পষ্ট করে চোখ মেলে নিজেই ঘরে গিয়ে দেখো না। কথাটা বলে ক্ষীরোদা আর দাঁড়াল না। অন্ধকারে দুপদাপ করে পা ফেলে আঙ্গিনার অন্য প্রান্তে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে উপবিষ্টা সুলোচনার প্রত্যেকটি কথা কানের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ

করছিল। মেয়ে সুনয়নার সামনে বসে সীমাহীন লজ্জায় যেন সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে থাকে। সুনয়নাও মাথা নীচু করে ছিল। এতক্ষণ ধরে এই ভয়টাই সে করছিল বুঝি। বয়স সুনয়নার এমন কিছু কম নয় যে সে তার বাপ ও দাসী ক্ষীরোদার সম্পর্কটা বুঝতে পারত না। কিন্তু সে সব দেখে এবং শুনেও মুখ ও চোখ বুজে না শোনবার ও না দেখবার ভান করতো। কিছুটা দুঃখে, কিছুটা অভিমান ও কিছুটা লজ্জায় বাপের ওপরে।

এদিকে হরনাথও ক্ষীরোদার কথাবার্তা ও আচরণে একটু যেন বিস্মিত হয়েই কিছুক্ষণ অন্ধকার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে থাকে। কে আবার তার গৃহে এলো! আর কেই বা আসতে পারে!

অবশেষে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই যেন হরনাথ পায়ে পায়ে কন্যার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ডাকে, নয়ন—

সুনয়নার সাড়া পাওয়া গেল না—এবং পরমুহূর্তেই হরনাথের সামনে ঘর থেকে বের হয়ে এসে দাঁড়াল গুণ্ঠনবতী সুলোচনা।

কে?

সুলোচনা কোন সাড়া না দিয়ে এগিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে হরনাথের পায়ের সামনে প্রণাম করে।

কে!

উঠে দাঁড়িয়েছে সুলোচনা তখন এবং হাত দিয়ে মাথার গুণ্ঠন একটু পিছনে সরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। ঘরের আলো বারান্দায় যৎসামান্য এসে পড়েছে। আলো-ছায়ার একটা অস্পষ্টতা।

কে! বিস্ময়ের ঘোরটা যেন কাটে নি এমনি ভাবেই প্রশ্নটা করে হরনাথ পুনর্বার।

আমি।

যতকাল পরেই হোক সুলোচনার কণ্ঠস্বর চিনে নিতে মুহূর্তেরও দেরি হয় না এবারে বুঝি হরনাথের। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন তার কণ্ঠ থেকে অর্ধোচ্চারিত হয় কথাটা।

সুলোচনা! তু-তুমি!

হ্যাঁ, আমি।

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে যায় হরনাথ। কণ্ঠ হতে তার আর কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না। তারপর এক সময় বলে, তু-তুমি কখন এলে?

আজ বিকেলে—

একা—একা এলে নাকি ?

না। সরকার মশাই সঙ্গে এসেছেন—

ওঃ, তিনি কোথায় ?

বাইরে বের হয়েছেন একটু—

কিন্তু—এ—এ-গৃহ খুঁজে পেলে কি করে ?

খুঁজে পেয়েছি যে দেখতেই তো পাচ্ছো, মৃদু হেসে বলে সুলোচনা, নচেৎ এলাম আর কি করে।

তা বটে—

সুনয়নাকে একা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলে, কেষ্টনগরে আমাকে একটা খবর পাঠাও নি কেন ?

খবর !

এতকাল যে নিঃসম্পর্কের মত পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে ছিল সে সব যেন কিছুই নয়, সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা বলতে থাকে যেন সুলোচনা—হ্যাঁ, একটা খবর কাউকে দিয়ে পাঠালেও তো পারতে।

কিন্তু তুমি কি খবর পাঠালে আসতে ?

খবর পাঠিয়ে দেখলেই পারতে, তা ছাড়া—

কি সুলোচনা ?

কেমন করে ভাবতে পারলে যে তুমি খবর পাঠালে আমি আসবো না !

হরনাথের ইচ্ছা হলো প্রত্যুত্তরে বলে, সে অধিকার থেকে তুমিই স্বেচ্ছায় একদিন আমাকে বহুকাল আগেই বঞ্চিত করেছো সুলোচনা।

কিন্তু কোন কথাই বলে না হরনাথ। চুপ করে থাকে।

যাক্ গে—কথা বলবার সময় অনেক আছে। সারা দিনের পর পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছো, জামা কাপড় ছাড়ো, হাত মুখ ধোও, আমি তামাক সেজে এনে দি—ঐ দিকে জল তোলা আছে—সুলোচনা আর দাঁড়াল না। পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ঐ সময় সুনয়না ঘর থেকে বের হয়ে এলো, বাবা—

কে। ও নয়ন ?

বড় মা এসেছেন, মেজ মাকেও আপনি নবদ্বীপ থেকে নিয়ে আসুন বাবা।

হ্যাঁ, আনবো, আনতে হবে বৈকি ! সকলকেই আনবো। সকলকেই আনবো—কথাটা কতকটা যেন স্খলিত কণ্ঠে বলে হরনাথ একটু যেন দ্রুতপদেই নিজের শয়ন ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। বস্তুত মেয়ের সামনে যেন সে আর

দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিল না।

অপরিসীম একটা লজ্জায় যেন সে নিজেকে শুধু মাত্র মেয়ে সুনয়নাই নয়, পৃথিবীর সকলের নয়ন থেকেই ঐ মুহূর্তে পালিয়ে নিজেকে আড়াল করতে পারলে বাঁচে।

দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল হরনাথ।

ঘরের মধ্যে ইতিপূর্বেই সুনয়না সেজ বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু বাতির শিখাটা ঈষৎ কমানো ছিল। ঘরের মধ্যে একটা আব্ছা আলো-আঁধারি বিরাজ করছিল।

কিছুক্ষণ ঘরে প্রবেশ করবার পর ভূতগ্রস্তের মতই যেন স্তব্ধ অনড় দাঁড়িয়ে থাকে হরনাথ। সমস্ত চিন্তা, যুক্তি, তর্ক যেন ঐ মুহূর্তে একবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

সুলোচনা আবার কোনদিন এ জীবনে স্বেচ্ছায় তার কাছে ফিরে আসবে এ শুধু অসম্ভবই নয়, চিন্তার অতীতও বুঝি ছিল!

খুব কম দিন নয়, বিবাহের পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সুদীর্ঘ আট বৎসর সুলোচনাকে নিয়ে ঘর করেছিল হরনাথ। এবং সেই সময়েই সুলোচনাকে সে চিনতে পেরেছিল।

ইস্পাতের মতই ঋজু ও কঠিন প্রকৃতির ঐ সুলোচনা। তার প্রতি বুক-ভরা প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসা থাকলেও কোনদিন কোন কারণেই সে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নি। ছায়ার মতই একদা সে স্বামীর অনুবর্তিনী ছিল সত্য, কিন্তু আপন সত্তাকে সে কোনদিন কোন কারণেই ছোট হতে দেয় নি।

স্বামীর কোন কথাতেই কখনো সে প্রতিবাদ করে নি বটে কিন্তু নিজের বুদ্ধি ও বিচারে যা সে অন্যায় বলে একবার মনে করেছে কোন যুক্তির বা উপরোধের কাছেই সে নতি স্বীকার করে নি। এবং সেই কারণেই বুঝি গোপালকে সাগরে বিসর্জন দিয়ে ফিরে আসার পর ধর্মের ও শাস্ত্রের অন্ধ গোঁড়ামি ও অনুশাসনকে তার মিথ্যা মনে হওয়ায়, স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পর হরনাথের হাজার অনুরোধেও আর সে মুখ ফেরায় নি তার দিকে।

এবং নিজের হাতেই একদিন পৃথিবীতে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহের রাত্রে নিজের হাতে বরবেশে সাজিয়ে দিয়েছিল।

সেই সুলোচনা আজ আবার স্বেচ্ছায় এতকাল পরে তার গৃহে ফিরে এসেছে। সত্য, সুলোচনার কাছ থেকে এতকাল সে যতদূরেই থাকুক না কেন, সুলোচনাকে একটি মুহূর্তের জন্যও সে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে নি।

তার শয়নে স্বপনে জাগ্রতে, সর্ব কাজের মধ্যেই এবং সর্বক্ষণ সুলোচনা এতকাল তার সমস্ত মনটা জুড়ে ছিল।

কিন্তু কই! তবু তো এই মুহূর্তে কোন অনাস্বাদিত পুলকে তার মনটা শিহরিত হচ্ছে না। অনাবিল কোন প্রসন্নতায় সুলোচনার এই প্রত্যাগমন তাকে পুলকিত বা রোমাঞ্চিত করছে না।

ধীরে ধীরে এক সময় হরনাথ এসে ঘরের একধারে পালঙ্কের ওপরে বিস্তৃত শয্যার ওপরে উপবেশন করল।

নিজের মনের সবটা সুলোচনার স্মৃতিতে সর্বক্ষণ ভরে থাকলেও বাইরে কখনো সে কথা কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি হরনাথ।

অবিশ্যি মুখে প্রকাশ না করলেও নারী হয়ে নয়নতারার কাছে সেটা আদৌ অবিদিত ছিল না, নয়নতারার চোখকে হরনাথ ফাঁকি দিতে পারে নি।

নয়নতারা বুঝতে পেরেছিল অল্প দিনেই স্বামীর মনের মধ্যে আর যারই হোক, এ জীবনে দ্বিতীয় কোন নারীরই আর জায়গা হবে না।

যদিও তার পূর্ববর্তিনী দাক্ষায়ণী এবং প্রথমা সুলোচনা আজও বর্তমান তথাপি এটা বুঝাতে কষ্ট হয় নি নয়নতারার ঐ প্রথমা স্ত্রী সুলোচনাই আজও তার স্বামীর সমস্ত মনটা জুড়ে রয়েছে। একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীর মতই আজও সেই নারী হরনাথের সমস্ত সত্তাকে আড়াল করে রেখেছে। সেখানে দাক্ষায়ণীরও স্থান নেই, তারও নেই।

সে কারণে প্রথম প্রথম অবিশ্যি নয়নতারার মনে স্বাভাবিক ভাবেই সুলোচনার প্রতি হিংসার অন্ত ছিল না। কিন্তু যতদিন অতিবাহিত হয়েছে ক্রমে তার সেই হিংসা একটু একটু করে যেন তার মন থেকে মুছে গিয়েছে।

মনে হয়েছে কার উপরে সে হিংসা পোষণ করছে, আর কেনই বা করছে। সে তো সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি।

সামনা-সামনি আসা দূরে থাক, একটি সংবাদ পর্যন্ত কখনো নেয় না বা নেবার চেষ্টাও করে না, মনে হয়েছে তাই কেমন সে মেয়েমানুষ! যে এমনি করে স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে।

অবশেষে তাই একদিন রাত্রে সুলোচনার কথা হরনাথকে না জিজ্ঞাসা করে আর পারে নি নয়নতারা, বলেছিল সে, তার কথা জানতে বড় ইচ্ছা করে।

কার কথা! গভীর বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সেদিন হরনাথ নয়নতারার মুখের দিকে।

বড় দিদির কথা।

হঠাৎ একথা বলছো কেন নয়ন?

কেন?

হ্যাঁ।

একটু হেসে জবাব দিয়েছিল নয়নতারা, জানতে ইচ্ছা করে না বুঝি ছোট বোন হয়ে বড় বোনের কথা। তাছাড়া এতে অন্যায়ই বা কি আছে। বল না গো!

কি বলবো!

বাঃ, ঐ যে বললাম বড় দিদির কথা। আচ্ছা বড় দিদি তো নবদ্বীপে আছেন।

হ্যাঁ।

তাছাড়া হাজার হোক তোমার সে স্ত্রী—শুধু স্ত্রী নয় প্রথমা স্ত্রী। কর্তব্য হিসাবে একটা খোঁজখবরও তো নেওয়া উচিত।

তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই নয়ন।

কথাটা যেন অতঃপর চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল হরনাথ। কিন্তু নয়নতারা কথাটা চাপা দিতে দেয় নি। আবার বলেছিল, কি যে বলো স্বামী-স্ত্রী—কথায় বলে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক।

তার কথা থাক নয়ন। অসম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে যেন ঐ প্রসঙ্গকে ঐখানেই ইতি করে দিয়েছিল হরনাথ।

সামান্য যেটুকু ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট ছিল, সেটুকুও বুঝি সেদিন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল নয়নতারার কাছে। কারণ সেই রাত্রে পাশাপাশি এক শয্যায় শুয়েও দুজনার একজনও ঘুমাতে পারে নি। এবং পরস্পর সে রাত্রে আর কেউ কারো সঙ্গে কথা আর না বললেও পার্শ্বে শায়িত স্বামীর বার দুই দীর্ঘশ্বাস মোচনের মধ্য দিয়েই নয়নতারার কাছে সব কিছু বুঝি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়বার আর কোনদিন ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন করে নি নয়নতারা স্বামীর কাছে। কিন্তু উত্থাপন না করলেও চাপা একটু বুক ভাঙা বেদনার হাহাকার তাঁর সমস্ত বুকখানিকে যেন ভরিয়ে রেখেছিল।

বস্তুত হরনাথের কাছেও ব্যাপারটা অবিদিত ছিল না শেষের দিকে। বুঝতে সে পেরেছিল বইকি সব কিছু।

সহসা সুলোচনার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে হরনাথ, কি হলো, বসে কেন এখনো? রাত অনেক হলো যে, হাত মুখ ধোবে কখন?

অ্যাঁ। হ্যা—এই যাই।

হরনাথ উঠে দাঁড়ায়। হাত মুখ ধুয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে, আহ্নিক সেরে হরনাথ ঘরের বাইরে আসতেই দেখতে পেল ঠাঁই হয়ে গিয়েছে।

হরনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে আসনের ওপরে উপবেশন করল। হরনাথ কিন্তু পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে পারল না।

দু'এক গ্রাস মুখে দিল তারপর কিছুক্ষণ আহার্য বস্তু নিয়ে নাড়া-চাড়া করে এক সময় ঢক-ঢক করে সমস্ত জলটুকু খেয়ে উঠে পড়লো।

ওকি! কিছুই যে খেলে না! রান্না ভাল হয় নি বুঝি? সুলোচনা শুধায়।

না, না—বেশ হয়েছে।

তবে খেলে না যে?

কেন। খেলাম তো।

হাত মুখ ধুয়ে হরনাথ ঘরে এসে বসতেই হুঁকোর মাথায় কল্কে চাপিয়ে ফুঁ দিতে দিতে সুলোচনা এসে ঘরে প্রবেশ করল। এবং স্বামীর হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে ঘর থেকে সে বের হয়ে গেল।

কিন্তু সে রাত্রে হুঁকোতেও দু-একটা টান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে পালঙ্কের একপাশে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে ঘরের সেজ বাতিটা নিভিয়ে দিল হরনাথ। অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু অন্ধকার।

বিচিত্র ব্যাপার—বিচিত্র যোগাযোগ যেন। ঐ দিনই লোকমুখে সংবাদ পেয়েছিল হরনাথ তার পরিত্যক্তা দ্বিতীয় স্ত্রী দাক্ষায়ণী—একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে নাকি সুদূর কেদারবদ্রীর পথে তীর্থযাত্রা করেছে, আর আজই সুলোচনা এতকাল পরে এসে হাজির হলো তার গৃহে—

অন্ধকারেই শয্যার ওপরে একসময় গা এলিয়ে দিল হরনাথ।

সমস্ত বাড়িটা যেন অদ্ভুত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, কোথাও কোন সাড়া পর্যন্ত নেই।

সমস্ত দিনের ক্লান্তি। অন্যান্য দিন কর্মক্লান্তির পর রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, আহারাদির পর শয্যায় শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই দু চক্ষুতে গভীর নিদ্রা নেমে আসে, কিন্তু আজ হরনাথের চক্ষু থেকে নিদ্রা যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একাকী দুই চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকে হরনাথ।

অবিশ্যি বৎসর তিনেক পূর্বে সংবাদ পেয়েছিল হরনাথ নবদ্বীপ থেকে

সুলোচনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীচরণ তাকে কৃষ্ণনগরে নিজগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন সুলোচনা সেখানেই ছিল, হঠাৎ সেখান থেকে চলে এলো কেন? ভবানীচরণ কি কোনরূপ অসম্মানজনক ব্যবহার করেছেন ভগিনীর প্রতি? সুলোচনা যে রকম প্রচণ্ড আত্মাভিমানিনী হয়ত তাই চলে এসেছে সেই গৃহ থেকে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়, ভবানীচরণ তো সে প্রকৃতির নন। প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন ভগিনীকে।

তবে, তবে সুলোচনা এভাবে হঠাৎ চলে এলো কেন! এতকাল যে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পর্যন্ত রাখে নি, হঠাৎ সে এভাবে চলে এলো কেন!

আর সে এলো এমন একটা সময় যখন জীবনটা তার শেষ প্রান্তেই এসে দাঁড়ায় নি—অসংখ্য জটিলতায় সে নিজেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে।

হৃদয়ের নিভৃত পূজা বেদীতে যে নারীকে সে এতকাল পরম শ্রদ্ধায় বসিয়ে রেখেছিল, কেন সে আবার সংসারের কুটিল আবর্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দে হরনাথের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। ত্রস্তে অন্ধকারে হরনাথ উঠে বসে, কে?

কোন সাড়া নেই, শুধু একটা চাপা কান্নার শব্দ।

কে?

অন্ধকারে পায়ের সামনে এসে কে যেন লুটিয়ে পড়লো কাঁদতে কাঁদতে। একরাশ চুল হরনাথের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

কে?

কিছুতেই আমি কোন কথা শুনবো না ঠাকুর, ওকে এখান থেকে এই মুহূর্তে সরিয়ে দিতে হবে।

ক্ষীরোদা। ক্ষীরোদা দু'হাতে হরনাথের দু'পা জড়িয়ে ধরেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই রুক্ষ চাপা কণ্ঠে ডাকে হরনাথ, ক্ষীরোদা—

তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও ওকে। তুমি না পারো আমি ঝাঁটা মেরে—

কিন্তু ক্ষীরোদার মুখের কথা শেষ হলো না, উপবিষ্ট অবস্থাতেই অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা লাথি বসিয়ে দিল হরনাথ ক্ষীরোদার মুখের ওপরে।

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করে অদূরে পানের বাটাটার উপর গিয়ে ছিটকে পড়লো ক্ষীরোদা। ঝন ঝন করে একটা শব্দ তুলে পানের বাটাটা মেঝেতে ছিটকে পড়লো।

হারামজাদী, বেরো—বেরো আমার বাড়ি থেকে।

গর্জন করে ওঠে হরনাথ।

বাইরের বারান্দায়, অন্ধকারে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুলোচনা। সেও শুতে যায় নি। সুনয়নাকে শয্যায় শুইয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঝন ঝন শব্দে ও হরনাথের চাপা গর্জনে প্রথমটায় সঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি সুলোচনা, কিন্তু হরনাথের শেষ কথাগুলো তার কানে যেতেই সে দ্রুতপদে ঘরে এসে ঢুকলো।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা তখন। থমকে দাঁড়ায় ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে সুলোচনা। একটি শব্দও তার কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হয় না।

হরনাথ ততক্ষণে সেজবাতিটা আবার জেলে ফেলেছে। এবং কোন কথা বলবার আগেই সেজবাতির আলোয় অদূরে ঠিক দরজার সামনে পাষাণপ্রতিমার মত দণ্ডায়মানা সুলোচনার প্রতি নজর পড়তেই সে যেন একেবারে পাথর হয়ে যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি হরনাথের দৃষ্টি সুলোচনার মুখের উপর থেকে ঘুরে গিয়ে পড়ে অদূরে ঘরের মেঝেতে উপবিষ্টা ক্ষীরোদার ওপরে এক সময় আবার।

মাথার এলায়িত কেশ খানিকটা বুকের ওপরে খানিকটা পৃষ্ঠের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

কারো মুখে কথা নেই। তিনজনেই নির্বাক।

ক্ষীরোদাই শেষ পর্যন্ত এক সময় গায়ের স্খলিত আঁচলটা কোন মতে বুকের উপর টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হরনাথের আকস্মিক পদাঘাতটা ক্ষীরোদাকে যতখানি না আহত করেছিল তার চাইতেও বেশী বুঝি আহত করেছিল তার মনকে।

হরনাথের কাছ থেকে এতবড় লজ্জাকর আঘাত কোন দিন আসতে পারে, এ বুঝি তার চিন্তারও অতীত ছিল।

এবং আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদা বুঝতে পেরেছিল ওখানকার ঘর তার ভেঙেছে চিরদিনের মতই।

ঘর থেকে বের হয়ে মুহ্যমানের মতই সোজা আঙ্গিনা অতিক্রম করে ক্ষীরোদা সদর দরজা খুলে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। এবং অন্ধকার জনহীন রাস্তা

ধরে হাঁটতে হাঁটতে হতাশা, লজ্জা ও অপমানের যে জ্বালাটা এতক্ষণ তার সমস্ত মনটাকে পুড়িয়ে থাক্ করে দিচ্ছিল, সেইটাই যেন অশ্রুর আকারে দর-দর ধারায় তার দুই চক্ষুর কোল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

অবিরল অশ্রুধারায় তার দুই চক্ষুর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, কিন্তু তবু সে চলতে থাকে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে? সংসারে একমাত্র আপনার জন মাসী, এককালে যে তাকে বুকে-পিঠে করে আপন সন্তানের মতই মানুষ করেছিল এবং যে মাসীই একদিন তার বিবাহ দিয়ে ঘর বেঁধে দিয়েছিল, আবার সে মাসীই বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে এলে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল, সেই মাসীকেই না একদিন উঁচু গলায় যা নয় তাই শুনিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল, সেই মাসীর ঘরেই ফিরে যাবে কোন্ লজ্জায়!

মাসী যখন বলবে, কেন মিনষের বুঝি দু'দিনেই শখ মিটে গেল, লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে!

কি জবাব দেবে সে তখন?

না, না—তার চাইতে গঙ্গার জলেই ডুবে মরবে।

সত্যিই তো মা গঙ্গা ছাড়া তার আজকের এত বড় লজ্জা আর অপমানকে কে ঢেকে দেবে? হ্যাঁ, কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না, কোন কিছুই বলবার প্রয়োজন হবে না।

সোজা গিয়ে সেই ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে তলিয়ে যাবে সে। সকল অপমান, সকল বেদনা, সকল লাঞ্ছনা—সমস্ত জ্বালা তার জুড়োবে।

ক্ষীরোদা ঘুরে গঙ্গার ঘাটের দিকেই হাঁটতে শুরু করে। হন হন করে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে।

মা গঙ্গা, তুমি আমায় নাও মা, তুমি আমায় নাও।

কিন্তু গঙ্গার ঘাটে এসে একেবারে জলের ধারে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ক্ষীরোদা।

গঙ্গায় তখন জোয়ার এসেছে।

জোয়ারের স্ফীত জলধারা ছল ছল শব্দে এসে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যায় ক্ষীরোদার। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা যেন শিউরে ওঠে অকস্মাৎ ক্ষীরোদার।

অন্ধকার রাত্রি।

নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকার যেন ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্নের মত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচরকে বিরাট একটা হাঁ করে কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

মাথার উপরে নিরালম্ব নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ আর পায়ের নীচে গঙ্গার জোয়ার-স্ফীত জলরাশি। কেবল একটি মাত্রই শব্দ শোনা যায় কল-কল-ছল-ছল।

মৃত্যু। মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার জন্যই তো ছুটে এসেছিল ক্ষীরোদা আর সেই মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে এমন করে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল কেন!

সমস্ত শরীরটা সহসা অমন করে শিউরে উঠলো কেন? না, মরতেই তো ছুটে এলো ক্ষীরোদা গঙ্গার ধারে, তবে কিসের আর ভয়! এগিয়ে যায় ক্ষীরোদা মন শক্ত করে জলের মধ্যে।

পায়ের পাতা, গোড়ালি, হাঁটু পর্যন্ত জল। ক্রমশঃ আরো-আরো গভীর—তারপরই অতলান্ত ডুবজল!

নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গন!

নামতে থাকে ক্ষীরোদা জলের মধ্যে। জলে জোয়ারের তীব্র টান। একটা ঢেউ এসে বক্ষের বসন ভিজিয়ে দিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যেন কে মনের ভিতর থেকে চিৎকার করে ওঠে, কেন মরবি! কেন, কেন?

সত্যিই তো। কেন, কেন মরবে ক্ষীরোদা! কোন্ দুঃখে এমন ভরা যৌবনে সে গঙ্গায় জলে ডুবে মরবে! বুকভরা এখনো তার কত আবেগ, কত আকাঙ্ক্ষা।

জীবনের কোন সাধই তো তার মেটে নি। বুকভরা তৃষ্ণার আগুন এখনো তার। শিশুবয়েসে মা বাপকে হারিয়ে মাসীর কাছে মানুষ।

সবাই বলেছে, কালো হলে কি হবে—সেই কালো রূপই তার নাকি মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

স্বামীকে সে পেয়েও পেল না।

মরীচিকার মতই তার স্বামী-সুখ মিলিয়ে গেল। সীমন্তের সিন্দুর-রেখা মুছে দিল বিধাতা। তা ছাড়া হরনাথ, হরনাথ তাকে লাথি মেরে দূর করে দিলেও—হরনাথই তার রূপমুগ্ধ একমাত্র পুরুষ নয় এ জগতে।

চেতলার মহেন্দ্র সাহা—মস্ত ধনী—হরনাথের চাইতে অনেক বেশী টাকা পয়সা তার।

ফলাও ব্যবসা, পাকা বসতবাড়ি। দু'দুটো বাগানবাড়ি। একটু যা বয়স হয়েছে—তা হোক। পাঁচ-পাঁচ বার বিবাহ করেছিল মহেন্দ্র সাহা—একটা স্ত্রীও বাঁচেনি। দুটি ছেলে দুটি মেয়ে।

মেয়ে দুটির বিয়ে অনেক দিন আগেই হয়ে গিয়েছে। ছেলে দুটিও বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়েই তারা ব্যস্ত।

প্রৌঢ় মহেন্দ্র সাহার দিকে তাদের কারো কোন নজর নেই। অথচ টাকা

পয়সা, বাড়ি ঘর তুলার ব্যবসা—সব কিছুর মালিক এখনো সে।

বয়েস হলে কি হবে—এখনো বেশ শক্তসমর্থ। পাকা চুলে এখনো সুগন্ধ তেল দিয়ে এলবার্ট টেরী কাটে, পরনে মিহি ফরাসডাঙার চওড়া কালোপাড় ধুতি। রীতিমত শৌখীন। হবেই বা না কেন, অর্থের তো অভাব নেই।

ইচ্ছা করলে আবারও বিবাহ করতে পারতো মহেন্দ্র সাহা, কিন্তু বিবাহে নাকি আর মানুষটার রুচি নেই। তবে যত্ন-আত্তি করতে পারে এ বয়েসে এমন একজন মেয়েছেলে পেলে তাকে সে রাজরাণীর গৌরবে রাখবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

মাসীর কাছে তাই কিছুদিন মহেন্দ্র সাহা অনুচর বৃন্দাবনকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু ক্ষীরোদা রাজী হয় নি।

মাসীও প্রস্তাবটা অনেকবার করেছে তার কাছে, কিন্তু ক্ষীরোদা বলেছে, ঘাটের মড়া মিন্‌সের শখ দেখে হাসি পায়। মরণ—

অথচ আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত আর এক প্রৌঢ় হরনাথ মিশ্রকেই আশ্রয় করলো ক্ষীরোদা।

মাসী ঘোরতর আপত্তি তুলেছিল কিন্তু ক্ষীরোদা তার কোন কথাতেই কান দেয় নি সেদিন।

মাসীর আশ্রয় ছেড়ে এসে উঠেছিল হরনাথের গৃহে। যে হরনাথের মহেন্দ্র সাহার সঙ্গে তুলনায় কোন যোগ্যতাই ছিল না।

ধন ঐশ্বর্য তো চায়নি ক্ষীরোদা, সে চেয়েছিল মনের মত একটি মানুষ—এমন কি তাই বুঝি হরনাথের বয়সটাও তার নজরে পড়েনি। সেই হরনাথ আজ তাকে লাথি মেরে গৃহ হতে বিতাড়িত করলো!

ধ্বক্ করে যেন জ্বলে ওঠে ক্ষীরোদার বুকের ভিতরটা অপমান ও ক্ষোভের আক্রোশে। এতদূর স্পর্ধা। এত অহংকার।

কি আছে হরনাথের। একটা ভিক্ষুক বই তো নয়। শুধু কি তাই, তার এত বড় ভালবাসাকে সে এমন নিদারুণ ভাবে অপমান করলো! আর সেই অপদার্থ পুরুষটার জন্যই কিনা সে আজ গঙ্গার জলে ডুবে আত্মঘাতী হতে চলেছে!

কেন, কেন সে আত্মঘাতী হবে। কোন দুঃখে। এখনো তার দেহভর্তি অটুট যৌবন ও চোখঝলসানো রূপ। তুচ্ছ ঐ হরনাথ মিশ্র, তার মত দশজন পুরুষকে এখনো সে ইচ্ছা করলে নাকে দড়ি দিয়ে কি ঘোরাতে পারে না।

তবে, তবে কেন সে আত্মহত্যা করে জীবনটাকে শেষ করে দেবে?

মহেন্দ্র সাহা, এক্ষুনি যদি সে মহেন্দ্র সাহার কাছে যায় সে তো তাকে বুকে তুলে নেবে। মহেন্দ্র সাহা। হ্যাঁ মহেন্দ্র সাহা।

অপমান লজ্জা ও আক্রোশে চোখ দুটো অন্ধকারে যেন প্রতিহিংসাপরায়ণা বাঘিনীর মতই জ্বলতে থাকে ক্ষীরোদার ধক্ ধক্ করে।

না, সে মরবে না, মহেন্দ্র সাহার কাছে যাবে। তারপর—তারপর একদিন যদি সে সুযোগ পায় তো ঐ চরম অপমানের উচিত প্রতিশোধ সে নেবে।

ঘুরে দাঁড়াল ক্ষীরোদা এবং সেই সিক্তবসনেই উঠে এল একসময় জল থেকে।

মহেন্দ্র সাহা কোনদিনই রাত্রে গৃহে থাকত না। সন্ধ্যার পর দোকান থেকে গৃহে প্রত্যাগত হয়ে স্নান করে টেরি কেটে বাবু সেজে গলায় গোড়ের মালা ঝুলিয়ে রুমালে আতর মেখে উঠে বসত নিজস্ব পাল্কী-গাড়িতে। কালো কুচকুচে দুটো ওয়েলার ঘোড়া সেই পাল্কী-গাড়ি টানে।

গাড়িতে চেপে সোজা চলে যেতো বেলগাছিয়ায় নিজস্ব বাগান-বাড়িতে। সারাটা রাত ধরে সেখানে চলতো ইয়ারবক্সী ও অনুগৃহীতের দল নিয়ে সুরাপান ও ফুর্তি।

বেলগাছিয়ার মস্ত সে বাগানবাড়িটা একদিন পথ চলতে চলতে মাসীই তাকে দেখিয়েছিল, বলেছিল, ঐ দেখ ক্ষীরি, সাহাবাবুর বাগানবাড়ি।

ক্ষীরোদা একবার মাত্র দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ঘৃণা ও অবজ্ঞায় ওদিকে দ্বিতীয়বার আর ফিরেও তাকায়নি।

সেদিন যে বাড়িটার দিকে নিদারুণ অবজ্ঞায় ক্ষীরোদা ফিরেও তাকায় নি আজ রাত্রির তৃতীয় প্রহরে সিক্তবসনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেই বাড়ির লোহার গেটটার সামনেই এসে দাঁড়াল ক্ষীরোদা।

তার নজরে পড়লো বাড়ির খোলা জানলাপথে অদূরে উজ্জ্বল আলোর শিখা ও সেই সঙ্গে কানে এলো সারেঙ্গী ও তবলায় মিঠা বুলির সঙ্গে সুমধুর নারীকণ্ঠে লহরী।

থমকে দাঁড়াল ক্ষীরোদা। প্রচণ্ড একটা উত্তেজনার মধ্যে দ্রুত সে সমস্ত পথটা অতিক্রম করে এসেছিল, কোথাও একটি মুহূর্তের জন্যও দাঁড়ায় নি।

আচমকা যেন ক্ষীরোদা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বিরাট লোহার গেটের পাল্লা দুটো ঈষৎ খোলাই ছিল। তবু যেন পা বাড়াতে পারে না ক্ষীরোদা।

রাত্রিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সিক্ত বসনের তলায় সমস্ত দেহটা যেন সির সির করে সহসা কেঁপে ওঠে।

সারেঙ্গী তবলার মিঠে বুলির সঙ্গে সুমধুর কণ্ঠলহরী ভেসে আসছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইলো ক্ষীরোদা, তারপর গেটের ভিতরে পা বাড়ালো।

একটা স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে যেন এগিয়ে চলে ক্ষীরোদা পায়ে পায়ে সামনের দিকে।

লম্বা টানা অলিন্দ পার হয়ে বিরাট একটা আলোকোজ্জ্বল হলঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ক্ষীরোদা।

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাল। ঘরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে ফরাশ পাতা ও মোটা মোটা সব তাকিয়া। এদিকে ওদিকে সুরার শূন্য বোতল ও বেলোয়ারী পানপাত্র সব গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আর আট-দশজন সুবেশধারী নানা বয়েসী বাবু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে বোধহয় নেশার ঘোরে জ্ঞান হারিয়ে ফরাশের ওপর পড়ে আছে।

একপাশে বসে মহেন্দ্র সাহা বিরাট একটা তাকিয়ার ওপরে হেলান দিয়ে, নিমীলিত চক্ষু, সামনে সুদৃশ্য রৌপ্য-থালিতে পানপাত্র।

মধ্যস্থলে সংগীতের আসর চলছে।

এক বাঈজী গান গাইছে, ও তার পাশে তবলচী সারেঙ্গী বাদক।

স্তব্ধ অনড় হয়ে নির্বাক সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ক্ষীরোদা।

সে যেন ঐ মুহূর্তে ভুলে গিয়েছে পর্যন্ত কেন সে এসেছে এবং কোথায় সে এসেছে।

গান শুনতে শুনতেই বোধহয় এক সময় সম্মুখের রৌপ্য থালি থেকে পানপাত্রটি তুলে চুমুক দিতে গিয়েই সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করে মহেন্দ্র সাহা।

নেশার চোখে প্রথমটায় মহেন্দ্র সাহা ঠিক ব্যাপারটা বোধহয় উপলব্ধি করতে পারে না। ভ্রূদুটো কুঞ্চিত হয়।

হাতের পানপাত্রটা রৌপ্যথালিতে নামিয়ে রেখে নেশারক্তিম চক্ষু দুটি ভাল করে প্রসারিত করে পুনরায় দরজাটার দিকে দৃষ্টিপাত করে। ঘরের উজ্জ্বল আলো দণ্ডায়মান ক্ষীরোদার সর্বাঙ্গে পড়েছে।

যৌবনস্ফীত নিটোল দেহসুষমা সিক্ত বসনের অন্তরাল হতে প্রতিটি রেখায় ও কুঞ্চনে যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এলায়িত সিক্ত কুন্তল। বক্ষের বসন কিছুটা স্খলিত ও বিস্রস্ত।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মহেন্দ্র সাহা। মহেন্দ্র সাহাকে আসর ছেড়ে উঠতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বাঈজী তার গান বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু সেদিকে তাকায় না মহেন্দ্র সাহা। ভ্রূক্ষেপও করে না।

স্কন্ধের উপর থেকে উত্তরীয়টা খসে পড়ে যায়। টলতে টলতে সোজা এগিয়ে এসে একেবারে দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান ক্ষীরোদার সামনে দাঁড়াল।

কে ?

নির্বাক নিস্পন্দ বোবা দৃষ্টিতে তখনো চেয়ে রয়েছে ক্ষীরোদা মহেন্দ্র সাহার মুখের দিকে। ওদিকে তবলচী, সারেঙ্গীবাদক ও বাঈজী তিনজনেই অবাক বিস্ময়ে পশ্চাতে আসরে যে যার জায়গায় বসে তাকিয়ে থাকে ওদের দুজনার দিকে।

সমস্ত হলঘরটার মধ্যে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা কেবল।

আমি ক্ষীরোদা। আস্তে আস্তে ক্ষীরোদা কথা বলে।

কে ? ক্ষীরোদা! চিৎকার করে ওঠে মহেন্দ্র সাহা। তারপর আরো কাছে এসে ক্ষীরোদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আরে সত্যিই তো, সত্যিই তো বটে। এসো, এসো—

ক্ষীরোদা বোধ করি এগুবার জন্যই পা বাড়ায়, কিন্তু এক পা'র বেশী অগ্রসর হতে পারে না, অকস্মাৎ জ্ঞান হারায় ক্ষীরোদা এবং পরমুহূর্তে সংজ্ঞাহীন দেহটা তার টলে পড়তে দেখে মহেন্দ্র সাহা দুবাহু প্রসারিত করে ক্ষীরোদার পতনোন্মুখ দেহটা বুকের ওপরে টেনে নেয়।

চিৎকার করে ওঠে, বেন্দা, বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন তখন সাড়া দেবে কি। হলঘরের পাশের ঘরটায় আকণ্ঠ মদ্যপান করে একটা খাটিয়ার উপরে নাক ডাকিয়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে।

ওদিকে হরনাথের গৃহে সেই রাত্রে ক্ষীরোদা টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ দুজনে নির্বাক হয়ে রইলো, সুলোচনা আর হরনাথ।

সুলোচনার মুখের দিকে যেন তাকাতেও পারছিল না হরনাথ। লজ্জায় আর ধিক্কারে প্রতিমুহূর্তে সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছিল।

ছি ছি ছি, আকস্মিক উত্তেজনার মাথায় এ একটা কি সে করে বসলো!

ক্ষীরোদার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কের কথাটা জানতে আর কিছুমাত্র বাকী রইলো না সুলোচনার।

সুলোচনাকে তো হরনাথ খুব ভাল করেই চেনে। এতকাল বাদে স্বেচ্ছায় যদিও বা সে তার গৃহে এসেছে অতঃপর আর এক মুহূর্তও যে সে তার গৃহে থাকবে না, হরনাথ সেটা বুঝতে পারছিল।

চলে যাবে ঠিকই সুলোচনা, কিন্তু হরনাথের প্রতি যে প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে সে আজ চলে যাবে সেই কথাটা ভাবতে গিয়েই প্রতিমুহূর্তে হরনাথের মনে হচ্ছিল এর

চাইতে মৃত্যুও বুঝি সহস্রগুণে শ্রেয় ছিল!

এমনিই বুঝি হয়। একান্ত প্রিয় ও আপনার জনের কাছে যখন কারো গৌরব শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসনটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তখন যেন তার আর সান্ত্বনার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু যার মুখের দিকে হরনাথ সেই মুহূর্তে লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না, সেই সুলোচনাই ধীরপদে এগিয়ে এল স্বামীর সামনে।

বললে, রাত অনেক হলো এবার চোখে মুখে একটু জল দিয়ে শুয়ে পড়।

কোন কিছুই যেন ঘটে নি। সুলোচনার কণ্ঠস্বরে কোথায়ও ভাবান্তরের লেশমাত্রও নেই যেন। শান্ত একান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর।

অসহায় দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল হরনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে।

শান্ত ভাবলেশহীন দৃষ্টি সুলোচনার দুই চোখে।

সুলোচনা!

বল।

সত্যিই আমি নরাধম। আমাকে, আমাকে—তুমি রক্ষা করো।

সুলোচনা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট স্বামীর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলে, ছি ছি, ও কথা বলতে নেই—ও কথা শোনাও আমার মহাপাপ।

কিন্তু সুলোচনা—

রাত শেষ হয়ে এলো—যাও বাইরে গিয়ে মুখে হাতে জল দিয়ে এসে শুয়ে পড়।

হরনাথ আর কোন কথা বললে না।

পালঙ্ক থেকে নেমে বাইরে চলে গেল।

সুলোচনা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবং অনেকক্ষণ তারপরও সুলোচনা একা একা ঘরের মধ্যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একসময় ঘর থেকে বের হয়ে এলো, চারিদিকে একবার তাকাল।

সামনের বারান্দাটা ও আঙ্গিনা একেবারে শূন্য, খাঁ খাঁ করছে, যতদূর দৃষ্টি চলে কেউ কোথাও নেই, বারান্দা থেকে সুলোচনা আঙ্গিনায় নামল এবং এতক্ষণে তার নজরে পড়ে সদর দরজার কপাট দুটো হা হা করছে খোলা। কি ভাবল সুলোচনা মুহূর্তকাল, তারপর সদর দরজার কপাটে অর্গল তুলে দিয়ে ফিরে এলো।

পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করলো সুলোচনা।

ঘর অন্ধকার।

অন্ধকারেই যে শয্যায় সুনয়না নিদ্রা যাচ্ছিল সেই শয্যায় গিয়ে বসল।

বড়মা!

যেন ভূত দেখার মতই অন্ধকারে সুনয়নার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সুলোচনা, কয়েকটা মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ পর্যন্ত নির্গত হয় না।

তারপর এক সময় যেন চাপা কণ্ঠে কোন মতে শুধায়, তুই জেগে নয়না?

হ্যাঁ, বড়মা—অনেকক্ষণ থেকেই তো আমি জেগে আছি।

সুলোচনার বুঝতে আর কিছুমাত্র বাকী থাকে না, পাশের ঘরে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই অবিদিত নেই সুনয়নার।

সুনয়না সব কিছু জেনেছে।

ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পরে সুলোচনা সুনয়নার গায়ে একখানি হাত রাখে নিঃশব্দে।

আর কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হয় না।

সুনয়না হাত বাড়িয়ে সুলোচনার হাতটা মুঠো করে অন্ধকারেই চেপে ধরে। সে যেন আজ সুলোচনার মধ্যেই আশ্রয় খুঁজছে।

সুলোচনার হাতটা ধরেই যেন সে আজ বাঁচতে চায়।

সুলোচনা নিঃশব্দে বসে থাকে। আর তার দু চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে নামতে থাকে।

॥ ২ ॥

টালির নালা যেখানে এসে বড় গঙ্গার মুখে মিশেছে সুন্দরম্ সেইখানেই তার নৌকার নোঙর ফেলল।

এমামুল্লা শুধায়, এইখানেই কি রাত্রে নাও থাকবে সাহেব?

হ্যাঁ, আপাতত এইখানেই থাকবো আমরা। সুন্দরম্ জবাব দেয়।

এমামুল্লা আর সুন্দরম্‌কে দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না। সে ভারী নোঙর জলে নামিয়ে দিয়ে ভাল করে নৌকা বেঁধে ফেলল।

ইতিমধ্যে চারিদিকে ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার চাপ বেঁধে উঠেছে। গঙ্গায় জোয়ার আসতে আর বেশি দেরি নেই। একটু পরেই হয়তো জোয়ার আসবে। মাল্লারা চুল্লী জ্বালিয়ে রাত্রির রন্ধনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

সুন্দরম্ এসে নৌকার কামরার মধ্যে প্রবেশ করল।

কামরার মধ্যে ইতিমধ্যে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মাল্লারা। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা দুলছে, সেই সঙ্গে বাতিটাও দুলছে মৃদু মৃদু।

দড়ির পালঙ্কে শয্যায় শায়িতা মৃন্ময়ী। শায়িতা মৃন্ময়ীর চোখে মুখে ও দেহে আলো পড়েছে। সুন্দরমের পদশব্দে মৃন্ময়ী চোখ মেলে তাকাল।

রুগ্না শীর্ণা মৃন্ময়ী। বাসি ফুলের মতই যেন মৃন্ময়ীর ফুল্লকুসুমবৎ মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। মাথার তৈলহীন রুক্ষ কেশরাশি উপাধানের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা হাত ও একটা পা অবশ—নাড়াচাড়া করতে পারে না। কথাও জড়ানো অস্পষ্ট। কথা অবিশ্যি বলেই না মৃন্ময়ী একপ্রকার।

সুন্দরম্ এসে মৃন্ময়ীর শয্যার শিয়রের ধারে রক্ষিত চৌকিটার উপর বসলো। মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকায় সুন্দরম্। তারপর একসময় ডান হাতটা ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর মাথার রুক্ষ কেশের ওপরে রাখে।

মৃন্ময়ী যেমন নিঃশব্দে তাকিয়েছিল, তেমনি করেই তাকিয়ে থাকে সুন্দরমের মুখের দিকে। সুন্দরম্ নিঃশব্দে তার মোটা মোটা রুক্ষ আঙুলগুলো চালাতে থাকে মৃন্ময়ীর রুক্ষ কেশের মধ্যে। মৃন্ময়ীর কেশ বিলি করতে করতে অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যায় সুন্দরমের।

একবার রাত্রে মাঝদরিয়ায় ঝড়ের মুখে পড়ে সে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল।

দুর্যোগ কেটে গিয়ে যখন প্রসন্ন আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, দেখলে কোথাও তীরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

শুধু দিগন্তবিস্তৃত নীলাম্বুরাশি। দুর্যোগ থামলেও হাওয়ার প্রকোপে আথালি-পাথালি করছে সমুদ্র। শুধু জল, জল আর জল।

সুদূর জাভা থেকে নাও নিয়ে ফিরে আসছিল সুন্দরম্ বাংলা দেশে।

দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে নাও নিয়ে অথৈ সমুদ্রের মধ্যে দশ-পনের দিন ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গে যা সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী ছিল সব তখন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মাঝি-মাল্লা নিয়ে জনা পনের লোক। ক্ষুধার জ্বালায় সব ছট্‌ফট্ করছে। মাথার উপরে অগ্নিবর্ষী নীল আকাশ আর নীচে যতদূর দৃষ্টি চলে লোনা জলের চোখ-ধাঁধানো নীল রূপ। চোখ ধাঁধায় তৃষ্ণা মিটায় না।

সেই সময় সহসা এক ঝাঁক সাগরপাখী মাথার ওপরে উড়তে দেখে নৌকার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে হাতের বন্দুক ছুঁড়েছিল সুন্দরম্।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, ঝাপসা দৃষ্টি তবু একটা পাখী গুলিবিদ্ধ হয়ে জলে এসে পড়ল। সাগরের নীল জলের খানিকটা সাগরপাখীর লাল শোণিতে রক্তাভ হয়ে ওঠে।

ঝুঁকে পড়ে জল থেকে তুলে নেয় পাখীটা সুন্দরম্। দেহের কোথাও গুলি লাগেনি, লেগেছিল ডানায়। সাদা ধবধবে পাখীর পালক রাঙা হয়ে উঠেছিল

রক্তে। কি নরম—যেন একরাশ তুলোর মতই পাখীটা মনে হয় সুন্দরমের হাতের মধ্যে।

সুন্দরমের শক্ত কঠিন মুঠোর মধ্যে ধৃত পাখীটা তখন তার ছোট ছোট গোল রক্তাভ দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেমন করে চেয়েছিল সুন্দরমের মুখের দিকে, সুন্দরমের মনে হয় ঠিক তেমনি করেই যেন চেয়ে আছে মৃন্ময়ী নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে। সেদিনকার তারই হাতে সেই আহত রক্তাভ অসহায় গুলিবিদ্ধ সাগর-পাখীটার মতই লুণ্ঠিতা মৃন্ময়ী যেন তার দিকে চেয়ে আছে বোবা দৃষ্টিতে।

সেযাত্রা অতবড় ক্ষুধার তাড়নাতেও কেন যেন সেদিন সেই পাখীটাকে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে নি সুন্দরম্। অবিশ্যি অচিরাৎ অদূরেই সে সেদিন ডাঙার দেখা পেয়েছিল। উত্তেজনার মধ্যে সে ভুলে গিয়েছিল, নচেৎ তার জানা উচিত ছিল সাগর-পাখীরা তীর থেকে বেশী দূরে উড়ে যায় না। তীরভূমির কাছাকাছিই তারা সাগর আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। তীরভূমি থেকে কখনো তারা বেশী দূর উড়ে যায় না।

শুধু তাই নয়, আরো একটা কথা যেন অকস্মাৎ মনে হয় সুন্দরমের—মৃন্ময়ীর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ও তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে, মৃন্ময়ী যেন তার কত আপনার। ঐ মৃন্ময়ীর জন্য বুঝি সে পৃথিবীর চরমতম দুঃখও বরণ করে নিতে পারে সানন্দে।

মৃন্ময়ী যেন তার একান্ত আপনার জন—আত্মার আত্মা। কিন্তু অমন করে নিশ্চল হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। মৃন্ময়ীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন নিরাপদ, নিশ্চিন্ত স্থানে যত শীঘ্র সম্ভব সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

উঠে পড়ল সুন্দরম্।

অরিন্দম সরকারের বাগান-বাড়িটা পাওয়া যায় কিনা তাই একবার চেষ্টা করে দেখবে। অরিন্দম সরকার লোকটা ধনী হলেও অর্থের লেন-দেনের ব্যাপারে একটু কঠিন। তা হোক, তবু সুন্দরম্কে অরিন্দম সরকার যে ভয় করে তা জানত সুন্দরম্। সুন্দরম্ কামরার ভিতর থেকে বের হয়ে এলো।

রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত। কালো আকাশে হীরার কুচির মত এক রাশ তারা ঝিক্‌মিক্ করছে। অন্ধকারে বিচিত্র একটা শব্দ তুলে একটানা গঙ্গার জলস্রোত বয়ে চলেছে। গলুইয়ের এক পাশে পাটাতনের উপর চুল্লী জ্বলছে, তার 'উপরে হাঁড়িতে বোধ হয় ভাত ফুটছে। তারই গন্ধ বাতাসে। তারই সামনে বসে মাঝি এমানুল্লা অন্ধকারেই মশলা পিষছিল।

এমানুল্লা!

সাহেব! তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায় এমাহুল্লা।

আমি একটু ভাণ্ডায় যাচ্ছি। সাবধানে থেকো। ফিরতে হয়ত রাত হতে পারে।

খানা খাবেন না সাহেব?

না—দোকান থেকেই কিছু খেয়ে নেবো'খন।

এমাহুল্লা আর কিছু বললো না।

কোমরে কটিবন্ধের মধ্যে গোঁজা গাদা-পিস্তলটা একবার হাত দিয়ে দেখে নিল সুন্দরম্, তারপরই নৌকা থেকে পা বাড়িয়ে জলে নামল। প্রায় একহাঁটু জল। জায়গাটায় দু'একঘর জেলের বাস ছাড়া জনমানবের বড় একটা বসতি নেই। গঙ্গার ধারটা ঘন আগাছা আর কাঁটা-ঝোপে ভর্তি। অবিশ্যি তারই ধার দিয়ে দিয়ে জেলেদের একটা সরু পায়ে-চলার পথ বরাবর বসতির দিকে চলে গিয়েছে। এবং দিনের বেলা লোকজন হাঁটলেও সন্ধ্যার পর থেকে কেউ বড় একটা সে পথে হাঁটে না। সাপের ভয়ে রীতিমত বিপদসংকুল।

কিন্তু সুন্দরমের কোন দিনই ভয়-ডর বলে কিছু নেই। তাছাড়া পায়ে তার সর্বদা চামড়ার ভারী চর্মপাদুকা থাকে। নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তেই সুন্দরম্ হন্ হন্ করে সেই পথ ধরে হেঁটে চলে।

অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

তা হোক, মৃন্ময়ীর একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সুন্দরম্ সুস্থির হতে পারছে না।

কুমোরটুলীতে অরিন্দম সরকারের বাটিতে এসে যখন পৌঁছাল সুন্দরম্ তখন বেশ রাত হয়েছে। দীর্ঘ পথ, বেশ দ্রুতই একটানা হেঁটে একটু যে পরিশ্রম হয় নি তার তা নয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গিয়েছিল।

অরিন্দম সরকারের অর্থের ব্যাপারে যতই দুর্নাম থাক এবং চোরাকারবার করে প্রচুর অর্থাগম হলেও লোকটার দান-ধ্যান ছিল।

বার বার দুইবার বিবাহ করেছিল অরিন্দম সরকার কিন্তু সন্তানাদি হয় নি একটিও। কিন্তু বাড়ি ভরতি ছিল আত্মীয়-পরিজন। বহু আশ্রিত জন তার গৃহে থেকে ও খেয়ে কাজকর্ম করতো, পড়াশুনা করতো অনেক দুঃস্থ পরিবারের ছেলেরা।

সরকার বাড়িতে ঐ সব দুঃস্থ আশ্রিত পুরুষদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল বহির্মহলের একটা বড় অংশ। তাদেরই সেখানে ভিড় ছিল।

বহির্মহলেরই একটা অংশে ছিল অরিন্দম সরকারের গদি।

রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চেতলার আড্ডত থেকে ফিরে এসে অরিন্দম সরকার ঐ গদিতে বসতো এবং সেই সময়ই তার চলত চোরাই মালের বেচা-কেনা।

চোরাই মালের ক্রেতা ও বিক্রেতারা ঐ সময়ই গদিতে এসে তার সঙ্গে বেচা-কেনা করত।

বহির্মহলের পুব দিকে এক কোণে নিরিবিলিতে অপরিসর একখানি ঘর।

মাঝারি গোছের একটি তক্তাপোশের ওপরে ফরাস বিছানো। ফরাশের ওপরে বসে বেচা-কেনা করতো অরিন্দম সরকার। সামনে থাকতো একটি স্টীলের ছোট পেটিকা, পেটিকা ভর্তি থাকত টাকা।

অরিন্দম সরকারের কাছে চোরাই কারবারের ব্যাপারটা ছিল নগদা-নগদি।

সুন্দরম্ ব্যাপারটা জানত।

সকলের অবিশ্যি সে ঘরে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। বন্ধ দরজার একেবারে সামনেই বসে থাকত জগা হাড়ি।

জগার অনুমতি ব্যতীত গদি-ঘরে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। একটা গুলবাঘের মতই যেন থাবা পেতে দরজার গোড়ার একটা জল-চৌকির উপর বসে বসে পাহারা দিত জগা যতক্ষণ গদি-ঘরে অরিন্দমের বেচা-কেনা চলত।

জগার চেহারাটা সত্যিই একটা গুলবাঘের মতই ছিল। বেঁটে-খাটো এবং অতীব পেশীবহুল ও বলিষ্ঠ মানুষটাকে ঘাড়ে-গর্দানে একটা বীভৎস জানোয়ারের মতই মনে হতো হঠাৎ দূর থেকে দেখলে।

গোলাকার মুখখানি।

চ্যাপটা বসা নাক। খুদে খুদে চক্ষু। নির্লোম ভ্রূ। এবং কপাল ও মুখ ভর্তি ছোট ছোট আব, পুরু ওষ্ঠ—নোংরা হরিদ্রাভ আঁকা-বাঁকা দাঁত। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবারই কথা।

চেহারাটা যেমন ছিল জগার, দৈহিক আসুরিক শক্তিও ছিল তেমনি। তেমনি ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতি। কোথা থেকে, কবে এবং কেমন করে যে ঐ মানুষটাকে যোগাড় করেছিল অরিন্দম সরকার, কেউ জানে না।

বগলে একটা তৈল-চক্‌চকে হাতখানেক লম্বা লাঠি নিয়ে সর্বদা যেন ছায়ার মত ফিরত জগা অরিন্দম সরকারের সঙ্গে সঙ্গে।

কেউ জানত না জগার ইতিহাস, অরিন্দম সরকার কোথা থেকে ঐ অসুরটাকে

যোগাড় করেছিল। থর্বাকৃতি অরিন্দম সরকারকে কেন ঐ অসুরটা যমের মত ভয় করতো।

এককালে প্রথম যৌবনে লাঠি ও সড়কি চালনায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিল অরিন্দম সরকার এবং পরবর্তীকালে লাঠি ও সড়কি দুটোর একটারও অভ্যাস না থাকলেও একদিন যৌবনের সেই দক্ষতাই তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

হাঁটা পথে শান্তিপুর থেকে হালি শহরে ফিরছিল অরিন্দম সরকার। একা মানুষ, সম্বল ও ভরসা ছিল মাত্র হাতে একটি লাঠি। সেই সময়টা ঐ পথে প্রায়ই ঠ্যাঙ্গাড়েদের অত্যাচারের কথা শোনা যেত। সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি ছিল। অনেকেই নিষেধ করেছিল ঐ ভাবে তাকে একা একা যেতে, কিন্তু একগুঁয়ে প্রকৃতির অরিন্দম সরকার কারো কথাতেই কর্ণপাত করে নি।

দ্বিতীয় রাত্রে এক প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে যখন আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে অরিন্দম সরকার, অদূরবর্তী কতকগুলো বাব্‌লা ঝোপের আড়াল থেকে অকস্মাৎ বিদ্যুৎগতিতে একটা ফাঁপড়া ছুটে এলো অরিন্দমের দিকে। ঐ সময়টা জোরে হাওয়া বইছিল। সেই কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, ফাঁপড়াটা অরিন্দম সরকারের ডান পা ছুঁয়ে অদূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

কিন্তু সেই ছোঁয়াতেই আঘাত পেয়েছিল অরিন্দম সরকার, তাকে মাটিতে বসে পড়তে হয়েছিল। আক্রমণকারী ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছিল মোক্ষম আঘাত, শিকার যথারীতি মাটি নিয়েছে আর তাই সে পরম নিশ্চিন্তেই ছুটে এগিয়ে এসেছিল ভূপতিত শিকারের সামনে।

ততক্ষণে অরিন্দম সরকার নিজেকে সামলে নিয়ে বসা অবস্থাতেই যন্ত্রণা ভুলে হাতের লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরেছে মুঠোর মধ্যে এবং আক্রমণকারী সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য করে লাঠি চালায়।

অস্ফুট একটা চিৎকার করে লাঠির সেই প্রচণ্ড আঘাতে লোকটা তার ডান হাতটা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

সেই লোকটাই জগা হাড়ি।

একটি আঘাতেই জগা বুঝেছিল কঠিন পাল্লায় সে পড়েছে।

লাঠি হাতে অরিন্দম এবারে সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে জগার সামনে দাঁড়াল, হাঁকাবো নাকি আর একটা? দিই মাথাটা দু'ফাঁক করে?

মিটিমিটি তাকাচ্ছে তখন জগা অরিন্দমের দিকে।

আকাশের এক প্রান্তে ইতিমধ্যে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই মৃদু আলোয়

সমস্ত প্রান্তরটায় আব্ছা আব্ছা আলো-ছায়া।

কিরে শালা, কথা কইছিস না কেন? হাঁকাবো আর একবার?

তবু নিরুত্তর জগা।

চল্ শালা, তোকে চৌকিদারের জিম্মা করে দেবো।

কাঁধের উড়নি দিয়ে হাত দুটো বেঁধে ফেললো জগার শক্ত করে, তারপর সঙ্গে করে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

চৌকিদারের হাতে তুলে দেয় নি জগাকে অরিন্দম সরকার। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল জগাকে কলকাতায়। সেই থেকেই জগা অরিন্দম সরকারের কাছে আছে।

সুন্দরম্ এসে দরজার সামনে দাঁড়াতেই জগা উঠে দাঁড়াল।

সুন্দরমের যে গদি-ঘরে যাতায়াত আছে পূর্বেই সেটা দেখেছিল জগা। অপরিচিত মানুষ নয়।

সরকার মশাই গদি-ঘরে আছেন নাকি? সুন্দরম্ শুধায়।

আছেন।

আর কেউ আছে?

না।

সুন্দরম্ আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ভেজানো দরজাটা ঠেলে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। চার হাত লম্বায় এবং তিন হাত প্রস্থে ছোট্ট ঘরটি।

ফরাশের উপর স্টীলের বাক্সটার সামনে বসে সেজবাতির আলোয় অরিন্দম সরকার আলবোলায় তামুক সেবন করছিল।

ঘরে সুন্দরম্কে প্রবেশ করতে দেখেই ভ্রূ-কুঁচকে চোখ তুলে তাকাল এবং সুন্দরম্কে দেখে তার শকুনের মত শুকনো মুখখানা মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আরে সুন্দর সাহেব যে? এসো, এসো—বসো। তারপর—অনেক দিন পরে, কি খবর?

সুন্দরম্ গদির এক পাশে বসে।

মাল-টাল কিছু আছে নাকি?

না সরকার মশাই—এতক্ষণে কথা বলে সুন্দরম্।

তবে? আগমন কেন সাহেব হঠাৎ?

একটু বিশেষ প্রয়োজনেই এসেছি।

বুঝতে পারছি। তা সেই বিশেষ প্রয়োজনটা কি?

সরকার মশাই—

বল।

কুলীর বাজারে গঙ্গাতীরে আপনার একটা বাগান-বাড়ি আছে—

তা তো আছে—

সেটা আমি ভাড়া নিতে চাই।

কেন বল তো সাহেব!

কেন আর কি—থাকবো। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি আছে—

উঁহু! ব্যাপারটা পরিষ্কার করে খুলে বল তো সাহেব—

বললাম তো থাকবো।

তা তো শুনলাম, কিন্তু জল ছেড়ে একেবারে ডাঙায় আসবে! জলের প্রাণী তোমরা!

জলে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি।

বল কি সাহেব। তাহলে তোমার কাজ-কারবার।

নতুন কারবার শুরু করবো ভাবছি।

নতুন কারবার!

হ্যাঁ—আপনি একসময় বলেছিলেন কাঠের বা চালের ব্যবসা করলে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন—

শুধু কি তাই সাহেব?

তাই।

কিন্তু সে ব্যবসা কি তোমার পোষাবে?

দেখি—তাছাড়া—

বল, থামলে কেন সাহেব!

আমি বিয়ে করেছি—

বল কি! বিয়ে!

হ্যাঁ—

তা পাত্রীটি কোথা থেকে যোগাড় হলো! দান না লুণ্ঠন?

আপনি আমাকে বাড়িটা দিতে পারেন কিনা বলুন।

ন্যায্য ভাড়া পেলে দেবো না কেন?

কত চান বলুন?

সে আর তোমার মত লোককে কি বলবো সাহেব! তুমিই বল না কত দিতে পারো?

আমার কথা ছাড়ুন। আপনি যা চান তাই পাবেন।

তবে আর কি! তা কবে থেকে ভাড়া চাও!

আজ রাত্ত থেকেই।

আজ থেকেই?

হ্যাঁ—কথাটা বলে কুর্তার জেব থেকে এক মুঠো টাকা বের করে অরিন্দম সরকারের সামনে রাখলো সুন্দরম্।

পিট পিট করে তাকায় টাকাগুলোর দিকে অরিন্দম সরকার।

চাবিটা দিন বাড়ির।

বসো, আমি চাবি নিয়ে আসছি—

অরিন্দম সরকার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘর থেকে বের হতেই জগা উঠে দাঁড়ায়।

জগা—

কর্তা।

একটা কাজ করতে হবে।

বলেন।

সুন্দর সাহেব আমার কুলীর বাজায়ের বাড়িতে যাচ্ছে—তার পিছু পিছু গিয়ে সব দেখেশুনে আসবি—

যে আজ্ঞে—

কিন্তু খুব সাবধান। জানিস তো ওকে—

জগার কুৎসিত মুখে ততোধিক কুৎসিত একটা চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

॥ ৩ ॥

সুতোয় বাঁধা চাবিটা হাতে নিয়ে সুন্দরম্ গদি-ঘর থেকে বের হয়ে আসে। একটি মুহূর্তও আর সে বিলম্ব করবে না। যত শীঘ্র মৃন্ময়ীকে নিয়ে গিয়ে তোলা যায়, ততই বুঝি মঙ্গল। নৌকার মধ্যে ভালভাবে মৃন্ময়ীর চিকিৎসাও হচ্ছে না।

নৌকার কামরার মধ্যে সামান্য জায়গা, নানাবিধ অসুবিধা। অরিন্দমের বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলে কালই একবার সে কানা কবিরাজকে ডেকে নিয়ে যাবে। বলবে, কবরেজ মশাই, যত তাড়াতাড়ি পারো মৃন্ময়ীকে ভাল করে দাও, সুস্থ করে দাও। চিকিৎসা ও ঔষধের জন্য যা দিচ্ছি তা তো দিচ্ছিই, ও ভাল হয়ে উঠলে তোমাকে খুশী করে দেবো।

বহির্মহল অতিক্রম করে যাবার পথে আত্মচিন্তায় বিভোর সুন্দরম্ হঠাৎ

থমকে দাঁড়ায়।

বহির্মহলের একেবারে শেষপ্রান্তে অলিন্দটা প্রায় অন্ধকার বললেও চলে। সামান্য যে একটি দেওয়ালগিরির ব্যবস্থা আছে তার আলো ঐ প্রশস্ত টানা অলিন্দপথটিকে কেমন যেন একটা রহস্যপূর্ণ আলোছায়ায় থমথমে করে রাখে।

অধিক রাত্রে তো ঐ অলিন্দ-পথে একা একা হেঁটে যেতে গায়ের মধ্যে কেমন ছমছমই করে।

হঠাৎ যেন একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসে সুন্দরমের। কান্নার শব্দটা কানে যেতেই সে থমকে দাঁড়ায়। অলিন্দের একধারে আবছা আলো-আঁধারিতে প্রথমটায় নজর না পড়লেও একটু ভাল করে দৃষ্টিপাত করতেই সুন্দরমের নজরে পড়ে আবছায়া একটা মূর্তি।

কেউ দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কাঁদছে যেন অতি সংকোচের সঙ্গে সকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে।

মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেন কি ভাবে সুন্দরম্, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সামনে। কাছাকাছি আসতে নজরে পড়ে আবছা আলো-আঁধারিতে, ষোল-সতের বছরের একটি যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে চোখে হাত দিয়ে।

কে তুমি?

সুন্দরমের গলার সাড়া পেয়ে সে হঠাৎ তার কান্না থামায়, কিন্তু কোন সাড়া দেয় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন?

তবু সাড়া নেই।

কে তুমি?

আমি শিবনাথ।

শিবনাথ!

হ্যাঁ, শিবনাথ লাহিড়ী।

ব্রাহ্মণ?

আজ্ঞে।

এ বাড়িতেই থাক বুঝি তুমি?

আজ্ঞে।

সরকার মশাইয়ের কোন আত্মীয়?

আজ্ঞে না।

তবে?

আশ্রিত। এখানে থেকে পড়াশুনা করি।

পড়াশুনা কর!

আজ্ঞে, মহাত্মা হেয়ারের স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি।

তা বেশ। কিন্তু তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে কেন?

সারাদিন কিছু আহার হয় নি—ক্ষুধায় কাঁদছিলাম।

কথাটা শুনে বিস্ময়ের অবধি থাকে না সুন্দরমের। ষোল-সতের বৎসর বয়স্ক একটি যুবক ক্ষুধার তাড়নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে!

তবু সে শুধায়, এখানে থাক যখন, এখানেই নিশ্চয়ই আহার কর?

তা করি।

তবে!

আমার তো সব পাঠ্যপুস্তক নেই—এক সহাধ্যায়ীর গৃহে তাই প্রত্যহ পড়তে যাই, একত্রে সেখানে দুজনা অধ্যয়ন করি। কয়েক দিন থেকেই ফিরতে রাত হচ্ছিল—

তার পর?

এবং প্রত্যহই এসে দেখি পাচকঠাকুর রন্ধনশালার দ্বার রুদ্ধ করে চলে গিয়েছে। আজও তাই হয়েছে।

তা সরকার মশাইকে কথাটা বল নি কেন?

তিনি যদি রুষ্ট হন!

রুষ্ট হবেন কেন, চল আমার সঙ্গে তুমি, তিনি এখনো হয়তো গদি-ঘরেই আছেন—তোমার হয়ে না হয় আমিই তাঁকে জানাব ব্যাপারটা।

না, না—তার কোন প্রয়োজন নেই। কত দয়া তাঁর, দয়া করে দুঃস্থ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর আশ্রয় না পেলে তো আমার ইংরেজী শিক্ষাই হতো না। শুধু তাই কেন, তিনি দয়া করে মহাত্মা হেয়ারের বন্ধু গৌরমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে না বলে দিলে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ফ্রি ছাত্ররূপে ভর্তি হতেও তো পারতাম না।

বেশ, বেশ—তা তোমার ক্ষুধা পেয়েছিল বলছিলে না?

তা তো পেয়েছিল, তবে সে যা হোক করে রাতটা কেটে যাবে। একটা রাত তো—

কিন্তু কাল রাতেও যদি অধ্যয়ন সেরে গৃহে ফিরতে তোমার দেরি হয়।

তা হলে আর কি করা যাবে!

তা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু এই ভাবে প্রতি রাত্রে উপবাস দিলে যে ক্রমশই দেহ

তোমার দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল শরীরে অধ্যয়ন করবে কি করে?

তা অবিশ্যি ঠিকই, কিন্তু উপায় কি?

তুমি আমার গৃহে যাবে?

আপনার গৃহে!

হ্যাঁ, আমার গৃহে। সেখান থেকে তুমি স্কুল করবে, পড়াশুনা করবে।

কিন্তু—

কি? বল?

আপনাকে তো আমি চিনি না।

তা ঠিক। তবে সরকার মশাইকে কি তুমি এখানে আসবার পূর্বে চিনতে?

না।

তবে আমাকে না চিনলেই বা তোমার ক্ষতি কি! দেখ যদি রাজী থাক তো কাল তুমি যে কোন সময় আমার গৃহে যেতে পারো। আমার গৃহে বেশী লোকজনের ভিড় নেই, আমি আর আমার স্ত্রী—স্ত্রী আমার অসুস্থ। বেশ বড় বাড়ি। তোমার সেখানে কোনরূপ কষ্ট হবে না।

সরকার মশাইকে তাহলে জিজ্ঞাসা করবো।

তা করতে চাও করো। তবে একটা কথা তোমার জানা দরকার শিবনাথ।

কি বলুন?

আমি কিন্তু ব্রাহ্মণ নই।

আপনি ব্রাহ্মণ নন?—

না। জাতে আমি পর্তুগীজ। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—পৃথক ঘরে তুমি থাকবে এবং রন্ধনের জন্য আমি পাচকের ব্যবস্থা করবো। সেই তোমার দুবেলা রন্ধনাদি করে দেবে—

তবে আর কি—

তা হলে তুমি সরকার মশাইকে বলে তাঁর কুলীর বাজারে যে বাগানবাড়ি আছে সেখানে চলে যেও,—হ্যাঁ একটা কথা।

কি!

তুমি আমার নাম তাঁকে করতে পারো। আমার নাম সুন্দরম্। সবাই আমাকে সুন্দর সাহেব বলে।

আমি সরকার মশাইকে শুধিয়ে যা তিনি পরামর্শ দেবেন তাই করবো।

তাই করো। কিন্তু আজ রাত্রে তো তোমার কিছু খাওয়া দরকার। আমার

সঙ্গে যদি তুমি আসো, আমি তোমার আহারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। যাবে আমার সঙ্গে?

কত দূরে যেতে হবে?

বেশী দূর নয়। কাছেই—

বেচারী শিবনাথের সত্যিই বড় ক্ষুধা পেয়েছিল। সে আর আপত্তি করে না। বলে, যাবো—

তবে এসো আমার সঙ্গে।

শিবনাথ সুন্দরমের পিছনে পিছনে এগিয়ে চলে।

পথ তখন প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। লোক-চলাচল একপ্রকার নেই বললেই চলে। রাতটাও অন্ধকার, কৃষ্ণপক্ষ।

তবে আকাশে তারা থাকায় স্তিমিত একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আকাশ থেকে। সেই আলোতেই দুজনে হেঁটে চলে। কিছুদূর এগিয়ে একটা অপ্রশস্ত গলিপথের মধ্যে প্রবেশ করে সুন্দরম্ একটা চালাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

বাইরে ঝাঁপ ফেলা। বাঁশের চাঁচাড়ির ঝাঁপ, ফাঁকে ফাঁকে একটা মৃদু আলোর আভাস আসছে। বোঝা গেল ভিতরে আলো জ্বলছে তখনও।

ঝাঁপের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরম্ ডাকে, মোতির মা! অ মোতির মা!

কে?

ভিতর থেকে সাড়া এলো।

ঝাঁপটা খোল মোতির মা। আমি সুন্দর সাহেব।

বিশেষ ঐ নামটার সঙ্গে বৃদ্ধা মোতির মা'র কি পরিচয় ছিল কে জানে, বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঝাঁপটা খুলে গেল।

ছোটখাট একটা দোকান—মুড়ি, চিঁড়ে, মেঠাই ইত্যাদির।

একপাশে একটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে। তারই আলোয় জায়গাটা মৃদু আলোকিত। মোতির মা'র বয়স যদিও হয়েছে, তথাপি এখনো বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথার চুলগুলি পেকে প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি একটা জলচৌকি এগিয়ে দেয় মোতির মা, বসো সাহেব, বসো—

না মোতির মা, বসবো না।

এতক্ষণে মোতির মা'র সুন্দরমের পাশেই দণ্ডায়মান শিবনাথের উপর নজর পড়ে। কেবল মোতির মা'র কেন, সুন্দরমেরও এই প্রথম যেন নজর পড়লো শিবনাথের ওপরে।

রোগাটে গড়ন, খুব বেশী লম্বা নয়। টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ। মাথাভর্তি

কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে কাঁধের ওপরে নেমে এসেছে।

পরিধানে একটি মলিন ধুতি ও গায়ে একটি বেনিয়ান।

মুখখানা যেন শিবনাথের একেবারে পটের ছবি।

প্রশস্ত ললাট—বঙ্কিম ভ্রূ-যুগলের নীচে টানা টানা দুটি চক্ষু। তীক্ষ্ণ নাসা। কোমল চিবুক।

মোতির মা এবং সুন্দর সাহেব দুজনাই একদৃষ্টে তাকিয়েছিল যুবক শিবনাথের দিকে। মোতির মা-ই প্রথমে প্রশ্ন করে, সঙ্গে এ কে সাহেব?

ছেলেটি ব্রাহ্মণসন্তান, ক্ষুধার্ত—এর জন্য কিছু ফলারের যোগাড় করে দিতে পারো মোতির মা?

সে কি! কেন পারবো না? চিঁড়ে আছে, দুধ আছে, কলা আছে, এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

কুর্তার পকেট থেকে একটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে মোতির মা'র হাতে দিতে যায় সুন্দরম্, তাহলে ওকে পেট ভরে ফলার করিয়ে দাও—

কিন্তু ওটা কি দিচ্ছ সাহেব!—মোতির মা হাত সরিয়ে নেয়, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ সন্তানকে একটু ফলার করাবো তার জন্য মূল্য নেব—পোড়া কপাল আমার—

না, না—আমি যখন দিচ্ছি কেন নেবে না।

না সাহেব। ও-কথা বলো না, বামুনের ছেলের ক্ষিধে পেয়েছে দুটো খেতে দেবো, তার জন্য মূল্য নিয়ে কি নরকে যাবো! তাছাড়া তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো সাহেব। না, না—ও কথা বলো না।

সুন্দরম্ হাসে। বলে, বেশ, না নাও নিও না—ওকে খেতে দাও।

চল গো ঠাকুর, ও-দিকে ভিতরে জল আছে, হাত-মুখ ধুয়ে এসো—সব দেখিয়ে দিচ্ছি, যোগাড় করে বসে পড়ে।

মোতির মা তাগিদ দেয়।

তাহলে আমি চলি শিবনাথ। তবে তোমাকে যা বলছিলাম, যদি আমার ওখানে গিয়ে থাকতে চাও তো চলে যেও।

সুন্দরম্ চলে গেল।

সব গোছগাছ করে নিয়ে শিবনাথ ফলারে বসে।

কিছু দূরে বসে বসে দেখে মোতির মা।

বেচারীর বোধ হয় সত্যিই খুব ক্ষুধা পেয়েছিল, গোগ্রাসে খেয়ে চলে।

শালিধানের মিহি সুগন্ধি চিঁড়া, পুরুষ্টু পাকা মর্তমান কদলী—দুধ—ফুল বাতাসা—

পরিতৃপ্তির সঙ্গে কলার করে শিবনাথ।

একসময় মোতির মা শুধায়, তা ঠাকুর, ঐ সুন্দর সাহেবের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কি করে?

ওকে তো আমি চিনি না।

চেনো না!

না।

তবে ওর সঙ্গে এলে!

উনি নিয়ে এলেন ডেকে সঙ্গে করে আমাকে সরকার মশাইয়ের গৃহ থেকে।

তা ঠাকুরের কোথায় থাকা হয়?

অরিন্দম সরকার মশাইয়েরই গৃহে থাকি।

তিনি কি তোমার আত্মীয়?

না। আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

পড়াশুনা করছো বুঝি?

হ্যাঁ—হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি।

সংসারে কে আছেন?

কেউ নেই।

মা-বাপ?

না—তাঁরা অনেক দিন স্বর্গে গিয়েছেন।

আহা রে—তা আর কেউ নেই?

আছেন মামা-মামী।

তা দেখো ঠাকুর, দোকানটা তো এবার চেনা হয়ে গেল তোমার, ক্ষুধা পেলেই যখন খুশি এখানে চলে এসো, কেমন?

আসবো?

হ্যাঁ, আসবে বৈ-কি! এসো, কেমন?

আচ্ছা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সেই রাত্রেই সুন্দরম্ মৃন্ময়ীকে নিয়ে এসে অরিন্দম সরকারের কুলীর বাজারের গৃহে তুলল।

বলতে গেলে একেবারে গঙ্গার তীরেই গৃহ।

জায়গাটি খুবই নির্জন এবং তেমন জনবসতি নেই কোন বললেই চলে। কয়েক ঘর যা বাসিন্দা আছে আশপাশে ছড়ানো, তারা কেউ-ই উচ্চবর্ণের নয়।

জেলে, কুমোর, কামার ইত্যাদি।

তবে কিছুটা এগিয়ে গেলে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ কায়েতের বসতি আছে।

প্রায় বিঘা দুই জায়গা নিয়ে আমকাঁঠালের বাগান ও তার মধ্যে একটি পাকা গাঁথুনির গৃহ। গোটা চারেক কামরা।

তবে কামরাগুলো বেশ প্রশস্ত।

নৌকার কামরার মধ্যে এতটুকু স্থান, মৃন্ময়ীকে এনে তোলবার পর সেখানে যেন আর পা ফেলবারই জায়গা ছিল না। বিশেষ করে সুন্দরমের লম্বাচওড়া চেহারা, তার নড়েচড়ে বসতেও ঐ স্বল্পপরিসর কামরার মধ্যে অসুবিধা হচ্ছিল। আরো বেশী অসুবিধা হচ্ছিল, শয্যার। একটিমাত্র শয্যা কামরার মধ্যে, তাও অধিকার করেছিল মৃন্ময়ী। সুন্দরম্‌কে কামরার একপাশে কোন মতে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে রাতটা কাটাতে হচ্ছিল, অরিন্দম সরকারের বাড়িতে এসে উঠে, প্রশস্ত ঘরের মধ্যে মনটা যেন মুক্তির আনন্দে পাখা মেলে দেয়।

তা ছাড়া এতকাল সুন্দরমের নৌকার মধ্যে জলে জলেই কেটেছে।

জল আর চারিদিকে উন্মুক্ত আকাশ বন্ধনহীন মুক্তির একটা স্বাদ ছিল বটে, কিন্তু তবু তার মধ্যে যেন কোথায় ছিল অদৃশ্য দাগকাটা একটা সীমানা।

নৌকার সীমানা। যে সীমানাটা পার হলেই শুধু জল আর জল। নিশ্চয়তা নেই যেখানে, নেই যেখানে বিশ্বাস, নেই কোন অবলম্বনের নিশ্চিন্ত আশ্বাস বা তৃপ্তি। একঘেয়ে স্বাদহীন বৈচিত্র্যহীন শুধু অনিশ্চিত জলের ব্যাপ্তি। এবং যার মধ্যে সে ক্রমশঃই নিজের অজ্ঞাতে যেন হাঁপিয়ে উঠছিল।

হাঁপিয়ে উঠছিল সুন্দরম্‌ আরো একটা কারণে। স্বাদহীন, ছন্দহীন একঘেয়ে একক জীবনের ক্লান্তি, কেমন যেন তাকে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন করে ফেলছিল ইদানীং। কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য ভাবনা মধ্যে মধ্যে তার মনের চারপাশে এসে তাকে যেন উদাস বিষণ্ণ করে দিচ্ছিল। বাধাহীন বেপরোয়া যে জল-জীবনটা একদিন তাকে উগ্র একটা নেশায় বুঁদ করে রেখেছিল, সে নেশাটা যেন কেমন তরল হয়ে এসেছে। বিশেষ করে গভীর রাত্রে একাকী ভাসমান নৌকার কামরার মধ্যে মনে হতো সুন্দরমের, সে বড় একা। কেউ যেন নেই তার কোথাও।

একটু স্নেহ, একটু মিষ্টি কথার জন্য মনটা যেন তার কেমন কাঙাল হয়ে

উঠতো। মনে হতো এইভাবে জলে জলে ভেসে বেড়ানোর চাইতে শক্তমাটির ওপরে ছোট্ট একটি ঘরেও যদি সে রাত কাটাতে পারত কিম্বা চলে যেতে পারত মা ভায়লার কাছে।

এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তটিতে যদি কেউ তার পাশে থাকত, তবে বুঝি এমনি করে সে হাঁপিয়ে উঠতো না। মনের মধ্যে যখন ঠিক এমনি একটা দ্বন্দ্ব চলেছে, তার জীবনে এলো মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ীকে সুন্দরম্ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিল হঠাৎ দেখে মুগ্ধ হয়ে নিতান্তই একটা ঝোঁকের মাথায়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যই সেদিন তার মনের মধ্যে ছিল না। কিন্তু লুণ্ঠন করে আনবার পর নৌকার কামরার আলোয় মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকাবার পরই হঠাৎ যেন তার মনে হয়েছিল, অনেক লুণ্ঠন ইতিপূর্বে সে করেছে কিন্তু এমন একটি বস্তু জীবনে এই প্রথম সে লুণ্ঠন করে নিয়ে এলো।

নানা বয়সের স্ত্রীলোক সে ইতিপূর্বে বহু দেখেছে, কিন্তু মৃন্ময়ী যেন সেই দেখার মধ্যে পড়ে না। মৃন্ময়ী যেন একান্ত স্বতন্ত্র, যেন একটা বিস্ময়।

তারপর জ্বরের ঘোরে মৃন্ময়ী আচ্ছন্ন হলো। আর তার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে সেই বিস্ময়টা যেন ক্রমশঃ অপূর্ব এক মমতায়, অপূর্ব এক স্নেহে রূপান্তরিত হয়ে সুন্দরমের সমস্ত মনটাকে ভরিয়ে তুলল।

এদিকে মৃন্ময়ীকে পেয়ে তার মনের দুঃসহ একাকীত্বটা কখন যে ভরাট হয়ে উঠেছিল সুন্দরম্ নিজেও জানতে পারে নি।

মৃন্ময়ীকে যেন সুন্দরম্ দুহাতে আঁকড়ে ধরল।

পরের দিন বিকালের দিকে সুন্দরম্ গিয়ে কানা কবিরাজের গৃহে হাজির হলো।

সেদিন আবার সকাল থেকেই কি একটা তুচ্ছ কারণে ভিষগ্‌রত্ন ও জগদম্বার মধ্যে কলহের শুরু হয়েছিল।

সুন্দরম্ যখন গিয়ে ভিষগ্‌রত্নের গৃহে পৌঁছাল তার কিছুক্ষণ আগেই সে একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে জগদম্বাকে তাড়া করায়, জগদম্বা তার হাত থেকে সেই কাঠটা ছিনিয়ে নিয়ে ভিষগ্‌রত্নকেই বেশ করে উত্তমমধ্যম দিয়েছিল।

জগদম্বার হাতে প্রহৃত হয়ে আক্রোশে ও মনের দুঃখে অসময়েই ঘরের সামনে বারান্দায় কারণের পাত্রটি নিয়ে বসেছিল কানা কবিরাজ।

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সুন্দরমের গলা শোনা গেল, ঠাকুর মশাই আছেন নাকি?

এবং সুন্দরম্ বরাবর সাড়া দিয়েই সোজা এসে একেবারে দুয়ার ঠেলে ভিতরে

এসে প্রবেশ করত, আজও তাই করে।

ঠাকুর মশাই!

খিঁচিয়ে ওঠে এবারে ভিষগ্‌রত্ন, কেন? দেখতেই তো পাচ্ছ এখানে আছি। প্রয়োজনটা কি বলে ফেল।

ঠাকুর মশাই I am সুন্দরম্‌।

সুন্দরম্‌ এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আব্‌ছা আঁধার একটু একটু করে চারিদিকে জমাট বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল। সুন্দরমের প্রথমটায় নজর পড়ে নি, কিন্তু এতক্ষণে নজর পড়লো—দাওয়ায় কারণপাত্র সামনে রেখে ভিষগ্‌রত্ন বসে।

ঠাকুর মশাই, আমার wifeকে একটিবার দেখতে যেতে হবে।

পারবো না।

চলুন ঠাকুর মশাই, একটিবার তাকে আবার ভাল করে দেখে ব্যবস্থা করে দিন—

না। পারবো না।

যা টাকা চান পাবেন, চলুন।

না, না, না—নিকালো হিঁয়াসে—

হঠাৎ একটা কথা ঐ সময় সুন্দমের মনে পড়ে যায়। মুহূর্তকাল কানা কবিরাজের দিকে তাকিয়ে থেকে সুন্দরম্‌ বলে, তা ঐ country liquor গিলছেন কেন! চলুন ভাল গুড্‌ শ্যাম্পেন আর শেরি আছে আমার কাছে, দেবো—

সাপের মাথায় যেন ধুলোপড়া পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

বললেন, সত্যি বলছিস তো বেটা! ধোঁকা দিচ্ছিস না তো?

আজ্ঞে না, চলুন না—

রীতিমত সেয়ানা কানা কবিরাজ। বলে, শুধু ঐ দিলে হবে না, ঐ সঙ্গে টাকাও দিতে হবে কিন্তু—

পাবেন তাও, চলুন। হেসে বলে সুন্দরম্‌।

কয় বোতল দিবি?

টু বটলস্‌।

ঠিক তো!

প্রমিস্‌—

তবে চল—

ভিষগ্‌রত্ন উঠে দাঁড়ালেন।

এদিকে সেই দিন সন্ধ্যারাত্রে গদি-ঘরে, চৌকির ওপরে বসে আলবোলার নলটি হাতে অরিন্দম সরকার সম্মুখে দণ্ডায়মান জগার দিকে চেয়েছিলেন।

একটু পরে বললেন, সত্যি?

আজ্ঞে কর্তা।

মেয়েটা সত্যি বলছিস সুন্দরী!

যাকে বলে ডানাকাটা পরী কত্তা।

বয়স কত হবে বলে মনে হয়?

তা চোদ্দ-পনের হবে।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে কেন?

তা বলবো কি করে। বোধ হয় অসুখ—

হুঁ।

অরিন্দম সরকার কি যেন ভাবতে লাগলেন।

॥ ২ ॥

সেদিন সুন্দর সাহেব শিবনাথকে যে কথাটা বলেছিল কিছুতেই যেন শিবনাথ সে কথাটা ভুলতে পারে না।

অদম্য একটা জ্ঞানার্জনের স্পৃহা, বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষালাভের স্পৃহা নিয়েই মাতুল অম্বিকাপ্রসাদের সঙ্গে সে কলকাতা শহরে এসেছিল এবং অম্বিকা-প্রসাদের শিষ্য অরিন্দম সরকারের গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল এবং এ কথাটাও সত্যি যে তারপর সে সরকার মহাশয়ের সাহায্য না পেলে তার পক্ষে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

তখনকার দিনে সরকার মশাই যে একজন কেবল কলকাতা শহরেরই ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন তাই নয়, তাঁর প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল সমাজে সর্বত্র।

তাই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর পরিচিত গৌরমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ধরে মহাত্মা হেয়ারের স্কুলে শিবনাথকে ফ্রি ছাত্ররূপে ভর্তি করে দেওয়া। এবং শুধু ভর্তি হলেই তো হবে না, সরকার মশাই তাকে আশ্রয় দিয়ে তার লেখাপড়া শিখবার যাবতীয় ব্যয় বহন না করলেও তার পড়াশুনা হতো না।

অবিশ্যি এটা ঠিকই সরকার মহাশয়ের পক্ষে তাঁর বিরাট ভবনে বহু আত্মীয়, অনাত্মীয় আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে কারো ওপরে নজর রাখা সম্ভবপর ছিল না। এবং সেক্ষেত্রে সুন্দর সাহেবের মত একজন দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে যেতে পারলে যে শিবনাথের যথেষ্ট সুবিধা হবে লেখাপড়ার,

সেটাও বুঝতে পেরেছিল সে।

অথচ সে যদি সুন্দর সাহেবের গৃহে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেই কারণে যদি সরকার মহাশয় অসন্তুষ্ট হন, সেক্ষেত্রে যেমন তার লজ্জা ও মনঃকষ্টের অবধি থাকবে না সেটাও যেমন তার এক চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, তেমনি আরো একটি চিন্তারও কারণ হয়েছিল, সুন্দর সাহেব পর্তুগীজ, বিধর্মী, আর সে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তান, তার গৃহে গিয়ে স্থান নিলে লোকে যদি তাকে সমাজচ্যুত করে!

তরুণ শিবনাথ বেচারী কি করবে ভেবে পায় না।

একদিকে জাতের ভয়, সমাজের ভয় ও সেই সঙ্গে এত সাধের তার শিক্ষা-ব্যবস্থা, কোন কারণে যদি তা অর্ধপথেই নষ্ট হয়ে যায় তবে যে জীবনই বৃথা এবং অন্য দিকে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সম্ভাবনা।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি ইংরাজী শিক্ষার অদম্য স্পৃহাই তাকে সুন্দরমের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল।

যেমন করে হোক ইংরাজী তাকে আয়ত্ত করতেই হবে।

কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত অবিশ্যি ইংরাজী শিক্ষা আজকের মত এমনি অপরিহার্য হয়ে ওঠে নি। কিন্তু আজকের দেশের লোক বুঝতে পেরেছে সবার মন থেকে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে হলে একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার দ্বারাই তা সম্ভবপর।

টোলে এবং পাঠশালায় সংস্কৃতচর্চা করে বা মৌলভীর কাছে কিছু ফার্সী চর্চা করে যে কিছু হবে না সেকথা আজ দেশবাসী বুঝতে পেরেছে।

জ্ঞানচক্ষু অবিশ্যি দেশবাসীর ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়েছিল বহু বৎসর ধরেই।

এ দেশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে পাকাপোক্তভাবে যাওয়ার পর থেকে যত এদেশে ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং ক্রমশ যত রাজ্য পরিচালনার জন্য শাসনকার্যের সুবিধাতে আইন-আদালতের সৃষ্টি হতে লাগল, এখানে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের ভিড়ও তত বাড়তে লাগল।

বিশেষ করে কলকাতা শহরে ইংরাজ বণিকদের যত বাণিজ্য বিস্তার লাভ করতে লাগল, সেই সূত্রে এদেশীয় লোকের মেলামেশাও তাদের সঙ্গে তত বেড়ে চলে। এবং বাণিজ্যের ব্যাপারে এদেশের লোকদের ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তারা ক্রমশ বুঝতে পারছিল, ইংরাজী শিক্ষা ব্যতিরেকে ওই বিদেশী ইংরাজ শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে তারা তো চলতেই পারবে না, অন্যান্য ব্যাপারেও বিশেষ সুবিধা হবে না। এবং ঐ সময় ইংরাজ-বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে

বিশেষ ভাবে যারা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল নানা দিক দিয়ে, তারা দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। তাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনেই প্রথম তাদের ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা দেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

আদিপর্বে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার মূলে ছিল দুটি সংস্থা। একটি কলকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরে শ্রীরামপুরে কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের খৃষ্টধর্ম প্রচার সংস্থা ও খৃষ্টানধর্মাবলম্বীদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদপ্রচেষ্টা। দ্বিতীয়, বিলাত থেকে যে সব সিবিলিয়ান কর্মচারীরা শাসনকার্যের জন্য এদেশে আসতো তাদের এদেশীয় ভাষা, রীতিনীতি ও এদেশীয় লোকেদের চরিত্র ও মনোভাব বুঝবার জন্য তাদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী স্থাপিত এ শহরের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহায্যে যেমন একদিকে পরোক্ষ ভাবে এদেশে ইংরেজদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা চলতে লাগল, তেমনি অন্যদিকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ছেলেরা যাতে ইংরাজী ভাষা শিখতে পারে তারই চেষ্টায় কলকাতা শহরের জায়গায় জায়গায় ইংরাজী স্কুল গড়ে উঠতে লাগলো।

চিৎপুরে সার্বরন সাহেবের স্কুল, আমড়াতলায় মার্টিন বাউলের স্কুল, আরটুন পিট্রাসের স্কুল একে একে গড়ে ওঠে অমনি করেই।

গড়ে উঠলো কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, এবং তারও অনেক পর কলকাতা শহরে হিন্দু কলেজের পত্তন হলো।

সেটা হচ্ছে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী।

দেশবাসীর মনে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। সেই প্রয়োজনীয়তাতেই মহাত্মা হেয়ারের উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে পর-বৎসরই অর্থাৎ ১৮১৮, ১লা সেপ্টেম্বর স্কুল সোসাইটি নামে একটি সভা গঠিত হয়।

সম্পাদক হলেন ডেভিড্ হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব।

স্কুল সোসাইটির কাজ হলো কলকাতা শহরে জায়গায় জায়গায় নতুন ভাবে ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল স্থাপনা করা।

নতুন নতুন স্কুল গড়ে উঠলো ঠনঠনিয়া, কালীতলা এবং আরপুলী প্রভৃতি জায়গায় জায়গায়। শিবনাথ পড়ছিল হেয়ারের কলুটোলার ব্রাঞ্চ স্কুলে।

অরিন্দম সরকারের বাড়ি চেতলায়, সেখান থেকে প্রত্যহ পদব্রজে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে শিবনাথকে যেতে হয় কলুটোলার ব্রাঞ্চ স্কুলে।

প্রত্যহ যাতায়াত করতেই কম সময় যায় না। অতখানি পথ যাতায়াত করে রাত্রের দিকে শিবনাথ এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে পড়তে বসলে সহজেই দুচোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসে।

পাঠ্যপুস্তকও শিবনাথের সব ছিল না। সে কারণে স্কুলের পরে আবার বড়-বাজারে সহাধ্যায়ী নরেন্দ্রের কাছে যেতে হতো।

প্রায় প্রত্যহই বড়বাজার অঞ্চলে নরেন্দ্রের গৃহে যেতে হতো বলে রাত করে তাকে গৃহে ফিরতে হতো।

যে সময় সাধারণতঃ পাঠ-অভ্যাস করে সে গৃহে ফিরত, সরকার মশাইয়ের গৃহে খাওয়াদাওয়ার পাট প্রায়ই সে সময় চুকে যেতো। তাই অনাহারেই রাতটা কাটাতে হতো তাকে, বেশীর ভাগ রাতই।

প্রায়ই উপবাস দিতে দিতে শিবনাথ যে দুর্বল হয়ে পড়ছিল ক্রমশঃ—কথাটা মিথ্যা নয়। মিথ্যা বলে নি সুন্দর সাহেব। এভাবে উপবাস দিলে যে সে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়বে, তাহলে পড়াশুনা করবে কি করে।

সুন্দর সাহেব যেভাবে আশ্বাস দিয়ে গেলেন তাতে করে তাঁর গৃহে আশ্রয় পেলে সেদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সপ্তাহখানেক শিবনাথ নানা ভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করলো, কিন্তু কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

সরকার মশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যে কথাটা বলবে সে সাহসও হয় না। যদি সরকার মশাই অসন্তুষ্ট হন! যদি তিনি তাকে তিরস্কার করেন! পরামর্শ দেবার মতও তো কেউ নেই। নচেৎ পরামর্শ একটা নেওয়া যেতো। মাতুলের কথা শিবনাথের মনে হয় নি যে তা নয়। কিন্তু সেখানে যেতে কেন জানি সাহস হয় নি।

আসলে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলার মত সাহসই ছিল না শিবনাথের মনে। নচেৎ ভেবেছে কতবার, আর কাউকে না হোক অন্ততঃ দয়ার অবতার হেয়ার সাহেবকে সে কথাটা বলবে।

হেয়ার সাহেব কতজনের কত ব্যবস্থা করে দেন, তারও হয়ত একটা ব্যবস্থা করে দিতেন তার কথা সব শুনলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সাহসও পায় নি। শুধু সাহস পায়নিই নয় মহাত্মা হেয়ারকে সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত করতেও মন তার সায় দেয় নি।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁকেও সে বলতে পারে নি কিছু।

ফলে পূর্বের মতই তার বেশীর ভাগ দিন উপবাসেই কাটতে লাগল।

এমনি করে আরো মাসখানেক কেটে গেল।

প্রত্যহ সকালের দিকে পাল্কীতে চেপে হেয়ার সাহেব তার স্কুলগুলি পরিদর্শন করতে আসতেন। সেদিন একটু দেরি হয়েছিল শিবনাথের স্কুলে আসতে হেয়ার সাহেবের।

সেদিন শিবনাথের স্কুলে পৌছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।

আগের রাত্রি উপবাস গিয়েছে এবং সেদিনটা ছিল আবার অরন্ধন। সরকার মশাইয়ের গৃহে রন্ধনাদি হয় নি।

কাজেই সকালেও সেই উপবাসের পর খালি পেটে ক্ষুধার্ত শিবনাথ দীর্ঘপথ হেঁটে আসতে আসতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

বেচারীর পা দুটো যেন আর চলছিল না।

স্কুলের সামনে যখন এসে পৌছাল, স্কুল বসে গিয়েছে।

ভয়ে ভয়ে সে স্কুলে ঢুকতে যাবে হেয়ার সাহেবের পাল্কী-বেহারাদের হুম্ হুম্ শব্দে চমকে একপাশে সরে দাঁড়াল।

হেয়ার সাহেবের পাল্কী দেখে তার ভয়ও হয়েছিল।

কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী হেয়ার সাহেব।

এখুনি হয়ত শুধাবেন তার দেরি হলো কেন।

হলোও তাই, শিবনাথের প্রতি হেয়ার সাহেবের নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেয়ার সাহেব পাল্কী থামিয়ে পাল্কী থেকে নামলেন।

হেয়ার সাহেবের অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল।

তাঁর স্কুলের, বিশেষ করে ফ্রি ছাত্রদের কারো নামই তিনি ভুলতেন না। প্রত্যেককেই তাঁর মনে থাকত।

হেয়ার সাহেব ডাকলেন, শিবনাথ, এদিকে আইস!

ধীরে কুণ্ঠিত পদে সে ডাকে শিবনাথ হেয়ার সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল মাথা নীচু করে।

স্কুলে আসতে তোমার এত বিলম্ব কেন শিবনাথ?

শিবনাথ চুপ করে থাকে।

হেয়ার সাহেব শিবনাথের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

শিবনাথের অনাহারক্লিষ্ট মুখখানি হেয়ারের দৃষ্টি বুঝি আকর্ষণ করে।

হেয়ার শুধান, কি হইয়াছে শিবনাথ? তোমার মুখ এত শুষ্ক কেন? কোন

অসুখ হয় নাই তো!

ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শিবনাথ ঐ স্নেহভরা কথাগুলিতে আর অশ্রু রোধ করতে পারে না।

তার শীর্ণ শুষ্ক গাল বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

কি হইয়াছে শিবনাথ?

হেয়ার এগিয়ে এসে সাগ্রহে শিবনাথের স্কন্ধে একখানি হাত রাখলেন।

বল শিবনাথ, কি হইয়াছে?

শিবনাথ তখন ধীরে ধীরে সব কথাই বললে।

হেয়ার সাহেব তো অবাক।

বলেন, বল কি! কাল রাত হইতে তুমি উপবাসী! আইস— চল আমার সঙ্গে।

কিন্তু স্কুল যে বসে গিয়েছে—

বসুক—চল—

হেয়ার সাহেব শিবনাথকে তাঁর পাল্কীতে তুলে নিয়ে সর্বাগ্রে গেলেন এক মিঠাইওয়ালার দোকানে। সেখানে পেট ভরে ক্ষুধার্ত শিবনাথকে খাওয়ালেন।

তারপর তাকে সঙ্গে করে নিজে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

যাবার সময় বলে গেলেন, কাল তুমি স্কুলের ছুটির পর আমার বাসায় যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। কেমন শিবনাথ!

শিবনাথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

পরের দিন যথাবিধি শিবনাথ হেয়ার সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করল।

সুন্দর সাহেবের প্রস্তাবের কথা আগের দিনই শিবনাথ হেয়ার সাহেবকে বলেছিল।

হেয়ার সাহেব কয়েকটি স্কুলের বালককে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর বাইরের ঘরে বসে। শিবনাথকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, আইস শিবনাথ, বসো। একটু অপেক্ষা কর। ইহাদের পাঠ বুঝাইয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিব।

শিবনাথ এক পাশে চুপচাপ বসে হেয়ার সাহেবের পড়ানো শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা বিদায় নেবার পর হেয়ার সাহেব বললেন, দেখ শিবনাথ, আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার আপাতত ওই সুন্দর সাহেবের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

সেখানেই যাবো?

হ্যাঁ। ইতিমধ্যে আমি তোমার জন্য অন্য একটি আশ্রয়ের অনুসন্ধানে থাকিব। আশ্রয় মিলিলেই তোমাকে আমি সংবাদ দিব।

আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন।

আমার ইচ্ছা তাই তুমি করো।

শিবনাথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

অতঃপর হেয়ার সাহেব শিবনাথের পড়াশুনা সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নাদি করতে শুরু করেন।

কথায় কথায় রাত হয়ে গিয়েছিল হেয়ার সাহেবের খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ খেয়াল হতেই ত্রস্তে উঠে দাঁড়ান, ইস্, অনেক রাত হইয়া গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তো তোমার আহারও কিছু হয় নাই। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছ। চল—আগে কিছু আহার করিয়া লইবে—তারপর আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিব।

শিবনাথ বলে, না, না–তার কোন প্রয়োজন নেই, আমি একাই চলে যেতে পারবো।

হেয়ার সাহেব বলেন, তা হয়ত পারিবে কিন্তু আমি তোমাকে এই রাত্রে একাকী এই দীর্ঘ পথ যাইতে দিতে পারি না।

সে রাত্রে মিঠাইওয়ালার কাছ থেকে শিবনাথকে পেট ভরে খাইয়ে সরকার মশাইয়ের গৃহে সঙ্গে করে এনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন হেয়ার সাহেব।

পরের দিনটা ছিল রবিবার।

স্কুল বন্ধ।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর শিবনাথ গৃহ থেকে বের হয়ে কুলীর বাজারের উদ্দেশে চললো।

হেয়ার সাহেব পরামর্শ দেওয়ায় যেন শিবনাথ মনের মধ্যে জোর পায়।

সুন্দর সাহেবের গৃহেই সে আশ্রয় নেবে স্থির করেছে। কিন্তু তার পূর্বে সুন্দর সাহেবের সঙ্গে তার একবার দেখা হওয়া দরকার। সেদিন সুন্দর সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কথাটা তাকে বলেছিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর মতের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটাও তো তার জানা দরকার।

কুলীর বাজারে সরকার মশাইয়ের বাগানবাড়িতে শিবনাথ যখন গিয়ে পৌঁছালো, শীতের রৌদ্র অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে।

পায়ে পায়ে গিয়ে বাগানবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল শিবনাথ।

বাড়িতে ঢুকবার মুখেই পাশাপাশি দুটো সুউচ্চ নারিকেল গাছ। তারই একটার মাথায় একটা চিল বসে মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ ডেকে উঠছে। শীতের অপরাহ্ণের স্তব্ধতায় সে ডাক বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা শান্ত স্তব্ধতা যেন চারিদিকে।

একটু অগ্রসর হতেই একটা জামরুল গাছ চোখে পড়ে, পীতবর্ণের পাতাগুলো মন্থর শীতের হাওয়ায় টুপটাপ করে খসে পড়ছে।

সামনেই চোখে পড়ল শিবনাথের বিরাট একটা দরজা, হা-হা করছে খোলা।

এদিক ওদিক তাকাল শিবনাথ, কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ল না।

একটা মানুষও তো দেখছে না শিবনাথ, কেউ নেই নাকি ?

মুহূর্তের জন্য বুঝি থমকে দাঁড়ায়।

নারিকেল গাছের মাথায় চিলটা যেন থেকে থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠছে।

কিছুক্ষণ খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় পায়ে পায়ে ভিতরে প্রবেশ করল শিবনাথ।

সামনেই একটা টানা বারান্দা।

পশ্চিম দিক থেকে অপরাহ্ণের খানিকটা সূর্যের আলো সেই বারান্দার ওপরে এসে পড়েছে।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল শিবনাথ।

তাকাতে তাকাতেই নজরে পড়ে পশ্চিম দিকেরই একটা ঘরের দরজা খোলা।

সেইদিকেই অতঃপর এগিয়ে যায় শিবনাথ।

খোলা দরজা-পথে উঁকি দিতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল শিবনাথের।

ঘরের মধ্যে জানালা ঘেঁষে একটি পালঙ্ক, সেই পালঙ্কের ওপরেই শুয়ে আছে একটি মেয়ে।

মেয়েটি একদৃষ্টে দরজার দিকেই নিঃশব্দে তাকিয়েছিল। ছোট একটি উপাধানের ওপরে মাথাটা রেখে তাকিয়ে ছিল মেয়েটি দরজার দিকে।

শীর্ণ শুষ্ক এক স্তবক ফুলের মতই যেন মনে হচ্ছিল মুখখানি মেয়েটির। কি এক বিষণ্ণ বেদনার ক্লান্তি সেই শীর্ণ মুখখানিতে ছড়িয়ে রয়েছে। রুক্ষ কেশভার গুচ্ছে গুচ্ছে উপাধানের দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

শয্যায় শায়িতা একমাত্র ঐ মেয়েটি ছাড়া ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় আর কোন প্রাণী ছিল না। পশ্চিমের জানালা-পথে অপরাহ্ণ সূর্যের খানিকটা আলো মেয়েটির শয্যার ওপরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

গায়ের উপরে একটা সূক্ষ্ম কারুকাজ করা পশমের চাদর। কটিদেশ পর্যন্ত

চাদরটা টানা। শয্যার পাশেই একখানি হাত ন্যস্ত। মোমের মতই সাদা হাতটা।

দুজনে দুজনার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কারো মুখে কোন শব্দ নেই।

তারপর এক সময় নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে পায়ে পায়ে খোলা দরজা-পথে শিবনাথ ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে, নিজেও বুঝি বুঝতে পারে নি।

হঠাৎ এক সময় শীর্ণ অথচ পাতলা ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে মেয়েটির। ক্ষীণ ক্লান্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, তুমি কে?

আমি শিবনাথ!

মেয়েটির ডাগর দুটি কৃষ্ণ-কালো চক্ষুতারকা অশ্রুতে মনে হয় যেন টলমল করছে।

তুমি?

শিবনাথ শুধায়।

আমি মৃন্ময়ী!

মৃন্ময়ীর কথাটা শেষ হলো না বাইরের দালানে একটা ভারী জুতোর মচ-মচ শব্দ শোনা গেল। মেয়েটির কানেও বোধ হয় শব্দটা প্রবেশ করেছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে।

শিবনাথ চকিতে পিছন ফিরে খোলা দরজার দিকে তাকাল।

জুতোর শব্দটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

একটু পরেই দরজা-পথে দেখা গেল বিরাট এক মনুষ্যমূর্তি।

সেই কুর্তা ও পাতলুন পরিহিত, মাথায় টুপি—সুন্দর সাহেব।

সুন্দরম্ বোধ হয় প্রথমটা চিনতে পারে নি শিবনাথকে।

ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে সুন্দরমের।

গম্ভীর ভরাট গলায় শুধায়, কে—who are you?

আ-আমি—

কে!

আজ্ঞে, আমি শিবনাথ।

॥ ৩ ॥

সেদিন রাত্রির আধো-অন্ধকারে আব্‌ছা আব্‌ছা শিবনাথ সুন্দরম্‌কে দেখেছিল। লম্বা-চওড়া দৈত্যাকৃতি চেহারাটাই শিবনাথের চোখে পড়েছিল এবং সে দেখাটাও

ছিল ঝাপ্সা-ঝাপ্সা। কিন্তু আজ দিনের আলোয় চেহারার সবটাই যেন স্পষ্ট হয়ে ওর চোখে পড়ে।

লোকটার চেহারা, বিচিত্র তার পোশাক কেমন যেন শিবনাথের বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত ভয় জাগায়। নিজের নামটা কোন মতে উচ্চারণ করে তখনো ভয়ে ভয়েই যেন সুন্দরমের দিকে তাকিয়েছিল শিবনাথ।

সুন্দরম্‌ও তাকিয়ে ছিল শিবনাথের মুখের দিকে। তখনো সে যেন শিবনাথকে ঠিক চিনে উঠতে পারে নি। আপন মনেই তাই সে বলে, শিবনাথ!

আজ্ঞে—

কোথায় তোমাকে দেখেছি বল তো—where I have seen you?

আজ্ঞে অরিন্দম সরকার মশাইয়ের গৃহে—

কোঁচকান ভ্রূযুগল সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরমের সরল হয়ে আসে। সে উৎফুল্লকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—চিনেছি—I remember now—

তারপরই একটু থেমে আবার বলে, What do you want here—কি চাও?

আজ্ঞে আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার এখানে এসে থেকে পড়াশোনা করবার জন্য।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলেছিলাম তো, তা থাকবে তুমি—want to stay here?

অনুগ্রহ করে যদি আপনি স্থান দেন—

আরে নিশ্চয়ই। অনুগ্রহ কি বলছো! থাকবে বৈকি। তা জিনিসপত্র তোমার সব কোথায়? এনেছো?

আজ্ঞে না।

তবে?

কাল-পরশু নিয়ে আসবো।

বেশ বেশ—চলে এসো তুমি এখানে, কোন কষ্ট হবে না তোমার। পাশেই আরো দুটো ঘর আছে—একটায় আমি থাকি, অন্যটায় তুমি থাকবে। কেমন?

আপনি যেমন বলবেন।

হ্যাঁ, চলে এসো, থাক তুমি এখানে। এ বাড়িতে দেখতেই পাচ্ছো লোকজনের মধ্যে আমি—আর ঐ আমার ailing wife—two servants—আর একজন ছত্রী ব্রাহ্মণ আছে। If you wish—তার হাতেই খেতে পারো, আর তা যদি না চাও তো নিজে রান্না করেও তুমি খেতে পারো—মানে you can cook yourself।

আপনি যেমন বলবেন।

আমি আর কি বলবো? তোমার যেমন খুশি, সুবিধা— তেমনি করবে।

যে আজ্ঞে।

চল, বাইরে গিয়ে তোমাকে বাড়িটা ঘুরে দেখাই—

সুন্দরম্ শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। লম্বা টানা বারান্দাটা দিয়ে পাশাপাশি যেতে এক সময় মৃদু-কণ্ঠে ডাকে সুন্দরম্, শিবনাথ!

আজ্ঞে—

Have not you seen my wife?

দেখলাম। কি হয়েছে ওঁর?

She is very ill—তবে একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে।

কি অসুখ? শিবনাথ প্রশ্ন করে।

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুন্দরম্ বলে, ওর জন্যেই আমার চিন্তা—আমি তো সর্বদা ঘরে থাকি না, থাকতেও পারি না। একা একা ঘরের মধ্যে শয্যার ওপরে অমনি পড়ে আছে। কথাটাও যদি বলতে পারতো—

শিবনাথ যেন চমকে ওঠে, কেন—উনি—

না। বথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—She can not speak—

শিবনাথ যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একটু আগে যে তার সঙ্গে কথা বললো, সে কথা বলতে পারে না কেন সাহেব বলছে!

সুন্দরম্ তখন বলে চলেছে, অবিশ্যি ভিষগ্‌রত্ন বলেছেন—কথা আবার ও বলতে পারবে। তা তুমি থাকলে ও একজন সঙ্গীও তো পাবে।

শিবনাথ কি জানি কেন চুপ করেই থাকে।

সুন্দরম্ বলে, তাহলে তুমি কিন্তু আর দেরি করো না। কাল-পরশুর মধ্যেই চলে আসবে। হ্যাঁ ভাল কথা, সরকার মশাইকে বলেছো তো?

আজ্ঞে এখনো বলি নি—

বলো নি এখনো? You must tell him—আগামী কালই বলো।

তাই বলবো।

বাড়ির সম্মুখ ও পশ্চাতের দিকে অনেকখানি করে খোলা জায়গা। সেখানে নানা ধরনের ফল ও ফুলের গাছ। কত প্রকারের ফলের গাছই যে আছে। আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল, পিয়ারা। বড় বড় অনেকগুলো নারিকেল গাছ। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে অনেকটা হেলে পড়েছে। রোদের তেজ কমে এসেছে।

বাড়ির পশ্চাৎদিকেই খাল। বাঁধান ঘাটও আছে।

একটু আগেই বোধ হয় জোয়ার এসেছে। জোয়ারে খালের জল স্ফীত হয়ে ঘাটের অনেকগুলো ধাপ ডুবিয়ে দিয়েছে। ঘুরে ঘুরে সুন্দরম্ শিবনাথকে নিয়ে সব কিছুই দেখালো। অবশেষে আরো ঘণ্টাখানেক বাদে শিবনাথ সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে চলে গেল। সুন্দরম্ নিজে তাকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

ফেরার পথে শিবনাথ সুন্দর সাহেবের কথাই ভাবে। সুন্দর সাহেব লোকটা যেমন দৈত্যের মত লম্বা-চওড়া দেখতে, ব্যবহারটা কিন্তু তেমন নয়। ভয় পাবার মত কিছুই নেই। মাঝে মাঝে দরাজ গলায় হো হো করে কথা বলতে বলতে হেসে উঠছিল। প্রাণখোলা হাসি। আরো মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল একখানি কৃশ মুখ। রুগ্ন শয্যাশায়িনী সুন্দর সাহেবের স্ত্রীর মুখখানি। অমন দৈত্যের মত সুন্দর সাহেব, কিন্তু কত ছোট তাঁর স্ত্রী। কিন্তু ওকথা বললে কেন সুন্দর—তার স্ত্রীর কথা বন্ধ? কথাই যদি বন্ধ হবে তবে কেমন করে সে শিবনাথের সঙ্গে কথা বললে? সুন্দর সাহেব কি তবে মিথ্যা বললে?

কিন্তু তার কাছে মিথ্যা বলেই বা লাভ কি! সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায় শিবনাথের। আরো ভাবে শিবনাথ, আজই সে সন্ধ্যার দিকে সরকার মশাইকে কথাটা জানাবে। জানাবে সে সুন্দর সাহেবের কাছে চলে আসতে চায়।

পথ নেহাত কম নয়। কুলীর বাজার থেকে চেতলা অনেকটা পথ। ক্রমশঃ দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। শিবনাথ চলার গতি বাড়িয়ে দেয়।

দেরি করে না শিবনাথ। সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পরে অরিন্দম সরকার যখন সেজেগুজে ফুলবাবুটি হয়ে পাল্কী গাড়িতে চেপে রাতবিহারে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বহির্মহলে এসে দাঁড়িয়েছে, শিবনাথ গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

কে?

আজ্ঞে আমি শিবনাথ।

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হলো অরিন্দম সরকারের, শিবনাথ?

আজ্ঞে আপনার আশ্রয়ে এখানে থেকে লেখাপড়া করি।

ওঃ—। তা কি চাই?

একটা নিবেদন ছিল। কোনমতে সংকোচের সঙ্গে কথাটা বলে শিবনাথ।

কিসের নিবেদন?

হাতে সুগন্ধী গোড়ের মালা জড়ান ছিল, সেই মালার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কথাটা বলে অরিন্দম সরকার।

আমি অন্য জায়গায় আশ্রয় একটি পেয়েছি, যদি আপনার অনুমতি হয় তো—

আশ্রয় ?

আজ্ঞে—

কোথায় ?

কুলীর বাজারে সুন্দর সাহেবের গৃহে—

কথাটা কানে যেতেই যেন চমকে ওঠে অরিন্দম সরকার। বলে, কি, কি বললে ?

পুনরাবৃত্তি করে কথাটার শিবনাথ।

সেখানে গিয়ে তুমি থাকবে!

যদি অনুমতি করেন।

জান সে ম্লেচ্ছ—ক্রেস্তান—আর তুমি ব্রাহ্মণসন্তান—

আজ্ঞে রন্ধন আমি নিজের হাতেই করে আহার করবো।

কিন্তু তোমার মাতুল যদি শোনেন—আমার গুরুদেব—

তাঁকে যা বলবার আমিই বলব—

তুমিই বলবে!

আজ্ঞে—

অরিন্দম সরকার যেন অতঃপর ক্ষণকাল কি ভাবল, তারপর বললে, বেশ—জাত নষ্ট করতে চাও তা আর কি বলব—যাবে, তবে মনে রেখো—সমাজে কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে সমাজে আর তোমার স্থান হবে না। কথাটা বলে অরিন্দম সরকার আর দাঁড়াল না। দেরি হয়ে যাচ্ছে, সোজা গিয়ে পাল্কী-গাড়িতে উঠে বসল।

কচুয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু শিবনাথ তখনো দেউড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। পণ্ডিত মশাইয়ের শেখানো একটি শ্লোক মনে পড়ছিল তার—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ।

তবে কি সে যাবে না ?

যত কষ্ট হোক এইখানেই সে পড়ে থাকবে!

কিন্তু মহাত্মা হেয়ার। হেয়ার সাহেব তাকে সুন্দর সাহেবের ওখানেই যাবার কথা বলেছেন। এরপর সে সুন্দর সাহেবের গৃহে না গেলে হয়ত মহাত্মা হেয়ার তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

পরের দিন স্কুলে আবার শিবনাথের হেয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

প্রাত্যহিক স্কুল পরিদর্শনে তিনি এসেছিলেন। শিবনাথের সঙ্গে দেখা হতেই তাকে তিনি কাছে ডাকলেন, শিবনাথ!

আমাকে ডাকছিলেন?

সসম্ভ্রমে শিবনাথ সামনে এসে দাঁড়ায়।

যে সুন্দর সাহেবের কথা বলিয়াছিলে তাহার গৃহেই এখন অবস্থান করিতেছ তো?

আজ্ঞে না।

সে কি, এখনো ক্লেশ ভোগ করিতেছ?

আজ্ঞে কাল-পরশুর মধ্যেই যাবো।

হ্যাঁ, আর বিলম্ব করিও না, যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে চলিয়া যাও। আমার মনে হয়, সর্বতোভাবে সেখানে তোমার সুবিধাই হইবে।

সাহেব আর দাঁড়ালেন না। সোজা গিয়ে তাঁর পাল্কীতে উঠে বসলেন।

পরের দিনই শিবনাথ স্কুলের ছুটির পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পাঠ্যপুস্তক ও জামা-কাপড়গুলি একটা বোঁচকায় বেঁধে কুলীর বাজারে সুন্দর সাহেবের গৃহের দিকে রওনা হলো।

সুন্দর সাহেবের গৃহে যখন সে গিয়ে পৌঁছাল সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে বেশ অন্ধকার।

সোজা একেবারে অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করল শিবনাথ। এবং বোঁচকাটি হাতে বারান্দা অতিক্রম করে পায়ে পায়ে মৃন্ময়ীর ঘরের দিকেই এগিয়ে গেল।

ঘরের এক কোণে একটি উঁচু কাষ্ঠখণ্ডের উপর একটি সেজবাতি জ্বলছিল। তারই আলোয় ঘরটি মৃদু আলোকিত।

হঠাৎ সুন্দর সাহেবের সেদিনের কথাটা মনে পড়ে: She can not speak.

মৃন্ময়ী একই ভাবে শয্যায় শুয়ে ছিল একাকী ঘরের মধ্যে।

ঘরের দরজায় এসে শিবনাথ দাঁড়াতেই তার পদশব্দে শয্যায় শায়িতা মৃন্ময়ী চোখ তুলে সামনের দিকে তাকায়। দুজনার চোখাচোখি হয়। শিবনাথ দরজার চৌকাটেই দাঁড়িয়ে যায়।

মৃন্ময়ীর চোখের তারা দুটি যেন মনে হয় আনন্দে চক্ চক্ করে উঠলো।

এসো, ঘরে এসো—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন শিবনাথ? মৃন্ময়ীই কথা বলে, আহ্বান জানায়। তবু শিবনাথ যেন ইতস্তত করে।

তার তখন কেবলই মনে পড়ছিল সেদিনকার সুন্দর সাহেবের কথাটা। তার স্ত্রীর অসুখে কথা বন্ধ। কথা নাকি বলতে পারে না।

মৃন্ময়ী আবার ডাকে, কই এসো—

শিবনাথ পায়ে পায়ে এবারে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

সাহেব কোথায়? তিনি কি গৃহে নেই?

মৃন্ময়ী মৃদুকণ্ঠে বলে, না।

কখন ফিরবেন তিনি?

তা তো জানি না। তারপরই মৃন্ময়ী বলে, তুমি তো এখানেই থাকবে, তাই না?

হ্যাঁ—তাই তো এলাম।

তারপরই যেন দুজনারই কথা ফুরিয়ে যায়।

একজন শয্যায় শুয়ে, অন্যজন তারই সামনে বোঁচকাটা বগলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল মৃন্ময়ীর মুখখানি শিবনাথ।

দুর্গাপূজার সময় সরকার বাড়িতে দুর্গা প্রতিমার পাশে যে লক্ষ্মী ঠাকরুনের মুখখানি শিবনাথ দেখেছে, যেন ঠিক তেমনি মুখখানি। তেমনি সুন্দর, তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি স্বর্গীয় এবং তার মধ্যেই যেন রয়েছে করুণ বিষণ্ণতার একটি ছাপ। দুই চোখের দৃষ্টিতে যেন কিসের ক্লান্তি।

মৃন্ময়ীই আবার কথা বলে, কি দেখছো অমন করে শিবনাথ আমার মুখের দিকে চেয়ে?

হঠাৎ শিবনাথ বলে ফেলে, তোমাকে!

আমাকে?

হ্যাঁ—তুমি খুব সুন্দর।

মৃদু হাসিতে ভরে যায় যেন মৃন্ময়ীর মুখখানি।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ? ঘরের কোণে ঐ যে চৌকিটা আছে ওটা নিয়ে এসে এখানে বসো। বোঁচকাটা হাত থেকে নামিয়ে রাখ।

শিবনাথ অতঃপর ঘরের কোণ থেকে চৌকিটা নিয়ে এসে মৃন্ময়ীর শয্যার অনতিদূরে বসল বটে, তবে বোঁচকাটা তার কোলেই ধরা থাকে।

এখানে তুমি কোথায় ছিলে শিবনাথ?

সরকার মশাইয়ের গৃহে।

কে কে তোমার আছে?

কেউ নেই।

কেউ নেই? মা-বাবা—ভাই-বোন?

না।

আচ্ছা শিবনাথ!

কি?

কৃষ্ণনগর কোথায় তুমি জান?

শুনেছি। কথনো সেখানে যাই নি।

ওঃ, আমার বাড়ি কৃষ্ণনগরে।

যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ধরে শিবনাথের মনের মধ্যে কেবলই আনাগোনা করছিল সে প্রশ্নটা যেন আর চেপে রাখতে পারে না শিবনাথ। নিজেই অজ্ঞাতেই যেন প্রশ্নটা বের হয়ে আসে। বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

কি?

মৃন্ময়ী শিবনাথের মুখের দিকে তাকায়।

সুন্দর সাহেব বলেছিলেন—

কি? কি বলছিল সে?

তুমি নাকি—

কি আমি?

কথা বলতে পারো না। অসুখে তোমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মাথা নেড়ে মৃন্ময়ী বলে, হ্যাঁ—

কিন্তু—

তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলি না। তাই তাঁর ধারণা আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কেন? কেন বল না? সে তো খুব ভাল লোক।

সব কথা তুমি জান না, সব কথা শুনলে—

কি কথা?

বলবো, সব তোমাকে বলবো। যদি—যদি তুমি আমাকে—

কি?

এখান থেকে উদ্ধার করতে পারো। আমাকে আবার আমার মা-বাবার কাছে দিয়ে আসতে পারো।

শিবনাথ কথাটা শুনে যেন একটু অবাকই হয়। বলে, কেন, সুন্দর সাহেবকে তুমি বললে—

না, সে আমাকে যেতে দেবে না—

যেতে দেবে না ?

না।

মৃন্ময়ীর চোখের কোণ দুটি জলে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

বেলগাছিয়াতে মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে এক বিশেষ উৎসব সেদিন।

এক বাঈজী এসেছে, কস্তুরীবাঈ। সে গান গেয়ে শোনাবে। মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়ির বিরাট হলঘরটার মধ্যে তারই আয়োজন করা হয়েছিল। মেঝেতে বিস্তৃত ফরাশ—তারই মাঝখানে ভেলভেটের নরম গালিচা, সেই গালিচায় বসে কস্তুরীবাঈ গাইবে।

মাথার ওপরে বেলোয়ারী ঝাড়বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

গালিচার এক পাশে রূপার সুদৃশ্য পাত্রে নানা ধরনের মেওয়া, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি। অন্য একটা পাত্রে বসান বেলোয়ারী আতরদান। এবং তার পাশে অন্য এক পাত্রে গোড়ের মালা।

অভ্যাগতদের সেই আতর ও গোড়ের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানান হবে।

একটু বেলাবেলিই মহেন্দ্র সাহা তার পাল্কীতে চেপে বাগানবাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। ঐ বাগানবাড়িরই একদিকের একটা ঘরে ক্ষীরোদার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্ষীরোদা এসে মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল বটে, কিন্তু সে যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল।

হাসে না, কথা বলে না, কেমন যেন বোবা।

ভৃত্য বৃন্দাবনের ওপরেই মহেন্দ্র সাহা ক্ষীরোদার দেখাশোনার ভার দিয়েছিল। প্রত্যহ কাজকর্ম সেরে একটু রাত্রের দিকেই মহেন্দ্র সাহা সেজেগুজে বাগানবাড়িতে আসত। অর্ধেক রাত্রি বাগানবাড়িতে কাটিয়ে আবার সে গৃহে ফিরে যেতো।

কিন্তু সেই প্রথম রাত্রি থেকেই ক্ষীরোদার ব্যবহারে মহেন্দ্র সাহা বিস্ময়বোধ করেছে। ক্ষীরোদাকে একদিন পাওয়ার জন্য মহেন্দ্র সাহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, যত অর্থব্যয়ই হোক তার জন্য সে পশ্চাৎপদ ছিল না এবং তবু তাকে কিছুতেই করায়ত্ত করতে পারে নি। সেই ক্ষীরোদাই যখন সে রাত্রে অমন বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে, স্বেচ্ছায় তার বাগানবাড়িতে উঠেছিল, মহেন্দ্র সাহা প্রথমটায়

রীতিমত যে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই।

শুধু বিস্ময়ই নয়, সে রাত্রে সিক্তবসনা ক্ষীরোদা যখন এসে নেশাগ্রস্ত তারই দু-বাহুর মধ্যে এলিয়ে পড়ে জ্ঞান হারাল—মহেন্দ্র সাহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন বোবা হয়ে বসেছিল, বুকের মধ্যে বহু-আকাঙ্ক্ষিত ক্ষীরোদার যৌবনপুষ্ট দেহটা আঁকড়ে ধরে। সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা কি ঘটেছে, না নেশার চোখে সে স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন মহেন্দ্র সাহা ক্রমে বুঝতে পারল ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়, নেশার চোখে কোনরূপ বিভ্রমও নয়, তখন যেন তার উল্লাসের অবধি থাকে না।

ক্ষীরোদা এসে তার কাছে ধরা দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে।

আনন্দে বিহ্বল মহেন্দ্র সাহা ক্ষীরোদার জ্ঞানহীন দেহটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বসে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীরোদার জ্ঞান ফিরে এলে সে চোখ মেলে তাকাল।

চোখ মেলে তাকাতেই মহেন্দ্র সাহা ডাকে, ক্ষীরি—

সেই ডাকেই বোধহয় পরমুহূর্তে ক্ষীরোদার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসে। শশব্যস্তে উঠে বসে সে গায়ের বিস্রস্ত বসন তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে টেনেটুনে ঠিক করতে থাকে।

তোমার শাড়িটা একেবারে ভিজে গিয়েছে—পাশের ঘরে আমার ধুতি আছে, ভেজা শাড়িটা বদলে ফেল।

ক্ষীরোদা উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে।

একটা সাদা ধুতি পরে ক্ষীরোদা ঘরের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং অনতিদূরে দাঁড়িয়েছিল মহেন্দ্র সাহা।

বাইরে রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

ঝাপ্‌সা অন্ধকারে প্রত্যুষের প্রথম আলোর ইশারা।

মহেন্দ্র সাহা এক সময় প্রশ্ন করে, কোথা থেকে অমন করে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে এলে ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই তখন তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ফিরছিল, এ হঠাৎ সে কি করে বসল ঝোঁকের মাথায়! গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েই বা কেন সে মরতে পারল না! আর কেনই বা সেখান থেকে সোজা এখানে এসে হাজির হলো!

ক্ষীরোদা! মহেন্দ্র সাহা আবার ডাকে।

দয়া করুন, ও সব কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহা। বলে, বেশ, বেশ—জিজ্ঞাসা করবো না। তুমি আমার কাছে এসেছো, তাতেই আমি খুশী হয়েছি ক্ষীরোদা। কোন কথা আমার জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনই বা কি। তা তুমি, আমার কাছেই থাকবে তো?

থাকবো বলেই তো এসেছি। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় ক্ষীরোদা।

বেশ, বেশ—দেখো ক্ষীরোদা, তোমাকে আমি রাজরাণী করে রাখবো। সোনাদানায় গা তোমার মুড়ে দেবো। কেন যে এত কাল তুমি ঐ ভিখিরী বামুনটার ওখানে পড়েছিলে—

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদার চোখের মণি ছুটো যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে। বলে, তার নামটা শুনতেও আমার ঘৃণা হয়—তার নাম আর আমার কাছে করবেন না।

না, না—করবো কেন তার নাম। তার আর প্রয়োজনটাই বা কি! ঠিক আছে—রাত শেষ হয়ে এলো, আমাকে এবারে গৃহে ফিরতে হবে, বেন্দা রইলো—সে-ই তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে। এদিককার এই ছুটো ঘর নিয়ে তুমি থাক—বেন্দাকে বলে যাচ্ছি সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরের দিন একেবারে সন্ধ্যার মুখেই এসে বাগানবাড়িতে হাজির হলো মহেন্দ্র সাহা।

আজ সাজগোজটা যেন একটু বেশীই হয়েছিল।

কিন্তু পাল্কী থেকে নেমে ভিতরে পা দিয়ে বেন্দার মুখে কথাটা শুনে যেন মহেন্দ্র সাহা থমকে দাঁড়াল।

ক্ষীরোদা নাকি সেই কাল থেকে এখনো পর্যন্ত স্নান করে নি, খায় নি, কিছু করে নি।

সে কি রে! কেন? মহেন্দ্র সাহা শুধায়!

তা কেমন করে বলবো কত্তা। তাকেই শুধিয়ে দেখুন।

কোথায় সে?

যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই তো আছে!

মহেন্দ্র সাহা একটু যেন বিস্মিত হয়েই ক্ষীরোদা যে ঘরে ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে দেওয়াল-বাতি জ্বলছিল। তারই আলোয় ক্ষীরোদার দিকে তার দৃষ্টি পড়লো।

জানালার ধারে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষীরোদা, বাইরের অন্ধকারে জানালা-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে।

ক্ষীরোদা ?

মহেন্দ্র সাহার ডাকে ক্ষীরোদা ফিরে তাকায়।

পরনে সাদা ধুতি, তৈলহীন রুক্ষ কেশভার বুকের একদিকে গুচ্ছে গুচ্ছে নেমে এসেছে। কিন্তু সামান্য ঐ এক সাদা ধুতিতেই ক্ষীরোদার দেহের যৌবনসুষমা যেন উপচে পড়ছে।

সত্যিই ক্ষীরোদা সুন্দরী, সন্দেহ নেই তাতে এতটুকু।

ক্ষীরোদার মত রূপ সত্যিই বড় একটা চোখে পড়ে না সচরাচর।

কামার্ত দৃষ্টিতে প্রৌঢ় মহেন্দ্র সাহা কিছুক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে সেই দেহসুষমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ক্ষীরোদা !

ক্ষীরোদা দেহের বসন একটু টেনেটুনে ঠিক করে নেয়।

বেন্দার মুখে শুনলাম তুমি নাকি স্নান করো নি, খাও নি—

ক্ষীরোদা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে এবারে, আমি কোথায় থাকবো ?

কেন ! এখানেই থাকবে।

এটা তো আপনার বাগানবাড়ি।

বাগানবাড়ি তো কি হয়েছে ! যেমন ব্যবস্থা তুমি চাও সেই ব্যবস্থা এখানে হবে।

না।

কি না ?

এই বাগানবাড়িতে প্রতি রাত্রে আপনার ইয়ারবন্ধুর দল আসে।

ও এই কথা ! হেসে ফেলে মহেন্দ্র সাহা, তা এলেই বা। তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি ?

না—আবার মৃদুকণ্ঠে ক্ষীরোদা প্রতিবাদ জানায়।

এত বড় বাড়ি, তুমি তো থাকবে একধারে।

কিন্তু—

তা ছাড়া তারা এদিকে আসবেই বা কেন ?

না—আমাকে অন্য কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করুন।

অন্য ব্যবস্থা তো এখন বললেই হুট করে হতে পারে না ক্ষীরোদা।

কেন, আপনার বাড়িতে।

মহেন্দ্র সাহা যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে, বলো কি! গৃহে নিয়ে গিয়ে তোমাকে তুলবো। হরনাথ মিশ্রের মত তো আমার মাথা খারাপ হয় নি। যে গৃহে গৃহ-দেবতা রয়েছে সেই গৃহে নিয়ে গিয়ে রক্ষিতা মেয়েমানুষকে তুলবো!

মহেন্দ্র সাহার শেষের কথায় যেন একটা চাবুক এসে সপাং করে ক্ষীরোদার মুখের ওপরে পড়ে।

সে রক্ষিতা মেয়েমানুষ, গৃহে তার স্থান নেই!

মহেন্দ্র সাহা বলে, ছেলেপুলের সংসার আমার, সমাজে দশ জনের মধ্যে বাস করি। সংসার কি বেলেল্লাপনার জায়গা? সেজন্য রয়েছে বাগানবাড়ি। মহেন্দ্র সাহার স্পষ্টোক্তিটা শুনে ক্ষীরোদা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মহেন্দ্র সাহা যেন তার সত্যিকারের পরিচয়টা তাকে বুঝিয়ে দিল।

সে তার প্রতি আসক্ত বটে, কিন্তু সে আসক্তি ঠিক কোন এক রক্ষিতার প্রতি যতটুকু হয় ততটুকুই। ক্ষীরোদাকে সে স্থান দিয়েছে সাগ্রহে বাগানবাড়িতে সত্যি, তাই বলে গৃহের সীমানায় কোন ছুতোতেই মহেন্দ্র সাহা তাকে পা ফেলতে দেবে না, সে সামান্যা ঘৃণ্যা এক রক্ষিতা। শুদ্ধান্তঃপুরে তার স্থান নেই। এবং স্বেচ্ছায় যখন সে এখানে পদার্পণ করেছে এখানেই তাকে—এই বাগানবাড়িতেই থাকতে হবে। রক্ষিতা হয়েই থাকতে হবে।

ক্ষীরোদা অবিশ্যি আর দ্বিতীয় অনুরোধ করে নি।

মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতেই সে থেকে গিয়েছে। তবে সেই যে সে সাদা ধুতি গায়ে তুলেছিল, আজো সেই সাদা ধুতিই তার পরিধানে।

মহেন্দ্র সাহা তারপর স্তূপাকার করে দিয়েছে শাড়ির পর শাড়ি এনে, রাশীকৃত গহনা এনে দিয়েছে, কিন্তু সে সব কিছুই সে স্পর্শ করে নি।

মহেন্দ্র সাহা আপত্তি তুলেছিল, কি ব্যাপার বল তো তোমার ক্ষীরোদা?

কিসের কি ব্যাপার?

এত সব শাড়ি গহনা-গাঁটি এনে দিলাম তো কই পর না কেন!

ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে না?

ঐ সব গায়ে পরতে।

সে আবার কি কথা?

আমি তো ঐ সব চাই নি, আর চাইবও না কোন দিন সাহা মশাই। আশ্রয় আমি চেয়েছিলাম—দয়া করে সেই আশ্রয়ই আপনি দিয়েছেন।

কিন্তু কিছুই যদি চাও না তো—আমার কাছে তুমি এলে কেন ক্ষীরোদা ?

ক্ষীরোদা মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, জানি না।

মহেন্দ্র সাহা অবাক হয়ে যায়।

ঠিক ব্যাপারটা যেন ক্ষীরোদার বুঝে উঠতে পারে না।

তবে সে-ও আর পীড়াপীড়ি করে না। মরুক গে, ও যদি না চায় কিছু, তো তারই বা কি এসে গেল।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নিতান্ত একটা ঝোঁকের মাথাতেই সে রাত্রে যখন সোজা গঙ্গার জল থেকে উঠে মহেন্দ্র সাহার আশ্রয়ে এসে ঢুকেছিল ক্ষীরোদা, সেদিন সে সত্যিই বুঝতে পারে নি, কোথায় এসে সে পা দিল।

বুঝতে পারে নি ক্ষীরোদা সেদিন, যে কত বড় একটা কামার্ত পশুর গহ্বরে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করলো।

কিন্তু বুঝতে ব্যাপারটা ক্ষীরোদার দু'রাত্রির বেশী দেরি হলো না।

ঐ প্রৌঢ় লোকটার কামের উলঙ্গ চেহারাটা যেন ক্ষীরোদাকে একেবারে বোবা করে দেয়।

যেমনই বীভৎস তেমনি যেন পাশবিক, কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

এক রাত্রিও নিষ্কৃতি নেই।

প্রতি রাত্রে আসে! এবং প্রতি সন্ধ্যায় ঐ লোকটা আসবে তার ঘরে—কথাটা ভাবতে গিয়ে ক্ষীরোদার সর্বদেহ যেন অবশ হয়ে যায়!

পশুটা যেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদার দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার পর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মরণাধিক যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হতে থাকে ক্ষীরোদা।

দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে তার।

কিন্তু তবু কেন জানি ক্ষীরোদা এতটুকু প্রতিবাদ করে না। মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাবার কথাটাও ভাবতে পারে না।

কি করে যে সে ঐ নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে রাতের পর রাত ক্ষীরোদা নিজেও বুঝি বুঝতে পারে না!

ক্ষীরোদা বাগানবাড়িতে এসে আশ্রয় নেবার পর প্রায় মাস দেড়েক মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে বন্ধু-ইয়ারদের নিয়ে কোন আমোদ হৈ-হল্লা হয় নি।

বাগানবাড়িতে নিয়মিত রাতের উৎসবটা যেন ইদানীং বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ সেদিন তাই দ্বিপ্রহরের দিকে বৃন্দাবনকে হলঘরটার চাবি খুলে লোকজন নিয়ে সাফ করতে দেখে, ক্ষীরোদা বৃন্দাবনকে ডেকে শুধায়, কি ব্যাপার বৃন্দাবন? এত তোড়জোড় কিসের?

বৃন্দাবন হেসে বলে, আজ যে এখানে গানের আসর বসবে—

গান?

হ্যাঁ—মস্ত বড় বাঈজী—কস্তুরীবাঈ আসছে—

বস্তুত গানের আসর বসবে জেনে বৃন্দাবন খুশীই হয়েছিল। ক্ষীরোদা এখানে আসবার আগে প্রত্যহ বাগানবাড়িতে আসর বসত ইয়ার-বক্সীদের নিয়ে এবং প্রত্যহই বকশিশের সঙ্গে আকণ্ঠ সুরা ও নানা উপাদেয় খাদ্য মিলত বৃন্দাবনের। কিন্তু ইদানীং সে ব্যাপার বন্ধ হওয়ায় বৃন্দাবনের কিছুই মিলছিল না। মন মেজাজটা তাই তার ভাল যাচ্ছিল না। এবং সেই কারণেই ক্ষীরোদার ওপরে কোন দিনই বৃন্দাবন তেমন প্রসন্ন ছিল না, মুখে যদিও সে কথা প্রকাশ করবার মত সাহস ছিল না বৃন্দাবনের।

কিন্তু আজ আসর বসার খবর পেয়ে মনটা তার রীতিমত খুশী হয়ে উঠেছিল, তাই ক্ষীরোদা তাকে প্রশ্ন করায় কস্তুরীর কথাটা জানিয়ে দিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলে, যাক্ বাঁচা গেল বাবা! স্ফূর্তি না হলে বাঁচা যায়, নাচো, গাও—ঢুকু-ঢুকু খাও—তা না বাবা—যত সব পান্তা ব্যাপার—

ক্ষীরোদা শুধায়, কস্তুরীবাঈ! সে কে?

সে সব তুমি বুঝবে না। দেখো নি তো কখনো, শোনো নি জীবনে তাদের গান। আহা শুনো শুনো আজ রাতে। গান তো না যেন কোকিল গাইছে, কুহু, কুহু—

ক্ষীরোদা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বৃন্দাবনের মুখের দিকে।

গরীবের ঘরের মেয়ে—তায় বিধবা—ধনীর বিলাসের কথা সে জানবেই বা কি করে, শুনবেই বা কোথা থেকে!

বৃন্দাবন বলে, সে বছর এসেছিল মোতিহারী থেকে পান্নাবাঈ। কি ঠুংরী আর কি খেয়াল গাইলে। পর পর সাত রাত এখানে মাইফেল বসেছিল।

সাত রাত?

তাই! জেদাজিদির ব্যাপার কিনা, ঐ যে হাটখোলার দত্তরা—নিমে দত্ত—ঐ যে গো ছোট দত্ত—কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল জদ্দনবাঈকে—যেমন গায় তেমনি নাচে। তিনরাত্তির ধরে গান আর নাচ। সেখানকার নাচগান শুনে

এসে কত্তার বন্ধু পেসন্ন ঘোষ বললে, আহা কি গান শুনলাম মহেন্দর—হ্যাঁ—আসর যদি বসাতে হয় তো অমনি—নইলে ছুটকী দাসী—ছ্যা-ছ্যা—

ছুটকী দাসী কে ?

তাও জান না—কত্তার পেয়ারের মেয়েমানুষ ছিল এক সময়। এই বাগান-বাড়িতেই, এখন যে ঘরে তুমি আছো, সেই ঘরে থাকত। আহা—বড় ভাল মেয়ে ছিল, আমাকে কি ছেদ্দাভক্তিই না করত।

কোথায় গেল সে ?

কোথায় আর যাবে। যেখানে গেলে আর ফেরে না কেউ কোন দিন, সেখানেই গেল।

সেখানে গেল মানে ?

গলায় দড়ি দে মরল।

সে কি !

হ্যাঁ—ছোট দত্তর উপর টেক্কা দেবার জন্য কত্তা মোতিহারী থেকে নিয়ে এলো পান্নাবাঈকে এক মুঠো মোহর ঢেলে—হৈ হৈ করে আসর বসালো এখানে। দু রাত্রির পর তৃতীয় রাত্রি পোহাবার পর যখন সকাল হলো, ছুটকীর ঘরে গিয়ে দেখি পরনের শাড়ি গলায় বেঁধে ঝুলছে কড়ি থেকে—

তারপর ?

তারপর আর কি ! থানা পুলিস হলো—সব মিটেও গেল !

হল-ঘর থেকে পায়ে পায়ে ফিরে এলো ক্ষীরোদা নিজের ঘরে।

তা হলে তার আগে এই ঘরে আর একজন ছিল। এবং সে পরনের শাড়ির আঁচল গলায় পেঁচিয়ে এই ঘরেই আত্মহত্যা করেছে।

সমস্তটা দিন যেন কেমন ঝিম মেরে ঘরের মধ্যে বসে রইলো ক্ষীরোদা।

ক্রমে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার নেমে আসে চারিদিকে। অন্যান্য দিন এই সময়ের মধ্যেই বৃন্দাবনের তাগিদে তাকে মহেন্দ্র সাহাকে রাত্রির অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ঘোরতর অনিচ্ছা ও আকণ্ঠ বিতৃষ্ণা নিয়েও তাকে গা-হাত ধুয়ে চুল বেঁধে একটা শাড়ি পরতে হয়।

কিন্তু আজ আর বৃন্দাবন এদিকটা মাড়ালও না।

বৃন্দাবন ঐ দিককার আয়োজনেই ব্যস্ত সেই সকাল থেকে।

রান্নাঘরে বড় বড় ডেকচিতে রান্না হচ্ছে মাংস-পোলাও-কোর্মা, তারই সুগন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে।

সন্ধ্যার পরই হল-ঘরের বড় বড় ছটো ঝাড়বাতি জলে উঠলো। এবং আরো কিছুক্ষণ পরে একে একে ইন্দ্রার বন্ধুরা এসে জড়ো হতে শুরু করে।

রাত আটটা নাগাদ মহেন্দ্র সাহার পাল্কীবাহকদের হুম্ হুম্ শব্দ শোনা গেল। মহেন্দ্র সাহা এসে পৌছাল।

শুরু হয় সারেঙ্গীর কান মোচড়ান ও স্বরের টান মৃদু এক আধটা এবং বাঁয়া তবলার শব্দ।

নিজের ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসে বসে শুনতে থাকে ক্ষীরোদা।

বৃন্দাবন আজ ক্ষীরোদার ঘরে আলোটা পর্যন্ত জ্বেলে দিয়ে যায় নি। আরো কিছুক্ষণ পরে আবার পাল্কীবাহকদের হুম্ হুম্ শব্দ কানে আসে ক্ষীরোদার। পাল্কী এসে একেবারে অন্দরে হল-ঘরের দরজার সামনে নামায় বাহকেরা।

অনেক কণ্ঠের উল্লসিত অভ্যর্থনা, এসো এসো বাঈ—

নমস্তে—মিহি সুরেলা কণ্ঠে শোনা যায়।

কস্তুরীবাঈ এলো।

শুরু হয়েছে গান। গানের সুর মূর্ছনা তরঙ্গে তরঙ্গে যেন সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছে।

সমস্ত চেতনা যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল ক্ষীরোদার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষীরোদার যেন মনে হয় অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে কে এসে তার পাশটিতে একেবারে দাঁড়াল।

হঠাৎ শিউরে ওঠে ক্ষীরোদা বুঝি।

অন্ধকারে ক্ষীরোদা দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সে অনুভব করছে একজন কারো উপস্থিতি, তার একেবারে পাশেই যেন।

ভয়ে কাঁপতে থাকে বুঝি ক্ষীরোদা।

ভয় পেয়েছো?

কে?

আমি।

কে—

আমি গো, আমি—

কথা তো নয় যেন কান্না। কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

এই ঘরে। এই ঘরেই এক রাত্রে ছুটকী দাসী পরনের শাড়ির আঁচলটা গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ক্ষীরোদা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। অন্ধকারে

ছাতের কড়ির সঙ্গে গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলছে একটা দেহ।

দুলছে আর দুলছে।

ক্ষীরোদা নিজের অজ্ঞাতেই পিছুতে থাকে ঘরের দেওয়ালের দিকে কিন্তু ওকি, যত সে পিছিয়ে যায় সেই ঝুলন্ত দেহটা যেন ততই তার দিকে এগিয়ে আসে ঝুলতে ঝুলতে—দুলতে দুলতে।

ক্ষীরোদা আরো পিছোয়, দেহটাও আরো এগিয়ে আসে।

এদিক থেকে ওদিক পিছু হাঁটতে থাকে ক্রমাগত ক্ষীরোদা, ঝুলন্ত দেহটাও দুলতে দুলতে যেন এগিয়ে আসে।

ক্ষীরোদা একটা আর্ত-চিৎকার করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজাটার ওপর। কিন্তু দরজাটা বন্ধ ছিল।

জ্ঞান হারায় ক্ষীরোদা, বন্ধ দরজার সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে।

হল-ঘর থেকে একটা উল্লসিত চিৎকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মরে যাই—আহা মরে যাই রে মরে যাই। বোম কালী নাচনেওয়ালী।

॥ ২ ॥

নাচ গানের আসর ভাঙে অনেক রাতে।

আসর ঠিক ভাঙে না।

চুর হয়ে মদের নেশায় একে একে সব আসরের ঢালা ফরাশের ওপরে গড়িয়ে পড়ে।

উল্লাস থেমে যায়। কণ্ঠ সকলেরই নিস্তেজ হয়ে আসে।

হাত-পা নাড়ারও শক্তি থাকে না, একে একে সকলে গড়িয়ে পড়ে এলোমেলো ভাবে বিস্তৃত ফরাশের যে যেখানে ছিল। কেবল গড়িয়ে পড়ে না একটি লোক।

মহেন্দ্র সাহা।

আশ্চর্য নেশা করবার ক্ষমতা ঐ মহেন্দ্র সাহার। আকণ্ঠ মদ্যপান করলেও সে কোনদিন বেএক্তিয়ার হয়ে পড়ে না। যত মদ্যপান করে তত যেন সে ধীর স্থির হয়ে যায়।

চুপচাপ বসে থাকে। আর বসে বসে নেশারক্তিম আধো আধো দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায় আর মিটি মিটি হাসে।

সে রাত্রেও একে একে সকলেই যখন গড়িয়ে পড়লো ফরাশের উপর, শূন্য পাত্রটা পুনরায় ভরে নিয়ে মিটি মিটি হাসতে হাসতে পূর্ণপাত্র আবার ওষ্ঠের

সামনে তুলে ধরে চুমুক দিল মহেন্দ্র সাহা।

দীর্ঘ একটা চুমুক।—এবং চুমুক দিয়ে গ্লাসটা সামনের রূপার থালার ওপরে নামিয়ে রাখতে গিয়ে নজর পড়লো কস্তুরীবাঈয়ের প্রতি। কস্তুরীবাঈও তখন গান শেষে তাকিয়ে ছিল এক দৃষ্টে মহেন্দ্র সাহার দিকে। একটি মাত্র মানুষ যে তখনো জেগে বসেছিল।

সে তখনো নেশায় সম্বিৎ হারিয়ে ফরাশের ওপরে লুটিয়ে পড়ে নি অন্যান্য সকলের মত।

মহেন্দ্র সাহা তাকিয়ে ছিল কস্তুরীবাঈয়ের সুর্মা-টানা কালো চোখের দিকে, টানা বঙ্কিম কালো ভ্রূযুগল। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে ঝরা কুঙ্কুমের রক্তটিপ। চিকন ওষ্ঠে প্রসাধনের রক্তরাগ।

চেয়ে থাকে চার জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে। নিস্তব্ধ রাত্রি।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন চারিদিকে থম্ থম্ করছে।

মৃদু ক্লান্ত কণ্ঠে কস্তুরীবাঈ বলে, যদি অনুমতি হয় তো বিশ্রাম-করি!

স্মিতকণ্ঠে বলে মহেন্দ্র সাহা, ঘুম আসছে বুঝি?

একটা ক্লান্তির হাই তোলে কস্তুরীবাঈ।

রাত তো বেশী হয় নি সুন্দরী।

কস্তুরী মৃদু হেসে বলে, রাত্রি তৃতীয় প্রহর—এবারে শয়ন না করলে কাল আবার মুজরো খাটতে যাবো কি করে। পাল্কী দ্বারে আনবার আদেশ হোক—

হাসে মহেন্দ্র সাহা। মুজরো তো কাল রাত্রে, আজ এত ত্বরা কেন?

কিন্তু বিশ্রামের তো দরকার!

এইখানেই শয়ন কর—বল তো ঐ ঝাড়ের বাতি নিভিয়ে দিই—

বিলোল কটাক্ষে হাসে কস্তুরীবাঈ, না—

না কেন! মুজরোর জন্য তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, কাল সন্ধ্যায়ও এখানেই মুজরো দিও।

তাই কি হয় সাহা মশাই, কথা দেওয়া আছে—

দিলেই বা কথা।

আগাম অর্থ নেওয়া আছে—

আমি দেবো, ফিরিয়ে দিও। না হয় দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিও।

তা হয় না।

হয় না বুঝি?

না। কস্তুরীবাঈ কখনো কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে না।

কিন্তু আমি যদি না যেতে দিই তোমায় ?

বলতে বলতে মহেন্দ্র সাহা সুরার বেলোয়ারী পাত্র তুলে তাতে একটি দীর্ঘ চুমুক দিল।

যেতে দেবেন না ?

না।

মহেন্দ্র সাহা উঠে দাঁড়ায়। বোধ করি ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়ায়।

শশব্যস্তে কস্তুরীবাঈ বলে ওঠে, চললেন কোথায় ?

কিন্তু জবাব দিতে গিয়েও জবাব দেওয়া হয় না মহেন্দ্র সাহার। ভৃত্য বৃন্দাবন ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢোকে।

হুজুর—হাঁপাতে থাকে বৃন্দাবন।

অমন করে হাঁপাচ্ছিস কেন হারামজাদা, হয়েছে কি ?

রক্ত।

রক্ত ?

হ্যাঁ হুজুর, রক্ত !

কি বলছিস হতভাগা। রক্ত কি ?

শিগ্‌গিরি চলুন হুজুর, রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে ? কোথায় ? কে ?

ঐ ঘরে হুজুর, যে ঘরে—সেই তিনি। ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল তুলে দিতে বলেছিলেন হুজুর, দিয়েছিলাম। একটু আগে খাবার নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে দেখি, মেঝেতে তিনি পড়ে আছেন আর রক্তে সারা ঘরের মেঝে থৈ থৈ করছে—।

হঠাৎ মেজাজ যেন তিরিক্ষি হয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহার।

ভৃত্য বৃন্দাবনের দিকে চেয়ে মুখ ভেংচে কর্কশকণ্ঠে বলে ওঠে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তো আমি কি করবো ?

হুজুর—চলেন একবার !

মিনতি জানায়, যেন কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে বৃন্দাবন।

ধমক দিয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহা বৃন্দাবনকে। যা, যা—দেখগে, যদি মরে গিয়ে থাকে তো দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে পা ধরে টেনে গঙ্গায় গিয়ে ফেলে দিয়ে আয়। যত সব ঝুট ঝামেলা।

কস্তুরীবাঈ এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র সাহা ও বৃন্দাবনের কথাবার্তা শুনছিল। ব্যাপারটা সে কিছুটা আন্দাজ করলেও ঠিক বুঝতে পারে নি।

কিন্তু আর সে যেন চুপ করে থাকতে পারে না। বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে শুধায়, কি হয়েছে?

বৃন্দাবন কস্তুরীবাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে, তা সে-ই জানে, তবে সেখানে যেন আশ্বাসের একটা আলো দেখতে পায়।

বলে, ক্ষীরোদা বোধ হয় এতক্ষণ মরেই গেছে বাঈজী সাহেবা।

ক্ষীরোদা! ক্ষীরোদা কে?

বিস্ময়ে প্রশ্ন করে কস্তুরীবাঈ।

বৃন্দাবন যেন কি জবাবে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ওঠে মহেন্দ্র সাহা, বৃন্দাবন, এই হারামজাদা, গেলি এখান থেকে?

বৃন্দাবন ঘুরে দাঁড়ায়, বোধ করি ঘর থেকে অতঃপর বের হয়ে যাবার জন্যই।

কিন্তু পশ্চাৎ থেকে ডাকে কস্তুরীবাঈ, দাঁড়াও বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন সে ডাকে আবার দাঁড়াল।

চল, আমি দেখে আসি—

আপনি যাবেন বাঈজী সাহেবা?

হ্যাঁ, চল।

তুমি আবার কোথায় যাবে কস্তুরী? বাধা দেয় মহেন্দ্র সাহা।

কস্তুরী কিন্তু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, বৃন্দাবনকে বলে, চল।

তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি কস্তুরী? একটা সামান্য দাসীর কি হয়েছে না হয়েছে—ও বৃন্দাবন আর দারোয়ানই ব্যবস্থা করতে পারবে।

মৃদু হেসে মহেন্দ্র সাহার মুখের দিকে তাকিয়ে কস্তুরী বলে, হয়ত পারবে, তবু একবার দেখে আসি সাহা মশাই—

না, না—

কিন্তু কস্তুরীবাঈ আর কোন জবাব দেয় না। মহেন্দ্র সাহার দিকে ফিরেও তাকায় না, ঘর থেকে সোজা বের হয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে মহেন্দ্র সাহা।

বৃন্দাবনের পিছনে পিছনে ঘরের মধ্যে ঢুকে সামনের মেঝেতে দৃষ্টি পড়তেই যেন হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে যায় কস্তুরীবাঈ।

মেঝেতে লাল রক্তের যেন একেবারে বন্যা বয়ে চলেছে এবং সেই রক্তবন্যার মধ্যে পড়ে এক নারী ছট্‌ফট্ করছে।

জ্ঞান বোধ হয় ফিরে এসেছে তখন ক্ষীরোদার, গোঙানির মত একটা মৃদু যন্ত্রণার কাতরোক্তি করছিল থেকে থেকে।

হঠাৎ ঐ অত রক্ত দেখে কস্তুরীর মাথাটা বুঝি মুহূর্তের জন্য ঝিম্ ঝিম্ করে উঠেছিল। তার পরই সে সম্বিৎ পেয়ে সব কিছু ভুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সেই রক্তের মধ্যে পরিধেয় দামী শাড়িটা নিয়ে বসে পড়ল ভূলুণ্ঠিতা ক্ষীরোদার শিয়রের সামনে। ধীরে ধীরে ক্ষীরোদার মাথাটা নিজের কোলের ওপরে তুলে নিল।

ক্ষীরোদা!

মৃদু মমতাভরা কণ্ঠে ডাকে কস্তুরী।

কে?

অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকাল ক্ষীরোদা।

নারী হয়ে কস্তুরীর ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হয় নি খুব। অত রক্ত আর ক্ষীরোদার অবস্থা দেখেই অনুমানে বুঝতে পেয়েছিল কস্তুরী, অন্তঃসত্ত্বা ছিল ক্ষীরোদা, হঠাৎ পড়ে গিয়েই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক অতর্কিত আঘাতে গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে। ঐ অত রক্তস্রাব তারই ইঙ্গিত।

কস্তুরীবাঈয়ের অনুমানটা মিথ্যা নয়। সত্যিই ক্ষীরোদা অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

ক্ষীরোদা!

উঁ!

আবার অতি কষ্টে যেন চোখ মেলে তাকাল ক্ষীরোদা কস্তুরীর মুখের দিকে। ক্ষণকাল ঝাপ্‌সা চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে শুধায়, তুমি কে?

আমি কস্তুরী বাঈজী।

নষ্ট হয়ে গিয়েছে, না?

কি জবাব দেবে কস্তুরী ক্ষীরোদার ঐ প্রশ্নের!

তাই ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অন্য প্রসঙ্গ তোলে, বড় কষ্ট হচ্ছে কি ক্ষীরোদা?

কষ্ট! না তো।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্র সাহা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

অত রক্ত আর ক্ষীরোদার ঐ অবস্থা দেখে তখন তার গলাটা শুকিয়ে উঠেছে, মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে।

কস্তুরী মহেন্দ্র সাহার দিকে তাকিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে দেখছেন কি সাহা মশাই —একজন কবিরাজ শিগ্‌গির ডেকে নিয়ে আসুন—

মহেন্দ্র সাহা কোনমতে যেন টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে কস্তুরী বলে, একটা শাড়ি বা ধুতি নিয়ে আসতে পার বৃন্দাবন!

এখুনি আনছি—

বৃন্দাবন পাশের ঘরে গিয়ে পোর্টম্যান্‌টো-ভর্তি যে সব দামী দামী শাড়ি ছিল মহেন্দ্র সাহার ক্ষীরোদাকে দেওয়া, তার থেকেই একটা শাড়ি বের করে নিয়ে এলো।

এই নিন—

বৃন্দাবন শাড়িটা কস্তুরীর হাতে দিল।

কস্তুরী অনেক কষ্টে ক্ষীরোদার পরিধেয় রক্তমাখা শাড়িটা বদলে আবার বৃন্দাবনকে ঘরে ডাকলো।

ওকে একটু ধর আমার সঙ্গে বৃন্দাবন—চল ঐ পালঙ্কের ওপরে শুইয়ে দিই—

ধরা-ধরি করে দুজনে ক্ষীরোদাকে পালঙ্কের ওপরে শুইয়ে দিল।

যাও বৃন্দাবন, বালতি করে জল এনে রক্তটা ধুয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেল। পারবে?

পারব—বৃন্দাবন বলে।

ঘণ্টাখানেক বাদে মহেন্দ্র সাহা একজন কবিরাজকে সঙ্গে করে এসে ঢুকল।

কবিরাজ ক্ষীরোদার নাড়ী পরীক্ষা করে মাথা নেড়ে বললেন, গর্ভপাত—

মহেন্দ্র সাহা চকিতে তাকায় কবিরাজের মুখের দিকে।

নাড়ীর গতি অতীব ক্ষীণ—

উৎকণ্ঠিতা কস্তুরী কবিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়, বাঁচবে তো কবিরাজ মশাই?

বলা দুঃসাধ্য। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রোগিণী অতীব দুর্বলা হয়ে পড়েছেন—আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, প্রহরে প্রহরে সেই ঔষধ খাইয়ে যান—

কবিরাজ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ক্ষীরোদা আবার তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

তিন দিন তিন রাত্রি এক ভাবে কস্তুরী ক্ষীরোদার শিয়রের ধারে বসে রইলো।

যাবার কথা সে যেন ভুলেই গিয়েছিল।

স্নান নেই, আহার নেই, ক্লান্তি নেই যেন কস্তুরীবাঈয়ের।

চতুর্থ দিন রাত্রে ক্ষীরোদা চোখ মেলে তাকাল।

আমি কোথায় ?

ক্ষীরোদার কপালে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে কস্তুরী বলে, ঘরেই আছো তুমি।

কোথায় ?

সাহা মশাইয়ের বাগানবাড়িতে।

ক্ষীরোদা ক্লান্তিতে আবার চক্ষু বোজে।

কিছু খাবে ক্ষীরোদা ?

একটু জল !

কস্তুরী জলপান করায় ক্ষীরোদাকে।

আর খাবে ?

আর একটু। তুমি কে ?

আমি বাঈজী কস্তুরী—

একটু পরে হঠাৎ ক্ষীরোদা ফু পিয়ে ফু'পিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

ছি, কাঁদে না !

সযত্নে ক্ষীরোদার চোখের জল মুছিয়ে দেয় নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে কস্তুরীবাঈ।

কেন, কেন তুমি আমাকে বাঁচালে ?

মরতে চাও ক্ষীরোদা ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—মরতে দিলে না কেন আমাকে ? কেন আমাকে বাঁচালে ?

কিন্তু তাতেই কি তুমি শান্তি পেতে ক্ষীরোদা ?

পেতাম। নিশ্চয়ই পেতাম।

বুঝতে পারছি ভাই, এ তোমার নিছক অভিমানের কথা। কিন্তু কার উপরে অভিমান তোমার বল তো ! ঐ পশু মহেন্দ্র সাহার ওপরে ?

না, না, ওর কাছে তো আমি স্বেচ্ছায়ই এসে ধরা দিয়েছিলাম।

স্বেচ্ছায় এসে দেহটাই তোমার ধরা দিয়েছিল ক্ষীরোদা, মনটা তো ধরা দেয় নি তোমার। তাছাড়া মরবেই বা কেন তুমি ?

মরবো না তো কি নিয়ে বেঁচে থাকবো ! আমার যে আর কিছু নেই—সর্বস্ব একজন কেড়ে নিয়েছে।

ওসব কথা এখন থাক। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

ক্ষীরোদার দু' চোখের কোণ বেয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ছি, আবার কাঁদে! কেঁদো না লক্ষীটি। চুপ করো।

আরো দুই দিন পরে।

ক্ষীরোদা অনেকটা সুস্থ হয়েছে।

উঠে বসতে পারে।

সন্ধ্যার দিকে চুপচাপ শয্যার ওপরে বসে জানালা-পথে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে ছিল।

কস্তুরী এসে ঘরে ঢুকল, কিন্তু ক্ষীরোদা টেরও পায় না।

মৃদুকণ্ঠে ডাকে কস্তুরী, ক্ষীরোদা—

দিদি!

এবারে তাহলে চলি ক্ষীরোদা।

তুমি চলে যাবে?

হ্যাঁ, আট দিন হয়ে গেল বাড়ি ঘর ছেড়ে পড়ে আছি এখানে।

না, না—তুমি যেও না—

হাত বাড়িয়ে ক্ষীরোদা কস্তুরীর ডান হাতটা চেপে ধরে।

না গেলে চলবে কেন ভাই! সাহা মশাই এখানে আমাকে চিরদিন থাকতে দেবে কেন?

নিশ্চয়ই দেবে—

পাগল!

তবে তুমি আমাকে নিয়ে চল।

নিয়ে যাবো, কোথায়?

তোমার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি?

কেন, তোমার বাড়িতে!

আমার বাড়ি? বাড়ি আমার কোথায় ক্ষীরোদা। বাঈজী আমি, আজ এখানে কাল সেখানে—যখন যে ডাকে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে নেচে বেড়াই—

তুমি যেখানে যাবে সেখানে যাবো। তোমার দাসীর কাজ করে দেবো। আমাকে নিয়ে চল।

ছি, তা কি হয়?

কেন হবে না? খুব হবে।

না। তা হয় না। তাছাড়া যে অপমানের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য

এ জায়গা ছেড়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইছো ক্ষীরোদা, সে জ্বালা তো তোমার আমার কাছে গেলেও নিভবে না। দুঃখ করো না—দুঃখ, বেদনা আর লজ্জা সইবার জন্যই তো আমাদের মেয়েদের জীবন।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে কস্তুরী ক্ষীরোদার।

কস্তুরীবাঈ চলে গেল। এবং কস্তুরী চলে যাবার পরদিনই সন্ধ্যায় মহেন্দ্র সাহা ন'দিন পরে এসে ক্ষীরোদার ঘরে ঢুকলো।

একটা কথা বলছিলাম ক্ষীরোদা।

কি!

এখানে আর তোমার থাকা চলবে না।

সাহা মশাই!

আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে ক্ষীরোদা।

হ্যাঁ ক্ষীরোদা—কাল বা পরশু চলে যেতে হবে তোমাকে।

কিন্তু কোথায় যাবো আমি?

কোথায় যাবে তার আমি কি জানি? যেখানে মন চায় তোমার যাবে। তবে একেবারে শূন্য হাতে তোমাকে আমি যেতে বলছি না—বলতে বলতে একটা রুমালে বাঁধা কিছু টাকা জামার পকেট থেকে বের করে ক্ষীরোদার শয্যার ওপরে নামিয়ে রাখল মহেন্দ্র সাহা—এই টাকা দিচ্ছি, বুঝে খরচ করতে পারলে কটা মাস চলে যাবে তোমার—

না, না—ও টাকা আমি চাই না। দয়া করুন—আমাকে দয়া করুন। এভাবে অসহায় আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

ভয় পাচ্ছো কেন ক্ষীরোদা, শরীরটা ভেঙেছে—ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলে আবার মানুষ একজন ঠিক তোমার জুটে যাবে—

মহেন্দ্র সাহার শেষের কথাগুলো যেন এক একটা চাবুকের মতই ক্ষীরোদার সর্বাঙ্গে সপাং সপাং করে পড়লো।

একটি কথাও ওর মুখ দিয়ে বের হয় না।

বোবা দৃষ্টিতে মহেন্দ্র সাহার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কেবল।

তাহলে ঐ কথাই রইলো—বলে মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

শেষ এবং চরম কথাটা জানিয়ে দিয়ে মহেন্দ্র সাহা ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং ক্রমশঃ এক সময় দরজার বাইরে অন্ধকার-পথে মহেন্দ্র সাহার পায়ের ভারী জুতোর শব্দটা মিলিয়েও গেল।

ক্ষীরোদা যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইলো। তার সমস্ত বোধশক্তি যেন তখন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। সমস্ত চেতনা কোন এক অতল অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। কোন রকম অনুভূতিই আর নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছে।

গত ক'মাসেই মহেন্দ্র সাহাকে চিনেছিল ক্ষীরোদা।

একটি মাত্র দৃষ্টিতেই মহেন্দ্র সাহা চিরদিন সমস্ত স্ত্রী-জাতটাকে দেখে এসেছে। একটি মাত্র প্রয়োজনই ছিল মহেন্দ্র সাহার কাছে স্ত্রী-জাতির, এবং সে প্রয়োজনটা যেমন স্পষ্ট তেমনি স্থূল—স্ত্রীলোকের স্থূল দেহটা, রক্ত-মাংসের স্থূল দেহটা, তাই সে নিত্য নতুন স্ত্রীলোকের সন্ধানে ফিরত।

সে জন্য সে খরচ করতেও অবিশ্যি যেমন দ্বিধা করতো না তেমনি প্রয়োজনটা মিটে গেলে অর্থাৎ সেই নারীকে কিছুদিন ভোগ করার পরই তাকে ত্যাগ করতেও কোন রকম সংকোচ ছিল না তার।

ক্ষীরোদার আগে আরো অনেক নারীই মহেন্দ্র সাহার জীবনে এসেছে এবং কাউকেই সে দুই থেকে ছয় মাসের বেশী আঁকড়ে থাকে নি।

সে রাত্রের ঐ ব্যাপারটা না ঘটলেও ক্ষীরোদাকে যেতেই হতো, কারণ তার প্রয়োজন মহেন্দ্র সাহার কাছে প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল আর সেই কথাটাই কিছুদিন ধরে চিন্তা করছিল মহেন্দ্র সাহা।

আকস্মিক একটা দুর্ঘটনায় কেবল সেটা কিছুদিন পিছিয়ে গিয়েছিল মাত্র।

তাই ক্ষীরোদার কাছে ব্যাপারটা যতই আকস্মিক হোক, মহেন্দ্র সাহার দিক থেকে কোন আকস্মিকতাই ছিল না।

কথাটা জানিয়ে দিতেও তাই মহেন্দ্র সাহার কোন রকম দ্বিধা বা সংকোচ হয় নি।

কিন্তু ক্ষীরোদা সত্যিই যেন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল মহেন্দ্র সাহার স্পষ্ট কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে।

ব্যাপারটা যেন তার কল্পনারও অতীত ছিল। কারণ একদিন মহেন্দ্র সাহা তাকে চেয়েও পায় নি। প্রচুর অর্থ ও ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়েও ক্ষীরোদার

মত সামান্য এক মেয়ের মনকে টলাতে পারে নি।

যার ফলে মহেন্দ্র সাহার জিদটা যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

ক্ষীরোদা দিনের পর দিন যত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মহেন্দ্র সাহা যেন ততই ক্ষীরোদাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

কোথায় ধনী ব্যবসায়ী মহেন্দ্র সাহা আর কোথায় অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক ব্রাহ্মণ হরনাথ মিশ্র।

মহেন্দ্র সাহা সত্যি কথা বলতে কি ভেবে পায় নি, প্রৌঢ় হরনাথের মধ্যে এমন কি পেয়েছিল ক্ষীরোদা যাতে করে সে কখনো ফিরেও তাকায় নি মহেন্দ্র সাহার দিকে।

কিন্তু মহেন্দ্র সাহা জানতেও পারে নি, বুঝতেও পারে নি, হরনাথের কাছে বাঁধা পড়েছিল ক্ষীরোদা নেহাত মনেরই দিক থেকে।

মহেন্দ্র সাহার কাছে পুরুষের একটা দিকই বরাবর স্পষ্ট—ছিল তার টাকাকড়ি, ঐশ্বর্য ও শক্তি। কিন্তু পুরুষের ঐ ঐশ্বর্য বাদ দিয়েও যে আর একটা দিক থাকতে পারে তার নারীর কাছে, সেটা জানত না বলেই মহেন্দ্র সাহা বুঝতে পারে নি ক্ষীরোদার মনের কোথায় বাঁধন পড়েছিল, অতি সাধারণ প্রৌঢ় হরনাথ কোথায় ক্ষীরোদাকে আকর্ষণ করেছিল।

মহেন্দ্র সাহা জানত না যে নারীর মনের মধ্যে ভালবাসা বলে একটা বস্তু আছে এবং সেই ভালবাসাই তাকে হরনাথের গৃহে বেঁধে রেখেছিল।

আর মহেন্দ্র সাহা বুঝতেও পারে নি ক্ষীরোদা যে একদিন স্বেচ্ছায় তার কাছে ছুটে এসেছিল দিক্‌বিদিক্ হারিয়ে, সে-ও ঐ ভালবাসার ভিতরটা অকস্মাৎ গুঁড়িয়ে গিয়েছিল বলেই।

অথচ মহেন্দ্র সাহা সে রাত্রে তার গৃহে ক্ষীরোদাকে দেখে ভেবেছিল, বুঝি এতকাল পরে ক্ষীরোদার ভুল ভেঙেছে। আর তাইতেই হরনাথকে ত্যাগ করে ক্ষীরোদা তার এখানে চলে এসেছে। মনে মনে হেসেছিলও মহেন্দ্র সাহা। হেসেছিল সে দুটি কারণে।

প্রথমত সে ভেবেছিল এতকাল পরে ক্ষীরোদার ভুল ভেঙেছে, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা সে বুঝতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত যে ক্ষীরোদা এতকাল তাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষীরোদাকেই স্বেচ্ছায় যেচে তার কাছে এসে ধরা দিতে হলো।

ক্ষীরোদাকে মহেন্দ্র সাহা এতদিন পরে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে এই আনন্দেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। সে বুঝতে পারে নি ক্ষীরোদা তার মুঠোর

মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে নিছক একটা দুরন্ত অভিমানের তাড়নাতেই এবং ঐ ধরা দেওয়া আদৌ ধরা দেওয়া নয়। মুঠি যতই সে শক্ত করুক সে মুঠির মধ্যে ক্ষীরোদা বাঁধা পড়বে না।

সত্যিই ক্ষীরোদা সেদিন রাত্রে দুরন্ত একটা অভিমানের বশেই গঙ্গার জল থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে হাঁটতে হাঁটতে অনির্দিষ্ট ভাবেই মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়ির জলসাঘরে এসে ঢুকে পড়েছিল। ভাল মন্দ বিবেচনাটুকুরও কোন ক্ষমতা বুঝি ঐ মুহূর্তে ছিল না তার। তাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সহসা সামনে মহেন্দ্র সাহাকে দেখে মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিল এবং মূর্ছাভঙ্গের পরও যে সে মহেন্দ্র সাহার গৃহ থেকে অন্যত্র চলে যায় নি সেও দুরন্ত সেই অভিমানেই।

দুরন্ত অভিমানে অন্ধ হয়েই বুঝি নিজেকে সে সমর্পণ করেছিল মহেন্দ্র সাহার লালসার গহ্বরে। কিন্তু তারপর যা স্বাভাবিক তাই হয়েছিল—অভিমানটা যখন থিতিয়ে এল তখন যে অনুশোচনা এল তা যেমনি অবর্ণনীয় তেমনিই করুণ।

এ কি করলো সে! দুরন্ত অভিমানের মোহে এ সে অকস্মাৎ কি করে বসল? দিনের পর দিন তিলে তিলে সে দগ্ধ হয়েছে, সেই অনুশোচনায় তারপর।

মহেন্দ্র সাহার পাশবিক আলিঙ্গনের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থেকেছে আর অবিমিশ্র একটা ঘৃণার ক্লেদাক্ত অনুভূতি যেন তাকে প্রতি মুহূর্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, নিজেকে নিজে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছে।

অথচ উপায়ই বা কি! কোথায়ই বা সে আর যাবে! পৃথিবীর সমস্ত দ্বারই তো তার কাছে আজ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকী জীবনটা তার ঐ বিষের জ্বালাতেই জ্বলে থাক হতে হবে।

কিন্তু তখনও সে জানতে পারে নি, হরনাথের সন্তান তখন তার গর্ভে। হরনাথ তাকে বিতাড়িত করলেও তার বন্ধন তখনো তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

প্রথম যেদিন ক্ষীরোদা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল হঠাৎ যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছিল—বর্তমান—ভবিষ্যৎ—অতীত সব যেন তার চোখের সামনে থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল—তারপরই নেমে এসেছিল দু'চোখে অবিরল অশ্রুর ধারা, তার বুকের সমস্ত জ্বালা যেন অশ্রুর আকারে তার দু'চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছিল।

কি করবে এখন সে, কি করবে! কিন্তু ভগবানই বুঝি সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন সে রাত্রে। অবিশ্যি স্বপ্নেও ভাবে নি ক্ষীরোদা মীমাংসাটা এমনি এক নিষ্ঠুর পথে এসে দেখা দেবে।

কস্তুরীর শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাই তার বুঝি বারবার মনে হয়েছিল, এ তো সে চায় নি। এ তো সে চায় নি।

কিন্তু তার চাইতেও মর্মান্তিক, সে বুঝি স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি মহেন্দ্র সাহা অতঃপর তাকে এমনি করে তার আশ্রয় থেকে চলে যেতে বলবে। বুঝতে পারে নি এত তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র সাহার কাছে তার প্রয়োজনটা শেষ হয়ে যাবে। মহেন্দ্র সাহার কাছে সে এমনি করে এত তাড়াতাড়ি তুচ্ছ হয়ে যাবে, তার মূল্য শূন্যের কোঠায় এসে পৌছাবে।

কতক্ষণ বসেছিল ক্ষীরোদা অন্ধকারে চৌকিটার উপর খেয়াল হয় নি। সমস্ত চিন্তাটা যেন একটা জায়গায় এসে বরফের মতই জমাট বেঁধে গিয়েছিল।

একটা জলন্ত বাতি নিয়ে এসে ভৃত্য বৃন্দাবন ঘরে ঢুকল। এবং বাতিটা হাতে করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বাতির আলোয় ঐ ভাবে স্থাণুর মত ক্ষীরোদাকে শয্যার উপর বসে থাকতে দেখে কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর দু'পা এগিয়ে এসে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মা?

ইদানীং ক্ষীরোদাকে বৃন্দাবন মা বলেই ডাকত।

কি জানি কেন, বৃন্দাবন ঐ মেয়েটির প্রতি প্রথম দিকে, মহেন্দ্র সাহার বাগান-বাড়িতে অন্যান্য মেয়েরা যারা এসেছে, থেকেছে, তাদেরই প্রতি যেমন সে কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে নি, তেমনি মনটা তার বিশেষ প্রসন্ন ছিল না কিন্তু তার ওপর কেমন যেন একটু একটু করে স্নেহ পড়ে গিয়েছিল।

বোধ হয় তার কারণ ইতিপূর্বে মহেন্দ্র সাহার ঐ বাগানবাড়িতে যে সব নারী এসেছে তাদের থেকে ক্ষীরোদা ছিল স্বতন্ত্র।

এবং তার ঐ স্বাতন্ত্র্যই হয়ত ক্ষীরোদার প্রতি বৃন্দাবনের মনটাকে আকৃষ্ট করেছিল।

আগে যারা এসেছে, তারা হেসেছে, গেয়েছে, কেউ কেউ প্রথম প্রথম দু'চার দিন একটু আধটু মুখভার করে থাকলেও বা কান্নাকাটি করলেও পরে আবার সহজ হয়ে গিয়েছে।

দু'হাতে মহেন্দ্র সাহার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, গহনা নিয়েছে, শাড়ি নিয়েছে। কিন্তু ক্ষীরোদাকে বৃন্দাবনের মনে হয়েছে একেবারে স্বতন্ত্র যেন তাদের থেকে।

মহেন্দ্র সাহার দেওয়া কোন জিনিস সে স্পর্শও করতে যেন ঘৃণা বোধ করেছে। নেহাত না নিলে নয় তাই যেন নিয়েছে। শাড়ি পরেছে, গহনা পরেছে, কিন্তু

সেও সামান্য সময়ের জন্যই। মহেন্দ্র সাহা চলে যাবার পরই সব খুলে ফেলেছে আবার।

একদিন বৃন্দাবন না শুধিয়ে পারে নি। শুধিয়েছিল, ও কি, সব গা থেকে খুলে ফেললে কেন গো মেয়ে?

প্রথম প্রথম দু'চার দিন ক্ষীরোদা ও প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নি, তারপর একদিন বলেছে, ভাল লাগে না—

বৃন্দাবন কথাটা শুনে তো অবাক। বলে, সে কি গো—গয়না—শাড়ি ভাল লাগে না তোমার?

না—

তবে এখানে এলে কেন।

ঐ প্রশ্নের জবাব আর দিতে পারে নি ক্ষীরোদা বৃন্দাবনকে।

চুপ করে থেকেছে।

তারপরই একদিন ক্ষীরোদা বলেছে, তুমি নেবে এসব?

কি?

এই সোনার গহনা।

না, না—

তাতে কি, নাও—আমি তো দিচ্ছি—

কিন্তু—

নাও—

তবু বৃন্দাবন প্রথমটায় নিতে চায় নি।

বলেছে—না, না—কত্তাবাবু জানতে পারলে আমাকে কেটে ফেলবে।

ক্ষীরোদা বলেছে, কিন্তু জানবে কেমন করে বৃন্দাবন? নাও তুমি—

কিন্তু তুমিই বা দিচ্ছ কেন আমাকে এসব?

দিলামই বা, নাও—

শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি বৃন্দাবন, হাত পেতে নিয়েছে।

মনে মনে এও ভেবেছে, এ কেমনধারা মেয়েছেলে, নিজের শাড়ি গহনা পরকে বিলিয়ে দেয়।

এবং সেই থেকেই বৃন্দাবন ক্ষীরোদাকে মা বলতে শুরু করে।

হাতের বাতিটা একপাশে নামিয়ে রেখে বৃন্দাবন আবার শুধায়, অমন করে বসে আছো কেন মা? শরীরটা কি আবার খারাপ লাগছে?

ক্ষীরোদার দিক থেকে কোন জবাব আসে না। যেমনটি সে স্থাণুর মত

বসেছিল তেমনিই বসে থাকে।

বৃন্দাবন আবার শুধায়, কি হয়েছে মা? কথা বলছো না কেন?

ক্ষীরোদা ধীরে ধীরে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়াল এবারে।

বৃন্দাবন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ক্ষীরোদার মুখের দিকে।

বৃন্দাবন!

কেন মা?

আমি চলে যাচ্ছি—

চলে যাচ্ছো! কোথায়?

কোথায়!

হ্যাঁ, কোথায় যাবে?

তা তো জানি না। আমার ঐ ঘরে যা কিছু রয়েছে তুমি নিও।

ক্ষীরোদার শরীর তখনো রীতিমত দুর্বল।

তবু সেই দুর্বল শরীরেই কাঁপা কাঁপা পা ফেলে খোলা দরজার দিকে কথাটা বলতে বলতে এগিয়ে গেল ক্ষীরোদা।

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ কি করছো মা? কোথায় যাচ্ছো? দুর্বল, কাঁপছো, হাঁটতে পারছো না—

ক্ষীরোদা কোন জবাব দেয় না, খোলা দরজা-পথে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দাঁড়াও মা, দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো? বৃন্দাবন সামনে ছুটে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায় আবার।

তোমার বাবু বলেছেন, এখান থেকে আমাকে চলে যেতে—

সে কি!

হ্যাঁ—পথ ছাড়ো বৃন্দাবন, আমাকে যেতে দাও।

না, তা হয় না—তুমি ফিরে চল মা। কত্তাবাবুকে যা বলবার আমি বলবো।

বৃন্দাবন!

কেন মা?

কস্তুরীর বাড়িটা কোথায় জানো?

বাঈজী সাহেবার বাড়ি?

হ্যাঁ—

জানি।

আমাকে সেখানে একটু পৌঁছে দেবে ?

সেখানে তুমি কোথায় যাবে মা ? আশ্চর্য হয়ে শুধায় বৃন্দাবন।

আমাকে একটু পৌঁছে দেবে সেখানে তুমি ?

কিন্তু মা—

বৃন্দাবন যেন কি বলবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে ক্ষীরোদা বলে, চল, আমাকে সেখানে একটু পৌঁছে দেবে ?

কিন্তু মা, এই দুর্বল শরীরে সেখানে তুমি যাবে কি করে, সে তো কাছে পিঠে নয়, অনেকটা পথ। একটা বরং ডুলি বা পাল্কী—

না, না—তুমি চল, আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

এখান থেকে অনেকটা পথ মা—রামবাগান কি এখানে ?

ঠিক পারবো আমি—তুমি চলো।

কাল সকালে তোমাকে না হয় সেখানে আমি পৌঁছে দেবো মা—বৃন্দাবন বলে। এই রাত্রে তুমি কোথায় যাবে!

না, না—কাল সকালে নয়, এখুনি, এখুনি—অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে ক্ষীরোদা।

বৃন্দাবন মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে! তারপর বলে, বেশ—চল।

আবার পথে এসে নামল ক্ষীরোদা।

অন্ধকার রাস্তা। দুপাশে কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী।

মধ্যে মধ্যে দু-একটা গৃহস্থবাড়ির জানালা-পথে সামান্য আলোর আভাস চোখে পড়ে।

আগে আগে বৃন্দাবন ও পশ্চাতে ক্ষীরোদা পথ ধরে হেঁটে চলে।

দুর্বল শরীর ক্ষীরোদার। ক্লান্ত পা দুটো টেনে টেনে যেন হাঁটতে আর পারে না। পা দুটো যেন ভেঙে আসে। মাথাটার মধ্যে ঝিমঝিম করছে।

এক সময় বৃন্দাবন শুধায়, হাঁটতে কি কষ্ট হচ্ছে মা ?

না, না—তুমি চল, কিন্তু আর কত পথ ?

এখনো অনেকটা পথ মা।

এতক্ষণে সেই অন্ধকার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষীরোদার দু' চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ক্ষীরোদা হাঁটতে থাকে।

রাত প্রায় পৌনে দশটা নাগাদ ওরা এসে পৌঁছল কস্তুরীর গৃহের সামনে।

কিন্তু দ্বারের সামনে পৌঁছেই দুজনে থমকে দাঁড়াল।

দুয়ার বন্ধ।

এ যে দেখছি দরজা বন্ধ মা—তালা দেওয়া। বৃন্দাবন মৃদুকণ্ঠে বলে।

ক্ষীরোদার তখন আর দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। সে সেই বন্ধ দরজার সামনেই ধুলোতে বসে পড়ে। মাথাটা তখন ঘুরছে।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে বৃন্দাবন, কি—কি হলো মা?

কিন্তু ক্ষীরোদার জবাব দেবার মত তখন আর ক্ষমতা নেই, ধীরে ধীরে চোখের সামনে তার সব অন্ধকার হয়ে যায়।

পথের ওপরেই লুটিয়ে পড়ে ক্ষীরোদা জ্ঞান হারিয়ে পরমুহূর্তে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সুন্দর সাহেবের গৃহে আশ্রয় নিলেও শিবনাথ আগের মতই তার সহাধ্যায়ী বন্ধু বড়বাজার অঞ্চলে নরেন্দ্রনাথের গৃহে যাতায়াত করতো।

সুন্দর সাহেব যদিও তাকে বার বার বলে দিয়েছিল তার যখন যা দরকার কোন রকম দ্বিধা মাত্র না করে তাকে জানাতে—তথাপি শিবনাথ তাকে তার পাঠ্যপুস্তকের কথা জানাতে পারে নি।

পূর্বের মতই মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রনাথের ওখানে গিয়ে তার পাঠ্যপুস্তক দেখে যা পড়বার পড়ে আসত। শুধু যে পাঠ্যপুস্তকের জন্যই শিবনাথ নরেন্দ্রের গৃহে স্কুলের ছুটির পর যেতো তা নয়, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার নিবিড় একটা সৌহার্দ্য যেন গড়ে উঠেছিল।

নরেন্দ্র রীতিমত ধনী বংশের সন্তান।

বড়বাজার ও সুতানটীর আদি প্রতিষ্ঠাতা যে বাঙালী শেঠ, বসাক, মল্লিক, সিংহ, শীল, বড়াল প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা সে সময় বড়বাজার অঞ্চলে আধিপত্য করতো, তাদের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র মল্লিকের একমাত্র ছেলে ছিল নরেন্দ্র।

সুরেন্দ্র মল্লিকের বিশাল চৌহদ্দি জোড়া চারমহলা বাড়ি লোকজন অতিথি-অভ্যাগতদের নিয়ে যেন রম-রম করতো সর্বক্ষণ।

পূজামণ্ডপ, দালান, বাগান, পুকুর।

গঙ্গাতীরে নিজস্ব ঘাট পর্যন্ত যাবার তৈরী পাকা পথ।

দু'তিনখানা পাল্কী গাড়ি।

বার মাসের তের পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, ভোজ, খানাপিনা হৈ-হৈ ব্যাপার।

যদিও লটারী কমিটির উদ্যোগে ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী গ্রামগুলো তখন দীর্ঘকালের গ্রাম্য বেশ ছেড়ে অতি দ্রুত আধুনিক এক শহরের রূপ নিচ্ছে; কলকাতার পথ-ঘাট, জলা-জংগল, খাল-পুষ্করিণী এদিক ওদিক যা ছড়িয়ে ছিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে, অধিকাংশ মাটির ঘর ইট কাঠের বাড়িতে রূপান্তরিত হচ্ছে; তথাপি বড়বাজার অঞ্চলে চকমিলান বড় বড় বাড়ির কিন্তু অভাব নেই।

এবং অভাব ছিল না ঐ সময় কলকাতা শহরের ধনী ব্যবসায়ীদের দৌলতেই।

নরেন্দ্রের অনুরোধে নয় প্রথম দিন নিজের তাগিদেই শিবনাথ নরেন্দ্রের গৃহ অনুসন্ধান করতে করতে ঐ বিরাট চারমহলা বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল।

যে বাড়িতে তখন শিবনাথ থাকতো সেই অরিন্দম সরকারের ঘর বাড়ি ঐশ্বর্য নরেন্দ্রর পিতা সুরেন্দ্র মল্লিকের ঐশ্বর্যের তুলনায় কিছুই নয়।

ইতিপূর্বে নাম শুনলেও বড়বাজারে কখনো শিবনাথ পা দেয় নি।

চারিদিকেই যেন ধনী-ব্যবসায়ী শেঠ, বসাক, মল্লিকদের ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি।

সেদিনটা ছিল রবিবার, স্কুল বন্ধ।

বাড়ির সামনে এসে থমকে যখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে শিবনাথ, এমন সময় পাল্কী-গাড়িতে চেপে সুরেন্দ্র মল্লিক বের হয়ে আসছিলেন।

গাড়িটা আর একটু হলেই হুড়মুড় করে একেবারে শিবনাথের ঘাড়ের উপর এসে পড়তো, কিন্তু গাড়ির চালক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘোড়ার রাশ টেনে গাড়িটা থামিয়ে দেয়।

হঠাৎ গাড়িটা থামায় সুরেন্দ্র মল্লিক, প্রায় হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেন।

এই! কি হলো রে?

প্রশ্নটা করে গাড়ির জানালা-পথে মুখ বাড়াতেই পাশেই রাস্তার ওপরে দণ্ডায়মান শিবনাথের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের নজর পড়ে।

কে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

থতমত খেয়ে গিয়েছিল শিবনাথও। সে আমতা আমতা করে বলে, আজ্ঞে—

কি নাম তোমার?

আজ্ঞে শিবনাথ লাহিড়ী।

ব্রাহ্মণ!

আজ্ঞে—

কাকে চাও?

আজ্ঞে, এটাই কি সুরেন্দ্র মল্লিক মশাইয়ের গৃহ?

হ্যাঁ। আমিই—কি দরকার বল!

আমি নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় শিবনাথ।

সুরেন্দ্র মল্লিকের স্নেহমধুর কণ্ঠস্বরে শিবনাথের লুপ্ত সাহস অনেকটা তখন আবার ফিরে এসেছে।

নরেন্দ্র! তার সঙ্গে তুমি অধ্যয়ন কর বুঝি?

আজ্ঞে, আমরা একই শ্রেণীতে পড়ি।

হুঁ, যাও—ভিতরে সে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিচ্ছে।

কথাটা বলে আবার কি ভেবে সুরেন্দ্রনাথ একজন ভৃত্যকে ডেকে বললেন, ওরে, নরেন্দ্র যেখানে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সংস্কৃত পাঠ নিচ্ছে, এই ছেলেটিকে সেখানে নিয়ে যা—

ভৃত্যকে আদেশ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ আবার পাল্কীগাড়ি চালাতে বললেন, গাড়িটা চলে গেল।

ভৃত্যর সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দিকে অগ্রসর হলো শিবনাথ।

নরেন্দ্র সংস্কৃত পাঠ নিচ্ছে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে, কথাটা শুনে শিবনাথ একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল। কারণ পূর্বে সমাজে যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বা আরবী-ফারসী শিখে নবাব-সরকারের রাজকাজের যোগ্যতা অর্জন করতেন, তাঁরাই বিদ্বান ছিলেন বা বিদ্বৎসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ইদানীং কলকাতায় যাঁদের নিয়ে নতুন বিদ্বৎসমাজ গড়ে উঠছিল তাঁরা ইংরাজী-জানা লোক। কারণ ইদানীং তাঁদেরই যা কিছু যোগাযোগ ছিল ইংরাজ বিদ্বৎ-সমাজের সঙ্গে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেক দিন পর্যন্ত ইংরাজরা রাজকার্যাদি নবাবী আমলের রীতি অনুযায়ী চালিয়েছিল, আর্বী ও ফারসীরও যথেষ্ট কদর ছিল, কিন্তু ক্রমশ যখন তারা ঐ ভাষা বাতিল করে ইংরাজী ভাষার প্রচলন করতে লাগলো—আরবী-ফারসী যারা শিখেছিল তাদের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগলো এবং নতুন করে তাদের ইংরাজী শিখতে শুরু করতে হলো ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগটা বজায় রাখবার জন্য।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসীবিদ্ মৌলবী মুন্সী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা—যাঁরা শিক্ষকতা করে স্বচ্ছন্দে অর্থ উপার্জন করতেন, তাঁদেরও ক্রমশ একঘরে হয়ে যেতে হলো বিদ্বৎসমাজ থেকে।

যদিও তখন কেন্দ্রীয় মহানগরী কলকাতায় উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী বড়লাট লর্ড হেস্টিংস সংস্কৃত কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ করেছেন এই মনে করে যে, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা কলেজ প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হলেও ক্রমশ ঐ শিক্ষায়তনের মাধ্যমেই হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ইংরাজী শিক্ষারই প্রসার হবে।

তারপরও দুই বৎসর, ব্যাপারটা কাগজের পৃষ্ঠাতেই বন্দী হয়ে ছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নবগঠিত জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন এবং সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি একসঙ্গে হয়ে প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করবার সংকল্প করেন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীটের একটি ভাড়াটে বাড়িতে কলেজের পাঠ্যারম্ভ শুরু হয়।

অথচ ঐদিকে ইতিমধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনে ধর্মতলা ও চিৎপুরে ফিরিঙ্গী সরবোর্ণ ও ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল থেকে যা শুরু, তার পরিণতি হয়েছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার—আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট প্রভৃতির চেষ্টায় মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকলেজে।

তারপর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে স্কুল সোসাইটি সভা।

সব উদ্দেশ্য একই—নতুন প্রণালীতে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া।

ইংরাজী পঠন পাঠনের যুগ সেটা—সেই দিনে—সেই সময় নরেন্দ্র পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করছে শুনে শিবনাথের বিস্ময়ের সত্যিই যেন সীমা ছিল না।

ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বহির্মহলের একটি কক্ষ সংলগ্ন বারান্দায় এসে শিবনাথ দেখলো, পণ্ডিত বৃদ্ধ রামদুলাল তর্কচূড়ামণির কাছে বসে নিবিড় নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে নরেন্দ্র সারস্বত ব্যাকরণ পাঠ নিচ্ছে। শিবনাথকে আসতে দেখে স্মিত হেসে নরেন্দ্র বলে, আয় বোস—

তর্কচুড়ামণির গৌরবর্ণ, দেবদুর্লভ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত ললাট ও চক্ষু শিবনাথের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করে।

সে পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করে সামনে বসে।

পণ্ডিত মশাই হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন, মঙ্গল হোক।

তারপর নরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই ছেলেটি?

নরেন্দ্র বলে, আমার সহাধ্যায়ী, একই স্কুলের আমরা ছাত্র।

কি নাম?

শিবনাথ লাহিড়ী।

ব্রাহ্মণ ?

আজ্ঞে—

আরো দু'একটা কথার পর তর্কচূড়ামণি বললেন, ব্রাহ্মনসন্তান, তুমি কেবল ইংরাজীই শিক্ষা করছ ? সংস্কৃত অধ্যয়ন করো না ?

শিবনাথ মাথা নীচু করে বসে থাকে।

তর্কচূড়ামণি বললেন সস্নেহে, দেশের আদি ভাষাটা শিক্ষা করবে না কেবল বিদেশী ম্লেচ্ছ ভাষাই শিক্ষা করবে, এ মনোবৃত্তি কেন হে শিবনাথ ?

শিবনাথ তথাপি নিশ্চুপ।

সেদিনকার পাঠ শেষ হয়েছিল, তর্কচূড়ামণি গাত্রোত্থান করতে করতে মৃদু হেসে শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, সংস্কৃত ভাষার মধ্যেও অনেক মহামূল্য রত্ন আছে হে শিবনাথ, অধ্যয়ন করে দেখো—

তর্কচূড়ামণি অতঃপর কাষ্ঠ পাদুকার শব্দ তুলে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

শিবনাথ এতক্ষণ কোন কথা বলে নি বটে কিন্তু এখন বলে, তুই সংস্কৃত পড়িস নরেন—

কি করবো, বাবা ছাড়েন না—

তাহলে কি তুই এরপর সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি হবি নাকি রে ? বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে শিবনাথ।

দেখি—বাবা যা বলবেন—

তাহলে তুই হিন্দু কলেজে পড়বি না ?

এখন কি করে বলি ?

আমি কিন্তু হিন্দু কলেজেই ভর্তি হবো।

হিন্দু কলেজে ভর্তি হবি ?

হ্যাঁ—কেন জানিস ?

কেন ?

ডিরোজিও সেখানে শিক্ষক।

নরেন্দ্র নামটা শুনে কেমন যেন একটু আশ্চর্যই হয়, কারণ তখন পর্যন্ত ঐ নামটা সে শোনে নি। তাই বোধ করি বোকার মতই প্রশ্ন করে, ডিরোজিও কে ?

জানিস না তুই ডিরোজিও কে ?

না, তুই তাকে চিনিস নাকি, কে লোকটা ?

চিনি না তবে দেখেছি।

দেখেছিস !

হ্যাঁ।

কোথায় ?

ড্রামণ্ড সাহেবের বাড়িতে—

ড্রামণ্ড সাহেব ? সে আবার কে রে ?

তুই দেখছি কোন খবরই রাখিস না নরেন—ড্রামণ্ড সাহেবই তো ধর্মতলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। ঐ ড্রামণ্ড সাহেবেরই ছাত্র ডিরোজিও—ঐ ধর্মতলা একাডেমি থেকে শিক্ষালাভ করে এই তো মাত্র কয়েক মাস হলো হিন্দু কলেজের শিক্ষক হয়েছে ডিরোজিও—

নরেন্দ্র আবার প্রশ্ন করে, লোকটা বুঝি সাহেব ?

না, ফিরিঙ্গী—তুই তো দেখেছিস ধর্মতলায় বাগান, পুকুর মস্ত বড় চৌহদ্দি নিয়ে লাল রংয়ের দোতলা বাড়িটা—মনে পড়ে ? ঐ যে রে—জীবনকৃষ্ণর বাড়িতে যেতে পড়ে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে—

সেই বাড়িতেই তো ডিরোজিও থাকে। জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে ডিরোজিওর আলাপ আছে—

সত্যি !

হ্যাঁ—জীবনকৃষ্ণও শিগ্‌গিরী নাকি হিন্দু কলেজে ভর্তি হবে—জানিস ?

জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবনাথ ও নরেনের সহাধ্যায়ী। তার বাড়ি বৌবাজারে।

জীবনকৃষ্ণও ধনীর সন্তান। জীবনকৃষ্ণর বাবা কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার কলকাতার ইংরেজ সমাজে যে সব বাঙালী বেনিয়ানদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন।

ককরেল ট্রেস এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান কালীকৃষ্ণ। বৌবাজার অঞ্চলে তাদের তিনমহলা বাড়ি।

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা নয়।

জীবনকৃষ্ণর সঙ্গেই একদিন শিবনাথ ডিরোজিওর গৃহে গিয়েছিল সন্ধ্যায়। সেখানে তখন একটা বিতর্ক সভা চলেছিল।

মহাপাঠশালা বা হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র ঘিরে ছিল ডিরোজিওকে। মানুষটার দিকে তাকিয়ে শিবনাথের মনে হয়েছিল যেন অরুণবহ্নি।

মনে হয়েছিল যেন ঝকঝকে একটা তলোয়ার। গোলালো মুখ—ঝাঁকড়া

ঝাঁকড়া চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা, আর কি সতেজ মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

মানুষ আর ঈশ্বর নিয়ে সেদিন তর্ক চলেছিল। ডিরোজিওর সেদিনকার কয়েকটা কথা আজও যেন শিবনাথ ভুলতে পারে নি।

ঈশ্বর—ভগবান, যদি কেউ থাকেন তো থাকুন। আর যাদের জীবনে অফুরন্ত অবসর আছে তার স্বর্গলোক কোথায় এবং সেখানে কোথায় ঈশ্বর বসে আছেন —খুঁজে বেড়াক তারা। কিন্তু ইহজীবনে আমি বলবো মানুষই ঈশ্বর, মানুষই তার সর্বময় প্রভু বা কর্তা এবং মানুষের চিন্তাই ঈশ্বরচিন্তা। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর পৃথিবীতে কিছু নেই।

চিরদিনের সংস্কার বুদ্ধি ও জ্ঞানের ওপরে এ যেন তীব্র কুঠারাঘাত। তাই প্রথমটায় চমকে উঠেছিল শিবনাথ ঐ সব কথা শুনে।

ঈশ্বর বলে কোন বস্তু নেই, মানুষই ঈশ্বর। পথে আসতে আসতে সেদিন শিবনাথ জীবনকৃষ্ণকে শুধিয়েছিল, কথাটা তুই বিশ্বাস করিস জীবনকৃষ্ণ?

জীবনকৃষ্ণ বন্ধুর প্রশ্নের স্পষ্টাস্পষ্টি উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে কথাটা বলেছিল, তুই বিশ্বাস করিস না শিবনাথ।

থতমত খেয়ে গিয়েছিল শিবনাথ পাল্টা প্রশ্নে, আমি?

হ্যাঁ, বিশ্বাস করিস না?

আমি মানে—

বল না বিশ্বাস করিস কি না?

না। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল শিবনাথ।

এবারে আর অস্পষ্টতা কিছু ছিল না জীবনকৃষ্ণের কথায়, সে স্পষ্টকণ্ঠে বলেছিল, কিন্তু আমি করি—

করিস?

হ্যাঁ, ডিরোজিও মিথ্যা বলে না। ঠিকই বলে। যেটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে কেবলমাত্র কল্পনারই তাকে আমি মেনে নিতে পারি না আর কেনই বা মেনে নেব—।

জীবনকৃষ্ণের দৃঢ়কণ্ঠের জবাবে এবারে যেন পরম বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকিয়েছিল শিবনাথ চমকে উঠে ওর মুখের দিকে।

জীবনকৃষ্ণ!

কি?

তোর বাবা মা জানেন এসব কথা? ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করেছিল সেদিন বন্ধুকে শিবনাথ।

কোন্ কথা?

ভয়ে ভয়ে যেন সংশয় ও দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে শিবনাথ আবার শুধিয়েছিল, এই যে তুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করিস না!

হো হো করে হঠাৎ হেসে উঠেছিল জীবনকৃষ্ণ, তারপর হাসতে হাসতেই বলেছিল, জানি না—জানে কি না। তবে এও ঠিক জানলেও কোন ক্ষতি নেই আমার। তার পরই গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, যুক্তি দিয়ে যা সত্য বলে মনে জেনেছি তাকে সকলের কাছেই স্বীকার করবার মত সাহস আমার আছে শিবনাথ, এমন কি মা-বাবার কাছেও।

আচ্ছা জীবনকৃষ্ণ?

কি?

তোদের বাড়িতে তো তুই-ই বলেছিস দোল-দুর্গোৎসব হয়, গৃহ-দেবতাও আছেন, আছেন রাধা-কৃষ্ণ—

আছে।

সেই সব পূজাদি ও দেবতা তোর কাছে তাহলে মিথ্যা?

হ্যাঁ—ও সবকিছুই আমি অন্ধ কুসংস্কার বলেই মনে করি—

এর পর আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নি জীবনকৃষ্ণকে শিবনাথ, কেমন একটা ভয়ে যেন বুকটা কেঁপে উঠেছিল।

জীবনকৃষ্ণকে তার পর থেকে সাধ্যমত সে এড়িয়েই গেছে সত্যি, কিন্তু তবু স্কুলে তার সঙ্গে চোখোচোখি হলেই তার প্রতি কি যেন এক অজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করেছে।

নরেন্দ্র ব্রাহ্মণসন্তান না হলেও নিষ্ঠাবান হিন্দু কায়স্থের সন্তান। এবং শিবনাথের মনে হলো সে যেন জীবনকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সে ইংরাজী স্কুলে পড়ে ইংরাজী শিক্ষা করলেও বাপের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে সে ইংরাজীর সঙ্গে সংস্কৃতও অধ্যয়ন করছে।

মনের মধ্যে স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে যেন শিবনাথের, তবে কে সত্য? নরেন্দ্রনাথ না জীবনকৃষ্ণ?

হঠাৎ নরেন্দ্রর প্রশ্নে যেন চমকে ওঠে শিবনাথ।

কি ভাবছিস রে শিবনাথ?

অ্যাঁ। কই কিছু না তো।

এমন সময় ভৃত্য এসে জানালো নরেন্দ্রকে, তার জননী দুর্গা দেবী অন্দরে

ডাকছেন।

নরেন্দ্র বলে, চল শিবনাথ, মা ডাকছেন।

শিবনাথের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নরেন্দ্রের আগ্রহে তাকে অন্দরে যেতেই হলো তার সঙ্গে। এবং সেই দিনই প্রথম সেই দেবী প্রতিমার মত দুর্গা দেবীকে দেখে শিবনাথ। মা তো নয় যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী।

॥ ২ ॥

ভাঁড়ারের সামনে দরদালানে বসে দুর্গা দেবী রাত্রির জন্য তরকারী কুটছিলেন বঁটি পেতে।

পরিধানে একটা লাল চওড়া পাড় শাড়ি। কপালে একটি বড় সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতেও ডগডগে সিঁদুর। অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কিছুটা কেশরাশি বক্ষের ওপর নেমে এসেছে। খালি গা। হাতে শাঁখা, লোহা ও মোটা সোনার হাঙ্গরমুখী কঙ্কণ। গায়ের রঙ টকটকে গৌরবর্ণ।

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শিবনাথ সেদিন দুর্গা দেবীর দিকে তাকিয়ে।

সত্যিই যেন মা দুর্গা।

মা—

মা ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দুর্গা দেবী বঁটিটা রেখে উঠে দাঁড়ান, নরেন—আয় বাবা—এবং নরেন্দ্রকে সম্বোধন করতে গিয়েই তাঁর নজরে পড়ে পুত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিবনাথের প্রতি।

এ ছেলেটি কে রে নরেন? দুর্গা দেবী পুত্রকে শুধান।

আমার সহাধ্যায়ী মা—শিবনাথ লাহিড়ী—

শিবনাথ ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে দুর্গা দেবীর পদধূলি নেবার জন্য নীচু হতেই দু'হাতে তাকে তাড়াতাড়ি তুলে ধরে গভীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলেন, থাক—থাক বাবা—বেঁচে থাকো। তোমাদের দেশ কোথায় শিবনাথ?

হরিনাভিতে শুনেছি।

মা বাবা বুঝি তোমার সেখানেই থাকেন?

আজ্ঞে না, তাঁরা স্বর্গত—

আহা! দুজনেই স্বর্গত?

হ্যাঁ—আমি আমার মাতুলালয় দিনাজপুরে মানুষ—

পিতৃমাতৃহারা কিশোর শিবনাথের প্রতি দুর্গা দেবীর জননীর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তা ছাড়া সে তাঁর পুত্রের সহাধ্যায়ী ও বন্ধু জেনে যেন গভীর স্নেহে

প্রথম দিনই শিবনাথকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রকে দুর্গা দেবী জলখাবার খাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং শিবনাথ ব্রাহ্মণ জেনে পুত্রের আসন থেকে কিছু দূরে আসন পেতে তার জলযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

শিবনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, দূরে দূরে আসন পেতেছেন কেন মা। পাশা-পাশিই তো আমরা বসতে পারি—

তা কি হয় বাবা? তুমি ব্রাহ্মণসন্তান—ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হবে না—

নরেন্দ্র বলেছিল হাসতে হাসতে, তুমিও যেমন মা। দুদিন বাদেই তো ও হিন্দু কলেজে পড়তে যাচ্ছে। ডিরোজিওর কাছে পড়বে—সে জাতধর্মই মানে না।

সে আবার কি! বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন দুর্গা দেবী, জাতধর্ম মানে না কি? ছিঃ! ও কথা বলাও পাপ। বলতে নেই ও কথা।

মায়ের কথায় নরেন্দ্রর সে কি হাসি!

বলেছিল, অন্দরে থাক মা তুমি, বাইরের জগতে কত ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে খবর তো রাখ না।

ওলট-পালট আবার কি শুনি! মানুষের জাতধর্ম- দেবতা কোন দিন মিথ্যে হতে পারে নাকি!

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে দুর্গা দেবীর কথাগুলিই বার বার শিবনাথের মনে পড়ছিল, মানুষের জাতধর্ম ও দেবতা কোন দিন মিথ্যা হতে পারে নাকি!

জীবনকৃষ্ণ মিথ্যা বলে। কখনো ঐ সব চিরন্তন সত্য মিথ্যা হতে পারে না। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না বলেই কি তা মিথ্যা নাকি! এবং চলতে চলতে মনে মনে শিবনাথ স্থির করে—পরের দিন স্কুলে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হলে কথাটা সে বলবে।

কিন্তু পারে নি।

পরের দিন কেন, কোন দিনই জীবনকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি পরবর্তী কালেও কথাগুলো শিবনাথ বলতে পারে নি।

জীবনকৃষ্ণের সেই তেজোদ্দীপ্ত চেহারা। দু চোখের সেই ক্ষুরধার শাণিত দৃষ্টির সামনে পড়লেই শিবনাথের কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যেতো।

সে রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে শিবনাথের একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল।

গৃহে ফিরে শিবনাথ হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরের দিকে চলেছে বারান্দা-পথে মৃন্ময়ীর কক্ষের সামনে দিয়ে, ঘরের মধ্যে মৃন্ময়ীর ডাক শোনা গেল।

শিবনাথ!

মৃন্ময়ীর ডাক শুনেই শিবনাথ বুঝতে পেরেছিল সুন্দর সাহেব তখন গৃহে নেই। নচেৎ অমন করে তাকে ডাকতো না।

সুন্দরম্ সত্যিই গৃহে ছিল না।

মৃন্ময়ীর শরীরটা কিছুতেই সারছে না, এখনো সে কথাই বলতে পারে না—সুন্দরম্ তাই কানা কবিরাজের কাছে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যার দিকে সেই যে সে গিয়েছে এখনো ফেরে নি গৃহে।

মৃন্ময়ীও সুন্দর সাহেবের সামনে কথা বলতো না বলে সুন্দর সাহেব যে সময়টা গৃহে উপস্থিত থাকতো শিবনাথ মৃন্ময়ীর ধারে কাছেও যেতো না। কথা বলা তো দূরের কথা।

সুন্দর সাহেব গৃহে নেই বুঝতে পেরেই শিবনাথ মৃন্ময়ীর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। অবিশ্যি বেশীর ভাগ দিনই ঐ সময়টা সুন্দর সাহেব গৃহে বড় একটা থাকতো না। সে যে ব্যবসা করবে বলে স্থির করেছিল তারই ধান্দায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো।

শিবনাথ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই তার নজরে পড়লো মৃন্ময়ী শয্যার ওপরে চুপটি করে বসে আছে।

অসুস্থতার ভান করে পড়ে থাকলেও ইদানীং মৃন্ময়ীর চেহারাটা অনেক ফিরে ছিল। রোগশীর্ণ গালে আবার রঙ ধরতে শুরু করেছিল।

আজ ফিরতে এত দেরি হলো যে তোমার শিবনাথ? শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে মৃন্ময়ী।

নরেন্দ্রর ওখানে গিয়েছিলাম, শিবনাথ জবাব দেয়।

তোমার এক বন্ধু তোমার খোঁজে এসেছিল—

কে?

জীবনকৃষ্ণ—নাম বলছিল শুনলাম—

জীবনকৃষ্ণ! কখন? কখন এসেছিল?

বিকেলের দিকে।

কিছু বলে গিয়েছে?

তা জানি না—তুমি গঙ্গাধরকে জিজ্ঞাসা করো—তার সঙ্গেই তো কথা বলেছিল—

গঙ্গাধর প্রৌঢ় ভৃত্য।

তাকে এবং এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা দাক্ষায়ণীকে নিযুক্ত করেছিল সুন্দর সাহেব, মৃন্ময়ীকে দেখা-শোনা করবার এবং তার আহার্য তৈরী করবার জন্য।

ওদের কথার মাঝখানেই দাক্ষায়ণী এসে ঘরে ঢোকে একটি পাত্রে দুধ নিয়ে মৃন্ময়ীর জন্য।

দাক্ষায়ণীর দিক থেকে মৃন্ময়ীর কোন ভয়ের কারণ ছিল না, কারণ দাক্ষায়ণী কিছুই শুনতে পেতো না দু'কানের এক কানেও। একেবারে যাকে বলে বদ্ধ কালা।

তবে দাক্ষায়ণী কানে না শুনতে পেলেও ও-বাড়ির কারোরই কোন অসুবিধা ছিল না, কারণ নিজের কাজটুকু সে সময়মত গুছিয়ে করতো। দাক্ষায়ণী কালা ছিল বলেই বিশেষ করে সুন্দরম্ তাকে মৃন্ময়ীর দেখাশোনা ও রন্ধনের ব্যাপারে নিযুক্ত করেছিল।

আর যাই হোক মৃন্ময়ীর দিক থেকে আশঙ্কার কোন কারণ থাকবে না। মৃন্ময়ী যদি কোন দিন কথা বলতেও পারে, সে কথা আর যার কানেই যাক দাক্ষায়ণীর কানে যাবে না।

দাক্ষায়ণী ঘরে ঢুকে দুধের পাত্র এগিয়ে ধরে মৃন্ময়ীর দিকে, অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে, মৃন্ময়ী দুধের পাত্রটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে নিঃশেষিত পাত্রটা দাক্ষায়ণীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

দাক্ষায়ণী শূন্য পাত্রটা হাতে নিয়ে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বসো শিবনাথ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

শিবনাথ কিন্তু বসে না এবং না বসেই বলে, কয়েক দিন থেকে একটা কথা ভাবছিলাম মৃন্ময়ী—

কি?

রাগ করবে না তো?

না, না—রাগ করবো কেন! বলো না কি?

আমার মনে হয় এটা ঠিক হচ্ছে না মৃন্ময়ী—

মুখের দিকে তাকায় মৃন্ময়ী শিবনাথের এবং বলে, কি ঠিক হচ্ছে না শিবনাথ?

এই বলছিলাম সাহেবের কাছে তুমি যে কথা বলতে পারো ব্যাপারটা এখনো গোপন করে রাখা।

কেন?

মনে করো কোন দিন হঠাৎ কোনক্রমে যদি সে তোমাকে আমার সঙ্গে কথা

শিবনাথের প্রতি নজর পড়েছিল তাই নয়, কানা কবিরাজেরও পড়েছিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকায় শিবনাথের দিকে কানা কবিরাজ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অদূরে মৃন্ময়ীর শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান বলিষ্ঠগঠন সুশ্রী চেহারা শিবনাথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সুন্দরমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, এই যুবকটি কে সাহেব? একে তো কোন দিন দেখি নি—

আজ্ঞে ও শিবনাথ—

শিবনাথ। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। ঘৃত ও বহ্নি—

কিছু বলছেন?

না। কি বললে? শিবনাথ?

হ্যাঁ—

তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে নাকি—কথাটা সুন্দরম্‌কে আবার প্রশ্ন করে কানা কবিরাজ অপাঙ্গে শিবনাথের প্রতিই তাকায়।

শিবনাথ মন্থর পদে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আজ্ঞে না। সুন্দরম্ জবাব দেয়, আমার আশ্রিত, এখানে থেকে পড়াশোনা করে—

তাহলে তোমার কোন আত্মীয় নয়—

আজ্ঞে না। ও ব্রাহ্মণ—

পূর্বপরিচয় ছিল বুঝি?

না—

বল কি—অজ্ঞাতকুলশীল। হুঁ—বেশ—বেশ। বলতে বলতে অতঃপর কানা কবিরাজ মৃন্ময়ীর শয্যার দিকে এগিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য এতক্ষণ বসে বসে শিবনাথের সঙ্গে কথা বললেও সুন্দরমের পদশব্দ পাওয়া মাত্রই উপাধানের ওপরে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল মৃন্ময়ী।

এগিয়ে শয্যার কাছে ক্ষণকাল মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে, বাঃ, এ তো দেখছি যৎপরোনাস্তি উন্নতি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। মুখের রঙই তো বদলে গিয়েছে—

কিন্তু ঠাকুরমশাই, ও তো এখনো—

কথা বলছে না? তাই না। কথাটা বলে মৃদু হাস্যসহকারে যেন কৌতুকভরা দৃষ্টিতে করালীচরণ সুন্দরমের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, মানে—

ও বোধ হয় তোর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, তাই—

কি বলছেন ঠাকুরমশাই!

বেটা মূর্খ গাড়ল—চল বেটা চল—উঠে দাঁড়ায় করালীচরণ।

কেমন যেন বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠে সুন্দরম্, পরীক্ষা করে দেখলেন না একটিবার।—Please examine—how much she has improved—

পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে, চল—কানা কবিরাজ বলে।

॥ ৩ ॥

করালীচরণের কথাটা সত্যিই বুঝতে পারে নি সুন্দরম্ তাই বুঝি ক্ষণপূর্বের প্রশ্নটারই আবার পুনরাবৃত্তি করে। জিজ্ঞাসা করে, পরীক্ষা করে দেখলেন না কবিরাজ মশাই ওকে?

ভিষগ্‌রত্ন পূর্ববৎ বলেন, বললাম তো পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে চল—

ভিষগ্‌রত্ন কথাটা বলে আর দাঁড়ায় না, সোজা ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়, সুন্দরম্ তাকে অনুসরণ করে।

বাইরের বারান্দার আধা-আলো আধা-অন্ধকারে ভিষগ্‌রত্নের পিছনে পিছনে চলতে চলতে সুন্দরম্ শুধায়, ঔষধপত্র যা চলছিল সেই চলবে তো কবিরাজ মশাই?

ঔষধ?

হ্যাঁ—

না, ঔষধের আর দরকার হবে না।

দরকার হবে না!

না—

কিন্তু ও তো এখনও ভাল করে সুস্থ হলো না—

হঠাৎ যেন ভিষগ্‌রত্ন খিঁচিয়ে ওঠে, সুস্থ হলো না—সুস্থ হবার বাকীটা কি আছে?

কি বলছেন?

বলছি ঠিকই; ও যদি অসুস্থ হয় তো তুই আমিও অসুস্থ। বেটার শুধু অসুরের মত চেহারাই—মাথায় যদি এক ফোঁটা বুদ্ধির ঘিলু থাকে—

What do you say!

বলতে আর কিছু হবে না, সময়ে সবই বুঝবি।

কথাটা বলে হঠাৎ যেন চলার গতি অত্যন্ত দ্রুত করে দেয় ভিষগ্‌রত্ন এবং হন হন করে সদরের দিকে চলে যায়।

সুন্দরম্ ব্যাপারটা তখনো ঠিক যেন উপলব্ধি করতে পারে না, আব্‌ছা আলো অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে কতকটা যেন হতভম্ব হয়েই।

বুঝবেই বা কি করে সুন্দরম্! মনের মধ্যে তো তার কোনদিন কোন মার প্যাঁচ ছিল না। সোজা সরল মানুষ সুন্দরম্।

ভেবে-চিন্তে কখনো সে কোন কাজ যেমন জীবনে করে নি তেমনি যে কাজ সে করেছে তার জন্যে কখনো পরে কোন রকম চিন্তা ভাবনাও করে নি।

কিন্তু আজ হঠাৎ ভিষগ্‌রত্নের কথায় সুন্দরমের মনের মধ্যে কোথায় একটা বুঝি খটকা লাগে।

কি বলে গেলেন ভিষগ্‌রত্ন!

সত্যিই কি তার মৃন্ময়ী সুস্থ হয়ে উঠেছে!

তাই যদি হয়ে থাকে তবে সে এখনো কথা বলতে পারছে না কেন? যে বাক্‌শক্তি তার লোপ পেয়ে গিয়েছিল, সেই বাক্‌শক্তিই বা এখনো ফিরে আসছে না কেন?

শয্যার ওপরে এখন সে মধ্যে মধ্যে উঠে বসে বটে, কিন্তু কই শয্যা থেকেও কখনো মাটিতে নামে না। দুর্বলতাও তো তার এখনও সম্পূর্ণ সারে নি।

তবে মৃন্ময়ী সুস্থ হয়ে উঠলো কোথায়? আর কেনই বা তার ঔষধের আর প্রয়োজন নেই? সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায় সুন্দরমের।

অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুন্দরম্ এবং অন্যমনস্ক ভাবেই অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে বাগানের দিকে চলে যায়।

বাগানের মধ্যে ঝোপে ঝোপে অন্ধকার যেন স্তূপ বেঁধে আছে এখানে ওখানে। এবং সেই স্তূপ স্তূপ অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির আলোর চুমকি।

কোথায় যেন একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।

দীর্ঘকায় সুন্দরম্ অন্ধকার বাগানের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

গত মাস দুই ব্যবসার ধাক্কায় সুন্দরম্ এক প্রকার মৃন্ময়ীর কথা ভুলেই গিয়েছিল। বাড়িতেও সে খুব কম সময়ই থেকেছে।

বেশীর ভাগ সময়ই তার বাইরে বাইরে কেটেছে।

এতদিন যে বেপরোয়া জীবন বেশীর ভাগ নৌকায় জলে জলেই কেটে গিয়েছে, যে জীবনের সঙ্গে সেই কিশোর বয়স থেকে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেই জীবন থেকে হঠাৎ রাতারাতি সরে আসা যতটা সে সহজ ভেবেছিল আসলে সেটা ততটা সহজ ছিল না এবং যত দিন যাচ্ছিল ক্রমশ সেটা উপলব্ধি করছিল।

মনে হচ্ছিল তার কি প্রয়োজন ঐ সব ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়বার।

নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ আরামের এবং সাচ্ছল্যের মধ্যেই তো আছে। কিন্তু ঐ সঙ্গেই প্রায় মনে পড়েছে মৃন্ময়ীর মুখখানা। মৃন্ময়ী ডাঙার মানুষ—জলে জলে থাকতে হয়তো সে পারবে না। অথচ মৃন্ময়ীকেও আজ আর তার পক্ষে ছাড়া সম্ভবপর নয়। মৃন্ময়ীকে বাদ দিয়ে আজ জগৎটাই তো তার কাছে মিথ্যে।

দ্বিগুণ উৎসাহে মনকে বেঁধেছে সুন্দরম্।

দ্বিগুণ উৎসাহে কি ব্যবসা করা যায় সেই কথা চিন্তা করেছে। মোটামুটি কিছুদিন হলো ব্যবসাও একটা সে শুরু করে দিয়েছে।

চালের ব্যবসাই সে শুরু করেছে। নিজের বিরাট ছয় মাল্লাবাহী নৌকাটা বেচে খান দুই মহাজনী নৌকা কিনেছে। সে নৌকায় এক কিস্তি চালও এসে গিয়েছে। তাই কদিন থেকে ভাবছিল মৃন্ময়ী আর একটু সুস্থ হলেই তাকে সে বিবাহ করবে। এবং রীতিমত ধর্ম-সম্মতভাবে গীর্জায় গিয়েই বিবাহ করবে। তার মৃন্ময়ী একান্তই যদি রাজী না হয় তবে অবিশ্যি পুরোহিত একজন ডেকেও বিবাহ করতে তার আপত্তি নেই। তার নিজের দিক থেকে ধর্মের ব্যাপারে অবিশ্যি কোন অন্ধ গোঁড়ামি নেই এবং নিজে ক্রেস্তান হলেও গীর্জায় জীবনে একবারও গেছে কিনা সন্দেহ। তার জননী ভায়লাও সে সম্পর্কে কখনও বলে নি। আর রোজারিও—তার পিতাও ধর্মটর্ম একটুকু কখনও মানে নি। বলেছে, nonsense —Who is god! There is no God—no heaven—no hell. কিন্তু সে ঐ বিবাহের কথাটা ভেবেই আজ করালীচরণকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু কবিরাজ মশাই কি বলে গেলেন। তাকে বোকা, গাড়ল বললেন কেন?

শিবনাথও অন্ধকারে বাগানের মধ্যে একাকী বড় বকুল গাছটার নীচে একটা যে বড় পাথর ছিল, সেই পাথরটার উপর চুপচাপ বসে ছিল। সেও মৃন্ময়ীর কথাগুলোই ভাবছিল।

সুন্দর সাহেব লোকটা দস্যু ডাকাত—শয়তান—খুনী। মৃন্ময়ীকে এক রাত্রে তাদের বাড়ি থেকে ডাকাতি করে ধরে নিয়ে এসেছে। সুন্দর সাহেব একজন পর্তুগীজ ডাকাত? জলদস্যু!

এক পর্তুগীজ জলদস্যুর আশ্রয়ে এসে সে উঠেছে। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে সে কিনা এক জলদস্যু—ক্রেস্তান বিধর্মী—ডাকাতের অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে।

আবার মনে হয় সত্যি সত্যিই কি মৃন্ময়ী যা তাকে বললে তা সত্যি। তাহলে তো সে ধর্মচ্যুত হয়েছে। ধর্মে পতিত হয়েছে।

ধর্মে পতিত। সঙ্গে সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের মুখখানা মনের পাতায় ভেসে ওঠে

শিবনাথের। মনে পড়ে, সেদিন জীবনকৃষ্ণ ডিরোজিও ছাড়াও আরো একজনের কথা বলেছিল ঐ ধর্ম আর সংস্কারের প্রসঙ্গেই। ধনী মহাপণ্ডিত এবং মহা প্রতিপত্তিশালী লোকটি নাকি।

লোকটির নাম রামমোহন রায়—দেওয়ানজী। তিনি একটি সভা স্থাপন করেছেন—আত্মীয় সভা, ঐ আত্মীয় সভায় নাকি কেবল যে বেদ-উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা হয় তাই নয়, দেশের বর্তমান বহু সামাজিক সমস্যা ও কুসংস্কার কেমন করে দূর করা যেতে পারে আজকের দিনে—যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বালবৈধব্য, জাতিভেদ ও সহমরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

জীবনকৃষ্ণ দেওয়ানজীর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে যায়। জীবনকৃষ্ণ সেদিন ধর্ম ও সংস্কার সম্পর্কে ওদের পরস্পরের বাদ প্রতিবাদের মধ্যে যে কথাগুলো বলেছিল হঠাৎ যেন সেই কথাগুলো মনে পড়ে যায় শিবনাথের।

বুঝলি শিবনাথ, দেওয়ানজী—রামমোহন রায় কি বলেন জানিস? আজকের সমাজের শাস্ত্রকার আর স্মৃতিকারের দল যতই সমাজকে তাদের নীতি আর চোখ-রাঙানি দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করুক না কেন আসলে এই যে সমাজের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতা, সহমরণ ও সতীদাহ প্রভৃতি বীভৎস ব্যাপার এগুলো আমাদের অযৌক্তিকতা ও অজ্ঞানতারই ফল। সত্যিকারের শিক্ষার অভাব। এই সব কুসংস্কার ও কুপ্রথা আমাদের সমাজ থেকে যেমন করে হোক দূর করতেই হবে—নচেৎ আমাদের মুক্তি নেই।

ক্ষীণকণ্ঠে তবু তর্ক করবার চেষ্টা করেছিল শিবনাথ।

বলেছিল, বুঝলাম—কিন্তু এতকাল যা হয়ে এসেছে—সবাই আমরা জেনে এসেছি সেটাই মিথ্যা আর কে এক রামমোহন যা বলছেন তাই সত্যি, তাই বা মেনে নেবো কেন?

শুধু তুই কেন শিবনাথ, জীবনকৃষ্ণ জবাব দিয়েছিল, অনেকেই মেনে নিতে চাইছে না—কিন্তু দেওয়ানজী মিথ্যে কথা বলেন নি এবং তিনি যে মিথ্যা কথা বলছেন না এও একদিন অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ হবে দেখে নিস, তোকে একটা রচনা দেবো, পড়ে দেখিস।

রচনা?

হ্যাঁ—

কার রচনা?

ভবানীচরণের লেখা। 'কলিকাতা কমলালয়' রচনার নাম। আজকের এই

কলকাতা শহরের নাগরিক জীবনের একেবারে জীবন্ত চিত্র—

পড়েছিল জীবনকৃষ্ণর কাছ থেকেই নিয়ে ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' রচনাটা পরের দিন।

ভবানীচরণ যা লিখেছেন তার সারমর্মটুকু স্পষ্ট মনে আছে শিবনাথের।

ইংরেজ বনাম নবাবের সংগ্রামকালে কলকাতা মন্থন হয়েছিল, তাতে বিষাদরূপ হলাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উভয়ই উঠেছিল, এবং তারই ফলে কলকাতা শহর ক্রমেই নিরুপম ও সর্বদেশখ্যাত হয়ে উঠেছে। মুদ্রারূপ আলয় অগাধ জলে কলকাতার দুকূল ভরে উঠেছে ক্রমে এবং বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ রত্নের সমাগম হচ্ছে শহরে। তার মধ্যে পরনিন্দাপরায়ণ বহু হাঙর এবং মূর্খরূপ ভয়ানক সব কুমীর স্বচ্ছন্দে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ শহরে সর্বদা লক্ষ্মী বিরাজ করছেন। 'কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থ দ্বারা কমলালয়', অতএব 'কলকাতা কমলালয়'।

সত্যিই কি তাই?

সত্যিই কি এসব কিছু, জীবনকৃষ্ণ যা বলতে চায়, তাদের আজকের অশিক্ষার কুসংস্কারেরই ফল।

দোটানায় মন দুলতে থাকে শিবনাথের। এখানে সে থাকবে না চলে যাবে?

চলে যদি যায় আজ এই সুন্দর সাহেবের আশ্রয় ছেড়ে তার পড়াশুনা ও বিদ্যালয়ে পড়ারও শেষ হবে।

যে বিদ্যার্জনের জন্য সে এত কষ্ট স্বীকার করে এসেছে সে বিদ্যার্জনের হয়তো এখানেই তার ইতি হবে।

তবে কি সে এই ম্লেচ্ছ বিধর্মী জলদস্যুর আশ্রয়েই পড়ে থাকবে!

কিন্তু উপায় বা কি!

একমাত্র আপনার জন ছিল মাতুল তাও তারও কাল হয়েছে মাত্র মাস দুই পূর্বে অকস্মাৎ।

পাপের—অধর্মের সে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করবে পরে।

মনকে সান্ত্বনা দেয় শিবনাথ।

আজকের দিনে লেখাপড়া না শিখতে পারলে তো জীবনটাই বৃথা। লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে। অবশ্য সেই সঙ্গে তার ধর্মকেও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

•

মৃন্ময়ীর চোখেও সে রাত্রে ঘুম ছিল না।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে দুটি চক্ষু মেলে সে শয্যায় শুয়ে ছিল।

মৃন্ময়ী ভাবছিল সে ঐ কথাগুলো শিবনাথকে বলে ভাল করল কি মন্দ করল কে জানে? শিবনাথ সুন্দরমের আশ্রিত। তারই দয়ায় সে লেখাপড়া শিখছে। তাছাড়া তার তীব্র প্রতিবাদেই তো বোঝা গেল বিশ্বাস করে নি সে তার কথাগুলো সুন্দর সাহেব সম্পর্কে।

ছি ছি, ঝোঁকের মাথায় মৃন্ময়ী এ কি করে বসলো! সুন্দরম্ সম্পর্কে অত কথা সে কেন বলতে গেল শিবনাথকে? শিবনাথের কাছে সুন্দরম্ তো দেবতা। এখন সব কথা যদি শিবনাথ সুন্দরম্‌কে বলে দেয়। সুন্দরমের তখন তো কিছুই জানতে আর বাকী থাকবে না। সুন্দরম্ জানবে সে ইচ্ছা করেই এখনো কথা বলছে না। ইচ্ছা করেই সে মূক হয়ে আছে।

সে আজ সম্পূর্ণ সুস্থ তবু অসুস্থতার ভান করছে। সুন্দরম্ সে কথা জানবার পর আর কি তার প্রতি এতটুকুও দয়া করবে?

হয়তো এবারে জোর করেই বিবাহ করবে তাকে।

কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন শিউরে ওঠে মৃন্ময়ী। কি হবে। তাহলে কি হবে!

চিন্তাটা যত মনের মধ্যে আসে ততই যেন মৃন্ময়ী অস্থির হয়ে ওঠে, অন্ধকারে শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঘামতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত মৃন্ময়ী আর শুয়ে থাকতে পারে না, উঠে বসে শয্যার উপর, কি করবে! এখন মৃন্ময়ী কি করবে!

অজ্ঞাত একটা বিভীষিকা যেন চারপাশ থেকে চেপে ধরতে থাকে মৃন্ময়ীকে।

সমস্ত বাড়িটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোন সাড়া পর্যন্ত নেই।

শয্যা থেকে নামল মৃন্ময়ী।

অন্ধকারে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মৃন্ময়ী জানে শিবনাথ কোন্ ঘরে শোয়।

মৃন্ময়ী যে ঘরে থাকে তার দুখানা ঘরের পরের পূবের ঘরটাতেই শিবনাথ থাকে তা জানতো।

মৃন্ময়ী পায়ে পায়ে অন্ধকার বারান্দা অতিক্রম করে শিবনাথের ঘরের দিকেই এগুতে থাকে।

বুকটার মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে, কারণ যে ঘরে শিবনাথ থাকে তারই পাশের ঘরটা সুন্দরমের। সে যদি কোনক্রমে জানতে পারে ব্যাপারটা, তাহলে কি যে হবে কে জানে। কিন্তু সে রাত্রে মৃন্ময়ী যেন মরীয়া হয়ে উঠেছিল।

তার ছলনাটা ধরা পড়ে গেলে সুন্দরমের কাছে কি হবে, সেই দুর্ভাবনায় মৃন্ময়ী যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

অনুমানের ওপরেই কতকটা নির্ভর করে ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মৃন্ময়ী।

শিবনাথের ঘরের ভিতরটাও অন্ধকার।

অতি সামান্য বাইরের ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে যা প্রবেশ করেছিল তাতে করে জানালাটার সামনে সামান্য একটু আলোছায়া ছাড়া বাকী ঘরটাই ছিল অন্ধকার।

ইতিপূর্বে কখনো ঐ ঘরে পা দেয় নি মৃন্ময়ী। ঘরটা কেমন, কি আকারের এবং ঘরের কোথায় কি, কিছুই মৃন্ময়ীর জানা নেই।

তাই বুঝি মৃন্ময়ী অন্ধকার ঘরের মধ্যে পা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায়।

বুকটার মধ্যেই তখন তার শুধু কাঁপছে না—দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস ও বেশ কিছুটা উত্তেজনা সব কিছু মিলে ঐটুকু পথ অতিক্রম করেই পা দুটোও কাঁপছে মৃন্ময়ীর তখন।

ক্রমশঃ অন্ধকারটা চোখে সয়ে গেলে মৃন্ময়ীর চোখে পড়ল অদূরে জানালার সামনে যে আলো-আঁধারি, সেইখানে যেন একটা পালঙ্ক রয়েছে।

কে একজন সেই পালঙ্কের শয্যায় শুয়েও আছে মনে হলো। শুয়ে আছে একটা মানুষ বটে সত্যি, কিন্তু সে শিবনাথ না হয়ে যদি অন্য কেউ হয়।

ধক্ করে ওঠে বুকের ভিতরটা মৃন্ময়ীর।

মৃন্ময়ী পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। আর ঠিক সেই সময় শিবনাথের কণ্ঠস্বরটা তার কানে আসে।

কে! কে ওখানে?

মৃন্ময়ী কিন্তু জবাব দিতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকে।

জবাব দিচ্ছ না কেন? কে?

কথাটা বলতে বলতে শিবনাথ শয্যা থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়ায়। শিবনাথ ঘুমায় নি, জেগেই ছিল। একটু আগে বাগান থেকে এসে শয্যায় শুয়েছিল—এবং জেগে চোখ দুটো মাত্র বুজিয়ে ছিল।

তাই মৃন্ময়ীর পদশব্দ সতর্ক ও ক্ষীণ হলেও তার কানে প্রবেশ করেছিল।

শিবনাথ শুধু উঠেই দাঁড়ায় না মৃন্ময়ীর সামনে এগিয়ে আসে, কে!

শিবনাথ!

চাপা সতর্ক কণ্ঠে সাড়া দেয় এবারে মৃন্ময়ী এবং কণ্ঠস্বরটা তার কেঁপে ওঠে।

কে! কে?

আমি—মৃন্ময়ী—

মৃন্ময়ী! শিবনাথের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। একটা ঢোক গিলে বলে, তুমি—

হ্যাঁ—

কিন্তু এত রাত্রে?

সহসা ঐ সময় মৃন্ময়ী দু'হাত বাড়িয়ে শিবনাথের একটা হাত চেপে ধরে এবং মৃন্ময়ীর কোমল হাতের স্পর্শ নিজের হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিবনাথের দেহের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে ছলাৎ করে ওঠে। ছলাৎ করে উঠে বুকের ওপরে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিবনাথের বাক্‌শক্তি যেন সেই সঙ্গে লোপ পায়।

শরীরের সমস্ত স্নায়ুতে স্নায়ুতে কিসের একটা অনুভূতি সির সির করে বয়ে চলেছে।

শিবনাথ, লক্ষ্মীটি বলো, সব কথা তুমি বলে দেবে না সুন্দরমকে, চাপা আকুতিতে যেন মৃন্ময়ীর কণ্ঠস্বর ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

বলে দেবো না, কি বলে দেবো না? ক্ষীণ কণ্ঠে শুধায় এতক্ষণে শিবনাথ।

আজ সন্ধ্যাবেলা যে সব কথা তোমাকে বলেছি—বলো, বলে দেবে না? শিবনাথ কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? বলো?

শিবনাথ আবছা আলো-আঁধারে তখনো মৃন্ময়ীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আবছা আবছা মৃন্ময়ীর মুখখানা দেখা যাচ্ছে। তার গরম গরম নিঃশ্বাস শিবনাথের চোখে-মুখে এসে পড়েছে। শিবনাথের একটা হাত তখনো মৃন্ময়ীর হাতের মধ্যে ধরা আছে।

শিবনাথ চুপ।

কোন শব্দই যেন গলা দিয়ে বেরুতে চাইছে না।

শিবনাথ—যে হাতটা শিবনাথের তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল, সেই হাতটা ঝাঁকিয়ে আবার ডাকল মৃন্ময়ী, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

না মৃন্ময়ী—বলবো না।

ঠিক তো?

হ্যাঁ ঠিক। যেন ফিস ফিস করে শেষের কথাগুলো বললে শিবনাথ।

মৃন্ময়ী আর দাঁড়াল না।

ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আর শিবনাথ?

সে তখনো অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

গভীর একটা উত্তেজনার পর সমস্ত শরীরের স্নায়ুগুলো তখন তার যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় গলা-বুক যেন সব শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গিয়েছে এবং ঠিক সেই সময় বারান্দায় যেন কার ভারী পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শিবনাথ টের পায় সেই ভারী পায়ের শব্দটা ক্রমশঃ তার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

শব্দটা এসে তার ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়ায় এবং তার পরই একটা ছায়ামূর্তি তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেন একেবারে মরার মতই পড়ে থাকে শিবনাথ।

ছায়ামূর্তিটা তারই শয্যার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তবে কি সুন্দর সাহেব সব জেনে ফেলেছে! সুন্দর সাহেব জেনে ফেলেছে যে মৃন্ময়ী তার ঘরে এসেছিল একটু আগে।

পর্তুগীজ জলদস্যু সুন্দর সাহেব।

ব্যাপারটা জানতে পেরে থাকলে তাকে ক্ষমা করবে না। হয়তো তার ঘরে মোটা চামড়ার কোমরবন্ধটার সঙ্গে যে গুলিভর্তি গাদা পিস্তলটা ঝুলানো আছে, সেই পিস্তলের একটা গুলিতেই তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

কি করবে ঐ মুহূর্তে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এবং ভাববারও খুব একটা সময় পায় না। তার আগেই সহসা একটা ভারী চাদর ওকে চারপাশ থেকে ঢেকে দেয় এবং একটা শব্দ করবারও সময় পায় না শিবনাথ।

আততায়ী সেই ভারী চাদরে তাকে ঢেকে একটা বোঁচকার মতই অক্লেশে এক ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধের ওপরে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ব্যাপারটা এত আকস্মিক ও এত দ্রুত ঘটে যায় যে, কোন রকম চিৎকার বা প্রতিবাদ করবারও কথা মনে হয় না শিবনাথের। কাঁধের উপরে ফেলে হন হন করে এগিয়ে চলে আগন্তুক।

ভয়ে উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা শিবনাথের তখন পাথর হয়ে গিয়েছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

বেশ খানিকটা চলবার পর আততায়ী তাকে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতেই ওর গায়ের উপর থেকে ভারী চাদরটা ঝুপ করে মাটিতে ওর

পায়ের সামনে পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ রুক্ষ কণ্ঠস্বর ওর কানে এলো, কে তুই?

কণ্ঠস্বরটা কানে যেতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠেছিল শিবনাথ এবং মুহূর্তে তার নিষ্ক্রিয় পঙ্গু ভাবটা কেটে যায়।

স্থানটি কৃষ্ণাচতুর্দশীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে মৃদু আলোকিত। সেই মৃদু আলোয় সামনে চোখ তুলে তাকাতেই শিবনাথ যেন বোবা হয়ে যায়। শিবনাথের সামনে দাঁড়িয়ে জগা।

গুলবাঘের মত বেঁটে-খাটো এবং পেশীবহুল ঘাড়ে গর্দানে একটা বীভৎস জানোয়ারের মত। যতদিন শিবনাথ অরিন্দম সরকারের গৃহে ছিল জগার সামনে পারতপক্ষে বড় একটা ঘেঁষে নি। চ্যাপটা নাক, খুদে খুদে চক্ষু, নির্লোম ভ্রূ এবং কপাল ও মুখভর্তি ছোট ছোট অসংখ্য আব, পুরু ওষ্ঠ, নোংরা হরিদ্রাভ আঁকাবাঁকা দাঁত—মুখখানার দিকে তাকালেই কেমন যেন শিবনাথের ভয়-ভয় করেছে।

শিবনাথের বুকের ভিতরে তখন কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ইতিমধ্যে জগাও তাকে চিনতে পেরেছিল। সে বলে, শিবু ঠাকুর, তুমি?

জগা?

ধ্যেৎ তেরি! শালা দেখছি আজ বাঁয়ে শিয়াল নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। পরিশ্রমটাই মাঠে মারা গেল—

কথাগুলো বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় জগা।

এতক্ষণে যেন পুরোপুরি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে শিবনাথ। কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া যেমন দুর্বোধ্য তেমনি বুদ্ধির অগোচর।

ভয়ে যদিও তখন তার বুকের মধ্যে দুর দুর করছে তবু কোনমতে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে, জগা?

জগা ফিরে দাঁড়ায় সে ডাকে এবং তার হলদে আঁকাবাঁকা দাঁতগুলো বের করে একটা কুশ্রী জান্তব হাসি হেসে বলে, এখনও দাঁড়িয়ে রইলে কেন শিবু ঠাকুর। যাও, ঘরে যাও। মনে কিছু করো না ঠাকুর, মিথ্যে অন্ধকারে ঘর ঠিক না করতে পেরে তোমাকে খানিকটা কষ্ট দিলাম—

হঠাৎ কি হয় শিবনাথের বোকার মতই বলে বসে কথাটা, ঘর ঠিক না করতে পেরে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সুন্দর সাহেবের মাগীটার ঘরে—অন্ধকারে ভুল করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছি।

অন্ধকারে ভুল করে ঢুকে পড়েছো আমার ঘরে!

হ্যাঁ গো, আচ্ছা চলি—

আর মুহূর্তও দাঁড়াল না জগা। অন্ধকারে বাগানের মধ্যে সড়াৎ করে যেন কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল।

শিবনাথ তখনো নির্বাক নিস্পন্দ একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

কি বলে গেল জগা!

প্রথমটায় জগার কথাগুলো তার মগজে ঠিক প্রবেশ করে নি। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা কথা তার মগজে বিদ্যুৎ চমকের মতই খেলে যায়।

সুন্দর সাহেবের মাগী!

তার মানে—তার মানে কি ঐ মৃন্ময়ী!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিবনাথ দ্বিগুণ চমকে ওঠে। ঐ শয়তান জগা তাহলে মৃন্ময়ীকে চুরি করতেই সুন্দরমের গৃহে এত রাত্রে এসেছিল। ভুল করে ঘরটা চিনতে না পেরে তার ঘরে ঢুকে পড়ে তাকে চাদর মুড়ি দিয়ে তুলে এনেছিল।

সর্বনাশ। ঐ জানোয়ারটা তাহলে ভাগ্যক্রমে ঘর না ভুল করলে এতক্ষণে মৃন্ময়ীকে এই রাত্রির অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে চলে যেত। সে বা সুন্দর সাহেব কেউ জানতে পারত না। কিন্তু কেন চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছিল মৃন্ময়ীকে জগা, আর কোথায়ই বা নিয়ে যেত! নিশ্চয় অরিন্দম সরকারের গৃহেই।

জগা নিশ্চয়ই নিজে থেকে আসে নি, অরিন্দম সরকারের পেয়ারের বিশ্বাসী অনুচর নিশ্চয়ই অরিন্দম সরকারের নির্দেশেই এসেছিল।

কিন্তু কেন! অরিন্দম সরকার মৃন্ময়ীকে চুরি করতে চায় কেন? মৃন্ময়ীকে তার কিসের প্রয়োজন। সব যেন শিবনাথের কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদ ইতিমধ্যে পশ্চিমাকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে। চাঁদের আলো মনে হয় যেন আরো পাণ্ডুর। বাগানের গাছপালাগুলো পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় স্তূপীকৃত ছায়ার মত মনে হয়।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা চারিদিকে আধো আলো আধো ছায়ায় যেন থমথম করছে। কেমন যেন সিরসির করে ওঠে শিবনাথের সমস্ত শরীর।

কর্কশ শব্দে একটা পেচক কোন্ অন্ধকার ডালের মধ্যে আত্মগোপন করে ডেকে ওঠে। মনে হয় শিবনাথের, মধ্যরাত্রি যেন শিউরে উঠলো হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের মনে পড়ে যায় সে একা। একা মধ্যরাত্রির নির্জন বাগানের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে তখনো।

মধ্যরাত্রির একটা হাওয়ার ঝাপটায় আশেপাশের গাছপালাগুলো মৃদু শব্দে হঠাৎ যেন ফিসফিস করে কি বলতে শুরু করে।

শিবনাথ দ্রুত পদবিক্ষেপে ভিতরের দিকে চলে যায়।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় অর্গল তুলে দেয়। এবং এতক্ষণে যেন নিজেকে কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে।

অন্ধকারেই শয্যার উপর এসে বসে।

ঝিম্ দিয়ে বসে আজকের রাত্রিতে পর পর যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল, মনে মনে সেই ঘটনাগুলো নতুন করে আবার ভাববার চেষ্টা করে।

মৃন্ময়ী তার ঘরে এসেছিল। শুধু আসেই নি। মৃন্ময়ীর সেই স্পর্শ যা তার দেহের সমস্ত শিরায় শিরায় বিচিত্র একটা উন্মাদনা জাগিয়েছিল, নতুন করেই সেই উন্মাদনাটা আবার উপভোগ করবার চেষ্টা করে।

মৃন্ময়ী।

পাশের ঘরের পরের ঘরটাতেই মৃন্ময়ী আছে। হয়তো ঘুমোয় নি এখনো, জেগেই আছে। জগা এসেছিল তাকে চুরি করে নিয়ে যেতে।

কিন্তু কেন, কেন জগা এসেছিল মৃন্ময়ীকে চুরি করে নিয়ে যেতে?

মৃন্ময়ীকে সুন্দর সাহেবও চুরি করে এনেছে। তাকে জোর করে সুন্দর সাহেব বিবাহ করতে চায়। কিন্তু মৃন্ময়ী তা চায় না।

মৃন্ময়ী সুন্দর সাহেবকে ঘৃণা করে।

মৃন্ময়ীর সুন্দর মুখখানি, তার তন্বী দেহবল্লরী শিবনাথের সমস্ত দৃষ্টিটা জুড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুক্তি চায় মৃন্ময়ী। পালিয়ে যেতে চায় এখান থেকে। অরিন্দম সরকারও চায় মৃন্ময়ীকে। মৃন্ময়ী তার ঘরে এসেছিল। তার হাতটা চেপে ধরেছিল। আচ্ছা মৃন্ময়ী কি ঘুমোচ্ছে। মনের পাতায় ভেসে ওঠে মৃন্ময়ীর যৌবনে ঢল ঢল দেহবল্লরী। মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী।

শিবনাথের দেহের ধমনীতে ধমনীতে বিচিত্র একটা উত্তেজনা যেন খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাভিদেশ থেকে একটা কুঞ্চন যেন উপরের দিকে ঠেলে উঠছে।

সে রাতটার কথা শিবনাথ অনেকদিন ভুলতে পারে নি যেমন, তেমনি সেই রাতের পর অনেকদিন মৃন্ময়ীর সামনা-সামনিও যেতে পারে নি শিবনাথ। এবং পাছে দুজনের চোখোচোখি হয়ে যায় তাই শিবনাথ অতঃপর মৃন্ময়ীকে

যেন এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করেছে।

আরো একটা কথা মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে শিবনাথের। সে রাত্রে জগার আগমনের কথাটা সুন্দর সাহেবকে বলবে কি না। কারণ পরে সে বুঝতে পেরেছিল জগা যে মৃন্ময়ীকে সে রাত্রে চুরি করতে এসেছিল সে অরিন্দম সরকারের জন্যই।

সুন্দর সাহেবকে সাবধান করে দেওয়া উচিত তার অরিন্দম সরকার সম্পর্কে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে, আর সেই সাপ যদি ছোবল হানে ?

তার চাইতে চুপ করে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু কথাটা সে সুন্দর সাহেবকে না বললেও অতঃপর রাত্রের দিকে সে সজাগ থাকারই চেষ্টা করতো।

শিবনাথের সন্দেহটা কিন্তু মিথ্যা নয়।

॥ ২ ॥

জগাকে অরিন্দম সরকারই পাঠিয়েছিল সে রাত্রে সুন্দর সাহেবের গৃহে মৃন্ময়ীকে চুরি করে নিয়ে যাবার জন্য।

সুন্দরম্ যেদিন অরিন্দম সরকারের কাছে গিয়েছিল তার কুলীর বাজারের বাগানবাড়িটা নেবার জন্য, পরের দিনই—সুন্দরম্ জানতেও পারে নি, জগা গিয়ে গোপনে তার সমস্ত সংবাদ নিয়ে এসেছিল এবং মৃন্ময়ীকে দেখে এসে অরিন্দম সরকারকে সে সংবাদটাও দিয়েছিল।

বলেছিল, খবরটা খুব ভাল কর্তা।

ফরসীর নলটা হাতে ধরে সুখটান দিতে দিতে নেশাগ্রস্ত অর্ধনিমীলিত চক্ষু দুটি তুলে অরিন্দম সরকার কথাটা শুনেই নিঃশব্দে তাকিয়েছিল জগার মুখের দিকে।

খুবসুরত একটা মাগী কর্তা—

বয়স কত ?

অল্প বয়েস।

হুঁ। আচ্ছা তুই যা।

বাগানবাড়িটা ভাঁড়া চাওয়ায় ঐ রকমই একটা সন্দেহ হয়েছিল অরিন্দম সরকারের। শালা পর্তুগীজ দস্যু। নিশ্চয়ই ছুঁড়িটাকে সুন্দরম্ কোথা থেকে ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে নারীমাংসলোভী দুশ্চরিত্র অরিন্দম সরকারের মনটা লালসায় ছিল ছিল করতে থাকে। এবং মনে মনে হাসে অরিন্দম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু করে না। ক'টা দিন অপেক্ষা করে। ভুলতেও কিন্তু পারে না জগার কথাটা অরিন্দম সরকার।

ক'টা দিন মনে মনে চিন্তা করে অবশেষে একদিন ডেকে পাঠায় অরিন্দম জগাকে।

জগা—

কর্তা।

সুন্দর সাহেবের মেয়েটাকে আমার চাই—

হলদে আঁকা-বাঁকা দাঁতগুলো বের করে জগা হাসে।

পারবি?

খুব। এ আর এমন শক্ত কি?

ঠিক আছে। কবে কাজ হাসিল করবি!

হুকুম করেন তো আজই!

ঠিক আছে—তাহলে আজ রাতেই সোজা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তুলবি বেলগাছিয়াতে মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে। বুঝেছিস?

জগার কুৎসিত মুখে আবার যেন জান্তব হাসি জেগে ওঠে। সে ঘাড় কাত্ করে বলে, আজ্ঞে তা আর বুঝি নি।

জগা কথাটা বলে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, অরিন্দম সরকার ফরসীর জরি জড়ানো নলটা মুখ থেকে হাতের মধ্যে নিয়ে ডাকে, এই শোন—

ঘুরে দাঁড়াল জগা।

একা যদি না পারিস তো সঙ্গে নরোত্তমকে নিবি?

এজ্ঞে নরোত্তমকে দিয়ে কি হবে? জগা বলে।

তবে! তুই একাই পারবি?

এ-আর কি এমন কাজ কত্তা। রাতারাতি ঠ্যাঙাড়ের মাঠ থেকে কত সময় দু-দুটো লাশ পর্যন্ত কাঁধে বয়ে নিয়ে কালী দীঘির পাঁকের নীচে পুঁতে ফেলেছি তা এ তো একটা ছুঁড়ি।

তা হোক—বলা যায় না—সঙ্গে একজন থাকা ভাল।

না কত্তা। এসব কাজে দোসর না থাকাই ভাল।

অরিন্দম সরকার কি যেন মুহূর্তকাল আপন মনে ভাবে, কথাটা মিথ্যে বলে নি জগা, এসব ব্যাপারে যত জানাজানি না হয় ততই ভাল।

ঘাড় নেড়ে বলে, বেশ—যা ভাল বুঝিস কর।

জগার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল অরিন্দম সরকার। মিথ্যে বড়াই করে না জগা। একান্ত নিশ্চিন্ত মনেই তাই অরিন্দম সরকার সেজেগুজে মহেন্দ্র সাহার বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে পাল্কীগাড়ি চেপে গিয়ে উপস্থিত হয়।

মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িটা কিনে নিয়েছিল অরিন্দম সরকার কিছুদিন আগে।

গত কয়েক মাস ধরে মহেন্দ্র সাহার ব্যবসায়ে লোকসান চলছিল। সে কারণে বাজারে এবং মহাজনদের কাছে কিছু কিছু তার ধার দেনাও হয়েছিল।

তাছাড়া দীর্ঘদিনের অত্যাচারে শরীরেও তার ভাঙন ধরেছিল। যকৃতের একটা ব্যথা মধ্যে মধ্যে উঠে প্রায়ই তাকে শয্যাশায়ী করে দিচ্ছিল।

সব দিক ভেবেই মহেন্দ্র সাহা তার বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িটা বিক্রি করে দেবার মনস্থ করেছিল। ক্ষীরোদাকে বাগানবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার সেও ছিল অন্যতম কারণ।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন কথাটা বন্ধু অরিন্দম সরকারকে বলায় অরিন্দম সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বিক্রি করে দেবে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ি?

হ্যাঁ, ভাল দর পেলে—দেখো তো সরকার তেমন খদ্দের যদি একটা পাও।

খদ্দের দেখতে হবে না, যদি সত্যিই বেচো তো আমিই কিনতে পারি! অরিন্দম সরকার বলে।

তুমি! তুমি কিনবে?

কিনবো। কত দাম চাও?

কথাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি সরকার। বাজারে কিছু ধার দেনা হয়ে গিয়েছে—এই বাগানবাড়ি বেচে ঋণমুক্ত হতে চাই—

বাগানবাড়িটার উপরে অরিন্দম সরকারের বরাবরই একটা লোভ ছিল কাজেই বেশী দরদস্তুর সে করলো না। মহেন্দ্র সাহা যা চেয়েছিল তাতেই বলতে গেলে রাজী হয়ে গেল এবং দিন কয়েক বাদে টাকা মিটিয়ে বাড়িটা কিনে নিল।

বৃন্দাবনকে অবিশ্যি অরিন্দম সরকার ছাড়ায় নি। বাগানবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার উপরেই রেখে দিল।

বাগানবাড়িটা ক্রয় করা অবধি অরিন্দম সরকার একদিনও আসে নি।

আজই প্রথম সে এসেছে।

বাবু আসবেন শুনে বৃন্দাবন আগে থাকতেই ঘর-দোর ঝাঁট পাট দিয়ে, ফরাশ পেতে ঝাড় বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

পাল্কীগাড়ির শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বৃন্দাবন সদরে গিয়ে দাঁড়ায়।

হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে পাল্কীগাড়ি থেকে নেমে অরিন্দম সরকার ভিতরে গিয়ে পা দেয়, মিহি গিলে করা শান্তিপুরী ধুতি, আদ্দির ফুলকাটা বেনিয়ান, গলায় কোঁচান ফরাসডাঙার চাদর, তার উপর গোড়ের মালা।

অরিন্দম সরকার একেবারে ফুলবাবুটি সেজে এসেছে যেন।

পাল্কীগাড়িতে করেই অরিন্দম সরকার সুরার বোতল নিয়ে এসেছিল। কোচোয়ান ঝাঁকা ভর্তি সুরার বোতল ঘরের কোণে এনে নামিয়ে রাখে।

বিস্তৃত ফরাশের উপর ঝাড়বাতির উজ্জ্বল আলোর নীচে এসে বসল অরিন্দম সরকার আরাম করে।

আদবকায়দায় বৃন্দাবন অভ্যস্ত। তাড়াতাড়ি সে বাবুর সামনে বোতল গ্লাস ইত্যাদি সাজিয়ে দেয়।

হুজুর—

কি রে?

এখানেই আজ আহার হবে তো।

হ্যাঁ—মাংস নিয়ে আয়, রান্না কর—

যে আজ্ঞে—

আভূমিনত হয়ে ফিরিঙ্গী কায়দায় সেলাম ঠুকে বৃন্দাবন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অরিন্দম সরকার সুরাভর্তি পাত্রে চুমুক দেয় আরাম করে।

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায়, রাত বাড়তে থাকে তবু জগার দেখা নেই। ক্রমশ বিচলিত হয়ে উঠতে থাকে অরিন্দম সরকার। এবং যত বিচলিত হয় তত বেশী মদ্যপান করতে থাকে। মাথার মধ্যে সুরার আগুন জলতে থাকে।

জগা এলো প্রায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরে।

কোনমতে বিরাট একটা তাকিয়ার উপরে ঠেস দিয়ে বসে ছিল অরিন্দম সরকার। ঢুলুঢুলু নেশাগ্রস্ত রক্তাক্ত দুটি চক্ষু। পদশব্দে নেশাগ্রস্ত দুটি আরক্ত চক্ষু মেলে তাকাল অরিন্দম সরকার, কে?

আজ্ঞে কর্তা আমি জগা—মিনমিনে গলায় জবাব দেয় জগা।

এনেছিস?

জগা মাথা নীচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি রে হারামজাদা, বোবা কেন? জবাব দিচ্ছিস না কেন কথার?

তবু নিশ্চুপ জগা।

এই হারামজাদা! গর্জন করে ওঠে এবারে অরিন্দম সরকার, এনেছিস না—

না—

না?

আজ্ঞে—একটু ভুলের জন্য অন্ধকারে—

শুধু হাতে ফিরে এসেছিস হারামজাদা? জগার কথা শেষ হয় না, গর্জন করে ওঠে পুনরায় অরিন্দম সরকার এবং পরমুহূর্তেই হাতে ধরা সুরার বেলোয়ারী পাত্রটা সজোরে জগার মুখের ওপরে ছুঁড়ে মারে। একটা অস্ফুট চিৎকার শোনা যায় ও সেই সঙ্গে বেলোয়ারী পাত্রটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ঝন ঝন শব্দ ওঠে।

বেরো—বেরো এখান থেকে হারামজাদা—অপদার্থ—

জগা তখনো চেয়ে আছে অরিন্দম সরকারের মুখের দিকে, বীভৎস মুখটা তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বৃন্দাবন চেঁচামেচি শুনে হন্তদন্ত হয়ে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ায়।

॥ ৩ ॥

অভাবনীয় এবং আকস্মিক আঘাতটা মুহূর্তের জন্যে বুঝি জগাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। শুধু বিমূঢ়ই নয় অতর্কিত আঘাতের নিদারুণ বেদনায় মাথাটা যেন ঘুরে ওঠে জগার। চোখে অন্ধকার দেখে। টলে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিজেকে সামলে নেয়।

আর তার ঠিক পরমুহূর্তেই ক্ষতস্থান থেকে নিঃশব্দে প্রবাহিত তাজা রক্তের ধারাটা ওষ্ঠের প্রান্ত দিয়ে মুখের মধ্যে প্রবেশ করে একটা লোনা স্বাদে তার সর্বাঙ্গ সিরসিরিয়ে তোলে।

বহুকালের খুনী ঠ্যাঙাড়ের যে নেশাটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা পরিবেশে এতকাল মনের কোণে এক নিভৃতে শান্ত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েছিল, সেই নেশাটাই যেন অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করে জেগে উঠলো।

জগার ছুটো পিঙ্গল চোখের তারা যেন হিংস্র শ্বাপদের চোখের মত জ্বল জ্বল করে উঠলো। রক্তাক্ত বীভৎস মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো। দৈত্যাকৃতি চেহারার পেশীগুলো সজাগ হয়ে উঠলো।

অরিন্দম সরকার আবার চিৎকার করে ওঠে, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে হারামজাদা—

কিন্তু এবার আর অরিন্দম সরকারের মুখের কথা শেষ হলো না, তার আগেই একটা হিংস্র বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো জগা উপবিষ্ট অরিন্দম সরকারের উপর। এবং লোহার মত শক্ত দুটো হাতে জগা অরিন্দম সরকারের গলাটা টিপে ধরলো।

শক্তিতে অরিন্দম সরকারও কম যায় না। এবং জগার চাইতে তার দেহে শক্তি কম ছিল না, কিন্তু নেশায় শিথিল বিবশ দেহ এবং অতর্কিত আক্রমণে অরিন্দম সরকার এমন বিহ্বল হয়ে পড়ে যে চেষ্টা করেও জগার সেই লৌহমুষ্টির পেষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।

অবশভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পরই নিজেকে এলিয়ে দেয়।

আর জগা তখন হিংস্র এবং ক্রুদ্ধ আক্রোশে দু'হাতে অরিন্দম সরকারের গলাটা টিপে ধরে প্রবল ভাবে ঝাঁকাতে থাকে।

অরিন্দম সরকারের গলা দিয়ে একটা চাপা গোঁ-গোঁ আর্তনাদ বেরুতে থাকে। অরিন্দমের চোখের তারা দুটো কপালে উঠে যায় সেই নিষ্ঠুর পেষণে।

বৃন্দাবন এতক্ষণ বিহ্বল হয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সে যখন দেখলে জগার হাতে অরিন্দম সরকার প্রায় শেষ হয়ে আসবার উপক্রম সে চকিতে এদিক-ওদিক তাকায়।

বৃন্দাবনের দেহে এত শক্তি ছিল না যে জগার হাত থেকে তার নতুন মনিবকে সে রক্ষা করতে পারে। অথচ এও বুঝতে পারছিল আর কিছুক্ষণ ঐ ভাবে চললে শ্বাসরোধ হয়ে অরিন্দম সরকারের মৃত্যু অনিবার্য।

বিহ্বল হতচকিত বৃন্দাবন বুঝে উঠতে পারে না ঐ মুহূর্তে যে সে ঠিক কি করবে? এবং এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতেই সহসা ঘরের কোণে ফুল রাখার একটা বিরাট সুদৃশ্য বেলোয়ারী পাত্র চোখে পড়ে।

বৃন্দাবন ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে সেই পাত্রটা দু'হাতে তুলে নিয়ে জগার মাথার উপর প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করে।

একটা ঝন ঝন শব্দে বেলোয়ারী পাত্রটা ভেঙে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে জগা জ্ঞান হারিয়ে ফরাশের উপর এক পাশে টলে পড়ে।

রক্তে ফরাশটা লাল হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় বৃন্দাবন তখনো রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

এক পাশে পড়ে আছে রক্তাক্ত জগার নিঃসাড় দেহটা। অন্য পাশে পড়ে অরিন্দম সরকারের জ্ঞানহীন দেহটা।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাইরে থেকে একটা ঘটিতে করে ঠাণ্ডা জল এনে

বৃন্দাবন জ্ঞানহীন অরিন্দম সরকারের চোখে মুখে ছিটোতে থাকে।

ব্যাকুল কণ্ঠে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকে কর্তা—কর্তা—হুজুর—।

অনেকক্ষণ চোখে-মুখে জল দেবার পর ধীরে ধীরে এক সময় অরিন্দম সরকার চোখ মেলে তাকায়।

কর্তা, হুজুর—

কে?

আমি—আমি—বৃন্দাবন হুজুর—

বৃন্দাবন?

অরিন্দমের তখনো সব কিছু ঝাপ্‌সা। সমস্ত বোধশক্তি তখনো ক্ষীণ। কণ্ঠের পেশীতে ও মাথার মধ্যে জগার পেষণের ফলে রক্তচাপাধিক্যের দরুন একটা বোবা যন্ত্রণাবোধ।

বৃন্দাবন আবার বলে, হ্যাঁ, হুজুর—বৃন্দাবন। এখন কেমন বোধ করছেন হুজুর?

একটু জল। ক্ষীণকণ্ঠে কোন মতে আবার কথাটা উচ্চারণ করে অরিন্দম সরকার।

এদিক ওদিক তাকায় বৃন্দাবন, কিন্তু জলের পাত্র তখন নিঃশেষ। কি করে, হঠাৎ ঐ সময় নজর পড়ে অর্ধেক শূন্য একটা সুরার বোতল।

হাত বাড়িয়ে সেটাই তুলে নিয়ে সেই বোতলের তরল পদার্থ খানিকটা অরিন্দম সরকারের মুখবিবরে ঢেলে দেয়।

তরল অগ্নি—সেই নির্জলা সুরা পেটে পড়তেই কাজ হয়। উত্তেজক সেই তরল পদার্থের ক্রিয়ায় অরিন্দমের শিথিল ঝিমিয়ে পড়া সমস্ত দেহটা যেন চন্‌ চন্‌ করে উঠে।

ধীরে ধীরে অরিন্দম সরকার এবারে নিজেই উঠে বসে। মাথাটা ঘুরে ওঠে, কিন্তু সামনের একটা তাকিয়া ধরে নিজেকে সামলে নেয় অরিন্দম সরকার। এবং সেই সময়ই নজরে পড়ে রক্তাক্ত তখনো চেতনাহীন জগার ফরাশের উপর প্রসারিত দেহটার প্রতি।

ধীরে ধীরে এতক্ষণে বুঝি সব মনে পড়ে যায় অরিন্দম সরকারের। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে অরিন্দম সরকার।

কিন্তু বৃন্দাবন বাধা দেয়, উঠবেন না, উঠবেন না হুজুর—একটু শুয়ে থাকুন বা বসে থাকুন—

জগা—হারামজাদা—

ভয় নেই হুজুর, ওকে এমন আঘাত করেছি যে সহজে উঠতে হবে না—ঐ দেখুন না কেমন করে পড়ে আছে এখনো।

আর ঠিক সেই সময়ই খোলা দরজার গোড়ায় একটা পদশব্দ শুনে প্রভু-ভৃত্য দুজনাই চমকে তাকায় সেই দিকে, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বাঈজী কস্তুরী।

সর্বাঙ্গে নর্তকীর বেশ এবং একটা আকাশ-নীল রঙের রেশমী ওড়না জড়ানো। কস্তুরীও ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সমস্ত ফরাশটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে, একপাশে পড়ে আছে রক্তাক্ত জগার চেতনাহীন দৈত্যের মত চেহারাটা।

অরিন্দম সরকার বসে এবং সামনে তার দাঁড়িয়ে বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন।

বাঈজী সাহেবা!

বিস্ময়াভূত বৃন্দাবনের কণ্ঠ হতে অস্ফুট কথা দুটো উচ্চারিত হলো, ক্ষীরোদা কোথায় বৃন্দাবন?

ক্ষীরোদা মা?

হ্যাঁ, কোথায় সে? তাকে তো কোথাও দেখলাম না?

বিহ্বল বৃন্দাবন একবার অরিন্দম সরকারের মুখের দিকে তাকাল, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললে, মা তো এখানে নেই বাঈজী সাহেবা।

নেই! কোথায় সে? মহেন্দ্র সাহা তাকে তা হলে শেষ পর্যন্ত তাড়িয়েই দিয়েছে?

হ্যাঁ—চলুন বাঈজী সাহেবা পাশের ঘরে।

এগিয়ে গেল বৃন্দাবন দরজার দিকে।

সে তখন কস্তুরীকে ঐ ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বলে আবার, চলুন—

কিন্তু কস্তুরী নড়ে না। পথও ছাড়ে না। ঘরের দরজা জুড়ে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। এবং প্রশ্ন করে, ওখানে ফরাশের উপর পড়ে কে?

কস্তুরী ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম সরকার মুখ নীচু করেছিল। এবং আগাগোড়া বৃন্দাবন অরিন্দম সরকারকে কতকটা ইচ্ছা করেই আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকায় কস্তুরী তাকে ঠিক চিনে উঠতে পারে নি।

কস্তুরীর শেষের কথায় অরিন্দম মুখ তুলে তাকাতেই এতক্ষণে কস্তুরীর অরিন্দম সরকারের প্রতি ভাল করে নজর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরী তাকে চিনতে পারে।

বিস্ময়াভূত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, কে! সরকার মশাই না?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরী ছু'পা বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

অরিন্দম কোন সাড়া দেয় না কস্তুরীর ডাকে, কেবল অসহায় বোবা দৃষ্টিতে ক্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অদূরে মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে দণ্ডায়মান কস্তুরীর মুখের দিকে।

ঘরের আলো কস্তুরীর অঙ্গের বেশভূষা ও অলংকারের উপর প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করছে।

সুর্মা-টানা কস্তুরীর দুটি চোখের দৃষ্টি অরিন্দমের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ।

অরিন্দমের দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কস্তুরীই এগিয়ে গিয়ে পায়ে পায়ে ফরাশের উপর শায়িত রক্তাক্ত চেতনাহীন জগার দেহটার সামনে দাঁড়ায়।

কে এই লোকটা সরকার মশাই? মনে হচ্ছে মরে গেছে!

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে অরিন্দম সরকার।

উঠে দাঁড়িয়ে কস্তুরীর দিকে তাকিয়ে ডাকে, বাঈজী।

অ্যাঁ—ফিরে তাকালো সেই ডাকে কস্তুরী অরিন্দমের মুখের দিকে। বললে, এ লোকটা কে সরকার মশাই?

ও কে তোমার জানবার প্রয়োজন নেই বাঈজী, কঠিন কণ্ঠে বলে অরিন্দম, এ গৃহও এখন মহেন্দ্র সাহার নয়—

তবে কার?

আমার। আমি তার কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি—

বলেন কি! সত্যি?

হ্যাঁ—এবং এই মুহূর্তে এখান থেকে তুমি চলে গেলেই আমি খুশী হবো বাঈজী।

কথাটা বলে ফিরে তাকালো অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের দিকে। বৃন্দাবন, ওঁকে সদর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়—

মৃদু হাসিতে কস্তুরীর ওষ্ঠ যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং সে স্মিত কণ্ঠে বলে, আপনি হয়তো জানেন না সরকার মশাই, এ বাড়ির সব কিছুই আমার অত্যন্ত পরিচিত—বাইরে যাবার রাস্তা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে না, আমি জানি।

কথাটা বলতে বলতে আড়চোখে একবার কস্তুরী ভূপতিত তখনো অচেতন জগার রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে পুনরায় স্থির দৃষ্টিতে তাকালো অরিন্দম সরকারের দিকে।'

তাছাড়া আমিও তো আপনার অপরিচিত নই সরকার মশাই—

বৃন্দাবন।

তীক্ষ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় ডেকে ওঠে অরিন্দম সরকার।

বৃন্দাবন রীতিমত বিব্রত বোধ করে এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যায় এই আশংকায় কস্তুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন বাঈজী সাহেবা—

হ্যাঁ, চলো বৃন্দাবন।

কথাটা বলে আর দাঁড়ালো না কস্তুরী, সোজা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বৃন্দাবনও তাকে অনুসরণ করে।

বারান্দায় দুজনে আগে পিছে বের হয়ে আসে। একটি মাত্র দেওয়ালগিরির আলোয় বারান্দায় একটা আলোছায়ার লুকোচুরি।

নিঃশব্দে বারান্দাটা অতিক্রম করে সদর বরাবর এসে কস্তুরী আবার ঘুরে দাঁড়ালো, বৃন্দাবন—

বাঈজী সাহেবা!

ক্ষীরোদা কোথায়?

আজ নয় বাঈজী সাহেবা, সে অনেক কথা। আজ আপনি যান, পরে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব আমি বলবো।

বেশ তাই বলো। একটা কথা শুধু বলো? সে বেঁচে আছে কি না?

জানি না—

জানো না?

না। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না, যান—

এ বাড়িটা সত্যিই তাহলে মহেন্দ্র সাহা বেচে দি ন

হ্যাঁ।

বাইরে দরজার কাছেই অন্ধকারে বাঈজীর পাল্কী অপেক্ষা করছিল, কস্তুরী সোজা গিয়ে পাল্কীতে উঠে বসল।

কাহাররা পাল্কী কাঁধে তুলে রওনা হয়।

হুম্‌হ্রো—হুম্‌হ্রো—

কাহারদের মিলিত ঐকতান ক্রমশঃ অন্ধকারে পথের অপর প্রান্তে মিলিয়ে যায়।

বৃন্দাবন যখন আবার পূর্বের হলঘরে ফিরে এলো, অরিন্দম সরকার পাত্রে সুরা ঢেলে মুখের কাছে তুলে পান করছে।

বৃন্দাবন ঘরে এসে ঢুকতেই হস্তধৃত পাত্রের বাকী সমস্ত সুরা এক চুমুকে নিঃশেষে পান করে হাতের পাত্রটা পাশেই নামিয়ে রাখতে রাখতে অরিন্দম

সরকার বলে, বৃন্দাবন, আগে দেখো জগা বেঁচে আছে না শেষ হয়ে গিয়েছে—

বৃন্দাবন আর কস্তুরী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরই ভূপতিত তখনো চেতনাহীন জগার দিকে এগিয়ে গিয়ে জানবার চেষ্টা করেছিল অরিন্দম, জগা কি মরেছে না বেঁচে আছে ?

অমনি করে সেই তখন থেকে অসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে কেমন যেন তার মনের মধ্যে সন্দেহ হয়েছিল হয়তো জগা বেঁচে নেই।

কিন্তু ভূপতিত জগার সামনে গিয়ে তার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মাথা ও মুখের দিকে তাকাতেই একটা অজানিত আশংকায় বুকের ভিতরটা কেমন যেন হঠাৎ সিরসিরিয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি চোখ বুজে দু'পা পিছিয়ে আসে।

মাথাটার মধ্যে যেন আবার পূর্বের মত ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

সত্যি সত্যিই বেটা মরে গেল নাকি শেষ পর্যন্ত।

লোকটা শুধু অনুগতই নয়, বিশ্বাসীও ছিল এবং অনেক দুরূহ কাজ ইতিপূর্বে অনায়াসেই শেষ করেছে। খুন, গায়েব কোন কিছুতেই কখনো পেছপাও হয় নি।

অনেক গোপন কাজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল লোকটা।

ঘরের মধ্যে একা থাকতেও যেন কেমন ভয় ভয় করে। সব কিছু যেন হঠাৎ কেমন খালি খালি মনে হয় অরিন্দমের।

আকণ্ঠ একটা পিপাসায় গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

শুষ্ক জিহ্বাটা ভিতরের দিকে টানছে যেন।

এদিকে ওদিকে তাকায় অরিন্দম সরকার এবং নজরে পড়ে বোতলটা এখনো শূন্য হয়ে যায় নি।

কোনমতে এগিয়ে গিয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়ে বোতলটা উপুড় করে অনেকটা ঢালে, তারপরই সেটা মুখের সামনে তুলে ধরে চুমুক দেয়।

বৃন্দাবন, আগে দেখ জগা বেঁচে আছে না শেষ হয়ে গিয়েছে।

আর ঠিক সেই সময় বৃন্দাবন এসে ঘরে ঢোকে।

বৃন্দাবন একবার অরিন্দমের মুখের দিকে তাকালো তারপর এগিয়ে গেল ভূপতিত জগার সামনে।

সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জগার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিল, জগা—এই জগা—

কিন্তু মুখের কথাটা বৃন্দাবনের শেষ হয় না, চকিতে হাতটা সরিয়ে নেয় সে। জগার দেহটা বরফের মত ঠাণ্ডা।

জগার কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকায় বৃন্দাবন অরিন্দম সরকারের দিকে এবং ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে, হুজুর—

কি রে?

শূন্য গ্লাসটায় আবার বোতল থেকে ঢালছিল অরিন্দম, বৃন্দাবনের ডাকে ওর দিকে তাকালো।

কি রে?

বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে—

অ্যাঁ, শেষ হয়ে গিয়েছে?

হাত থেকে অরিন্দম সরকারের গ্লাসটা ফরাশের উপর পড়ে যায়।

কি হবে হুজুর? আতংকে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে বৃন্দাবন।

জগা যে তারই আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে সেটা তো বৃন্দাবন বুঝতেই পারছে। উত্তেজনার মাথায় দুম্ করে মেরে বসেছিল জগাকে, কিন্তু সেই আঘাতেই শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই যে জগার প্রাণটা বের হয়ে যাবে তা কি বেচারী বৃন্দাবন স্বপ্নেও ভেবেছে।

হুজুর! কি হবে হুজুর! হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বৃন্দাবন।

কিন্তু অরিন্দম সরকার ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ওঠে থাম্ বেটা, কাঁদিস নে।

হুজুর?

আবার কাঁদে? যা—চট করে সদরটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

বাঈজী সাহেবা দেখে গিয়েছেন হুজুর—এখন যদি তিনি কোতোয়ালীতে গিয়ে খবর দেন—আমাকে বাঁচান হুজুর—ছুটে এসে বৃন্দাবন অরিন্দমের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে।

এই বৃন্দাবন, ওঠ—ওঠ—

গরীব মানুষ হুজুর, কেবল আপনাকে বাঁচাবার জন্যই ওর মাথায় আমি আঘাত করেছি হুজুর—কি হবে হুজুর!

অরিন্দমেরও তখন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেও কিছু ভাবতে পারছে না।

কিন্তু লাশ সরিয়ে ফেলতে হবে। এবং রাতারাতিই সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু কোথায় সরাবে লাশ।

হঠাৎ একটা মতলব চকিতে অরিন্দম সরকারের মাথার মধ্যে খেলে যায়।

অরিন্দম ডাকে, বৃন্দাবন—

হুজুর।

এ-বাড়ির পিছনে খানিকটা খোলা জমি আছে না?

আজ্ঞে—

এক কাজ কর। বাড়িতে শাবল আছে?

আছে—

শাবলটা আর একটা আলো নিয়ে আয়।

শাবল দিয়ে কি হবে হুজুর?

যা বলছি তাই শোন, একটা আলো আর শাবলটা নিয়ে আয়।

বৃন্দাবন চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং একটু পরেই লোহার একটা শাবল ও একটা আলো নিয়ে এলো।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরিশ্রম করে দুজনে মিলে বাড়ির পিছনে যে খালি জমিটা পড়ে ছিল সেখানে একটা ঝুপসী কামিনী গাছের নীচে গর্ত খুঁড়ে ফেলে।

তারপর দুজনে ধরাধরি করে জগার মৃতদেহটা এনে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে যখন দাঁড়িয়েছে, তখন রাতের আকাশে ভোরের প্রথম আলোর ইশারা জেগে উঠেছে।

কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকে, বৃন্দাবন!

আজ্ঞে—

তুই সকাল হলেই কিছুদিনের জন্য বাড়ি চলে যা।

বাড়ি চলে যাবো?

হ্যাঁ, যা—তোর কোন ভয় নেই, যা করবার এদিকে আমি করবো।

কিন্তু হুজুর বাঈজী সাহেবা?

সেজন্যও তোর ভয় নেই। সে ব্যবস্থাও আমি করবো!

মুখে বলে বটে অরিন্দম কস্তুরীর ব্যবস্থা সে করবে, কিন্তু ভেবে পায় না সে [illegible]বে। কস্তুরী বাঈজীকে অরিন্দম খুব ভাল করে চেনে। কিন্তু যতই ভাবছে, [illegible]মান্য এক নর্তকী। পারবে না কি অরিন্দম তাকে অর্থ দিয়ে বশ

করতে? অর্থে বশ কে না এ-দুনিয়ায়!

অরিন্দম উঠে দাঁড়াল, বৃন্দাবন!

হুজুর?

তাহলে তুই এখুনি বের হয়ে পড়্।

এখুনি?

হ্যাঁ—আর দেরি করিস না। সঙ্গে টাকা আছে তো?

আজ্ঞে—

ঠিক আছে, এই নে—বলে জামার জেব থেকে কিছু টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল অরিন্দম সরকার বৃন্দাবনের দিকে।

বৃন্দাবন টাকাগুলো তুলে নেয়।

মনে থাকে যেন এক মাসের এদিকে এ শহরে পা দিবি না। যা—

বৃন্দাবন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

একটু পরে অরিন্দম সরকারও উঠে দাঁড়াল।

অরিন্দম সরকার যখন তার গৃহের সামনে এসে পাল্কীগাড়ি থেকে নামলো, ভোরের আলো চারিদিকে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ ৪ ॥

বৃন্দাবন।

বেচারা বৃন্দাবন। টাকাগুলো কোমরে গুঁজে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো। মহেন্দ্র সাহার ঐ বাগানবাড়িতে অনেকগুলো বছর সে কাটিয়েছে এবং কখনো জীবনে ভাবে নি ঐ বাড়ি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হবে।

মহেন্দ্র সাহা লোকটা দুশ্চরিত্র, মাতাল ও খেয়ালী ছিল বটে, তবে তার হৃদয় বলে একটা বস্তু ছিল। কখনো কারো প্রতি নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবহার করে নি।

ক্ষীরোদার প্রতি কেন যে মহেন্দ্র সাহা অকস্মাৎ অমন নিষ্ঠুর ও নির্মম হয়ে উঠেছিল সেটা বৃন্দাবনের সত্যিই বোধগম্য হয় নি।

অবিশ্যি ক্ষীরোদাকেও রীতিমত দুর্বোধ্য লেগেছে বৃন্দাবনের।

ক্ষীরোদাকে সত্যিই সে বুঝতে পারে নি। মেয়েমানুষ, অথচ টাকাকড়ি গহনা প্রভৃতির দিকে নজর নেই।

ক্ষীরোদার মত মেয়েমানুষ সত্যিই বৃন্দাবনের তার আগে আর নজরে পড়ে নি।

আশ্চর্য! কিছুরই যেন মেয়েটার প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীর যাবতীয় সব-কিছুর উপরেই যেন বৈরাগ্যের নিস্পৃহতা।

শেষ রাত্রের দিকে জনহীন রাস্তা ধরে চলতে চলতে হঠাৎই যেন ক্ষীরোদার মুখখানা বৃন্দাবনের মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

মনে পড়ে বৃন্দাবনের সেই রাতটার কথা।

মেয়েটা তো নয়, তাকে যে মা বলে ডেকেছিল বৃন্দাবন। কেন যে হঠাৎ মা বলে ক্ষীরোদাকে ডেকেছিল, তা জানে না বৃন্দাবন। তবে মা বলে তাকে ডেকেছিল।

মা বলে ক্ষীরোদাকে ডেকে বুকটা তার ভরে গিয়েছিল যেন। নিজের মাকে বৃন্দাবনের মনেও পড়ে না।

জন্মাবধি মা-বাপকে সে দেখে নি। অবিশ্যি সে জন্ম বৃন্দাবনের কোন দুঃখও ছিল না। যাদের কোন স্মৃতিই তার মনের মধ্যে ছিল না তাদের জন্ম দুঃখই বা হবে কেন।

যোগীন্দ্র গোয়ালার ঘরে সে মানুষ।

যোগীন্দ্র দুধের যোগান দিত মহেন্দ্র সাহার গৃহে, সেই সূত্রেই মহেন্দ্র সাহার গৃহে যাতায়াত ছিল যোগীন্দ্রর।

যোগীন্দ্রই একদিন তার হয়ে মহেন্দ্র সাহার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল, দয়াপরবশ হয়ে মহেন্দ্র সাহা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল।

কিছুদিন মহেন্দ্র সাহার বাড়ীতেই ছিল সে, তারপর তাকে এনে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেছিল।

দীর্ঘ চোদ্দ বছর ছিল ঐ বাগানবাড়িতে।

আজ চোদ্দ বছর পরে সেই আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে দাঁড়ালো রাস্তায়।

মনে পড়লো বৃন্দাবনের, মাত্র কয়মাস আগে ঐ বাগানবাড়ি থেকেই বিতাড়িত হয়ে ক্ষীরোদা এসে তারই মত এমনি করে পথে দাঁড়িয়েছিল।

দুর্বল দেহে কোনমতে পায়ে চলে পথ অতিক্রম করে ক্ষীরোদাকে নিয়ে গিয়ে সে উপস্থিত হয়েছিল সে রাত্রে কস্তুরী বাঈজীর গৃহের দ্বারে। এবং দ্বারে তালা ঝুলতে দেখে ক্ষীরোদা বসে পড়েছিল ক্লান্ত অবসন্ন সেই বন্ধ দ্বারের সামনে। তারপরই সহসা জ্ঞান হারিয়েছিল।

ক্ষীরোদার সংজ্ঞাহীন দেহটার সামনে বসে বৃন্দাবন যখন ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে ডাকছে, মা—মাগো—ক্ষীরোদার কোন সাড়া নেই, তখন ঐ সময় হুমৃত্রো

হমৃব্রো শব্দ করতে করতে কাহারম্বা এসে কস্তুরীর পাল্কীটা দোরগোড়ায় নামালো।

পাল্কী থেকে নেমে ক্ষীরোদা ও বৃন্দাবনকে ঐ অবস্থায় দেখে কস্তুরী তো হতভম্ব।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে কস্তুরী, কে! একি বৃন্দাবন—

এসেছো বাঈজী সাহেবা? কেঁদে ফেলে বৃন্দাবন, এই দেখো মা বোধহয় মারা গেছে—

মারা গেছে?

হাঁটু গেড়ে চেতনাহীন ক্ষীরোদার শিয়রের কাছটিতে দামী বেনারসী পরিহিতা কস্তুরী বাঈজী মাটিতে ধূলাতেই বসে পড়ে।

ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকে, ক্ষীরোদা—ক্ষীরোদা—

সাড়া নেই ক্ষীরোদার। ইতিমধ্যে কস্তুরীর দাসী মোক্ষদা আর মাণিক এসে উপস্থিত হয়; বাঈজীর অনুপস্থিতিতে সে ও ভৃত্য মাণিক দরজায় তালা লাগিয়ে আগের রাত্রে তার বোনঝির ওখানে গিয়েছিল।

কস্তুরী মোক্ষদাকে দেখে ধমকে ওঠে, কোথায় গিয়েছিলি তোরা দরজায় তালা লাগিয়ে—শিগ্‌গির দরজা খোল।

মোক্ষদা আর মাণিক দুটিতেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

বাঈজীর আরো দুদিন পরে ফিরবার কথা ছিল। সে যে দুদিন আগেই চলে আসবে তারা বুঝতে পারেনি।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি? আবার ধমকে ওঠে মোক্ষদাকে কস্তুরী, যা শিগ্‌গির একটা ঘটিতে করে জল নিয়ে আয়।

ইতিমধ্যে মাণিক দরজার তালা খুলে দিয়েছিল, মোক্ষদা ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আসে।

চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে কিছুক্ষণ পর ক্ষীরোদা চোখ মেলে তাকায়।

ক্লান্ত ক্ষীণকণ্ঠে অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করে ক্ষীরোদা, উঃ মাগো—

মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কস্তুরী, ক্ষীরোদা—

কে?

আমি কস্তুরী, এখন কেমন বোধ করছো?

আমি কোথায়? ক্ষীণকণ্ঠে শুধায় ক্ষীরোদা।

কস্তুরী নিজের কোলের উপরে ক্ষীরোদার মাথাটা তুলে নিয়েছিল, তার ভিজে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে বলে, তুমি আমার কাছে আছো

ক্ষীরোদা। এখন একটু ভাল বোধ করছো কি ?

ক্ষীরোদা উঠে বসবার চেষ্টা করে।

বাধা দেয় কস্তুরী, বলে, না-না, উঠো না। শুয়ে থাকো।

কিন্তু ক্ষীরোদা বাধা মানে না। উঠে বসে।

যেতে পারবে বাড়ির ভিতরে ? কস্তুরী জিজ্ঞাসা করে।

কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় কস্তুরীর মুখের দিকে ঐ প্রশ্নে ক্ষীরোদা।

বলে, বাড়ির ভিতর ?

হ্যাঁ, যেতে পারবে ?

পারবো।

কস্তুরীর সাহায্যেই অতঃপর ক্ষীরোদা কোনমতে টলতে টলতে বাড়ির ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে। একপাশে এতক্ষণ ছল ছল চোখে দাঁড়িয়ে ছিল বৃন্দাবন।

কস্তুরী তাকেও ডাকে, এসো বৃন্দাবন—

বৃন্দাবনের মুখ থেকেই কস্তুরী ক্ষীরোদার দুর্ভাগ্যের আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা শোনে। শুনতে শুনতে কস্তুরীর দু'চোখের তারা যেন জ্বলে ওঠে।

মহেন্দ্র সাহা লোকটা চিরদিনই নীচ ও স্বার্থপর প্রকৃতির, কিন্তু সে যে এত নীচ—এত স্বার্থপর সেটাই জানতো না কস্তুরী।

মনে হয় কস্তুরীর, স্বার্থপর ঐ নীচ পশুটাকে যদি সে উচিতমত শিক্ষা দিতে পারতো তবে বুঝি শান্তি পেত। কিন্তু মহেন্দ্র সাহা তার নাগালের বাইরে। তাছাড়া মহেন্দ্র সাহা শহরের মধ্যে একজন প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তি।

কস্তুরীর মত একজন সাধারণ নগণ্য বাঈজী কি করতে পারে তার।

কেশস্পর্শও তো সে করতে পারবে না। তাছাড়া, তারা কস্তুরী, ক্ষীরোদা—অধম মেয়ের জাত।

আর মহেন্দ্র সাহারা পুরুষের জাত, যারা তাদের মত হতভাগিনীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাদের পাপ-পুণ্যের বিধান কর্তা।

ঐ পুরুষদের পদাশ্রয়ই যে তাদের একমাত্র আশ্রয়। তাদের ইহকাল পরকাল যে ঐ পুরুষরাই।

তারা সামাজিক আশ্রয় দিলেই তাদের জননী—জায়া—কন্যা, আবার তাদের সেই সামাজিক আশ্রয় না দিলেই তারা বারবনিতা—তারা রক্ষিতা। কুলটা, ভ্রষ্টা।

তারা যতদিন বেঁচে আছে—স্বামীর গৌরবে তাদের যা কিছু গৌরব, তাদের মৃত্যুতে সহমরণ। উপায় তো নেই। কোন উপায়ই নেই।

জ্ঞান ফিরে আসার পর ক্ষীরোদার দু'চক্ষুর কোণ বেয়ে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। বৃন্দাবন তখন একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

কস্তুরী সযতনে সস্নেহে ক্ষীরোদার চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, কেঁদে আর কি হবে ভাই। আমাদের জীবনে ও অশ্রু তো শেষ হবার নয়। এখানে সেদিন তোমাকে আনতে চাই নি, এক কলঙ্ক থেকে আর এক কলঙ্কের মধ্যে এসে পড়তে এই জন্যই। কিন্তু ভগবানই যখন তোমাকে হাতে করে এখানে পৌছে দিলেন, এখানেই তুমি থাকবে।

ক্ষীরোদার মুখের দিকে চেয়ে সে সময় কিছু বোঝা না গেলেও বৃন্দাবন কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিল। সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভেবে যে, যাক অন্তত তার মাকে রাস্তায় গিয়েই শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি দাঁড়াতে হলো না। এবং নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে এসেছিল সেদিন বৃন্দাবন।

আজ যখন অরিন্দম সরকার তাকে বিদায় দিল তখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই যে প্রশ্নটা বৃন্দাবনের মনে জাগে—কোথায় সে যাবে এখন।

যোগীন্দ্র অনেক দিন মারা গিয়েছে। এখন যোগীন্দ্রর ছেলেরা সংসারের মালিক, তাকে সেখানে কেউই আশ্রয় দেবে না।

শুধু হাতেই মাত্র অরিন্দম সরকারের দেওয়া টাকা ক'টা সম্বল করে রাস্তায় বের হয়ে পড়েছিল বৃন্দাবন একবস্ত্রে।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো প্রায়। দু-একজন মানুষও পথে দেখা যায়। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে চলেছে। অনির্দিষ্ট ভাবে সেই পথ ধরে হাঁটতে থাকে বৃন্দাবন।

মনে পড়লো হঠাৎ বৃন্দাবনের—মেদিনীপুরে তার এক দূর-সম্পর্কীয় খুল্লতাত থাকে। তার ওখানে গেলে কেমন হয়।

বছর দুই আগে সেই খুল্লতাতের সঙ্গে এই কলকাতা শহরে তার একবার দেখা হয়েছিল। তখন সে তাকে মেদিনীপুরে যাবার জন্য বলেছিল, কিন্তু বৃন্দাবন সম্মত হয় নি।

বলেছিল, না—মহেন্দ্র সাহার আশ্রয়ে সে সুখেই আছে। এ শহর ছেড়ে সে কোথায়ও যেতে চায় না।

আজ যখন সে মেদিনীপুরে তার ভাইয়ের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তখন হয়তো সে হাসবে। হয়তো বলবে, তবে যে বলেছিলে শহর ছেড়ে আসবে না—

বৃন্দাবন বলবে, আর লজ্জা দিও না ভাই—চোখ আমার খুলে গেছে—

কিন্তু তার পূর্বে একবার ক্ষীরোদা মার সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে তাকে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃন্দাবন কস্তুরীর গৃহের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ক্রমশঃ আরো ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে আসছে। বৃন্দাবন একটু দ্রুতই হেঁটে চলে।

হাটখোলার কাছাকাছি নাতিপ্রশস্ত একটি রাস্তার উপরেই কস্তুরী বাঈজীর গৃহ। গৃহের কাছাকাছি আসতেই বৃন্দাবনের কানে ভেসে আসে সুমিষ্ট একটি সুরালাপ।

মহেন্দ্র সাহার বাগানবাড়িতে বহু রাতের আসরে বাঈজীদের কণ্ঠে নানা রাগ-রাগিণী শুনতে শুনতে বৃন্দাবনের সংগীতের সঙ্গে একটা পরিচয় ঘটেছিল।

রাগ-রাগিণীর মোটামুটি জ্ঞান শুনতে শুনতে আপনা হতেই যেন একটা জন্মেছিল বৃন্দাবনের।

বিশুদ্ধ ভৈরবীর সুরালাপ বৃন্দাবন বুঝতে পারে এবং এও বুঝতে পারে যে ভোরে আপন মনে বসে বসে বাঈজী কণ্ঠ সাধছে।

বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দিতেই ভৃত্য মাণিক দরজা খুলে দিল, কে গা ?

আমি—

বৃন্দাবন মাণিকের অপরিচিত নয়। ক্ষীরোদাকে নিয়ে আসা ছাড়াও ইতিপূর্বে দু'চারবার সে তার মনিবের সংবাদ নিয়ে বাঈজীর গৃহে যাতায়াত করেছে।

মাণিক বলে, বৃন্দাবন কি খবর—এত ভোরে ?

বৃন্দবন মৃদুকণ্ঠে বলে, বাঈজী সাহেবার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

মাণিক আর কোন প্রশ্ন করে না।

দরজাটা পুনরায় বন্ধ করে গৃহকর্মে চলে যায়।

দ্বিতলের একটি অপরিসর কক্ষে মেঝের উপরে বসে তানপুরা নিয়ে কস্তুরী গলা সাধছিল। ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো বৃন্দাবন।

কিন্তু বৃন্দাবনের দিকে নজর পড়ে না কস্তুরীর। সুরের মধ্যে সে তখনো সমাহিতা।

বৃন্দাবন যেন সব ভুলে যায়। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সুরালাপ শুনতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে এক সময় হঠাৎ নজর পড়ে কস্তুরীর দরজার গোড়ায়

দণ্ডায়মান বৃন্দাবনের প্রতি।

কে! কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

বাঈজী সাহেবা আমি—

বৃন্দাবন—কি খবর?

ক্ষীরোদা মার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে এলাম।

ক্ষীরোদা?

নামটা উচ্চারণ করে কেমন যেন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কস্তুরী বৃন্দাবনের মুখের দিকে।

ক্ষীরোদা মাকে দেখছি না, কোথায় তিনি বাঈজী সাহেবা?

সহসা কস্তুরীর দুটি চক্ষুর কোল অশ্রুতে ছল ছল করে ওঠে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ে কস্তুরী।

উৎকণ্ঠিত বৃন্দাবন শুধায়, কি, কি হয়েছে ক্ষীরোদা মার?

সে নেই বৃন্দাবন—আর সেই কথা বলতেও ক্ষীরোদা ওখানে যদি গিয়ে থাকে, সেইজন্যই কাল রাত্রে তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম। কথাটা বলতে গিয়ে যেন কান্নায় বুজে আসে কস্তুরীর গলা।

সে কি।

হ্যাঁ—

আমি বুঝতে পারি নি বাঈজী সাহেবা। আমি বুঝতে পারি নি।

কস্তুরী চুপ করে বসে থাকে তানপুরাটার উপর একটা হাত রেখে।

বৃন্দাবন মৃদুকণ্ঠে আবার বলে, মা তাহলে এখানে নেই!

না।

কিন্তু—

তাকে তুমি এখানে রেখে যাওয়ার মাসখানেক পরে মুজরো নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম সেই সময়—

বৃন্দাবন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, মা তাহলে আর বেঁচে নেই—

কস্তুরী বলে, তাও জানি না বৃন্দাবন, ক্ষীরোদা বেঁচে আছে কি নেই তাও জানি না। তারপর একটু থেমে আবার বলে, মুজরো নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে সাতদিন পরে মাণিক আর মোক্ষদার মুখে শুনলাম একদিন ভোরে উঠে তাকে নাকি আর ওরা দেখতে পায় নি। সে এসেছিলই যদি বৃন্দাবন আমার কাছে, তো আবার অমনি করে চলে গেল কেন এটাই আজ পর্যন্ত ভেবে পেলাম না।

খুব কান্নাকাটি করতো বুঝি মা ? বৃন্দাবন শুধায়।

কান্নাকাটি ? না ! যে কটা দিন এখানে ছিল কখনো তাকে কাঁদতে দেখি নি। বেশীর ভাগ সময়ই পাশের ঘরে গিয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকতো আর ভোরবেলা যখন তানপুরা নিয়ে আমি রেওয়াজ শুরু করতাম এই ঘরে একপাশে এসে চুপচাপ বসে শুনতো।

বৃন্দাবন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি যাই বাঈজী সাহেবা।

যাচ্ছো ?

হ্যাঁ।

বৃন্দাবন ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে পশ্চাৎ থেকে কস্তুরী ডাকে, বৃন্দাবন !

বৃন্দাবন ফিরে দাঁড়ালো, কিছু বলছেন !

যদি তার কোন সংবাদ পাও তো আমাকে একটা খবর দিয়ে যেও।

খবর !

হ্যাঁ—কিন্তু আর কি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে বাঈজী সাহেবা—

কেন ! এ কথা বলছো কেন বৃন্দাবন ?

আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

চলে যাচ্ছো ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ! তবে কি তোমাকেও অরিন্দম সরকার তাড়িয়ে দিয়েছেন !

না ছুটি দিয়ে দিলেন।

তোমার কথা তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না বৃন্দাবন ?

সংক্ষেপে তখন সমস্ত কথা বলে বৃন্দাবন। কেবল বলে না আগের রাত্রে হত্যার ব্যাপারটা।

সমস্ত কথা শুনে কস্তুরী কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বৃন্দাবন নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

পথ দিয়ে চলতে চলতে বৃন্দাবন ভাবে, কি হলো ক্ষীরোদার ? কোথায় গেল সে ! তবে কি সে আত্মঘাতীই হলো। অপমানের আর দুঃখের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতীই হলো !

হয়তো তাই। অনেক দুঃখ অনেক অপমান সহ্য করেছে মা তার। হয়তো গঙ্গার জলেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে।

দু'চোখ জলে ভরে আসে বৃন্দাবনের চলতে চলতেই হাতের পাতায়

চোখের জল মুছে নেয়।

হারিয়ে গেল ক্ষীরোদা।

সবাই একদিন হারিয়ে যায়। সেও হারিয়ে যাবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে বৃন্দাবন, অনির্দিষ্টভাবে হেঁটে চলে।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

দিন ও রাত্রি।

রাত্রি আসে আবার প্রভাত হয়।

হরনাথ আর সুলোচনারও জীবনের সেই রাত্রি এক সময় প্রভাত হলো।

সে রাত্রে ক্ষীরোদাকে নিয়ে সেই কুৎসিত ব্যাপারের পর সুলোচনার ঐ ঘরের মধ্যে আবির্ভাবে সাধারণ যে পরিস্থিতিটা অতঃপর হরনাথ আশঙ্কা করে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তার কিছুই যখন ঘটলো না, বরং একান্ত শান্ত ও ধীরভাবে তাকে বাইরে গিয়ে হাতে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়বার জন্য বললে সুলোচনা, হরনাথ আর তার সামনে মুহূর্তকালও দাঁড়াতে পারে নি।

নিঃশব্দে পালঙ্ক থেকে নেমে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

একটা দুর্নিবার লজ্জা ও ছিছিক্কার যেন হরনাথকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়েছিল। তাকে যেন প্রতি মুহূর্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছিল।

তার জ্ঞান, শিক্ষা ও রুচির বাইরে অকস্মাৎ এ সে কি করে বসলো।

তিন তিনবার জীবনে বিবাহ করতে যে লজ্জা ও গ্লানি কোন দিন তাকে—তার পৌরুষকে এমনভাবে ধিক্কার দেয় নি, আজ যেন সেই গ্লানিটা অপরিসীম হয়ে তাকে, তার পৌরুষকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলো।

অকস্মাৎ হরনাথের মনে হলো যেন ঐ মুহূর্তে সুলোচনার চোখে সে অনেক, অনেকখানি নীচে নেমে গিয়েছে।

আর বুঝি সে সত্যি কোন দিনই সুলোচনার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

তার অচেতন মনের যৌনলালসাদৃপ্ত পশুটা যেন অকস্মাৎ তার এক দুর্বল মুহূর্তে সুলোচনার চোখের সামনে উৎকট উলঙ্গভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো।

বাড়ি থেকে বের হয়ে এতক্ষণে যেন দৌড়তে শুরু করে হরনাথ রাতের নির্জন রাস্তা ধরে।

আর পিছনে পিছনে সুলোচনার নিঃশব্দ হাসির একটা ধিক্কার যেন তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলে।

ছি ছি, মুহূর্তের উত্তেজনায় এ সে কি করে বসলো! এ সে কি করলো। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হরনাথ গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হলো। জোয়ারের স্ফীতি তখন গঙ্গাবক্ষে।

জোয়ারে কানায় কানায় পূর্ণ গঙ্গায় জল কল কল ছল ছল শব্দে তীরের উপর এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

একেবারে জলের কিনারে এসে থমকে দাঁড়ালো হরনাথ।

অন্ধকার হলেও স্তিমিত তারার আলোয় গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় নানা ধরনের নৌকাগুলো আবছা চোখে পড়ে।

জোয়ারের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হেলছে দুলছে অন্ধকারে নৌকাগুলো। তারই মধ্যে দু-একটায় আলোর আভাস পাওয়া যায়।

অদূরে শ্মশানে একটা চিতা প্রায় বুঝি নিভে এলো। নিবস্ত চিতার বুক থেকে একটা আগুনের চাপা রক্তিম আভাস অন্ধকারে যেন একটা আলোর চক্র রচনা করেছে। মধ্যে মধ্যে সেই আলোর চক্র থেকে বাতাসে আগুনের ফুলকি অন্ধকারে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দুটো মানুষ সেই নিবস্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়।

ঐ ভাবে এই মুহূর্তে যদি হরনাথ পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। অন্ধকারে নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে পারতো।

স্তব্ধ হয়ে হরনাথ দাঁড়িয়ে থাকে গঙ্গার কিনার ঘেঁষে আর মধ্যে মধ্যে এক একটা ঢেউ এসে ওর পায়ের উপর গোড়ালির উপর আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে।

ঐ ভাবে গঙ্গার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে।

পুব আকাশে অত্যাসন্ন প্রত্যুষের চাপা আলোর একটা দ্যুতি একটু একটু করে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। এবং ক্রমে ক্রমে একজন দুজন করে বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় স্নানার্থী নরনারী গঙ্গার জলে এসে অবগাহন শুরু করে।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে হরনাথ।

তন্দ্রাচ্ছন্ন সম্বিৎটা যেন অকস্মাৎ এক সময় আবার ফিরে আসে অম্বিকাচরণের কণ্ঠস্বরে, মিশ্র মশাই।

অম্বিকাচরণের ডাকে কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে হরনাথ তাকালো তার

মুখের দিকে।

আপনাকে তো কখনও এত সকালে গঙ্গাস্নান করতে আসতে দেখি নি?

অম্বিকাচরণ দত্তও একজন চালের আড়তদার এবং বেশ ফলাও চালের ব্যবসা। সেই সূত্রেই সুধামাধবের আড়তে হরনাথের সঙ্গে অম্বিকাচরণের আলাপ পরিচয় হয়।

হরনাথ অম্বিকাচরণের প্রশ্নে যেন লুপ্ত সম্বিৎ আবার ফিরে পায়। বলে, আজ একটু তাড়াতাড়িই এসেছি স্নান করতে দত্ত মশাই।

কথাটা বলে আর দাঁড়ালো না হরনাথ। সোজা গঙ্গার জলে নেমে যায়। গঙ্গার শীতল জলে পর পর কয়েকটা ডুব দেয়, এবং ডুব দিয়ে সোজা আবার তীরে উঠে হাঁটতে শুরু করে। পিছন ফিরে একটি বারও তাকায় না।

অম্বিকাচরণ দত্ত কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়েই হরনাথের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেমন গম্ভীর চিন্তাযুক্ত মনে হলো হরনাথ মিশ্রকে। ভাল করে কথা পর্যন্ত বললে না। হরনাথ মিশ্রের প্রকৃতি তো তেমন নয়। তাছাড়া দু'চোখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

গৃহের দরজার কাছে যখন এসে দাঁড়ালো হরনাথ তখন চারিদিকে ভোরের আলো সবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গঙ্গায় জলে ডুব দিয়েই সোজা চলে এসেছিল হরনাথ সিক্ত বস্ত্রে। শুধু যে পরিধেয় বস্ত্রই সিক্ত তাই নয়, সর্বাঙ্গ জলসিক্ত। মাথার চুল থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা চোখে মুখে গড়িয়ে পড়ছিল। সদর দরজা বরাবর এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হরনাথ।

সদর দরজাটা খোলা এবং খোলা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে সুলোচনা।

হরনাথ মুখ তুলে তাকালো এবং সুলোচনার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই দৃষ্টি আবার সে ভূমিতে নিবদ্ধ করে। মুহূর্তের জন্য দুজনেই নির্বাক হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে।

একজনের চোখের দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। অন্যের চোখের দৃষ্টি সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ।

সুলোচনাই একপাশে সরে দাঁড়ালো একসময়। হরনাথ নিঃশব্দে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। হরনাথ সোজা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

সুলোচনা এসে ঘরের সামনে বারান্দার উপরে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। সারাটা রাত সুলোচনা ঘুমোয় নি। সুনয়না এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম আসে নি চোখে সুলোচনার। এবং সুনয়না ঘুমিয়ে পড়বার পর এক সময় নিঃশব্দে শয্যা থেকে উঠে বাইরে অন্ধকারে বারান্দায় এসে বসেছিল। আর বার বার একটা কথাই কেবল তার মনে হয়েছে কেন সে কলকাতায় এলো! কৃষ্ণনগরে দাদার ওখানে সে তো ভালই ছিল। মনের সুখ না থাকলেও সম্মান ছিল। এতবড় অসম্মানের মধ্যে কেন সে এসে স্বেচ্ছায় পা দিল।

স্বামী তার এখানে এসে আবার নয়নতারাকে বিবাহ করেছে সংবাদটা সুলোচনার অবিদিত ছিল না। লোকপরম্পরাতেই স্বামীর তৃতীয়বার বিবাহের সংবাদটা তার কানে গিয়ে একদিন পৌছেছিল। সংবাদটা শুনে সেদিন মনে দুঃখও পায় নি। অসম্মানও বোধ করে নি। হিন্দুঘরের কুলীন মেয়েদের ভাগ্যে তো অমন হামেশাই ঘটে থাকে।

কুলীন পুরুষরা একাধিক বিবাহ করে। কুলীন মেয়েদের স্বামীর একাধিক দারপরিগ্রহণ তাই বুঝি তাদের মনে বিশেষ তেমন দাগ কাটতো না কোনদিনই। তাছাড়া সুলোচনার স্বামী হরনাথের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

স্বামী তো তার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ করতে চায়ই নি। সেই বরং কতকটা তাকে বাধ্য করেছিল। তাছাড়া স্ত্রী হয়েও স্ত্রীর সমস্ত সম্পর্কই একদিন যখন সে স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে মুছে দিয়েছিল নিজে থেকে তখন আর তার লজ্জা, অভিমানই বা কি—দুঃখই বা কি?

আর তাইতেই বোধ করি দস্যু কর্তৃক মৃন্ময়ী একরাত্রে লুণ্ঠিতা হওয়ায় কৃষ্ণনগরের গৃহ তার কাছে শূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে থেকে যেখানে হোক চলে যাবার জন্য মনটা ছটফট করে উঠেছিল, এবং হয়তো সেই কারণেই তখন কলকাতায় স্বামীর গৃহে আসতে তার মনে কোন দ্বিধাই জাগে নি।

এক সময় তো সতীনকে নিয়ে সে ঘর করেছেই।

আজই বা তবে পারবে না কেন?

তাছাড়া স্বামীর একটি সন্তান হয়েছে সুলোচনা শুনেছিল। সেই সন্তানটিকে নিয়েও তো সে দিন কাটাতে পারে।

স্বামীর সংসারের সঙ্গে তাকে জড়াতেই হবে তারই বা মানে কি?

কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি সুলোচনা এমন কি স্বামীর ঘরে এত বছর পরে পা দেবার পূর্বমুহূর্তেও যে এখানে এত বড় অসম্মান ও লজ্জা থাকতে পারে।

ভাবতে পারে নি সুলোচনা যে স্বামীকে সে বরাবর দেবতাজ্ঞানে পূজা করে এসেছে, সেই স্বামী তার কোনদিন এতখানি নীচে নেমে আসতে পারে।

গৃহে এক কিশোরী কন্যা থাকতেও এত বড় নির্লজ্জ হতে পারে কোন সন্তানের বাপ ভাবতে পারে নি সে। হরনাথ শুধু তার চোখেই ছোট হয় নি বা নীচে নেমে আসেনি—তার সন্তানের চোখেও যে সে অনেকখানি নীচে নেমে এলো।

ছি ছি, তার স্বামী এ কি করলো? একটা ছোট জাতের বেশ্যাকে নিয়ে এ সে কি করলো! আত্মমর্যাদা, সম্মানে এতটুকু তার লাগলো না।

এখন সুলোচনাই বা কি করবে? আবার সে ফিরে যাবে কৃষ্ণনগরে? কিন্তু সেখানে আবার ফিরে গেলেও কি স্বামীর এই কলঙ্ক-কথা আর চাপা থাকবে। সব কিছুই তারা জানতে পারবে। আর সে লজ্জাকে সে কেমন করে স্বীকার করে নেবে।

না, না—তার চাইতে এই ভালো।

স্বামীর লজ্জা নিয়ে সে স্বামীর ঘরের এই কোণেই পড়ে থাকুক—দশজনের সামনে গিয়ে সে আর দাঁড়াতে পারবে না।

তাছাড়া ঐ সুনয়না। মাতৃহারা অভাগী মেয়েটা। আজ ওর মুখের দিকে তাকাবারও তো কেউ নেই। ওকে এ দুঃখের মধ্যে ফেলে সে-ই বা কোন্ লজ্জায় যাবে। হতভাগিনী মেয়েটা তাকে আজ মায়ের মতই তো দু'হাতে আঁকড়ে ধরছে।

ওদিকে ক্রমশ রাত আরো গভীর হতে থাকে, কিন্তু স্বামীর দেখা নেই।

দরজার দিকে কান পেতে বসে থাকে সুলোচনা।

ঐ বুঝি বন্ধ দরজায় করাঘাত পড়লো। ঐ বুঝি স্বামী ফিরে এলো। কিন্তু না—রাত শেষ হয়ে আসতে চললো তবু স্বামী ফিরে এলো না এবং এতক্ষণে একটা উদ্বেগে একটা অজানিত আশংকায় সুলোচনার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপতে শুরু করে।

কি হলো লোকটার?

দুঃখে লজ্জায় শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হলো না তো।

নিশ্চিন্ত হয়ে আর বসে থাকতে পারে না সুলোচনা। উঠে দাঁড়ায় এবং পায়ে পায়ে বন্ধ সদর দরজাটার দিকে এগিয়ে যায়।

দরজার আগলটা নামিয়ে দরজার গেট দুটো খুলতেই সামনের দিকে দৃষ্টি

পড়ে সুলোচনার! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সুলোচনা।

ভোরের আলো তখন চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং সেই আলোতেই নির্জন রাস্তায় চোখে পড়ে সুলোচনার, সর্বাঙ্গে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে—সিক্ত বসন—তার স্বামী এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকেই।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সুলোচনা স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সিক্ত বসন পরিত্যাগ করে হরনাথ তখন আহ্নিকে বসেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে নিঃশব্দে আবার একসময় ঘর থেকে বের হয়ে এলো সুলোচনা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার মশাই এসে খোলা সদর দরজা দিয়ে আঙ্গিনায় প্রবেশ করলেন। সুলোচনা এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

সুলোচনার কাছ বরাবর এসেই কিন্তু সরকার মশাই সুলোচনার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

জাগরণক্লিষ্ট সুলোচনার বিষণ্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়েই সরকার মশাইয়ের মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে।

কি হয়েছে পিসিমা? সরকার মশাইয়ের প্রশ্নে ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো সুলোচনা নিঃশব্দে।

সরকার মশাই আবার প্রশ্ন করে, কি হয়েছে পিসিমা?

কিছু না—

কিন্তু আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে—

কিছু না সরকার মশাই। কাল রাত্রে ঘুম হয় নি তাই হয়তো—

না পিসিমা, আপনি আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করছেন!

সুলোচনা সত্যিই এবার যেন কেমন নিজেকে বিব্রত বোধ করে। প্রৌঢ় সরকার মশাইয়ের চোখের দৃষ্টিকে যে সে ফাঁকি দিতে পারে নি বুঝতে পারে এবং কি জবাব দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কিন্তু সুলোচনাকে বুঝি বাঁচিয়ে দেয় সুনয়না। ইতিমধ্যে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল এবং সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই সুলোচনা তাকে দেখিয়ে বলে, সরকার মশাই, আমার মেয়ে সুনয়না—সুনয়না—প্রণাম কর—

সুনয়না এগিয়ে সরকার মশাইকে প্রণাম করতেই তিনি সস্নেহে বলেন, থাক মা, থাক—বেঁচে থাক, দীর্ঘায়ু হও—নারায়ণের মত স্বামীলাভ কর—

আপনি কাল রাত্রে ফিরলেন না, অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। মৃদু

কণ্ঠে সুলোচনা বলে।

হ্যাঁ, পিসিমা, ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে গেল, তাই মন্দির চত্বরেই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

কোন খোঁজ করতে পারলেন?

পেরেছি, কিন্তু—

কি?

আমার মনে হয় আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয় পিসিমা। লোকটা পর্তুগীজই—আর লোকের মুখে এও শুনলাম, সাংঘাতিক চরিত্রের লোক।

কোথায় থাকে লোকটা কিছু সন্ধান করতে পারলেন?

এখানে কোন ঘর-বাড়ি নেই—দশ মাল্লাবাহী বিরাট একটা নৌকা আছে সেই নৌকাতেই থাকে।

নৌকাতে থাকে!

হ্যাঁ, কারো কাছে কোন সঠিক খবর কিছু পেলাম না বটে, তবে যতটুকু বুঝতে পেরেছি লোকটা সম্পর্কে—শুনি লুঠতরাজ করে বেড়ায়।

পর্তুগীজ দস্যু!

তাই তো মনে হলো!

নাম কি লোকটার?

সুন্দরম্! সুন্দর সাহেব বলেই সকলে জানে। এখানকার অনেকেই সুন্দর সাহেবকে চেনে, হয়তো মিশ্র মশাইও ওকে জানতে পারেন।

উভয়ের মধ্যে কথা হচ্ছে, ঐ সময় হরনাথ ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

হরনাথকে দেখে সরকার মশাই নত হয়ে প্রণাম জানান।

কেমন আছেন?

ভাল। আপনি? শুধায় হরনাথ।

ভাল। চলে যাচ্ছে একরকম। কাল তো কই আপনাকে দেখলাম না?

একটা কাজে বের হয়েছিলাম। ভাল কথা মিশ্র মশাই, আপনি হয়তো জানতে পারেন—

কি?

সুন্দরম্ সাহেবকে চেনেন?

কেন বলুন তো?

পিসিমা লোকটার খোঁজ নিতে বলেছিলেন আমাকে—

হরনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুলোচনার দিকে তাকায়, কি ব্যাপার সুলোচনা?

সুলোচনা ভাবছিল, কৃষ্ণনগরের ঘটনাটা স্বামীর কাছে প্রকাশ করবে কি করবে না। হরনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সরকার মশাইয়ের দিকে তাকায়। সুলোচনা তখন একটু ইতস্তত করে বলে, কৃষ্ণনগরে রায়-বাড়িতে কিছুদিন পূর্বে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে—

দুর্ঘটনা !

হ্যাঁ—

কি হয়েছে ?

সংক্ষেপে তখন সরকার মশাই মৃন্ময়ীর লুণ্ঠনের কথাটা প্রকাশ করেন।

সমস্ত শুনে হরনাথ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধায়, কবে এ দুর্ঘটনা ঘটলো ?

মাসখানেক আগে—

চোখের উপরে যেন ভেসে ওঠে পর্তুগীজ সুন্দরমের বিরাট পেশীবহুল চেহারাটা। তার বিচিত্র পোশাক, বিচিত্র আচরণ।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা যেটা মনে পড়ে ঐ মুহূর্তে হরনাথের, ঐ লোকটার বিরাট অন্তঃকরণের কথা। নয়নতারার মৃত্যুসময়ে কানা কবিরাজ ঐ লোকটার কথাতেই শেষ পর্যন্ত তার গৃহে নয়নতারাকে দেখতে এসেছিল, তাছাড়া—ঐ বিচিত্র মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন কেন যেন তার মনে হয়েছিল, মুখটা তার চেনা-চেনা। কেন মনে হয়েছিল অমন অদ্ভুত কথাটা হরনাথের, আজো সে বুঝে উঠতে পারে নি। কিন্তু মনে হয়েছিল তার কথাটা।

হরনাথ মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি লোকটাকে বিশেষ চিনি না—তবে সুধামাধবের আড়তে মধ্যে মধ্যে ওকে আসতে দেখেছি—সুধামাধব লোকটাকে চেনে—কিন্তু কথাটা বলে এবারে হরনাথ স্ত্রী সুলোচনার দিকে তাকালো, তোমার চিনতে ভুল হয় নি তো। সে রাত্রে যে মৃন্ময়ীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে সুন্দর সাহেবের চেহারায় সত্যিই সাদৃশ্য আছে বলে তোমার ধারণা !

শান্ত মৃদু কণ্ঠে সুলোচনা জবাব দেয়, ঘরের প্রদীপের আলোয় সামান্যক্ষণের জন্য তাকে দেখলেও তার মুখ আমি ভুলি নি। গঙ্গার ঘাটে যাকে দেখেছি নৌকার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সে যে ঐ একই ব্যক্তি সে সম্পর্কেও আমি স্থিরনিশ্চিত।

ক্ষণকাল অতঃপর হরনাথ চুপ করে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, অসম্ভব কিছু নয়! কারণ লোকটা সম্পর্কে আমিও ইতিপূর্বে অনেক কিছুই শুনেছি

যাই হোক আমি আজই লোকটার সম্পর্কে ভাল করে সন্ধান নেবো। এখানকার কোতোয়ালীর দারোগা সাহেবও আমার পরিচিত বিশেষ বন্ধু লোক, প্রয়োজন হলে তার সাহায্যও আমি পাবো।

সরকার মশাই সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ফিরে গেলেন এবং রাত্রে গৃহে ফিরে হরনাথ সুলোচনাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালো।

সুন্দর সাহেব সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলাম—

দেখা হয়েছে লোকটার সঙ্গে? সুলোচনা শুধায়।

হরনাথ বলে, না। নৌকা নিয়ে কাল রাত্রেই সে যে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ কিছু বলতে পারলো না। তবে মনে হলো তোমার সন্দেহ বোধ হয় মিথ্যা নয় সুলোচনা—

কিসে বুঝলে?

ভিষগ্‌রত্নের কথাটা উল্লেখ করে হরনাথ অবশেষে বলে, সন্ধ্যায় কানা কবিরাজের ওখানে গিয়েছিলাম এবং তার মুখেই একটা কথা শুনলাম।

কি?

সে রাত্রে মানে নয়নতারাকে দেখবার জন্য যে রাত্রে কানা কবিরাজকে আমি ডাকতে যাই, সেই রাত্রে সুন্দর সাহেবের স্ত্রীকে দেখতে কানা কবিরাজ তার নৌকায় গিয়েছিল এবং স্ত্রী বলে যাকে সে পরিচয় দিয়েছিল সেই মেয়েটিকে দেখেই কানা কবিরাজের যেন কেমন সন্দেহ হয়, তাঁর ধারণা মেয়েটি তার স্ত্রী নয়—

কি রকম দেখতে মেয়েটি শুনলে কিছু?

হ্যাঁ—অপরূপ সুন্দরী নাকি।

আর কিছু শুনলে না?

হ্যাঁ, এও শুনলাম মেয়েটি নাকি অত্যন্ত অসুস্থ এবং—

কি?

তার উত্থানশক্তি নেই নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে এবং বাক্‌শক্তিও রহিত।

॥ ২ ॥

স্বামীর কথাগুলো শুনে সুলোচনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো এবং সব-কিছু যেন তার কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

তবে কি ঐ পর্তুগীজ আর সুন্দর সাহেব একই ব্যক্তি নয়, যে কৃষ্ণনগরে

তার ভাইয়ের বাড়িতে এক রাত্রে হামলা দিয়ে পড়ে মৃন্ময়ীকে লুঠ করে নিয়ে এসেছিল!

কিন্তু আবার মনে হয় হয়তো আসলে সুন্দর সাহেবের কোন স্ত্রী নেই। যাকে স্ত্রী বলে সে কানা কবিরাজের কাছে পরিচয় দিয়েছে আসলে সে তার স্ত্রীই নয়। সে-ই হয়তো মৃন্ময়ী, কিন্তু নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে উত্থানশক্তি রহিত বাক্‌শক্তিও রহিত মৃন্ময়ীর হবে কেন?

সুলোচনা সে সময় কথাটার আর উত্থাপন না করলেও—রাত্রে আহারাদির পর হরনাথ যখন নিজের শয়নকক্ষে বসে হুকাটি হাতে তামুক সেবন করছে সেই সময় সামনে এসে আবার কথাটি তুললো।

বলছিলাম কি, তুমি আর একবার ভালো করে খোঁজ করে দেখো।

কথাটা হরনাথ এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিল। তাই স্ত্রীর প্রশ্নে বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ কথাটা সুলোচনা?

বলছিলাম ঐ পর্তুগীজটার কথা।

ও সুন্দর সাহেবের কথা বলছো?

হ্যাঁ, কানা কবিরাজ সব খবর তার না জানলেও অন্য কেউ নিশ্চয়ই তার বিশদ খবর দিতে পারবে। এখানে যখন তার যাতায়াত আছে ও অনেকেই তাকে চেনে, খোঁজ করলে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হয়তো তার সব খবরই পাওয়া যাবে।

তোমার কি স্থির ধারণা সুলোচনা, ঘাটে নৌকার উপরে দণ্ডায়মান যাকে দেখেছো এবং সে ঐ একই ব্যক্তি যে সে রাত্রে কৃষ্ণনগরে তোমার দাদার বাড়িতে গিয়ে মৃন্ময়ীকে লুঠ করে এনেছে।

তোমাকে তো আজ সকালেই বলেছি আমার ধারণা তাই।

বলছিলাম কি পর্তুগীজরা সব প্রায় চেহারায় ও পোশাকে একই রকম দেখতে। সে কারণে তোমার ভুলও হতে পারে।

তা যে পারে না তা নয়। তবে আমার ধারণা, ভুল আমার হয় নি। কিন্তু আর একটি কথা ভেবে দেখেছো কি?

কি?

তোমার অনুমানই যদি সত্যি হয় ধর, তাহলে ব্রাহ্মণ-কন্যা মৃন্ময়ী—তাকে বিধর্মীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে—এক-আধ দিন নয় তা প্রায় মাসাবধি-কাল হতে চললো, সে-ক্ষেত্রে তাকে যদি আবার ফিরে পাওয়া যায়ও, তাকে কি আর নিতে পারবে তোমরা?

সত্যিই। মিথ্যা তো নয় কথাটা।

মিথ্যা তো বলে নি তার স্বামী, সুলোচনার মনে হয়।

আজ মৃন্ময়ীকে আবার ফিরে পাওয়া গেলেও তো গৃহে স্থান দেওয়া যাবে না। জন্মের মতই তো গৃহের দ্বার তার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ধর্মে পতিতা, সমাজ-বহির্ভূতা আজ মৃন্ময়ী।

শুধু কি তাই—ব্রাহ্মণের কুমারী-কন্যা। বিধর্মী এক পুরুষের ঘরে এতদিন ছিল—আজ আর তার ধর্ম নেই, জাতি নেই, চরিত্র নেই। সে আজ আর তাদের কেউ নয়।

আশ্চর্য। তার নিজের কোন দোষ নেই অথচ সে আজ তাদের কেউ নয়। তাদের সংসারের তো নয়ই এত বড় হিন্দু-সমাজেও আজ আর তার এতটুকু স্থান নেই কোথায়ও।

আর একটি কথাও বলতে পারে না সুলোচনা। ধীরে ধীরে এক সময় স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে অন্ধকার বারান্দায় খুঁটিটা হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

অন্ধকার আকাশ।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত।

এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত তারাগুলো চোখে পড়ে! যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ছাড়া ছাড়া হয়ে রাত জাগছে।

বিচিত্র হিন্দু সমাজ। বিচিত্র তার নিয়ম বিধান।

নারীর জন্য স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ ব্যবস্থা আর পুরুষ একের পর এক স্ত্রী গ্রহণ করবে তাতে কোন দোষ নেই, কোন অপরাধ নেই। স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য নারীতে ব্যভিচারী—তাতে কোন অপরাধ নেই সমাজবিধানে। কিন্তু নারীর বেলায় সামান্য পদস্খলনে ত্রুটিতে তা সে অনিচ্ছাকৃত হলেও সে কুলটা—অসতী। আশ্চর্য! ঐ অন্যায় বিধান যুগে যুগে সব নারীরাই মেনে আসছে, কোন প্রতিবাদই করে নি আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতেও করবে না।

সুলোচনা ও মৃন্ময়ীরা চিরকাল এমনি করেই মরবে—দলিত হবে—পিষ্ট হবে—এ যেন তাদের লিখিত ভাগ্য। এ দেশে হিন্দুর ঘরে জন্মে ঐটুকুই যেন তাদের প্রাপ্য।

মৃন্ময়ীকে আজ আর ঘরে নেওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া গেলেও নেওয়া যাবে না। নিজে ফিরে আসতে পারলেও হিন্দুর গৃহে আজ আর তার কোথাও স্থান নেই। তার অপরাধ তার হিন্দু মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে রক্ষা

করতে পারে নি, যেদিন একজন বিধর্মী ডাকাত তাকে লুঠ করে নিয়ে আসে জোর করে তাদের আশ্রয় থেকে।

আশ্চর্য! সুলোচনাই বা আজ এ সব কথা ভাবছে কেন? এ সব কথা ভেবেই বা লাভ কি! হাসি পায় সুলোচনার। সে সত্যিই পাগল নচেৎ এখনো মৃন্ময়ীর কথা ভাবে!

মৃন্ময়ী তো কবেই মারা গেছে।

মৃতা সে আজ তাদের কাছে।

হরনাথ মুখে স্ত্রীকে যাই বলুক না কেন কথাটা সে ভোলে নি।

সুযোগ বা সুবিধা হলেই তারপর থেকে সে সুন্দর সাহেবের খোঁজ করতো। পরিচিত একে ওকে তাকে সুন্দর সাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করতো।

মাসখানেক পরে আবার অকস্মাৎ একদিন সুন্দর সাহেবের সঙ্গে হরনাথের দেখা হয়ে গেল সুধামাধবের গদিতেই।

সুন্দরম্ এসেছিল কিছু স্বর্ণালঙ্কারের বদলে কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে। এবং বোধ করি সেইসব কথাই হচ্ছিল নিম্নকণ্ঠে উভয়ের মধ্যে।

হরনাথ গদিতে প্রবেশ করতেই ওরা থেমে যায়।

সে রাত্রের পর হরনাথ আর সুধামাধবের চালের কারবারের গদিতে পা দেয় নি। কিন্তু পা না দিলেও সমস্ত খবরই রাখতো হরনাথের সুধামাধব।

আজ হরনাথকে গদিতে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি সুধামাধব বলে, হরনাথ যে—এসো—এসো, তারপর খবর কি! এক যুগ দেখাসাক্ষাৎ নেই—

হরনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বর্তমান পরিস্থিতিটা চাপা দেবার চেষ্টা করছে সুধামাধব। হরনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুন্দর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, এই ভালোই আছি।

আমাদের তো ভুলেই গিয়েছো—সুধামাধব বলে।

না, না—ভুলবো কি হে?

ওদিকে সুন্দরম্ উঠে দাঁড়ায়, আমি কি তাহলে আজ উঠবো—বাবুজী।

হ্যাঁ, এসো সাহেব—কাল পরশু এক সময় এসো।

তা আসবো না হয় কিন্তু টাকাটার যে আমার বড় প্রয়োজন। সুন্দরম্ বলে।

বেশ তো, বেশ তো—কাল নিও না। কাল এসো।

কিন্তু বাবুজী, টাকাটা আজই পেলে ভালো হতো।

আঃ সাহেব, কেন বিরক্ত করছো। বললাম তো কাল এসো। এবারে সুধা-

মাধবের কণ্ঠস্বরে যেন বেশ একটু বিরক্তই প্রকাশ পায়।

সুন্দর সাহেব আর কথা বাড়ায় না। উঠে দাঁড়ায়, আচ্ছা তবে চলি বাবুজী—সেলাম্—।

সুন্দরম্ গদি থেকে বের হয়ে গেল। এবং সুন্দরম্ গদি থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথও উঠে দাঁড়ায়।

বলে, চলি ভাই—

সে কি এখুনি চললে নাকি?

হ্যাঁ—

তা কেন এলে, কি বৃত্তান্ত কিছুই তো বললে না। এলে আর চললে—

আজ চলি ভাই বিশেষ একটু কাজ আছে। আবার একদিন আসবো।

হরনাথ আর কোন কথার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সোজা গদি থেকে বের হয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলো।

সুন্দরম্ ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

দূর থেকে দেখতে পায় হরনাথ বিচিত্রভূষা সুন্দরম্ হন হন করে এগিয়ে চলেছে। হরনাথও দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ করে।

কিন্তু সাহেব এমন লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে চলেছে যে হরনাথ তার নাগাল পায় না। বেচারীকে শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে হয় এবং কাছাকাছি গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, সাহেব, ও সাহেব।

প্রথমটায় হরনাথের ডাক শুনতে বোধ হয় পায় না সুন্দরম্।

কিন্তু আবার যখন ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকে হরনাথ, সাহেব, ও সাহেব—

সুন্দরম্ দাঁড়ালো এবং ফিরে তাকালো হরনাথের দিকে।

You are calling me—বাবুজী।

হ্যাঁ—

Why—কেন বলো তো।

তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্য তোমাকে ডেকেছি।

আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কেন বাবুজী। কিন্তু বাবুজী, আপনাকে আমি কোথায় দেখেছি বলুন তো আগে! হুঁ, দেখেছি।

আমাকে?

হ্যাঁ, Yes—I have seen you somewhere! দাঁড়ান, হ্যাঁ, হ্যাঁ—I remember। আপনাকে আমি দেখেছি ঠাকুরমশাই, মানে কবিরাজ মশাইয়ের ওখানে। তাই নয় কি বাবুজী। Your wife was very ill

—আপনি কবিরাজ মশাইকে ডাকতে এসেছিলেন—

হ্যাঁ—আমি গিয়েছিলাম।

কেমন আছেন—How is your wife now বাবুজী।

সে নেই, স্বর্গে গিয়েছে—

Dead—I am sorry—I never thought of it!

তোমার স্ত্রীরও তো অসুখ শুনেছিলাম সাহেব, সে এখন কেমন আছে?

My wife—!

একটু যেন চমকে ওঠে কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরম্।

হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীর। কথাটার পুনরাবৃত্তি করে হরনাথ।

সে ভালোই আছে বাবুজী।

পক্ষাঘাত হয়েছিল শুনেছিলাম।

Who told you?

কবিরাজ মশায়ই বলছিলেন। বাক্‌শক্তিও ছিল না।

হ্যাঁ—এখন, এখন সে ভালো হয়ে গিয়েছে, She is alright now—আচ্ছা, বাবুজী আমি চলি—Good bye। কথাটা বলে সুন্দরম্ আর দাঁড়ালো না।

হন হন করে সোজা চলে গেল।

হরনাথ স্পষ্টই বুঝতে পারে কতকটা যেন ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে চলে গেল সুন্দর সাহেব। তার স্ত্রীর প্রসঙ্গ নিয়ে কোন আলোচনা করতে চায় না বলেই যেন চলে গেল বলে মনে হলো তাকে এড়িয়ে হঠাৎ অমন করে।

হরনাথ সুন্দর সাহেব চলে যাবার পরও পথের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। ঠিক যেন বুঝতে পারে না কেন সুন্দর সাহেব তাকে এড়িয়ে গেল অমন করে। ইচ্ছা করেই কি তাহলে সে তার স্ত্রীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। হয়তো তাই। কিন্তু কেন?

মিথ্যা নয়। সুন্দরম্ ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্ত তাড়াতাড়ি হরনাথের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।

মনটা সেদিন থেকে সত্যিই সুন্দর সাহেবের বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। যেদিন করালীচরণ মৃন্ময়ীকে পরীক্ষা করে যাওয়ার সময় অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বলে যায়, ও বোধ হয় তোর সঙ্গে কথা বলতে চায় না তাই বোবা হয়ে আছে।

তারপর শেষ কথা বলেছিলেন, বেটা মূর্খ, গাড়ল।

কবিরাজের কথাগুলোর তাৎপর্য প্রথমটায় বুঝতে না পারলেও পরে ভাবতে ভাবতে সুন্দরমের মনে হয়েছে একটা অর্থ যেন কোথায় কথাগুলোর মধ্যে আছে। একটা বাঁকা অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ।

তারপরই মনে হয়েছে সুন্দরমের, সত্যিই কি সে মূর্খ, গাড়ল!

হয়তো তাই। সত্যিই হয়তো সে মূর্খ—গাড়ল।

আসল কথাটা সত্যিই সে বুঝতে পারে নি। কিন্তু কেন সে বুঝতে পারে নি। ভাবতে ভাবতেই চকিতে একটা কথা মনে পড়ে যায়, তবে কি মৃন্ময়ীর সবটাই মিথ্যা—সবটাই ভান। না, না—সে কি করে হবে। দিনের পর দিন কেউ অমন মিথ্যা ভান করে পড়ে থাকতে পারে, না তাই কি সম্ভব। কিন্তু যে ভাবেই ভাবুক সুন্দরম্ মনের মধ্যে যেন শান্তি পায় না।

দুশ্চিন্তার কীট কোথায় যেন মনের মধ্যে অদৃশ্য বাসা বেঁধেছে, সর্বক্ষণ সেই কীটটা নিঃশব্দে ভিতরে ভিতরে রক্ত ক্ষরণ করিয়ে চলে।

একবার ভাবে সোজাই গিয়ে সে মৃন্ময়ীকে সব কথা জিজ্ঞাসা করে। আবার মনে হয় তাতেই বা লাভ কি! কি হবে আর তার সে কথা জেনে। যদি ব্যাপারটা সত্যিই প্রমাণিত হয় তারপর তার কি বাকী রইলো। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যে সে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখলো এতদিন, সেই ঘরই যদি গুঁড়িয়ে গেল তো কি আর তার রইলো।

একটা শূন্যতা, একটা হাহাকার যেন সুন্দরমের বিরাট বুকখানাকে থেকে থেকে তোলপাড় করতে থাকে। ভেবে পায় না সুন্দরম্ কানা কবিরাজের কথাই যদি সত্য হয়তো, কেন! কেন মৃন্ময়ী এমন ব্যবহার তার সঙ্গে করবে। সত্য তাকে সে জোর করে লুঠ করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তো তার কোন অসম্মান করে নি, কোন রকম দুর্ব্যবহারও তার সঙ্গে করে নি।

তবে? তবে কেন এমন ব্যবহার করবে মৃন্ময়ী তার সঙ্গে।

কিন্তু মনে মনে মৃন্ময়ী সম্পর্কে যাই ভাবুক সুন্দরম্ সোজাসুজি সামনে গিয়ে সে কথাটা মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না।

এদিকে ব্যবসা করবে বলে আড়ত খুলেছিল চালের—চাল সংগ্রহের জন্য এমামুল্লাকে নৌকা দিয়ে পাঠিয়েছিল সোজা একেবারে বাখরগঞ্জে। আজই সকালে নৌকা এসে ঘাটে ভিড়েছে। এখন আবার অর্থের প্রয়োজন। কারণ হাতের অর্থ চাল কিনতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই টাকার জন্যই সুন্দরম্ সুধামাধবের গদিতে গিয়েছিল। গিয়েছিল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে যেন আর

কোন রকম সাড়া বা উৎসাহ পাচ্ছিল না। বিশ্রী একটা অনাসক্তি যেন সর্ব ব্যাপারে মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তার।

সুধামাধবের গদি থেকে বের হয়ে সোজা সুন্দরম্ ঘাটের দিকেই চলে। ঘাটে পৌঁছাতেই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। আবছা অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে। নিজের নাওটার দিকে এগুতে যাবে হঠাৎ পাশ থেকে চাপাকণ্ঠে কার যেন ডাক শোনা যায়।

কাপ্তান—

কে?

আবছা একটা ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে আসে সুন্দরমের সামনে।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সুন্দরম্। আবার প্রশ্ন করে সে, কে?

আমি। ডি'কুনহা।

ডি' কুনহা, you are still living—

হ্যাঁ, আমি মরি নি। হাতে ছোরা বিদ্ধ হয়ে বসে পড়েছিলাম সে রাত্রে ঘরের মধ্যে—তুমি তো পালালে, কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লাম।

ধরা পড়েছিলি?

হ্যাঁ, উপায় কি! তারপর যে মারটা খেয়েছি—মারতে মারতে অজ্ঞান করে নদীর ধারে মরা বলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাক সে কথা। এখানে এসে খোঁজ করে তোমার বা তোমার নাওর কোন সন্ধান না পেয়ে চুঁচড়োয় তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

মা!

হ্যাঁ···বুড়ি ভায়লা এবারে যাবে। খুব অসুস্থ—She is very ill—

কি হয়েছে মার?

তা জানি না, তবে তোমাকে একবারটি দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। তুমি পারো তো আজই রাত্রে রওনা হয়ে পড়ো, নচেৎ হয়তো তাকে দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ।

॥ ৩ ॥

ডি'কুনহার মুখে মা ভায়লার কথা।

অনেক—অনেক দিন পরে যেন একটা কথা শুনলো সুন্দরম্। অনেক দিন, যেন এক যুগ পরে একটা স্নেহের ডাক তার মনটাকে বিচিত্র একটা দোলা দিয়ে

গেল। বিশাল বুকটা যেন সুন্দরমের ফুলে উঠলো।

কতকাল হবে মা ভায়লার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। একবার চোখের দেখাও দেখে নি সে ভায়লাকে।

অথচ, শৈশবে ঐ ভায়লা না হলে তার একটি মুহূর্তও চলতো না। যখনই যা হয়েছে ছুটে গিয়েছে ঐ মায়ের কাছে। মাকে গিয়ে আঁকড়ে ধরেছে।

মা-ই ছিল তার একমাত্র বন্ধু—একমাত্র আপনার জন, ফ্রেণ্ড—কম্পানী ও একমাত্র বিশ্বাসের জন—সবার বড় আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ হঠাৎ একদিন কেমন করে যেন ছিঁড়ে গেল।

সেদিনটার কথাও স্পষ্ট মনে পড়ে সুন্দরমের। বাপ রোজারিও তাকে প্রথম নৌকাতে নিয়ে গিয়েছিল। ভায়লা প্রথমটায় কিছুতেই রাজী হয় নি। হতে চায় নি।

বাধা দিয়েছে। বলেছে রোজারিওকে, না, কিছুতেই না। ওকে আমি কিছুতেই দরিয়ায় নিয়ে যেতে দেবো না। সেখানে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। দরিয়ার কোন গৃহ-আকর্ষণ নেই। একবার দরিয়ায় গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। সর্বনাশা দরিয়া মানুষকে একেবারে গিলে খায়—গোটা গিলে খায়—কিছু আর অবশিষ্ট রাখে না, না—দরিয়ায় ওকে তোমায় আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না।

হা হা করে দরাজ গলায় হেসে উঠেছে রোজারিও।

রোজারিওর চেহারাটা আজও মনে পড়ে সুন্দরমের। বিরাট লম্বা দৈত্যের মত চেহারা। ঝকঝকে পোশাক—কোমরের একদিকে তলোয়ার, একদিকে গাদা পিস্তলটা। ডান হাতে একটা চামড়ার পেটি, তাতে ঝকঝকে ইস্পাতের গোল গোল গুলির মত কি সব বসানো।

গায়ের রংটা রোজারিওর টকটকে লাল হয়তো এক সময় ছিল, পরে রোদে পুড়ে পুড়ে ও দরিয়ার লোনা পানির হাওয়া লেগে লেগে কেমন যেন তামাটে হয়ে গিয়েছিল। বিরাট পাকানো সাদা গোঁফ। মাঝে মাঝে গোঁফের দু'প্রান্ত পাকিয়ে পাকিয়ে সরু করত। মোম দিয়ে মাজত।

জ্ঞান হাওয়া অবধি সুন্দরম্ বাপকে খুব কমই দেখেছে।

নয় মাসে ছয় মাসে দু'চার দিনের জন্য হৈ-হৈ করে রোজারিও এসে হাজির হতো। হা হা করে গলা ছেড়ে হাসত।

বিরাট একটা পাত্রে এক গাদা রুটি মাংস নিয়ে রাক্ষসের মত গপ্ গপ্ করে খেত।

বাপকে দেখে কেমন যেন ভয় ভয়ই করত সুন্দরমের। বড় একটা বাপের কাছে ঘেঁষত না।

বাপও তাকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। কাছে কখনো ডাকেও নি। কিন্তু সেবারে যখন এলো বছর তিনেক বাদে। হঠাৎ এসে হাজির হলো এক গভীর রাত্রে। ঘুমিয়ে ছিল জানতে পারে নি সুন্দরম্, কখন এসেছে তার বাপ।

সুন্দরম্ তখন অনেকটা বড় হয়েছে। ষোল বছর বয়স তখন তার। ঠোঁটের উপর গোঁফের চিকন কালো রেখা দেখা দিয়েছে। দেহের সজাগ পেশীতে পেশীতে যৌবন সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে।

মনে আছে সে সময়টা সুন্দরমের। কিছু একটা করতে চায় মন সর্বক্ষণ তখন তার। মনটা সর্বদা কিছু একটা করবার জন্য ছটফট করে। ঠিক সেই সময় তিন বছর বাদে আবার একদিন এসে এক রাত্রে হাজির হলো কাপ্তান রোজারিও।

ভোরবেলা দেখা হলো পিতা-পুত্রে।

বাপও বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে থাকে ছেলের সদ্য-জাগ্রত যৌবনের দিকে এবং ছেলেও চেয়ে থাকে যেন নতুন দৃষ্টি নিয়ে দৈত্যের মত বাপের চেহারাটার দিকে, এবং সেই দিনই প্রথম আশ্চর্য একটা কথা মনে হয়েছিল সুন্দরমের, বাপ রোজারিও অমন টকটকে লাল, তার মায়ের রংটা অনুরূপ, তবে তার এমন কষ্টিপাথরের মত কালো মিশমিশে চেহারা কেন? Why he is so black!

ছেলে যখন পরস্পরের গাত্রবর্ণের কথা ভাবছে বাপ তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠে, সাবাস।

তারপরই এগিয়ে এসে বাঘের মত চওড়া ও লোহার মত শক্ত কঠিন দুই থাবা দিয়ে ছেলের দুটো কাঁধ চেপে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠে—মাই সান।...কালই আবার আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে দরিয়ায় যাবি বেটা।

দরিয়ায়!

হ্যাঁ—সমুন্দর—sea.

হ্যাঁ, যাবো।

কিন্তু ভায়লা কথাটা শুনে বেঁকে বসল। বললে, না, কিছুতেই না। ছেলেকে সে দরিয়ায় যেতে দেবে না।

মার কোন নিষেধেই কান দেয় নি সুন্দরম্ সেদিন। শেষ রাত্রের দিকে

পরের দিন গোপনে রোজারিওর সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসেছিল। সোজা এসে গঙ্গার ঘাটে নোঙর করা তার চিরদিনের স্বপ্নের বিশমাস্তাবাহী নৌকাটায় লাফিয়ে উঠে বসেছিল।

আব্‌ছা আব্‌ছা অন্ধকার তখনো চারিদিকে ছম্‌ছম্‌ করছে।

সে সময়টা শীতকাল। ছম্‌ছমে তরল অন্ধকারের সঙ্গে রাত্রি-শেষের কুয়াশা মিশে ছিল। ঝাপসা ঝাপসা চারিদিক। তারই মধ্যে রোজারিও নাও ছেড়ে দিল।

পাঁচ দিন পর্যন্ত তারপর গঙ্গায়। সুন্দরমের চোখে যেন ঘুম ছিল না। ব্যাকুল তৃষিত নয়নে সে সর্বক্ষণ চেয়ে থাকত সামনের দিকে—দরিয়া—কালাপানি কোথায়, কোথায় সমুন্দর? Where is sea?

বার বার রোজারিওকে শুধিয়েছে, সমুন্দর কোথায়—Where is sea?

দেখবি। দেখবি বেটা, ব্যস্ত কেন!

শেষটায় সাত দিনের দিন এক প্রত্যূষে হঠাৎ ঘুমটা সুন্দরমের ভেঙে গেল অদ্ভুত একটা দোল খেতে খেতে যেন।

দুলছে। বিরাট বিশমাস্তাবাহী নাওটা দুলছে। দোল দোদুল দোল।

ঘুম-ঘুম চোখে প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি ব্যাপারটা। উপলব্ধিতে ঠিক যেন পৌঁছায় না। কিন্তু সে বিচিত্র দোল খেতে খেতে বেশীক্ষণ শুয়েও থাকতে আর পারে না সুন্দরম্‌। উঠে বসে।

আশ্চর্য!

অন্যান্য দিনের মত আকাশে সেদিন কিন্তু এতটুকু কুয়াশাও ছিল না। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার চারিদিক। অদ্ভুতভাবে টলতে টলতে বাইরে এসে দাঁড়াল সুন্দরম্‌।

প্রথম ভোরের আলো তখন ভালো করে চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। শেষ আঁধার ও প্রথম আলোর একটা ঝাপসা যবনিকা যেন চারিদিকে থির থির করে কাঁপছে। কানে আসে একটা অদ্ভুত গর্জন—একটানা একটা চাপা গর্জন।

সেই গর্জন শুনতে শুনতেই হঠাৎ চোখে পড়ল সুন্দরমের বহুদূরে আবছা দিকচক্রবালে একটা বিচিত্র বস্তু। রক্তরাঙা অর্ধগোলাকৃতি যেন কি একটা। ক্ষণে ক্ষণে সেটার আকার বদলাচ্ছে।

এই অর্ধেক কলসীর আকার, তার পর মুহূর্তেই অর্ধেক থালি যেন, তার পরই সহসা একটা গোলাকার আগুনের ঢেলা উপরের দিকে লাফিয়ে উঠল।

আর তার পরই সুন্দরমের বিস্ময়বিমুগ্ধ দুই চোখের দৃষ্টির সামনে অনন্ত পারাপারহীন এক জলধি যেন উদ্‌ঘাটিত হলো সঙ্গে সঙ্গে।

মাথার উপরে প্রথম সূর্যকরস্পর্শে আলোকিত নীল আকাশটা গোলাকৃতি হয়ে নেমে গিয়েছে দূর দিগন্তে। তাছাড়া যে দিকে তাকাও শুধু জল, জল আর জল। নীল জলরাশি অথালিপাথালি করছে কিসের একটা চাপা বিক্ষোভে যেন। বড় বড় ঢেউ উঠছে, ভাঙছে আর সেই ভাঙা-গড়ারই একটানা উচ্ছ্বাস—গর্জন। গুম্‌···গুম্‌···গুম্‌···গুম্‌।

বিরাট বিশমাল্লাবাহী নাওটা যেন সেই জলধিবক্ষে একটা ছোট মোচার খোলার মত দুলছে আর দুলছে।

রোজারিও কখন পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায় নি সুন্দরম্‌।

হঠাৎ রোজারিওর কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালো।

এই কালাপানি—সমুন্দর বেটা—this is sea—

মনে আছে সুন্দরমের, বহুক্ষণ তারপরও বিস্ময়বিমুগ্ধ সে দাঁড়িয়েছিল সেই পারাপারহীন উচ্ছ্বসিত জলধির দিকে তাকিয়ে।

ষোল বছর মাত্র বয়স তখন তার। তারপর আর সে দীর্ঘ দু বছরের মধ্যে ফিরে যায় নি ভায়লার কাছে। দরিয়ায় ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে। অবিশ্যি মনে পড়েছে সুন্দরমের মধ্যে মধ্যে ভায়লার কথা। তার মার কথা। তার স্নেহের কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই দুরন্ত সমুন্দরের উত্তেজনা তার নিত্য নব নব রূপ ও ঐশ্বর্য যেন তাকে মার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

নেশা। একটা যেন নেশা ধরে গিয়েছিল সুন্দরমের। সেই নেশার মধ্যে আকণ্ঠ যেন ডুবে গিয়েছিল।

তারপর একদিন সমুন্দরের মধ্যেই হঠাৎ ঘনিয়ে এলো কাপ্তান রোজারিওর শেষ সময়। প্রত্যেক মানুষেরই শেষ সময় একদিন ঘনিয়ে আসে—রোজারিওরও ঘনিয়ে এসেছিল।

বছর কয়েক আগে শয়তান ডি'সুজোর সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে বুকের বাঁ দিকটায় তার ডি'সুজার তলোয়ারের একটা আঘাত লেগেছিল।

শেষ পর্যন্ত ডি'সুজাকে হত্যা করে ডি'ক্রুজের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল বটে রোজারিও, কিন্তু নিজের বুকের আঘাতটা তখনকার মত সামলে গেলেও পরে মধ্যে মধ্যে একটা ব্যথা দেখা দিত ঐ পুরাতন ক্ষতস্থানটায়। গ্রাহ্য অবিশ্যি করে নি কাপ্তান রোজারিও এতটুকু কোনদিন। কিন্তু গ্রাহ্য না

করলেও একদিন ঐ পুরাতন আঘাতটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

সন্ধ্যার দিকে মারা গেল রোজারিও। মাত্র উনিশ বছরের যুবক তখন সুন্দরম্। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিজের কেবিনে ডেকে এনে রোজারিও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলেছিল, অতঃপর যেন সবাই তার ছেলেকেই নাওর কাপ্তান বলে মেনে নেয়। তারাও মেনে নিয়েছিল তাদের কাপ্তানের শেষ কথাটা।

মধ্যরাত্রিতে তারপর কাপ্তান রোজারিওর মৃতদেহটা সকলে মিলে জলেই সমাধি দিল।

আর রাতারাতি নাওর কাপ্তান হলো সুন্দরম্।

ঐ ঘটনারও বছর দুই বাদে মাত্র একদিনের জন্য সুন্দরম্ সপ্তগ্রামে গিয়েছিল। ভায়লার তখন অনেক বয়েস হয়েছে। অসংখ্য বলিরেখা পড়েছে মুখে। ভায়লা ছেলের হাত ধরে বলেছিল, আমাকে এখানে একলা ফেলে আর দরিয়ায় ফিরে যাস নে সুন্দর।

যাবো না তো কি করব ?

নাওটা বেচে দে। টাকা দেবো আমি, এখানেই কোন একটা ব্যবসা কর।

হো হো করে হেসে উঠেছিল সুন্দরম্।

দরিয়ার নেশা তখনো তার দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আশ্চর্য !

সেই অদ্ভুত দরিয়ার নেশা তার কেটে গেল।

কেটে গেল ঐ মৃন্ময়ী তার জীবনে আসার সঙ্গে সঙ্গে। মৃন্ময়ীকে নিয়ে জীবনের এক নতুন স্বপ্ন যেন উদ্‌ঘাটিত হলো তার দু' চোখের সামনে।

ভায়লার যে ব্যবসার কথায় সেদিন বিদ্রূপের সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠেছিল সুন্দরম্, আজ সে সেই ব্যবসাই শুরু করেছে। আর শুরু করছিল সে মৃন্ময়ীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য। কিন্তু মৃন্ময়ী—কোনদিনই কি সে তাকে পাবে !

হঠাৎ ঐ সময় আবার ডি'কুনহার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সুন্দরম্।

কাপ্তান ?

উঁ !

কি ভাবছো কাপ্তান ?

ডি'কুনহা।

বলো !

সত্যিই মা খুব অসুস্থ?—Very ill—

হ্যাঁ—বুড়ি একটিবার তোমাকে দেখবার জন্য একেবারে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একবার যাও, দেখা দিয়ে এসো।

আবার যেন নতুন করে মনে পড়ে ভায়লার মুখখানা সুন্দরমের।

ধীরে ধীরে সে বলে, যাবো—yes, I will go—

কবে যাবে কাপ্তান?

আজই। এখুনি—now।

চল—তা হলে আর দেরি করো না।

না আর দেরি কি, চল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নাও ভাড়া করে সাতগাঁর দিকে রওনা হয়ে পড়ে সুন্দরম্।

পরের দিন সকালের দিকে নাও এসে ঘাটে লাগল।

অনেক বছর পরে এখানে পা দিল সুন্দরম্। অনেক বদলে গিয়েছে আশপাশের সব কিছু। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। রাস্তায়ও কত মানুষের ভিড়! সেই বাড়ি। এই কয় বছরে আরো জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মাঝারি আকারের ভিতরের একটা ঘরে রোগশয্যায় শুয়েছিল ভায়লা। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সুন্দরম্, মা—

কে?

সঙ্গে সঙ্গে শয্যার উপর উঠে বসে ভায়লা, কে?

মা—আমি সুন্দরম্।

সুন্দর—দু'হাত বাড়িয়ে দেয় ভায়লা।

এগিয়ে এসে শয্যায় বসে দু'হাতে মাকে বুকের ওপরে টেনে নেয় সুন্দরম্।

ভায়লার দু' চোখের কোণ বেয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

মা—

বেটা।

কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হয়ে ভায়লা বলে, সুন্দরম্, বেটা—my son—

কি মা?

I am going—আমার দিন হয়ে এসেছে আমি বুঝতে পেরেছি। তাই যাবার আগে একটা কথা তোকে আমার বলে যেতেই হবে।

কি কথা মা?

বলব। বলব—

মা।

হ্যাঁ—আর গোপন রাখব না কথাটা তোর কাছে। এতকাল গোপন রেখেছি কিন্তু আর রাখব না।

কি কথা মা?

বলব।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

মৃন্ময়ী যে ঠিক কি করবে ভেবে পায় না।

বিধর্মী দস্যু কর্তৃক সে অপহৃতা।

বিধর্মী দস্যুরা একদিন তাকে তার গৃহ, সমাজ ও আশ্রয় থেকে অপহরণ করে এনেছে এবং গত কয়মাস ধরে সেই বিধর্মী দস্যুর আশ্রয়েই আছে।

আজ যদি সে গৃহে ফিরে যেতেও পারে—গৃহে কি তার আর স্থান হবে!

বিধর্মীর আশ্রয়ে, বিধর্মীর অন্নে তার যে আজ সব গিয়েছে।

জাত গিয়েছে, ধর্ম গিয়েছে, সব গিয়েছে।

তার চিরদিনের গৃহ সেখানেও আজ আর তার কোন স্থানই নেই। তবে—তবে সে কি করবে? কোথায় যাবে? না—সব রাস্তাই আজ তার সামনে বন্ধ। সমস্ত দুয়ারই বন্ধ।

আর যদি সে কোথায়ও নাই যায় তো এই বিধর্মী জলদস্যু সুন্দরমের গৃহেই থেকে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে।

ধর্ম-সমাজ সব কিছু ছেড়ে এই পঙ্কের মধ্যে তাকে বাকী জীবনটা ডুবে থাকতে হবে।

কিন্তু সে তো এখান থেকে গেলেও হবে, না গেলেও হবে!

গৃহে ফিরে যেতে পারলেও আর তাকে কেউ অন্দরে পা ফেলতে দেবে না। গৃহদেবতার মন্দিরে আর সে প্রবেশ করতে পারবে না।

নিজের গৃহে তার ফিরে যাওয়া ও না যাওয়া তো আজ তার কাছে দুই-ই সমান। একই কথা।

কিন্তু এখানেও তো সে বাঁচবে না।

কেমন করে বাঁচবে? কি নিয়ে বাঁচবে? কি আশায় বাঁচবে?

তাছাড়া এখানে থাকলে ঐ বিভীষিকার হাত থেকেও তো সে মুক্তি পাবে

না। ঐ নর-দানবটার অঙ্কশায়িনী হতে হবে। না, না—

ঐ কুৎসিত দানবসদৃশ জলদস্যুটার অঙ্কশায়িনী সে হতে পারবে না। কোন দিনই হতে পারবে না।

তার চাইতে সে বিষ খাবে।

বিষ!

হ্যাঁ, বিষ। বিষই সে খাবে।

প্রৌঢ়া দাক্ষায়ণী এসে ঘরে ঢুকল।

সব তৈরী হয়ে গিয়েছে গো মেয়ে—স্নান করে নাও—এসো দেখি মাথায় তেলটা দিয়ে দিই।

দাক্ষায়ণীর হাতে তেলের বাটিটা ছিল সেটা কাছাকাছি এক পাশে নামিয়ে রেখে মৃন্ময়ীর বাঁধা চুল খুলতে লাগল।

মৃন্ময়ীর মনে হয় এই দাক্ষায়ণীর সাহায্যেই তো সে বিষ সংগ্রহ করতে পারে। পরক্ষণেই আবার মনে হয় দাক্ষায়ণী কালা, একেবারে বদ্ধ কালা। কানে কিছুই শোনে না।

কথাটা বললেও সে বুঝতে পারবে না।

দাক্ষায়ণী মৃন্ময়ীর গোছা গোছা চুল দু'হাতের মধ্যে ধরে তাতে তেল মাখাতে থাকে। আর আপন মনেই কি যেন বিড়বিড় করে বলতে থাকে।

এতদিন যা কখনো মৃন্ময়ী করে নি আজ তাই করল।

দাক্ষায়ণীর তেলমাখানো হয়ে গেলেই মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়াল এবং সোজা পায়ে পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দু'পা গেলেই তো গঙ্গার ঘাট।

ঘরের জানালা-পথেও গঙ্গার ঘাট দেখা যায়।

এতদিন ঘরেই সেই একটা ছোট চৌকির উপর কোনমতে দাক্ষায়ণী ওকে তুলে ধরে বসিয়ে দিয়েছে, তারপর মৃন্ময়ীকে স্নান করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সে মনে মনে ইতিমধ্যে স্থিরই করে ফেলেছিল পঙ্গুর ভান আর সে করবে না—যা হবার হোক—সুন্দরম্ জানতে পারে পারুক তাই মৃন্ময়ী হঠাৎ সোজা হয়ে চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের রাস্তা ধরে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল ধীর মন্থর পায়ে।

দাক্ষায়ণীও যেন কেমন বিস্মিত হয়েছে।

সেও হাঁ করে চেয়ে থাকে মৃন্ময়ীর চলার পথের দিকে।

মেয়েটা কেবল যে হাঁটতে পেরেছে তাই নয়—হাঁটতে হাঁটতে সোজা যে

গঙ্গার ঘাটে চললো! দাক্ষায়ণীর একবার ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়ে তখুনি সংবাদটা সুন্দর সাহেবকে দেয়—কিন্তু সুন্দর সাহেব আজ দুদিন হলো গৃহে নেই।

মৃন্ময়ী একবার ফিরেও তাকায় না।

সোজা এগিয়ে চলে।

দাক্ষায়ণী মৃন্ময়ীকে অনুসরণ করে।

মৃন্ময়ী সোজা এসে গঙ্গার জলে নামে। জোয়ারের স্ফীত গঙ্গা। জল অনেকখানি উঠে এসেছে। গঙ্গার জলে নেমে মৃন্ময়ী যেন আজ অনেকদিন পরে অনেকক্ষণ ধরে ডুব দিয়ে দিয়ে আশ মিটিয়ে স্নান করে।

দাক্ষায়ণী পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ স্নান করার পর ভিজে কাপড়ে যখন মৃন্ময়ী উঠে এলো, পাড়ে দণ্ডায়মান দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় মৃন্ময়ী, তারপর আবার এগিয়ে যায়।

দাক্ষায়ণীও তাকে অনুসরণ করে।

মৃন্ময়ী মনে মনে ইতিমধ্যে স্থিরই করেছিল আর পঙ্গুর ভান করে সর্বক্ষণ শয্যায় পড়ে থাকবে না। কথা বন্ধ বলে মুখ বন্ধ করে থাকবে না।

মরবে না সে। মরতে চায়ও না। কেন মরবে? কোন্ দুঃখে সে মরবে? বাঁচতেই সে চায়। যেমন করে হোক বাঁচবার পথ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। বাঁচতে তাকে হবেই।

শিবনাথ।

শিবনাথ তাকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না?

পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।

কাল রাত থেকে কতবার ভেবেছে শিবনাথের কথা এবং যতবার মনে মনে শিবনাথকে ভেবেছে, সমস্ত মুখখানা যেন তার রাঙা হয়ে উঠেছে।

মৃন্ময়া উঠে গিয়ে গঙ্গায় স্নান করে এসেছে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দাক্ষায়ণীর নজরে যখন পড়েছে, সুন্দর সাহেব ফিরে এলে তার কানে কথাটা নিশ্চয়ই উঠবে। আর তারপর যে কি হবে তাও জানে মৃন্ময়ী।

সুন্দর সাহেব সোজা এসে তার ঘরে ঢুকবে। স্পষ্টই হয়তো সে জিজ্ঞাসা করবে, এতদিন ধরে এই ছলনার মানেটা কি!

যা খুশি বলে বলুক সুন্দর সাহেব, মৃন্ময়ী কোন জবাব দেবে না। বোবার তো শত্রু নেই, সে যদি জবাব না দেয় তো কি করবে সাহেব।

কি আশ্চর্য! সেদিনও সারাটা দিন গেল—সন্ধ্যা হলো—রাত হলো, সুন্দর

সাহেব কিন্তু তার ঘরে এলো না। শুধু তার ঘরেই নয়—সেই যে দুদিন আগে এক সকালবেলা সুন্দর সাহেব বের হয়ে গিয়েছিল আর বাড়িতেই এলো না।

তবু মৃন্ময়ী সজাগ হয়ে থাকে। কান পেতে থাকে প্রতিমুহূর্তে পরিচিত সেই শব্দটা শোনবার জন্যে, কিন্তু সে পদশব্দ মৃন্ময়ী শুনতে পায় না।

জীবনকৃষ্ণ দেখা করতে বলেছিল বলে শিবনাথ পরদিন স্কুলের ছুটির পর সোজা একেবারে জীবনকৃষ্ণের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।

জীবনকৃষ্ণ সেদিন কলেজেও যায় নি। বাড়িতেও ছিল না।

জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে কথা ছিল তাকে সে ঐদিন রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভায় নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় যাবার কথা ছিল।

কিছুক্ষণ বাদেই জীবনকৃষ্ণ ফিরে এলো।

জীবনকৃষ্ণকে দেখে শিবনাথের মনে হলো সে যেন একটু বেশী উত্তেজিত।

কি ব্যাপার, তোমাকে যেন অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণ!

দুই দলের মধ্যে দলাদলিটা আবার বেশ পেকে উঠেছে—জীবনকৃষ্ণ বলে।

কোন্ দল? কাদের কথা তুমি বলছ জীবনকৃষ্ণ? কিসের দলাদলি?

তুমি কি হে শিবনাথ, কোন খবরই কি রাখ না এ যুগের ছেলে হয়ে! যা নিয়ে এত আন্দোলন চলেছে, তার কিছুরই খবর রাখ না নাকি!

না ভাই। তুমি তো জান আমি বেশী লোকের সঙ্গে মিশি না।

মেশো বা নাই মেশো—দুই দলে যে এত আন্দোলন হচ্ছে—

. কাদের কাদের দল?

রাজা রামমোহন রায় আর রাধাকান্ত দেবের দল। রামমোহন রায়ের 'কৌমুদী' আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রিকা'ও কি নিয়মিত তুমি পড় না?

না। পড়ি নি তো!

পড় নি? আশ্চর্য! এই যে সহমরণ-প্রথা নিবারণ, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন আর ব্রহ্মোপাসনা স্থাপনের ব্যাপার নিয়ে দেশের সব জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও আন্দোলন চলেছে তার কিছুরই খবর রাখ না? দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, মতিলাল শীল এঁদেরও নাম বোধ হয় শোন নি?

শুনেছি। সবার নামই শুনেছি। আর ঐ কবিতাটাও শুনেছি—

কবিতা!

হ্যাঁ—ঐ যে—শোন নি তুমি—

স্থরাই মেলের কুল

বেটার বাড়ি খানাকুল,

বেটা সর্বনাশের মূল,

ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল ;

ও সে জেতের দফা, করলে রফা

মজালে তিনকুল।

থাম, থাম—চিৎকার করে উঠে জীবনকৃষ্ণ। লজ্জা হয় না তোমার—আজকের একজন শিক্ষিত যুবক হয়ে কার সম্পর্কে ওসব কথা বলছ! জান তুমি যাকে নিয়ে ঐ কবিতায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে সে মানুষটা আমাদের দেশের, সমাজের ও শিক্ষার জন্য কি করেছে এবং এখনও কি করছে? তারপরই একটু থেমে জীবনকৃষ্ণ বলে, এ বিরোধ একদিন মিটে যাবেই—সত্যের আলোয় সকলের চোখের অন্ধকার দূর হবে। তখন তারা রামমোহন রায়ের মূল্য বুঝবে।

আচ্ছা জীবনকৃষ্ণ—

বলো।

সত্যিই কি তুমি মনে কর সহমরণ-প্রথা উঠে যাবে এ দেশ থেকে?

নিশ্চয়ই যাবে—যেতে বাধ্য। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কয়েরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহানুভূতি আছে।

কিন্তু হিন্দুর ধর্ম—

ধর্ম! ধর্ম তুমি বলো কাকে? ধর্মের নামে ওটা তো একটা অন্ধ কুসংস্কার। বছর দুই আগে অক্টোবর মাসে এই কলকাতা শহরেরই কাছে নৃশংস যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তুমি শোন নি?

নৃশংস হত্যাকাণ্ড!

হ্যাঁ—যে সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট‌কে লেখা হয়েছিল—

কি হয়েছিল কি ব্যাপারটা?

জীবনকৃষ্ণ তখন যা বললে তার মর্মার্থ হচ্ছে:

একটি অল্পবয়সী যুবক কলেরায় মারা যায়।

চিরন্তন প্রথানুযায়ী তার বিধবা স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় সহমরণ যাওয়া মনস্থ করে, সর্বপ্রকার আয়োজন হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে সেজন্য লাইসেন্সও নেওয়া হয়। যথাসময় মৃতের আত্মীয়স্বজনরা চিতায় মৃতদেহ স্থাপন

করে অগ্নিসংযোগ করে, দাউ দাউ করে যখন আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুন চোখের ওপরে দেখে মৃতের তরুণী স্ত্রীর সহমরণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও সাহস লোপ পায় এবং সে সেখান থেকে সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে পালিয়ে যায় পাশের জঙ্গলে।

বলো কি! তারপর?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শিবনাথ শুনতে থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মেয়েটার, প্রথমে তার পালানোর ব্যাপারটা কারো নজরে না পড়লেও পরে যখন জানতে পারল সকলে—সবাই যেন ক্ষেপে উঠল।

ক্ষেপে উঠল! কেন?

কেন আবার কি, তাদের ধর্ম গেল বলে! আসলে তা নয়—একটা পৈশাচিক নিষ্ঠুর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বলেই মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছিল।

তারপর?

তারপর আর কি, সকলে মিলে গিয়ে জঙ্গল থেকে খুঁজে বের করে নিয়ে এলো হতভাগিনীকে এবং ডিঙ্গিতে তুলে মাঝনদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারল শেষ পর্যন্ত।

বলো কি!

হ্যাঁ—তাহলেই বুঝে দেখ, ধর্মের নামে অন্ধ গোঁড়ামি আজ আমাদের কতখানি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে তুলেছে।

জীবনকৃষ্ণ—

বলো।

শিক্ষার ব্যাপারে কি সব আন্দোলনের কথা তুমি একটু আগে বলছিলে!

তুমি তো জান বছর তিনেক হলো কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশান নামে একটি কমিটি এই কলকাতা শহরে স্থাপিত হয়েছে!

জানি।

কমিটির যাঁরা মেম্বার ও কর্মকর্তা তাঁরা চান প্রাচ্য শিক্ষার ব্যাপারেই সব টাকা ব্যয়িত হোক, কিন্তু রাজা রামমোহন রায় বললেন, চলবে না। লর্ড আমহার্স্টকে তিনি সে সম্পর্কে দীর্ঘ এক পত্রও লিখেছেন এবং সে পত্রে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এদেশে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে এদের মনের অশিক্ষা ও কুসংস্কার—ধর্মের গোঁড়ামির অন্ধকার দূর হবে না আর তা না হলে জাতীয় জীবনেও কোন উন্নতি হবে না।

এই ব্যাপার নিয়েই বুঝি দুটো দল গড়ে উঠেছে দেশে—এত তর্কাতর্কি এত আন্দোলন!

হ্যাঁ। একদল বলছেন এ দেশে এতকাল যা ছিল সেই প্রাচীনই ভাল—অন্য দল বলছেন প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যা কিছু প্রাচ্য সব মন্দ, যা কিছু প্রতীচ্য সবই ভাল।

তুমি যা বললে জীবনকৃষ্ণ সেই জন্যই কি রাজা রামমোহন রায়ের ওপরে দেশের লোক খাপ্পা হয়ে উঠেছে?

শুধু শিক্ষা ব্যাপারের জন্যই নয়—বললাম তো এদেশের এতদিনকার ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে সহমরণ-প্রথা তিনি বিলোপ করতে চান, তার উপরে আছে তাঁর একেশ্বরবাদ।

কেন দেশের লোক এই সব ব্যাপার নিয়ে মিথ্যে হল্লা করছে বুঝি না, কারণ জ্ঞানভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুলতে হলে ইংরাজী শিখতেই হবে আমাদের। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাল করে পরিচিত হতেই হবে। তা ছাড়া এ কথাও মিথ্যা নয় যে ঐ সহমরণ-প্রথা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নৃশংস—

হবে—হবে, জীবনকৃষ্ণ বলে, সব কিছুই হবে একদিন শিবনাথ। কলকাতার ইংরাজও যে ব্যাপারটা বুঝছে না তা নয়।

তা যদি হয় তারা ইচ্ছা করলেই তো অন্তত সহমরণ প্রথাটা বন্ধ করে দিতে পারে। গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট কি পারেন না!

পারবেন না কেন, পারেন। নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি জান?

কি?

তারা বিদেশী। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ওঁরা কি বলেন জান? ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করেই হোক এ দেশ আজ তারা মানে ইংরাজরা করায়ত্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু এদেশে টিকে থাকতে হলে যে এ দেশের জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে চলতে হবে এটা তারা ভালভাবেই বোঝে। পাছে এ দেশের এতকাল প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে হাত দিতে গেলে হঠাৎ বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে জলে ওঠে সেই ভয়েই এরা সর্বদা সংকুচিত। কারণ ঐ সহমরণের ব্যাপারটাই দেখ না। আগে ইংরেজরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ সব নৃশংস অনুষ্ঠান চুপ করে দেখত, মুখ বুজে থাকত—কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তা কি তারা থেকেছে! আর থাকে নি বলেই আগেকার গভর্নর লর্ড আমহার্স্ট কতকগুলো নিয়মও বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে এই অন্যায় কুপ্রথা লোপ পাবেই এবং পেতে বাধ্য। একজন মরেছে বলে আর একজনকে তার সঙ্গে মরতে হবে কেন? এ তো হত্যা—রীতিমত হত্যা। চরম নিষ্ঠুরতা। চরম নৃশংসতা।

উত্তেজনায় জীবনকৃষ্ণের গলাটা কাঁপতে থাকে।

সেই সঙ্গে শিবনাথের চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা যেন সরে যায়। শিক্ষার আলো যেন তার চোখের সামনে একটা নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত করে।

শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ নিয়ে যে দেশের জনগণের মধ্যে এমন একটা আন্দোলন চলেছে এসবের কিছুরই তো কোন খবর আজ পর্যন্ত রাখে নি শিবনাথ।

ঐ যে মানুষগুলোর নাম করল জীবনকৃষ্ণ একটু আগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মুন্সী কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি তাদের সম্পর্কেই কিছু সত্যিই তো সে বিশেষ জানত না।

সে তার বিদ্যালয় ও লেখাপড়া নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

দু'মুঠো অন্নের সংস্থানের জন্যই সর্বদা ব্যস্ত। একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁইয়ের জন্যই সে চিন্তিত।

কিন্তু ঐ সব কিছুর বাইরেও যে আর একটা জীবন আছে—সে জীবনের সন্ধান ও কোন দিনই করে নি।

তুমি আজ আমাকে আত্মীয়-সভায় নিয়ে যাবে বলেছিলে!

আজ নয়—পরশু সেখানে আলোচনা সভা আছে একটা। তুমি এসো নিয়ে যাবো।

আর ডিরোজিওর ওখানে?

সেও এই সপ্তাহেই একদিন নিয়ে যাবো।

সেদিনকার মত জীবনকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ যখন গৃহে এসে পৌছল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

গৃহে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল তার গতরাত্রির কথাটা এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ল মৃন্ময়ীর কথা।

মৃন্ময়ী!

মৃন্ময়ীকে চুরি করতেই গতরাত্রে অরিন্দম সরকারের লোক এসেছিল।

একটা ভুলের জন্য সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আবার যে তারা আসবে না, তার কি স্থিরতা আছে!

তার কর্তব্য মৃন্ময়ীকে সাবধান করে দেওয়া।

ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর ঘরের দিকেই অগ্রসর হলো শিবনাথ।

॥ ২ ॥

বিচিত্র একটা অস্থিরতায় যেন শিবনাথ ছট্‌ফট করছিল।

আজকের দিনের সঙ্গে সে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, শিক্ষা পেতে চায়, কিন্তু আজকের দিন বলতে যে সব মানুষগুলোকে বোঝায়—যাদের চিন্তা ও কর্মধারা বোঝায়, তাদের কারও সঙ্গেই তো শিবনাথের অদ্যাবধি বলতে গেলে কোন পরিচয়ই হয় নি। পরিচয়ের কোন সুযোগই হয় নি।

কাউকেই সে দেখে নি। কাউকেই সে চেনে না। কয়েকটা নাম মাত্র শুনেছে সে আজ পর্যন্ত। মাত্র কয়েকটা নাম।

রাজা রামমোহন রায়, জয়রাম ঠাকুরের বংশজাত দ্বারকানাথ ঠাকুর, শোভাবাজারের রাজবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দেবের পুত্র রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, কলুটোলার কাপড়ের ব্যবসায়ী চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র মতিলাল শীল, ডেভিড্‌ হেয়ার ও পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও।

দেশের লোকের মুখে মুখে নামগুলো ফেরে—বহু লোকের মুখে শুনেছে শিবনাথ যখন তখন—তাই বোধ করি মাত্র নামগুলোর সঙ্গেই তার পরিচয় ঘটেছিল এবং ঐটুকুই, তার চাইতে বেশী কিছু নয়। ঐ নামগুলো সম্পর্কে তার মনের মধ্যে কোন অনুসন্ধিৎসা বা কোন প্রশ্নই জাগে নি, কিন্তু আজ যেন হঠাৎ অনেকগুলো প্রশ্ন এসে তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

জীবনের এতদিনকার বিশ্বাস ও সংস্কারের—ধ্যান ও ধারণার মূলে যেন ঐ প্রশ্নগুলো এসে আঘাত করেছে।

আশ্চর্য! আজ মনে হচ্ছে যে ভাবে তার জীবনটা চলেছে সেইটাই তার জীবনের শেষ কথা নয়। তার জীবন বলতে তার নিজস্ব সুখ-দুঃখটুকুই নয়। জীবনটা তার আরো বিস্তৃত আরো ব্যাপক।

চারপাশে এই শহরে যারা আছে তারা—এদের কাজ-কারবার—ধর্ম, সংস্কার চালচলন—উত্থান-পতন তার জীবনেরই অংশ। যে অংশ নিয়েই সে সম্পূর্ণ। নচেৎ সে অসম্পূর্ণ। অর্থহীন।

মিথ্যা বলে নি, ঠিকই বলেছে জীবনকৃষ্ণ। সত্যিই—আজকের সমাজ—আজকের ধর্ম—শিক্ষা সব কিছু নিয়ে আজকের দিনে যে জনগণের মধ্যে চলছে একটা আন্দোলন, তার কিছুই সে জানে না। তার কোন সংবাদই সে রাখে না—লজ্জার কথা। সত্যিই লজ্জার কথা!

কি রকম যেন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যেই এক সময় পায়ে পায়ে গিয়ে শিবনাথ মৃন্ময়ীর কক্ষের দ্বারে এসে দাঁড়ায়। মৃন্ময়ীর কক্ষের দরজাটা খোলাই ছিল। ভিতরে যে আলো জ্বলছিল তারই আবছা মৃদু একটা আভাস দরজার গোড়া পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। দরজা পর্যন্ত এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শিবনাথ।

গতরাত্রের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মৃন্ময়ীকে তার বলা উচিত হবে কি না সেই কথাটাই হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় এবং মনে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে।

মনে হয় কেনই বা সে হঠাৎ কথাটা মৃন্ময়ীকে বলবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে! কি হবে মৃন্ময়ীকে কথাটা জানিয়ে? দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করতে থাকে শিবনাথ এবং তার মনে হয় সেই সঙ্গে, কেন সে জানাবে না!

জানানো তার কর্তব্য। মৃন্ময়ীকে সব কথা বলতে হবে। হঠাৎ ঐ মুহূর্তে আর একজনের কথাও মনে পড়ে যায় শিবনাথের। সুন্দর সাহেবের কথা।

সুন্দর সাহেবের আশ্রিত সে। শুধু কি আশ্রিতই? আজ সে তার অন্নদাতা—পালনকর্তা। সর্বাগ্রে তো তাকেই সব কথা তার বলা কর্তব্য। কিন্তু কৈ, এখন পর্যন্ত তো তাকে কোন কথাই সে জানায় নি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় সুন্দর সাহেবকে গত রাত্রের কথাটা জানানো কি ভাল হবে! সুন্দর সাহেব যদি অন্য রকম কিছু ভাবে।

কি ভাববে সুন্দর সাহেব। কি ভাবতে পারে সে। আর ভাবলেই বা কি আর এসে যায় তাতে। আশ্রিত হিসাবে তার যতটুকু কর্তব্য তা সে করবে।

শিবনাথ ফিরে চলল সুন্দর সাহেবের ঘরের দিকে। সুন্দর সাহেবের ঘরের দরজাটা ভেজানই ছিল। ঈষৎ ঠেলা দিতেই দরজার কপাট দুটো খুলে গেল।

অন্ধকার ঘর। থমকে দাঁড়াল শিবনাথ।

সুন্দর সাহেব ঘরে নেই। সুন্দর সাহেব এখনো তাহলে ফেরে নি। পরশু রাত থেকে তাহলে সুন্দর সাহেব গৃহে ফেরেই নি নাকি? অন্যমনস্কভাবে কথাটা চিন্তা করতে করতে শিবনাথ মৃন্ময়ীর ঘরের দিকেই পুনরায় পা বাড়ায় এবং এবারে আর কোন রকম ইতস্তত না করে সোজা গিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

ঘরের এককোণে কুলুঙ্গীতে প্রদীপ জ্বলছিল। তারই ম্রিয়মাণ আলোয় কক্ষটি স্বল্পালোকিত। সেই স্বল্প আলো-ছায়াভরা ঘরের খোলা জানালাটার সামনে

পিছন ফিরে মৃন্ময়ী দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য দিনের মত শয্যায় শুয়ে ছিল না।

কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের পদশব্দে ফিরে তাকাল মৃন্ময়ী, কে!

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে দণ্ডায়মান শিবনাথের প্রতি নজর পড়ে মৃন্ময়ীর এবং মৃন্ময়ী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে শিবনাথের মুখের দিকে। শিবনাথও চেয়ে থাকে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ। অকস্মাৎ মৃন্ময়ীর ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসির বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হাস্যস্ফীত কণ্ঠে বলে মৃন্ময়ী, কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলে কেন অমন করে, এসো—

অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল শিবনাথ মৃন্ময়ীর দিকে।

স্বল্প প্রদীপের আলো মৃন্ময়ীর চোখে-মুখে এসে পড়েছে এবং সেই স্বল্প আলোয় মৃন্ময়ীকে যেন অপরূপ দেখাচ্ছে। তার চোখ কপাল ভ্রূ-যুগল চিবুক ওষ্ঠ এলায়িত কেশরাশি সব কিছুরই উপর যেন প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো পড়ে মৃন্ময়ীকে স্বপ্নময়ী করে তুলেছে।

এতদিন এ বাড়িতে আছে শিবনাথ ইতিপূর্বে কতবার দেখেছে ঐ মৃন্ময়ীকে কিন্তু তাকে তো কখনও এমন অপরূপা, অনন্যা মনে হয় নি। এমনি করে তো মৃন্ময়ী তার চোখে আবিষ্কৃত হয় নি। এ যেন তার পরিচিতা মৃন্ময়ী নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিতা—জীবনে প্রথম দেখা এক নারী। শিবনাথ আদি পুরুষের চোখের সামনে যেন মৃন্ময়ী আদি নারী।

কি দেখছো অমন করে?

মৃদু শান্তকণ্ঠে মৃন্ময়ীই প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করে।

অ্যাঁ—

চমকে ওঠে শিবনাথ।

কি দেখছো আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে শিবনাথ? স্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে মৃন্ময়ী শিবনাথকে।

তোমাকে দেখছি—

আমাকে দেখছো?

হ্যাঁ।

কেন, আমি কি নতুন? আমাকে কি আর আগে দেখ নি?

আশ্চর্য! সত্যিই তুমি নতুন, সত্যিই তোমাকে নতুন লাগছে যেন আমার চোখে আজ মৃন্ময়ী।

নতুন লাগছে কেন?

তা তো জানি না—নতুন লাগছে !

সত্যি নতুন লাগছে ?

সত্যি।

মৃন্ময়ী মৃদু হাসে। নিঃশব্দ একটা হাসির ঢেউ যেন ওর ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে।

হেসো না মৃন্ময়ী—সত্যিই বিশ্বাস করো তোমাকে আজ নতুন লাগছে।

হঠাৎ মৃন্ময়ী ডেকে ওঠে, শিবনাথ।

কিছু বলছিলে মৃন্ময়ী ?

হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে আমি বলি—জান—তুমি আজ না এলে আজ রাত্রে হয়তো তোমার ঘরে আমি নিজেই যেতাম।

আমার ঘরে নিজেই যেতে রাত্রে ?

হ্যাঁ।

কেন ?

আমি আর এখানে থাকব না।

কেন ?

থাকব না তাই।

তবে কি—

কি তবে !

বলছিলাম তবে কি করবে ?

এখান থেকে আমি চলে যাবো।

চলে যাবে এখান থেকে !

হ্যাঁ।

কোথায় ?

শিবনাথের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই। মৃন্ময়ীর কথাটা যেন আদৌ বুঝতে পারছে না এমনিভাবে চেয়ে থাকে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

জানি না কোথায় যাবো ! তবে চলে যাবো।

সুন্দর সাহেব—

শিবনাথের কথাটা শেষ হলো না। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ভাবছো সুন্দর সাহেব জানতে পারবে। না। সে জানতে পারবে না। কেমন করে জানবে। আমি রাত্তির বেলা কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যাবো।

তুমি বলছো তুমি কোথায় যাবে তা তুমি জান না। কিন্তু এক জায়গায়

যেখানেই হোক তোমাকে তো যেতেই হবে ?

বললাম তো জানি না কোথায় যাবো। আর যাবোই বা কোথায়, বাড়িতে তো কিছু আর ফিরে যেতে পারব না।

কেন ? কেন পারবে না বাড়িতে ফিরে যেতে ?

কেন তা বোঝ না! বিধর্মী দস্যুরা আমাকে জোর করে ধরে এনেছে। জাত গেছে আমার।

দস্যুরা তোমাকে লুঠ করে এনেছে, তোমার কি দোষ।

আমারই তো দোষ। আমার ভাগ্যের দোষ।

মনে পড়ে হঠাৎ জীবনকৃষ্ণের কথাগুলো শিবনাথের। জীবনকৃষ্ণ সেদিন বলছিল, সংস্কার আজ আমাদের এমনি অন্ধ করে তুলেছে যে, আমাদের সমস্ত বিচার-বুদ্ধি-বিবেক—সেই সংস্কারের মূলে বলি দিয়ে বসে আছি। ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে একদফা ধর্মের জন্য নিজেদের বলি দিচ্ছি আর একদফা চোখ বুজে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করছি।

কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবনাথ ডাকে, মৃন্ময়ী।

কি ?

তুমি এখনই হুট করে কোথাও যেও না।

কেন যাবো না!

না।

আর আমাকে কথা দাও মৃন্ময়ী, আমাকে না বলে, আমাকে না জানিয়ে এ বাড়ি থেকে তুমি কোথাও যাবে না।

কিন্তু শিবনাথ—

শোন মৃন্ময়ী, আনি তাহলে কথাটা তোমাকে খুলেই বলি। আমি নিজেও আর এখানে থাকতে চাই না।

থাকতে চাও না !

না—

কেন শিবনাথ ? কেন থাকতে চাও না ?

তা জানি না—তবে এক মুহূর্তও আর আমার এখানে থাকবার ইচ্ছা নেই।

সত্যি, সত্যি বলছো শিবনাথ! পরম আগ্রহে মৃন্ময়ী শিবনাথের মুখের দিকে তাকায়। কি এক প্রত্যাশায় তার চোখের মণি দুটো চিক চিক করতে থাকে প্রদীপের আলোয়।

হ্যাঁ মৃন্ময়ী, এখানে আর আমি থাকবো না। অন্য কোথায়ও আমি

আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছি। পেলেই আমি চলে যাবো।

আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে শিবনাথ?

হ্যাঁ—

সত্যি বলছো?

সত্যিই বলছি; তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

তবে চল এখুনি পালিয়ে যাই আমরা।

না।

পালাব না?

না—আর চোরের মত পালিয়ে যাবো না। কেনই বা চোরের মত পালিয়ে যাবো! সুন্দর সাহেবকে বলেই যাবো।

কিন্তু যদি সে আমাদের যেতে না দেয়!

কেন যেতে দেবে না। নিশ্চয় দেবে।

না, না—তুমি ওকে চেনো না শিবনাথ। ও জানতে পারলে যেতে দেবে না। কিছুতেই হয়তো যেতে দেবে না। তাছাড়া—

কি তাছাড়া?

সে যখন দেখবে আমি হাঁটছি কথা বলছি—এত দিন সব মিথ্যা ভান ছিল আমার সে কি আমাকে ক্ষমা করবে মনে কর—

নাই বা করুক তাতে কি—

আছে বৈকি।

যাই থাকুক জোর করে কিছু সে আমাদের এখানে ধরে রাখতে পারবে না—

পারে সে। ওকে তুমি জান না ও সব পারে—

না। হঠাৎ যেন শিবনাথের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে। সে বলে, জোর করে ধরে রাখতে সে আমাকে পারবে না। এটা কোম্পানীর রাজত্ব। জোর যার মুলুক তার আর চলে না। তারপরই হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে শিবনাথ, সুন্দর সাহেবকে তার ঘরে দেখলাম না। সে কি আজও ফেরে নি?

বোধ হয় না। পরশু রাত থেকেই সে ফেরে নি।

ফেরে নি!

না।

কোথায় গিয়েছে বলতে পার?

তা জানি না। তবে এরকম মধ্যে মধ্যে তো সে দু'চার দিনের জন্য কোথায় যেন যায়। কিন্তু আর তুমি এ ঘরে থেকো না শিবনাথ, দাক্ষায়ণী হয়তো এখুনি

এঘরে আসবে।

তা এলেই বা—

না, না—তুমি হয়তো লক্ষ্য কর নি কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি তোমাকে আর আমাকে একত্রে দেখলেই ও আমাদের দুজনার দিকে যেন কেমন করে চেয়ে থাকে। সে সময়কার ওর চোখের দৃষ্টি আমার আদৌ ভাল লাগে না তাছাড়া আজ যখন প্রথম হঠাৎ উঠে গঙ্গায় স্নান করতে গেলাম এমনভাবে ও আমার দিকে চেয়েছিল—

হেঁটে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলে বুঝি?

হ্যাঁ—

বল কি—

বললাম তো আর ভান করব না—ভান করে বিপদকে চিরদিন যখন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না—তখন আর মিথ্যা ভান কেন—কিন্তু এঘরে আর তুমি থেকো না হঠাৎ যদি এঘরে ও এসে পড়ে—আমাদের কথা শুনতে পায়—

কি ও তো বদ্ধ কালা—

আমার সন্দেহ আছে তাতে—মৃন্ময়ী বলে।

কি বলছো মৃন্ময়ী।

হ্যাঁ—আমার যেন মনে হয়—মৃন্ময়ীর কথা শেষ হলো না। কার যেন পদ-শব্দ শোনা গেল বাইরের বারান্দায়, পায়ের শব্দটা ঐ ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে—মৃন্ময়ী বলে—চুপ, কে যেন আসছে এ দিকে—

॥ ৩ ॥

ভায়লার সময় শেষ হয়ে এসেছিল।

সে টেনে টেনে শ্বাস নিতে থাকে। বোঝা যায় কষ্ট হচ্ছে তার শ্বাস নিতে। পৃথিবীর এত হাওয়াও যেন আজ তার ছোট বুকখানাকে ভরিয়ে দিতে পারছে না।

নেই। পৃথিবীতে যেন হাওয়া নেই।

এমনিই হয়। শেষ মুহূর্তে এমনি করেই যেন হাওয়া ফুরিয়ে যায়।

মা, মাগো—সুন্দরম্ মায়ের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকে উৎকণ্ঠায়। ভায়লার দু'চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা তখন গড়িয়ে পড়ছে।

মা, মাগো—সযতনে ভায়লার চোখের কোল থেকে অশ্রু মুছিয়ে দেয় সুন্দরম্, কাঁদছো কেন মা? Why crying—কি বলতে চাও বল!

কোনমতে টেনে টেনে ভায়লা ভগ্নকণ্ঠে বলে, কোনদিনই বলব না ভেবেছিলাম তোকে কথাটা সুন্দর, কিন্তু—কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছিল অন্যায় হবে—তোকে সব কথা না জানিয়ে গেলে অন্যায় হবে—তাই—

বল মা, বল—থামলে কেন? বল কি বলছিলে? উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙে পড়ে সুন্দরম্। সত্যি কথা বলতে কি তার বুকের ভেতরটা তখন সত্যি সত্যিই কাঁপতে শুরু করেছে। হঠাৎ যেন কেন অজ্ঞাত একটা আশঙ্কা তাকে তখন ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করেছে।

মৃত্যুপথযাত্রিণী মার মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। কি বলতে চায় তার মা তাকে।

কি এমন বলতে চায় মা তাকে, যা এতদিন বলতে পারে নি—এতদিন তার কাছ থেকে গোপন রেখেছে।

বল মা, বল—বলছো না কেন? কি বলতে চাও বল?

বলছি বাবা, বলছি—একটু জল।

ঘরের কোণে সরাইতে জল ছিল, তাড়াতাড়ি একটা বেলোয়ারী পাত্রে সেই জল এনে মার মুখের সামনে ধরলো, মা—জল।

ভায়লা হাঁ করে।

সুন্দরম্ একটু একটু করে তৃষিত জননীর গলায় জল ঢেলে দেয়।

গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল ভায়লার, জল পান করে অনেকটা সুস্থ বোধ করে।

সুন্দর—

মা।

আমি তোকে বুকে করে মানুষ করলেও—তুই আমাকে মা জানলেও সত্যি আমি তোর গর্ভধারিণী মা নই—

মা।

হ্যাঁ—তুই—তুই আমার ছেলে নোস—

কি, কি বললে? একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে সুন্দরম্। তার হাত থেকে জলের বেলোয়ারী পাত্রটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় শব্দ করে।

হ্যাঁ বাবা! তোকে আমি গর্ভে ধরি নি—

যেন বোবা হয়ে গিয়েছে সুন্দরম্। একেবারে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। কি বলছে তার মা ভায়লা। সে তার সন্তান নয়। ভায়লা তার মা নয়।

স্তব্ধ বোবা চোখে ভায়লার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সুন্দরম্। মৃত্যুপথযাত্রিণী ভায়লাও তখন তাকিয়ে পার্শ্বে উপবিষ্ট সুন্দরমের দিকে।

দু'চোখের দৃষ্টি তার জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সুন্দরম্—

সাড়া দেয় না সুন্দরম্ সে ডাকে। যেমন পাথর হয়ে বসেছিল তেমনিই বসে থাকে ভায়লার পাশটিতে।

কাঁপতে কাঁপতে সুন্দরমের একখানা হাত ধরে কোনমতে ভায়লা ডাকে, সুন্দরম্—তবু সাড়া নেই সুন্দরমের।

ক্ষণপূর্বে মার মুখে শোনা কথাটা তখনো যেন তার দু'কানের মধ্যে দুন্দুভি পিটছে। দুম দুম দুম।

সত্যিই তুই আমাদের—আমার আর রোজারিওর সন্তান নোস।

আমি—আমি তোমাদের ছেলে নই? একটা করুণ কান্নার মতই যেন কথাটা উচ্চারিত হয় সুন্দরমের ভগ্ন স্তব্ধপ্রায় কণ্ঠ হতে অনেকক্ষণ পরে।

না, আমাদের কোন সন্তান হয় নি।

তবে, তবে আমি কে? আমি যদি তোমাদের সন্তান নই তো তবে আমি কে? Who I am—কোথা থেকে আমি এলাম। কে আমার মা, কে আমার বাবা—who is my mother—who is my father—

জানি না।

কোনমতে ভাঙাক্ষীণ কণ্ঠে যেন জবাব দেয় ভায়লা।

সত্যি—সত্যি বলছো মা, জান না! জান না আমি কে? কে আমার বাপ? কে আমার সত্যিকারের মা?

না, জানি না।

তবে—তবে তোমাদের কাছে কোথা থেকে আমি এলাম?

দরিয়ার পানি থেকে—

কি—কি বললে?

দরিয়ার পানি থেকে রোজারিও একদিন তোকে তুলে এনে আমাকে দিয়েছিল। আমারই মতো এক মেয়েছেলে তোকে পিঠে বেঁধে নিয়ে দরিয়ার পানিতে ভাসছিল—তারই বুক থেকে তুলে এনে রোজারিও তোকে আমার বুকে একদিন তুলে দিয়েছিল—ছোট্ট এতটুকু একটি শিশু তুই তখন।

আর সেই—সেই মেয়েছেলে যার পিঠের সঙ্গে বাঁধা হয়ে আমি দরিয়ার পানিতে ভাসছিলাম সে, তার—তার কি হলো? What happened to her—

সে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বল, বল—সে কোথায় ?

সে—সে কোথায় জানি না—

মারা গিয়েছে কি ? Is she dead—

তাও জানি না—

কি জাত সে !

জানি না—

বাঙালী ?

হ্যাঁ—হিন্দু—

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে সুন্দরম্। নেই। তাহলে যার কাছ থেকে তার পরিচয়টা হয়তো জানা যেত তারও খোঁজ আজ আর কেউ জানে না—

আশার একটা ক্ষীণ আলোর শিখা যেন মনের কোণে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। অন্ধকার। আবার গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

কিন্তু দরিয়ার পানির মধ্যে আমাকে নিয়ে সে ভাসছিল কেন ? তবে কি কোন নৌকাডুবি—না—

সম্ভবত তা নয়—

তবে ! তবে কি ?

অনেকে সাগরে মানত করে ছেলে বিসর্জন দেয়, মনে হয় সেই রকমই কিছু—

কিন্তু তোমরা—তোমরাও কি খোঁজ কর নি আমার মা-বাবার ?

না—

কেন !—Why—why—why—

জানতে পারলে যদি তারা তোকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয় এই ভয়ে।

কিন্তু তাই যদি হবে তো আজই বা সে কথা বললে কেন ! কেন বললে তোমরা আমার কেউ নও। আমি তোমাদের কেউ নই।

সুন্দর—

নাই বা বলতে কথাটা। নাই বা জানতাম কথাটা আমি—

ভেবেছিলাম বলব না—কোনদিনই তোকে জানাব না কিন্তু—একটা কাসির ধমক ওঠে ভায়লার। কাসতে কাসতে ভায়লার দম বন্ধ হয়ে আসে প্রায়।

অনেক কষ্টে সুন্দরম্ ভায়লাকে সুস্থ করে। সুস্থ হয়ে ভায়লা বলে, কিন্তু বিশ্বাস কর সুন্দর—গর্ভে না ধরলেও তোকে আমি আমার গর্ভের সন্তানের মতই চিরকাল মনে করে এসেছি, ভালবেসেছি। জানতে দিই নি কোনদিন যে তুই আমার আপন পেটের সন্তান নোস—সুন্দর—

বল ?

একটা কথা তোকে আজ বলি—

কি কথা ?

রোজারিও বলেছিল যার বুক থেকে তোকে সেদিন ছিনিয়ে নিয়েছিলাম সে তখনো মরে নি—প্রাণ ছিল তার তখন !

সত্যি ! সত্যি বলছো ?

ভায়লার বুকের ওপরে আবার ঝুঁকে পড়ে সুন্দরম্‌ গভীর উৎকণ্ঠায়—গভীর আগ্রহে।

হ্যাঁ—রোজারিওর কাছেই পরে শুনেছি তোকে ও তাকে নৌকায় জল থেকে তোলা হয়েছিল তার পর তোকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে তারা সাগরের চড়ায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—

তারপর—বল তারপর ?

তারপর আর কিছু জানি না—

আবার একটা কাসির ধমক শুরু হয় ভায়লার। কাসতে কাসতে আবার ভায়লা হাঁপিয়ে পড়ে।

ভায়লার সময় শেষ হয়ে এসেছিল।

পৃথিবীতে তার গোনা দিন ফুরিয়ে এসেছিল। পরের দিন দ্বিপ্রহরের দিকে সজ্ঞানেই কথা বলতে বলতে সুন্দরমের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ভায়লার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

সব যোগাড়যন্ত্র করে ডি'কুনহার সাহায্যে বুড়ীকে কবর দিতে দিতে মধ্যরাত্রি হয়ে গেল।

নদীর ধারে গীর্জারই আঙ্গিনায় ভায়লাকে কবর দিল সুন্দরম্‌। কফিনের উপর মাটি চাপা দিতে দিতে সুন্দরমের মনে হয়, এই তো জীবন।

এই তো মানুষের জীবন।

চলে যাবার দিনটি চিহ্নিত করে নিয়েই তারা জন্মায়। এবং জন্মাবার পরমুহূর্ত থেকেই নিজের অজ্ঞাতে দুর্লঙ্ঘ্য এক নিয়তির নির্দেশে যেন পায়ে পায়ে সেই চলে যাবার মুহূর্তটির দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। সেই মুহূর্তে পৌঁছে অবশেষে থামে।

ভায়লাও তেমনি থেমে গেল। সেও একদিন এমনি করে থেমে যাবে।

সবাই থামে। সবাই থেমে যাবে।

আকাশে কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদ।

তারই আলোয় প্রকৃতি জুড়ে যেন একটা আলোছায়ার লুকোচুরি চলেছে। সঙ্গের লোকজনদের ও ডি'কুনহাকে বিদায় দিয়ে একসময় এসে সুন্দরম্ নদীর ধারে বসলো।

কিছুক্ষণ আগে জোয়ার শুরু হয়েছে। ক্রমশ জল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভায়লা—যাকে সে এতকাল মা বলে জেনে এসেছে সে তাহলে তার মা নয়। কেউ নয়। কোন সম্পর্কই নেই তার সঙ্গে তার।

লুণ্ঠন করে এনেছিল রোজারিও আর ভায়লা তাকে। নিজেকে সে এতকাল রোজারিও আর ভায়লার সন্তান—পর্তুগীজ ক্রিশ্চান বলে জেনে এসেছে। তাও সে নয়।

গঙ্গাসাগরের কাছে তাকে দরিয়ার বুক থেকে পাওয়া গেলেও সে কোন হিন্দুরই সন্তান।

হিন্দুর রক্তই তার শরীরে প্রবাহিত।

ক্রিশ্চান নয় সে, হিন্দু।

বিধর্মী নয় সে—হিন্দু।

কিন্তু তাতেই বা কি, ক্রিশ্চানের ঘরে পালিত—ক্রিশ্চানের অন্নে পুষ্ট—ধর্মচ্যুত তো সে অনেক দিনই। ধর্মে পতিত—কোন ধর্মেরই নয় সে। না হিন্দু না ক্রিশ্চান।

তাছাড়া ক্রিশ্চান ধর্মের দীক্ষাও তো তার হয় নি। শুধু ক্রিশ্চানদের ঘরে পালিত ও তাদের অন্নে পুষ্ট।

বাঃ চমৎকার। জাত নেই—ধর্ম নেই—বাপ নেই—মা নেই—কোন পরিচয় কোন কিছুই নেই এ জগতে তার।

বেওয়ারিশ একটা মানুষ।

আকাশের দিকে তাকাল সুন্দরম্।

আধখানা চাঁদ—তার পাশে পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক অনেক তারা। ঐ তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই কেন যেন মনে হয়, তার সত্যিকারের গর্ভধারিণী মা কি আজও বেঁচে আছে!

বেঁচে আছে কি মা তার এই পৃথিবীর কোনখানে। যদি বেঁচে থাকে তো কোথায়—কোথায় আছে সে।

কেমন দেখতে সে!

তাকে পিঠে বেঁধে দরিয়ার বুকে ভেসে যাচ্ছিল অসহায় শিশু সে—রোজারিও তাকে তুলে এনে ভায়লার বুকে তুলে দিয়েছিল।

হয়তো নৌকাডুবি হয়েছিল এবং নৌকাডুবির পর তার মা তাকে অনন্যোপায় হয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে দরিয়ার বুকে ভেসেছিল।

রোজারিও তাকে বাঁচিয়েছে।

হয়তো মা তার আজও বেঁচে আছে। কিন্তু সে জানে তার সন্তান কোন এক সময় বাঁধন খুলে হয়তো দরিয়ায় ডুবে গিয়েছে চিরদিনের মত।

না, না—ডুবি নি মা। ডুবি নি—আজও আমি বেঁচে আছি। তোমার অভাগা সন্তান তোমার ক্রোড়চ্যুত হয়ে আজও বেঁচে আছে।

যদি দেখা পেত। একটিবার যদি তার মায়ের দেখা পেত। ঝাঁপিয়ে পড়তো গিয়ে মার বুকের ওপরে।

বলত, মা, মাগো—দেখ তো—দেখ তো আমায় চিনতে পার কি না?

সুন্দরমের দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তার গণ্ড ও চিবুক ভাসিয়ে দেয়।

মা, মা—মাগো—

আশ্চর্য!

ঠিক সেই রাত্রেই বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখে সুলোচনার ঘুমটা ভেঙে যায়। সুলোচনা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—তার সেই অনেকদিন আগেকার গোপাল। কালো কষ্টিপাথরের গোপাল যেন বিশাল সমুদ্রের ঢেউয়ের বুকের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে—

পাড়ে দাঁড়িয়ে সুলোচনা।

চিৎকার করে ওঠে সুলোচনা, গোপাল। গোপাল—

দু'হাত বাড়িয়ে দেয় সুলোচনা, গোপাল, আয়—আয়—

কিন্তু আসতে পারে না গোপাল ঢেউ অতিক্রম করে। বিরাট—বিরাট ঢেউ একটার পর একটা পড়ছে আর ভাঙছে আর গোপালকে দূরে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

তার কাছ থেকে দূরে—দূরে সরে যাচ্ছে গোপাল।

চিৎকার করে ডাকে সুলোচনা স্বামীকে, কোথায় তুমি—গোপালকে ধর—ধর। ও যে ডুবে গেল।

কিন্তু হরনাথ তার স্বামী তার পাশে প্রস্তরমূর্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকে, কোন সাড়াই দেয় না। কোন প্রচেষ্টাই নেই যেন তার।

তারপরই যেন সহসা সব অন্ধকার করে দেয় একটা বিরাট ঢেউ এসে।

কাঁদতে থাকে স্থলোচনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ক্রমে এক সময় আবার অন্ধকার তরল হয়ে আসে। সামনের অশান্ত বিক্ষুব্ধ সাগর শান্ত হয়ে আসে।

ফিকে একটা আলোয় চারিদিক মৃদু আলোকিত হয়ে ওঠে আর তারপরই—তারপরই স্থলোচনার নজরে পড়ে, সেই কালো কষ্টিপাথরের শিশু গোপাল যেন মস্ত বড জোয়ান হয়েছে। বিশাল বক্ষ, বিশাল দুই বাহু! এবং সেই বাহুতে গাদা বন্দুক।

বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে সামনের দিকে।

চিৎকার করে ওঠে স্থলোচনা, গোপাল, গোপাল—আমি—আমি তোর মা। বন্দুক নামা—বন্দুক নামা—

বন্দুক নামায় সেই বিরাট কালোপুরুষ। তারপরই হো হো করে হেসে ওঠে সে।

কিন্তু ও কি! এতক্ষণে ভাল করে দৃষ্টি পড়ে স্থলোচনার লোকটার মুখের প্রতি। কে! কে ও! ও যে সেই পর্তুগীজ দস্যু।...যে দস্যু মৃন্ময়ীকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

সেই দস্যুটা তখনো হাসছে।

হা হা করে অট্টরবে হাসছে।

. .

ঘুমটা ভেঙে গেল স্থলোচনার। চোখ মেলে ধড়ফড় করে শয্যার উপর উঠে বসে স্থলোচনা। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে।

এ কি! এ কি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলো স্থলোচনা!

আর কেনই বা এ স্বপ্ন দেখল।

বাইরে খড়মের খট্ খট্ আওয়াজ শোনা যায়। কান পেতে শোনে স্থলোচনা তার স্বামী হরনাথ ঘরের সামনে বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

আজকাল রাত্রে বেশির ভাগই ঘুমোয় না হরনাথ। প্রথম রাত্রে একটু ঘুমোয়, তারপরই ঘুম ভেঙে যায়।

মধ্যরাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত এমনি করে পায়চারি করে হরনাথ।

সেদিন শুধিয়েছিল স্থলোচনা, রাত্রে অমন করে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াও কেন?

ঘুম আসে না—

কেন?

জানি না। অথচ নিদ্রাহীন শয্যায় পড়ে থাকতেও অসহ্য লাগে তাই—

ধীরে ধীরে সুলোচনা শয্যায় উঠে বসলো। গায়ের কাপড় ঠিক করে নেয়। পাশেই মেয়েটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মেয়েটার গায়ের কাপড় সরে গিয়েছে। হাত দিয়ে টেনে-টুনে মেয়েটার গায়ের কাপড় ঠিক করে দেয় সুলোচনা, তারপর শয্যা থেকে উঠে পড়ে।

দরজা খুলে বাইরে দাঁড়াল।

অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিল হরনাথ। সুলোচনার ঘরের দরজা খোলার শব্দে ফিরে দাঁড়ায়।

কে!

আমি—

সুলোচনা।

হ্যাঁ, জেগে আছো, ঘুমোও নি!

না—

ঘুম এলো না!

না—ঘুম কিছুতেই আসে না।

কিন্তু—এগিয়ে এলো সুলোচনা স্বামীর কাছে, এমনি করে রাতের পর রাত জাগলে শরীর ক'দিন টিকবে—

আর টিকিয়েই বা কি হবে—

ও আবার কি কথা—

হ্যাঁ সুলোচনা—সত্যি কথাই বলছি। দিবারাত্র এই আগুন বুকের মধ্যে নিয়ে আর পারছি না।

আস্তে কথা বল—মেয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে বটে তবে ওর ঘুম বড় পাতলা।

ওর কি কিছু আর জানতে বাকী আছে সুলোচনা। চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত বাপের কোন্ কথাটাই বা ও আর না জানে। সেই লজ্জাটাই তো আরো আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটা কথা তোমাকে এখনো বলি নি।

কি কথা!

পরশু গঙ্গার ঘাটে—থেমে যায় হরনাথ।

কি! থামলে কেন?

দেখলাম ক্ষীরোদা গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে বসে ভিক্ষা করছে—

কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কথাটা শুনে স্বামীর মুখের দিকে

সুলোচনা। যে কথাটা বলবার জন্য সে উদ্যত হয়েছিল সে কথাটা আর বলা হয় না।

কিন্তু ভিক্ষা করার চাইতেও কি মর্মান্তিক দেখলাম জান সুলোচনা?

কি!

ক্ষীরোদার আজ সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে—

সে কি!

হ্যাঁ, সে আজ একেবারে উন্মাদিনী। পৃথিবীর কাউকেই সে আজ আর চেনে না, আমাকেও সে চিনতে পারে নি। কিন্তু এমনটা কেন হলো বলতে পার সুলোচনা!

সুলোচনা স্বামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। ক্ষীণ ঝাপ্‌সা মধ্যরাত্রির জ্যোৎস্না সামনের আঙ্গিনার ওপরে এসে যেন গা এলিয়ে ঝিমুচ্ছে।

তারই ক্ষীণ আলোয় বারান্দাটায় আলোছায়ার খেলা। সেই আলোছায়ায় স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন সুলোচনার, এ স্বামী তার পরিচিত স্বামী নয়। এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানুষ।

এককালে ঐ মানুষটাকে সুলোচনা জীবনে নিবিড় করে পেয়েছিল—একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিল তারপর নিষ্ঠুর ভাগ্যের চক্রান্তে তার কাছ থেকে দূরে চলে গেল মানুষটা। কিন্তু দূরে চলে গেলেও মানুষটার যে ছবি বুকের নিভৃতে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল সে ছবি তো কোনদিন ঝাপ্‌সা হয়ে যায় নি।

অবিশ্যি এখানে আসার পর মনের মধ্যে যে তার স্বামীর রূপটি খোদিত হয়েছিল সেই রূপটিতেই স্বামীকে সে গ্রহণ করেছিল মনে মনে, বাইরে যাচাই করে দেখে নি—দেখবার প্রয়োজনও বোধ করে নি।

কিন্তু আজ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ তো সে নয়। সুলোচনার সেই স্বামী হরনাথ তো এ নয়।

তবে কে? কে এই মানুষটা? নয়নতারার স্বামী—দাক্ষায়ণীর স্বামী?

সব যেন কেমন গুলিয়ে যায় সুলোচনার। সব যেন কেমন জট পাকিয়ে যায়।

আবার হরনাথের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সুলোচনা।

হরনাথ তখন বলছে, কিন্তু পাগল ক্ষীরোদা হলো কেন সুলোচনা। কার পাপে ওর এমনটা হলো। পাপ যদি কেউ করে থাকে সে তো আমি। ক্ষীরোদা তো নয়। ক্ষীরোদাকে তবে কেন এ আঘাত সইতে হচ্ছে—

সুলোচনা যে কথাটা জীবনে কোনদিনই হয়তো বলতে পারত না, সেই

কথাটাই হঠাৎ যেন তার মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো।

সুলোচনা বললে, তাকে এখানে নিয়ে এলে না কেন?

কি বলছো তুমি সুলোচনা—চমকে তাকায় হরনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—সে হয়তো এখনো গঙ্গার ঘাটেই আছে। চল আমরা তাকে গিয়ে নিয়ে আসি—

তাকে আনতে যাবে তুমি!

বিস্ময়ের যেন অবধি নেই হরনাথের। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে চেয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে।

কেন যাবো না—একদিন তো তুমি তাকে গ্রহণ করেছিলে—

সুলোচনা—

সেই গ্রহণের দাবীতেই তো সে এ গৃহে আসতে পারে।

তার মানে—তুমি—তুমি আমাকে আবার ত্যাগ করে যাবে বলে স্থির করেছো সুলোচনা?

ত্যাগ? না—ও কথা আর বলো না। স্ত্রী হয়ে অনেক অপরাধ করেছি তোমার পায়ে—এবং যে অপরাধের মূল্য এতদিন ধরে দিচ্ছি এবং বাকী জীবনটা ধরেও দিতে হবে—আর নতুন কোন অপরাধের বোঝা যেন কাঁধে এসে না চাপে এই আশীর্বাদই কর—বলতে বলতে কান্নায় সুলোচনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, সে নীচু হয়ে গলবস্ত্রে স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখে।

হরনাথ তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে পরম স্নেহে স্ত্রীকে তুলে ধরতে ধরতে বলে, ওঠো সুলোচনা, অপরাধ তোমার নয়। আমার। আর লজ্জা দিও না এই হতভাগ্যকে।

হরনাথের গলার স্বর বুজে আসে।

অশ্রুতে দু' চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

হরনাথের বলিষ্ঠ দু' বাহুর মধ্যে কোনমতে নিজেকে সমর্পণ করে কাঁপতে থাকে সুলোচনা। আর বার বার মনে মনে বলতে থাকে, আমার সকল অহঙ্কার গিয়েছে। সমস্ত অহঙ্কার আমার ধুলোয় মিশিয়ে গিয়েছে—ক্ষমা করো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

মৃন্ময়ীর কথায় শিবনাথও শব্দটা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে।

মিথ্যে নয়।

সত্যিই কার যেন পায়ের শব্দ—বেশ ভারি পায়ের শব্দ এদিকেই এগিয়ে আসছে। শিবনাথ মুহূর্ত আর দেরি করে না। চট্ করে উঠে পড়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের কুলুঙ্গিতে রক্ষিত প্রজ্বলিত প্রদীপটি—ঘরের একটিমাত্র আলো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়।

মুহূর্তে ঘর অন্ধকার হয়ে যায়।

চাপা শংকিতকণ্ঠে মৃন্ময়ী শুধায়, এ কি করলে শিবনাথ, আলো নিভিয়ে দিলে কেন?

কিন্তু মৃন্ময়ী শিবনাথের কোন সাড়া পেল না।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে, এদিক-ওদিকে আশেপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতেও পায় না।

পুনরায় আগের চাইতেও চাপাকণ্ঠে যেন কতকটা ফিস্ ফিস্ করে মৃন্ময়ী শুধায়, চলে গেলে। শিবনাথ—

অন্ধকারে এবারে পাশ থেকেই সাড়া এলো সতর্ক চাপাকণ্ঠে, না, আস্তে, কথা বলো না—

ইতিমধ্যে সেই ভারি পায়ের শব্দটা যেন মনে হলো ওদের ঘরের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেল। মনে হলো যেন সুন্দর সাহেবের ঘরের দিকেই গেল। ক্লান্ত শ্লথ মন্থর পদশব্দ।

অন্ধকারেই আন্দাজে মৃন্ময়ী শিবনাথের একেবারে গা ঘেঁষে বুকের কাছটিতে দাঁড়ায়। মৃন্ময়ীর বক্ষের ধুক্‌ধুকুনিটা পর্যন্ত শিবনাথ শুনতে পায়।

ওর নিশ্বাসটাও যেন শিবনাথের গায়ে এসে লাগছে।

ফিস্ ফিস্ করে পুনরায় চাপাকণ্ঠে শুধায় মৃন্ময়ী, কে গেল শিবনাথ?

মৃন্ময়ী না বুঝতে পারলেও শিবনাথ বুঝতে পেরেছিল, ঐ ভারি পায়ের শব্দটা—যা একটু আগে ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল, সেটা কার পায়ের শব্দ।

চাপা সতর্ককণ্ঠে জবাব দেয় শিবনাথ, সুন্দর সাহেব।

কি হবে শিবনাথ, যদি এখুনি এ ঘরে এসে হাজির হয়।

বোধহয় আসবে না। ও ঘরের দিকেই তো চলে গেল। দাঁড়াও এক কাজ করি—সামনের দরজা দিয়ে বেরুব না। আমি ঐ পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি—তুমি দরজাটা আটকে দাও—

শিবনাথ কথাটা বলে অন্ধকারে পিছনের দরজাটার দিকে-এগিয়ে যেতেই মৃন্ময়ী ওর একটা হাত চেপে ধরে।

কি হলো?

তুমি যা একটু আগে বললে করবে তো? এখান থেকে তুমি যখন যাবে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তো?

নিশ্চয়ই।

ভুলে যাবে না তো।

না না, ভুলব না।

সত্যি বলছো?

সত্যি, সত্যি বলছি মৃন্ময়ী—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারেই হঠাৎ শিবনাথ তার বলিষ্ঠ দু'বাহু বাড়িয়ে মৃন্ময়ীকে আপন বক্ষের উপর টেনে নেয়।

দু'বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে মৃন্ময়ী যেন নিঃশেষিত হয়ে যায়। হারিয়ে যায়।

মৃন্ময়ী···মৃন্ময়ী—

শিবনাথের কণ্ঠের মধ্যে যেন ডাকটা হারিয়ে যায়।

অন্ধকারেই শিবনাথের তপ্ত তৃষিত দুটি ওষ্ঠ তার বক্ষলগ্না মৃন্ময়ীর পুষ্পকলির মত ওষ্ঠের ওপরে নেমে আসে।

মৃন্ময়ীর ঘর থেকে বের হয়ে অন্ধকারে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঘুরে এক সময় শিবনাথ তার ঘরের মধ্যে ফিরে এলো।

সমস্ত দেহটা তখনও যেন তার অবশ। সমস্ত স্নায়ু শিথিল। মৃন্ময়ীর দেহের সুখস্পর্শটা তখনো যেন তার প্রতি রোমকূপে শিহরিত হয়ে চলেছে।

হ্যাঁ—চলে যেতে হবে তাকে, যেমন করেই হোক। আর যাবার সময়ে মৃন্ময়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সে।

মৃন্ময়ীকে ছেড়ে সে যেতে পারবে না। পৃথিবীর কোথাও সে তাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে না। কিন্তু যাবে সে কোথায়! কোথায় যাবে—

একটা কাজ করলে তো হয়, জীবনকৃষ্ণকে সব কথা খুলে বললে তো হয়। সে হয়তো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

কিম্বা ঐ যে রাজা রামমোহন রায়ের কথা জীবনকৃষ্ণর মুখে শুনেছে শিবনাথ—তিনি তো মস্ত লোক, রাজা মানুষ। তাঁর কাছে সমস্ত কথা গিয়ে খুলে বললে কি তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না ওদের।

সে অবশ্যি তাঁর বাড়ি চেনে না, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ চেনে।

জীবনকৃষ্ণকে নিয়েই তো সে অনায়াসে তাঁর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে।

কিন্তু তবু মনটার মধ্যে যেন পুরাপুরি সায় পায় না শিবনাথ। রাজা রামমোহন প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক বটেন কিন্তু তাঁর বিরোধীপক্ষেরও তো অভাব নেই।

কার কাছে তা হলে পরামর্শ নেওয়া যায়।

কে তাকে সঠিক নির্দেশ দিতে পারে।

হঠাৎ ঐ সময় মনের পাতায় ভেসে ওঠে শিবনাথের এক দেবী-প্রতিমার সহাস্য সুন্দর মুখখানি।

নরেন্দ্র—সহাধ্যায়ী নরেন্দ্রজননী দুর্গা দেবী। পরিধানে একটি লাল চওড়া পাড় শাড়ি, অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কিছুটা কেশরাশি বক্ষের উপরে নেমে এসেছে। কপালে একটি বড় সিন্দুরের টিপ। সিঁথিতে ডগডগে সিন্দুর, হাতে শাঁখা, লোহা ও মোটা হাঙ্গরমুখী স্বর্ণ বলয়, টকটকে গৌর গাত্রবর্ণ। সত্যিই যেন মা দুর্গা।

শোভাবাজারের রাজবাড়িতে রাধাকান্ত দেবের গৃহে পূজার সময় যে দুর্গা-প্রতিমা দেখেছে ঠিক সেই মা দুর্গার মতই যেন মুখখানা।

প্রণাম করবার পর সেদিন শিবনাথ পিতৃমাতৃহারা জেনে গভীর স্নেহে দুর্গা দেবী শিবনাথকে আপন বক্ষে টেনে নিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ঠিক—এতক্ষণ মনে পড়ে নি। দুর্গা দেবীর কাছেই তো গিয়ে সে মৃন্ময়ীর হাত ধরে সোজা দাঁড়াতে পারে।

বলতে পারে, মা, মৃন্ময়ীকে আশ্রয় দাও।

মা কি মৃন্ময়ীকে বক্ষে টেনে নেবেন না। নিশ্চয়ই নেবেন।

আশ্চর্য! এতক্ষণ একবারও এ কথাটা তার মনে হয় নি কেন। কাল—কালই সে দুর্গা দেবীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়—কাল কেন! আজ রাত্রেই তো তারা চলে যেতে পারে সেখানে!

ঠিক, শুভস্য শীঘ্রম্।

আর দেরি নয়। আজ রাত্রেই মৃন্ময়ীকে নিয়ে সে বের হয়ে পড়বে।

মৃন্ময়ীর একটা আশ্রয় হলে তারপর তার নিজের জন্য সে ভাবে না।

একটা আশ্রয় সে খুঁজে নিতে পারবে, এতবড় শহরে একটা আশ্রয়ের অভাব! যেমন করে যেখানেই হোক একটা আশ্রয় তার জুটে যাবেই।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি করে না শিবনাথ। মন স্থির করে সে অন্ধকারেই পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বের হয়ে এলো আবার।

টানা বারান্দাটা অন্ধকার, শুধু শেষপ্রান্তে নজর পড়ে শিবনাথের, আলোর একটা রশ্মি এসে অন্ধকার বারান্দায় পড়েছে।

থমকে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ।

কত রাত কে জানে। কিন্তু যত রাতই হোক সুন্দর সাহেব এখনো ঘুমোয় নি। জেগেই আছে। তার ঘরের খোলা দরজা-পথেই আলো এসে অন্ধকার বারান্দায় পড়েছে।

সুন্দর সাহেব এখনো জেগে।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল শিবনাথ তারপর পা টিপে-টিপে সুন্দর সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

খোলা দরজাটার কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়ে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে আর একটা দীর্ঘ ছায়া দেওয়ালের উপর দিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করছে।

সুন্দর সাহেব ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

সুন্দর সাহেবের ঘরের দুখানা ঘরের পরেই মৃন্ময়ীর ঘর। সাহস হয় না শিবনাথের মৃন্ময়ীর দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ডাকতে।

সুন্দর সাহেব এখনো জেগে আছে। যদি জেনে ফেলে তো—রক্ষা থাকবে না কারো, তাকে এবং মৃন্ময়ীকে কাউকেই ছেড়ে দেবে না সুন্দর সাহেব।

শিবনাথ পা টিপে টিপে পুনরায় ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। ঘুরে অন্ধকারে বাগানের দিকে গেল বাড়ির পশ্চাতে।

অন্ধকার বাগানটার এদিকে-ওদিকে গাছপালাগুলো মনে হয় যেন এক-একটা ভৌতিক স্তূপ, ঘাপটি দিয়ে বসে আছে বুঝি অন্ধকারে।

বাগানে নারিকেল গাছের সরু সরু পাতাগুলো হাওয়ায় অদ্ভুত সিপ সিপ শব্দ করছে। মাথার উপরে কালো আকাশের গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তারা। আর কিছু দেখা যায় না, একটা সীমাহীন শূন্যতা যেন চারিদিকে থমথম করছে।

শিবনাথের বুকের ভেতরটা কাঁপে।

ভয়ে আশংকায় না উত্তেজনায় কে জানে, কাঁপে শিবনাথের বুকের ভিতরটা। হঠাৎ ঝি-ঝি ডাকতে শুরু করল।

পায়ের নীচে শুকনো পাতা মচ্ মচ্ করে গুঁড়িয়ে যায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় শিবনাথ। মৃন্ময়ীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ঐ দরজা-পথেই সন্ধ্যারাত্রে আজ সে বের হয়ে এসেছিল মৃন্ময়ীর ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় সেই সুখস্পর্শের কথাটা।

সির সির করে ওঠে সারা দেহ।

বন্ধ-দরজার গায়ে মৃদু টোকা দিয়ে টুক্ টুক্ করে চাপা সতর্ককণ্ঠে ডাকে, মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী—

আশ্চর্য!

দু'বার টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'বার নাম ধরে ডাকতেই ভেতর থেকে চাপাকণ্ঠে সাড়া এলো, কে?

মৃন্ময়ী—

কে?

আমি—শিবনাথ। দরজাটা খোল মৃন্ময়ী—

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল।

ঘর অন্ধকার। আবছা ছায়ার মত অন্ধকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ী।

শিবনাথ—

শিবনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

কি হলো শিবনাথ?

চুপ—আস্তে কথা বল। সুন্দর সাহেব এখনো জেগে তার ঘরে।

কিন্তু এসময় এখানে এলে কেন শিবনাথ? সুন্দর সাহেব জানতে পারলে—

জানতে পারার আগেই এখান থেকে আমরা চলে যাবো।

চলে যাবো!

হ্যাঁ—তোমাকে না আজই সন্ধ্যায় আমি বলছিলাম এখানে আর একমুহূর্ত আমার থাকবার ইচ্ছা নেই, আমি এখুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

এখুনি!

হ্যাঁ।

এই রাত্রেই?

হ্যাঁ—এই রাত্রেই। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও তো চলো।

কিন্তু কাল যখন সকালে সুন্দর সাহেব জানতে পারবে আমরা দুজনে পালিয়ে গিয়েছি—

তা জানলেই বা—তা ছাড়া জানবে তো নিশ্চয়ই—কিন্তু আমরা যেখানে

যাচ্ছি সেখানে সুন্দরমের ক্ষমতা নেই আমাদের ছিনিয়ে আনে।

কিন্তু—

আর দেরি করবার সময় নেই মৃন্ময়ী। এসো—বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে শিবনাথ মৃন্ময়ীর একটা হাত চেপে ধরে।

কিন্তু শিবনাথ—

আঃ! এসো।

না। আমার ভয় করছে। এই রাত্রে—

ভয় কি! আমি তো আছি সঙ্গে।

মিথ্যা নয়। তবু ভয় করে মৃন্ময়ীর। বিচিত্র মানুষের মন, মুহূর্ত আগেও সে ভেবেছে এখান থেকে সে পালাবে। কোথায় পালাবে তা না জেনেই ভেবেছে পালাবে। অথচ পরমুহূর্তে সেই যাবার সুযোগ যখন সামনে—সবটাই মনে হচ্ছে যেন অনিশ্চয়তার একটা সংশয়। যেখানে এই মুহূর্তে পা বাড়াতে আর সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু মৃন্ময়ীকে ভাববারও সময় দেয় না শিবনাথ, তার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সোজা ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়।

তারপর একপ্রকার হাত ধরে মৃন্ময়ীকে টানতে টানতেই একসময় বাগান পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ে।

নির্জন রাস্তা—যতদুর দৃষ্টি চলে—জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। খাঁ-খাঁ করছে।

হন হন করে দুজনে সেই অন্ধকার রাত্রির মধ্যখানে বড়বাজারের দিকে এগিয়ে চলে।

কিন্তু দীর্ঘদিন হাঁটায় অনভ্যস্ত মৃন্ময়ী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পা দুটো ভারী হয়ে ওঠে—আর যেন চলতে চায় না।

শিবনাথ—

কি হলো!

পা দুটো ব্যথা করছে, আর চলতে পারছি না।

আর বেশিদূর নয়—চল—

একটু বসো।

বুঝতে পারে শিবনাথ সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হাঁটতে হাঁটতে মৃন্ময়ী। কিন্তু এখন রাস্তার মধ্যে কোথাও থামলে দেরি হয়ে যাবে।

বড়বাজার এখনো কিছুটা দূর।

না—এখন বসতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। চল—

আমি আর পারছি না শিবনাথ—একটু বসো।

অগত্যা শিবনাথকে অন্ধকার একটা বটগাছের তলায় পথের ধারেই বসতে হয়। কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতেই আবার তাড়া দিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

অবশেষে ওরা যখন ধনী-ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র মল্লিকের বিশাল চৌহদ্দি-জোড়া চারমহলা বাড়ির দেউড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

দেউড়ি বন্ধ।

থমকে দাঁড়ায় শিবনাথ। সেও তখন দ্রুত অনেকটা পথ একনাগাড়ে হেঁটে এসে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। কিন্তু দেউড়ি বন্ধ। কি করবে। কেমন করে এখন দেউড়ি খোলাবে শিবনাথ। প্রবেশ করবে কেমন করে এখন মৃন্ময়ীকে নিয়ে ঐ প্রাসাদে।

হঠাৎ ঐ সময় ঘোড়ার ক্ষুরের খটা-খট আওয়াজ দূর থেকে ভেসে এলো শিবনাথের কানে এবং শিবনাথ পিছন ফিরে দেখলো ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট একজোড়া ঘোড়া জোর কদমে ছুটে আসছে দেউড়ির দিকে। অশ্বক্ষুরের শব্দ ও সতর্ক ঘণ্টাধ্বনি ঢং-ঢং করে রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি মৃন্ময়ীর হাতটা চেপে ধরে পাশে সরে দাঁড়ায়, ঝক্‌ঝকে যুগল অশ্ববাহিত একটা পাল্কিগাড়ি দেউড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ দেখতে পেল কে একজন একটা বাতি হাতে এসে দেউড়ি খুলে দিচ্ছে।

দেউড়ি খোলা হলো, দ্বাররক্ষী হাতের বাতিটা উঁচু করে তুলে ধরল—পাল্কি-গাড়ি ধীরে ধীরে দেউড়ি-পথে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যায়। আর সেই আলোয় দেউড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে শিবনাথের চোখে পড়ল পাল্কিগাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট সুরেন্দ্র মল্লিক মহাশয়। মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে। গলায় গোড়ের মালা। তীব্র একটা আতরের গন্ধ সারা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

পাল্কিগাড়ি ভিতরে চলে যাবার পর দ্বাররক্ষী দেউড়ির পাল্লা বন্ধ করতে যাচ্ছে, এমন সময় শিবনাথ মৃন্ময়ীর হাত ধরে সামনে এসে দাঁড়াল।

কৌন্ হো!

আমি শিবনাথ—আমি তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

হাতের বাতিটা উঁচু করে আবার তুলে ধরে দ্বাররক্ষী, মৃন্ময়ীর চোখে আলো পড়তেই সে চোখের পাতা বুজিয়ে ফেলে।

মনে কেমন সন্দেহ জাগে দ্বাররক্ষীর, তবু সে বলে, আভি তো দাদাবাবু নিদ্ যাতা হ্যায়।

ও তো হাম জানতা হ্যায়—তুম যাকে বলো শিবনাথবাবু আয়া হ্যায়। বহুৎ জরুরী। একদফা নীচু মে বোলাতা হ্যায়।

লোকটা কি ভাবল কে জানে। চলে গেল ভেতরে।

দুজনে দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। নরেন্দ্র কিন্তু এলো না।

একটু পরে লোকটা ফিরে এসে বললে, চলিয়ে—মাঈজী অন্দর মে বোলাতা হ্যায়।

মাঈজী—অর্থাৎ নরেনের মা—দুর্গা দেবী।

চল মৃন্ময়ী, ভালই হলো—ভেবেছিলাম নরেনকে দিয়েই মাকে সব কথা বলাবো। তা তিনিই যখন ডেকে পাঠিয়েছেন—

মৃন্ময়ী শিবনাথের কথার কোন জবাব দেয় না। সে তখন পথশ্রমে এত ক্লান্ত যে, কোথাও বসে একটু বিশ্রাম করতে পারলে যেন বেঁচে যায়!

শিবনাথ অন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। মৃন্ময়ী তাকে অনুসরণ করে ক্লান্ত শিথিলপদে।

অন্দরমহলে প্রবেশ করবার আগেই বহির্মহল। লম্বা একটা টানা বারান্দা অতিক্রম করে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়। সেরেস্তাঘরের পাশেই যে ঘরটা, সেই ঘরটার মধ্যে একটা কৌচের উপরে গা এলিয়ে দিয়ে তামুক সেবন করছিলেন আলবোলায় সুরেন্দ্র মল্লিক।

বাঈজীর আসর থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এখনো তিনি অন্দরে প্রবেশ করেন নি। সামনের দরজাটা খোলাই ছিল—সেই দরজা-পথেই বারান্দা অতিক্রম করবার সময় শিবনাথ ও মৃন্ময়ীর প্রতি নজর পড়ল সুরেন্দ্র মল্লিকের। হাঁক দিলেন, কে যায়?

ভরাট গুরুগম্ভীর গলার সে ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিবনাথ। আর মৃন্ময়ীও তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আবার প্রশ্ন করলেন সুরেন্দ্র মল্লিক, কে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে!

শিবনাথ বা মৃন্ময়ীর দিক থেকে কোন সাড়া আসে না তবু। তারা যেন বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভোলা!

ভৃত্যের নাম ধরে হাঁক দিলেন সুরেন্দ্রনাথ, দেখ তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে কারা?

ভোলা বাইরেই বোধহয় কোথাও ছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় শিবনাথের সামনে, কে তোমরা! কর্তা শুধোচ্ছেন, সাড়া দিচ্ছ না কেন?

সুরেন্দ্র মল্লিক ততক্ষণে আলবোলার নলটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অত্যধিক নেশায় একটু একটু টলছেন।

ঘর থেকে বের হয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালেন, কে ?

ওরা তবু জবাব দেয় না এবং অন্ধকারে ওদের স্পষ্ট করে দেখতেও পান না সুরেন্দ্রনাথ। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন ভৃত্য ভোলার দিকে তাকিয়ে, হারামজাদা—এখানে বাতি জ্বালাস নি কেন ? বাতিটা জ্বালা।

ভোলা তাড়াতাড়ি বারান্দার দেওয়ালে বসানো বাতিটা জ্বেলে দেয়। মৃদু আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে বারান্দাটা এবং সেই আলোতেই নেশায় রক্তিম দু' চোখ তুলে প্রথমেই সুরেন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকান।

মৃন্ময়ীর রূপ যেন তাঁর নেশা ছুটিয়ে দেয় মুহূর্তে।

কে! কে তুমি ?

আজ্ঞে আমি—আমি, এতক্ষণে কোনমতে কথা বলে শিবনাথ, নরেন্দ্রর সহাধ্যায়ী আমি।

কি বললে ?

সহাধ্যায়ী—

এ কে ?

মৃন্ময়ী।

শিবনাথের কথাটা শেষ হলো না, বারান্দার অপরপ্রান্তে ঠিক অন্দরমহলে প্রবেশের মুখ থেকে সহসা এক নারীকণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ভোলা ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দে।

শুধু একটা কথা নয়—যেন একটা আদেশ। বলা নয়—যেন ঘোষণা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ দু' পা পিছিয়ে এলেন।

দুর্গা দেবীর কণ্ঠস্বর এবং তাঁরই নির্দেশ।

ভোলা এগিয়ে আসে নিশ্চিন্তে এবারে—চলেন—ভেতরে চলেন গো।

শিবনাথ ও মৃন্ময়ী ভোলাকে অনুসরণ করে অন্দরের দিকে অগ্রসর হয় অতঃপর।

ঠিক অন্দরের প্রবেশমুখেই অলিন্দের সাদনে দাঁড়িয়েছিলেন দুর্গা দেবী। অলিন্দের আলো দুর্গা দেবীর চোখে-মুখে এসে পড়েছে।

পরিধানে সেদিনকার মতই লাল চওড়াপাড় গরদের শাড়ি। তেমনি বক্ষের উপরে লম্বিত কেশরাশি।

শিবনাথ—

দুর্গা দেবীর শিবনাথকে চিনতে কষ্ট হয় না।

শিবনাথ এগিয়ে এসে দুর্গা দেবীর পদধূলি নেয়—মৃন্ময়ীও এসে পদধূলি নেয়।

থাক্—থাক্—বেঁচে থাক—দীর্ঘজীবী হও। এত রাত্রে কি খবর—কিন্তু এটিকে তো চিনলাম না শিবনাথ—

ও মৃন্ময়ী, মা—

মৃন্ময়ী?

হ্যাঁ—আপনার পায়ের তলায় একটু আশ্রয়—

কিন্তু মেয়েটি কে শিবনাথ। তোমার কেউ হয়?

না—আমার মানে—কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না শিবনাথ। থেমে যায়।

॥ ২ ॥

দুর্গা দেবীর প্রশ্নের কি জবাব দেবে শিবনাথ বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে না কি পরিচয় সে দেবে মৃন্ময়ীর দুর্গা দেবীর কাছে।

মৃন্ময়ীও স্তব্ধ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

অলিন্দের আলো মৃন্ময়ীর চোখে-মুখে পড়েছে। দুর্গা দেবী দেখেন অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী মেয়েটি।

বয়সে কৈশোর বুঝি সবে উত্তীর্ণ হয়ে যৌবন ছুঁই-ছুঁই করছে।

ঘটনার আকস্মিক পরিস্থিতিটা শিবনাথ ততক্ষণে কতকটা সামলে নিয়েছে। বলে, ওর সব কথা আপনাকে আমি বলবো মা। ওকে আপনাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে।

কিন্তু আশ্রয়ের কথা নয়, দুর্গা দেবী তখন সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছেন। অনিন্দ্যসুন্দরী মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছেন বুঝি।

স্বামীর নজরে পড়েছে মেয়েটি।

স্বামীকে তিনি খুব ভালভাবেই চেনেন। নারী সম্পর্কে তাঁর মনোবৃত্তিটা একটু যেন বেশি রকমই উদার এবং সে দুঃখ ও লজ্জার ব্যাপারটা—আর যার কাছেই হোক পুত্রের বন্ধুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে বা পড়বার যেখানে ক্ষীণতম সম্ভাবনাও আছে, সেখানে ঐ মেয়েটিকে এ বাড়িতে তিনি আশ্রয় দেবেন কোন্ দুঃসাহসে, সেই কথাটা মনে হওয়াতেই বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মুখের ওপরে ওদের সে কথাটা বলতেও যেন পারেন না।

তা ছাড়া মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় যেন মনটা কেমন হয়ে পড়ে।

বললেন, এসো—আমার সঙ্গে এসো—মা—

অন্দরমহলে ওদের নিজের ঘরে নিয়ে এলেন দুর্গা দেবী। তারপর ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানে বসো তোমরা—ঠাকুরঘরটা গুছিয়েই আমি আসছি—

ওদের ঘরে বসিয়ে দুর্গা দেবী ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

স্বামীর সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থাকলেও ইদানীং ঐ ঠাকুরঘরটিই যেন ছিল তাঁর সত্যিকারের সান্ত্বনা ও শান্তির জায়গা—গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নেবার পর থেকে।

দিনমানে সংসারের নানা কাজের ভিড়ে পারেন না, কিন্তু রাত্রে সংসারের সব কাজ মিটে যাবার পর গিয়ে প্রবেশ করেন ঠাকুরঘরে।

অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে কেটে যায় এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরঘরেই রাত হয়তো শেষ হয়ে যায়। গৃহদেবতা কালো কষ্টিপাথরের বালগোপাল—হামাগুড়ি দিয়ে হাত পেতেছেন নাড়ুর জন্য।

মন্ত্র নয় পূজা নয় শুধু গোপালের হাসি হাসি মুখখানির দিকে চেয়ে বসে থাকলেও বুঝি মনটা ভরে যায়। সংসারের চিন্তা দুঃখ ভাবনা জ্বালা সব যেন মন থেকে মুছে যায়, ধূপের গন্ধের মতই যেন মনটা স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে—ভরে ওঠে কানায় কানায় আপনা থেকে। গোপালের সামনে চুপটি করে বসে থাকতেও বুঝি ভাল লাগে।

সেদিনও রাত্রে চুপটি করে বসেছিলেন গোপালের সামনে, বাইরে ঐ সময় মোক্ষদা দাসীর গলা শোনা গেল।

মোক্ষদা বলছে, কেন এত রাত্রে দাদাবাবুকে দিয়ে কি হবে।

ভৃত্য ভোলা বলে, দাদাবাবুর কে এক বন্ধু আর একটি মেয়ে নিয়ে এসেছে, দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে দেখা করবে বলে।

বন্ধু আর একটি মেয়ে— এই এত রাত্রে দেখা করার সময় না কি—বলে দে গে—দাদাবাবু ঘুমোচ্ছে, এখন দেখা হবে না। যত সব অনাসৃষ্টির কথা—রাত দুপুরে এসেছে দেখা করতে।

ইতিমধ্যে ওদের সমস্ত কথাবার্তাই দুর্গা দেবীর কানে এসেছিল। দুর্গা দেবী আসন ত্যাগ করে উঠে পড়েন।

দাদাবাবুর বন্ধু ও একটি মেয়ে কথাটা তার কানে গিয়েছে। বাইরে এসে

দাঁড়ান।

ভৃত্য ভোলা ফিরে যাচ্ছিল, তাকে ডাকেন, ভোলা!

মা?

ভোলা ঘুরে দাঁড়াল।

কে এসেছে দাদাবাবুর কাছে বলছিলি মোক্ষদাকে?

মোক্ষদা কি বলবার চেষ্টা করে কিন্তু দুর্গা দেবী তাকে থামিয়ে দিয়ে পুনরায় ভোলাকে শুধান, কে এসেছে?

দাদাবাবুর একজন বন্ধু আর তার সঙ্গে একটি মেয়ে—দ্বাররক্ষী বলছিল—

চল তো দেখি কে!

ভোলা বহির্মহলের দিকে এগিয়ে যায়, দুর্গা দেবী তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হন।

ভুলে যান ঐ মুহূর্তে তিনি যে অন্তপুরের বাইরে অত রাত্রে গৃহস্থবধূর পা বাড়ান এ বাড়িতে রীতি নয় এবং কথাটা যেন তাঁর মনে পড়ে অন্দরমহল ও বহির্মহলের মধ্যবর্তী দ্বারপথ বরাবর পৌঁছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে দাঁড়ান আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর কানে আসে স্বামীর ঈষৎ জড়িত কণ্ঠস্বর, এ কে?

স্বামী তা হলে ফিরে এসেছেন। ঠিক কি করবেন বুঝতে পারেন না দুর্গা দেবী। মুহূর্তের জন্য বোধ করি ইতস্তত করেন, তারপরই শান্ত-কণ্ঠে ভোলাকে নির্দেশ করেন, ভোলা ওদের ভিতরে পাঠিয়ে দে।

ওদের ঘরে বসিয়ে রেখে এসে ঠাকুরঘরের কাজ কোনমতে সারতে সারতেই দুর্গা দেবী ভাবছিলেন অতঃপর ঐ মেয়েটির কি ব্যবস্থা করবেন।

আশ্রয়ের জন্য মেয়েটি এসেছে তাঁর কাছে এবং নিঃসন্দেহে বিপদে পড়েছে নচেৎ এত রাত্রে এমন করে ছুটে আসত না এখানে।

মেয়েটির মুখের করুণ অসহায় দৃষ্টি যেন দুর্গা দেবীর চোখের উপর ভাসতে থাকে। কোনমতে কাজ সেরে আবার ফিরে এলেন দুর্গা দেবী, যে ঘরের মধ্যে মৃন্ময়ী আর শিবনাথকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন ক্ষণপূর্বে সেই ঘরে।

দেখলেন ক্লান্ত অবসন্ন মৃন্ময়ী মেঝেতে আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে আর তার শিয়রের কাছে অল্পদূরে বসে আছে শিবনাথ, স্থির পাথরের মূর্তির মত।

মৃন্ময়ীকে ঘুমোতে দেখে বললেন, আহা, ঘুমিয়ে পড়েছে!

হ্যাঁ, মা—এতখানি পথ হাঁটা তো ওর অভ্যাস নেই। তার ওপর

অনেকদিন ঘরের মধ্যে বন্দিনী ছিল।

বন্দিনী ছিল। সে কি?

হ্যাঁ—সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

দুর্গা দেবী সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন শিবনাথের মুখের দিকে।

শিবনাথ বলে, হ্যাঁ, মা, এক পর্তুগীজ দস্যু ওকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে ওর মা-বাবার কাছ থেকে।

কি বলছো তুমি শিবনাথ। বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না দুর্গা দেবীর।

শিবনাথ সংক্ষেপে মৃন্ময়ীর ইতিহাস বলে যায়।

স্তব্ধ হয়ে শোনেন সে ইতিহাস দুর্গা দেবী।

শিবনাথ বলতে থাকে, আজ সেই দস্যুই নিজের আওতার মধ্যে পেয়ে ওকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়েছে।

কিন্তু লোকটা কে? সেখানে তুমি গেলে কি করে? ওর সঙ্গে পরিচয় হলোই বা কি করে তোমার?

আমিও যে সেই দস্যুর কাছেই ছিলাম এতদিন মা।

কি বলছো?

হ্যাঁ—দস্যু হলেও মানুষটা এমন উদারচেতা যে কখনো কল্পনাতে ভাবতেও পারি নি তার ভেতরে এমন একটা জঘন্য অত্যাচারী লোভী দস্যু লুকিয়ে আছে। মৃন্ময়ীর সব কথা না শুনলে সুন্দর সাহেবের সত্যিকারের পরিচয়টা হয়তো কোনদিনই পেতাম না। তাই পরিচয়টা পাওয়ার পর আর সেখানে থাকতে সাহস হলো না। ভাবছি কোথায় যাবো, কে আশ্রয় দেবে—হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়লো মা। মনে হলো পৃথিবীতে আর কোথায়ও ওর জন্য একটু আশ্রয় পাই বা না পাই আপনার কাছে পাবোই। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম ওর হাত ধরে।

বেশ করেছো।

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন দুর্গা দেবী।

আমি জানতাম মা, ভুল আমি করি নি। আমি এখন নিশ্চিন্ত—ওকে আপনার পায়ের তলায় পৌছে দিলাম।

দুর্গা দেবী যেন একটু অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছিলেন।

শিবনাথ বলে, আমি তা হলে এখনই যাই মা?

তুমি যাবে?

হ্যাঁ—

রাত শেষ হয়ে এলো। তা ছাড়া এখন তুমি যাবেই বা কোথায়? যেখানে এতদিন ছিলে সেখানে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে না?

না।

তবে?

আমার এক বন্ধু—জীবনকৃষ্ণ বৌবাজার অঞ্চলে থাকে—তার বাবা ককরেল ট্রেড এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান, তার ওখানে হয়তো কিছুদিনের মত আশ্রয় পেতে পারি। তারপর স্থবিধামত একটা ব্যবস্থা করে নেব।

সে কাল যা করার করো। আপাততঃ বাকি রাতটুকু খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নাও। খাজাঞ্চি বুড়ো মহেশবাবু আছেন, বলে ডাকলেন, ভোলা!

ভোলা আশেপাশেই ছিল, কর্ত্রীর ডাকে এগিয়ে এলো, মা ডাকছিলেন?

হ্যাঁ শোন্, ওকে বাইরের মহলে খাজাঞ্চিবাবুর ঘরে নিয়ে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে দে।

চলেন বাবু।

শিবনাথ আর দ্বিরুক্তি করে না। ভোলার পিছু পিছু ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সত্যিই সে তখন অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছে। একটু ঘুমোবার প্রয়োজন।

শিবনাথ চলে গেলে আবার তাকালেন দুর্গা দেবী মেঝেতে শায়িতা ও নিদ্রিতা মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

মৃন্ময়ী তখনো ঘুমোচ্ছে।

কমলকলির মত মুখখানি যেন। ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় ও দুর্ভাবনায় যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে।

স্থান দিতে হবে মেয়েটিকে। স্থান নয়, রক্ষা করতে হবে। কিন্তু নিজের গৃহে তা সম্ভব নয়।

সহসা মনে পড়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনাদিনাথ বসুর কথা।

ঠিক। দাদার কাছেই কাল পাঠিয়ে দেবেন ওকে দুর্গা দেবী। দাদার আশ্রয়েই ও নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

অনাদিনাথ ধনী ব্যক্তি—নিমকমহলের দেওয়ানী করে কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেছেন।

তা ছাড়া শোভাবাজারের রাজবংশোদ্ভূত গোপীমোহন দেবের পুত্র বর্তমান

রাজা রাধাকান্ত দেবের বিশেষ স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র অনাদিনাথ। সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব দুই-ই আছে অনাদিনাথের।

অনাদিনাথ কলকাতার সমাজের অন্যতম প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এবং দুর্গা দেবী জ্যেষ্ঠের মুখেই শুনেছিলেন কলকাতার সমাজ প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন চালিয়েছে বর্তমানে।

রাজা রামমোহন রায়ের দল ও রাজা রাধাকান্ত দেবের দল। মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়েছে দুই দলের মধ্যে তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে। যেমন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ এবং ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন।

রাজা রামমোহন রায়ের দলের ঐ তিনটিই লক্ষ্য এবং ঐ তিনটি ব্যাপার নিয়েই আন্দোলন চালিয়েছেন আর অন্য দল রাধাকান্ত দেবের দল—তাঁদের মতে ঐ তিনটিই বর্জনীয়। অন্যথায় নাকি সনাতন হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী অদূর ভবিষ্যতে। তাই তিনি হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে অগ্রণী হয়েছেন। সমাজের এই দুর্দিনে শক্তমুঠিতে হাল ধরেছেন।

আর সেই রাধাকান্ত দেবের দলেরই অন্যতম পাণ্ডা আজ অনাদিনাথ। অনাদিনাথ শোভাবাজারেই বসবাস করেন।

দুর্গা দেবী স্থির করেন প্রত্যূষেই জ্যেষ্ঠের কাছে সংবাদ পাঠাবেন।

কিন্তু মেয়েটা যে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকালেন—অকাতরে ঘুমোচ্ছে মৃন্ময়ী।

গায়ে ঠেলা দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ী—ওঠ মা!

দু'তিনবার ডাকতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে মৃন্ময়ী।

চল্, ঘরে শুবি চল্।

দুর্গা দেবীর কথায় আর দ্বিরুক্তি না করে মৃন্ময়ী উঠে ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করে।

শিবনাথ ভৃত্যের সঙ্গে এসে খাজাঞ্চিঘরে প্রবেশ করল। ঘরজোড়া তক্তপোশ পাতা—তার উপরে ফরাশ বিছান। এককোণে দুটো সুবৃহৎ কাঠের আলমারি। তার পাশে লোহার সিন্দুক—তেল-সিন্দূরে চিত্র-বিচিত্র।

বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মহেশ সামন্ত একধারে ফরাশের উপর শুয়ে প্রচণ্ড নাসিকাধ্বনি করে চলেছেন।

ভোলা শিবনাথকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই বলে যায়, শুয়ে পড়ুন গো একধারে, শুধু যাবার সময় সাবধান করে যায়, বুড়োকে জাগাবেন না—একপাশে শুয়ে

থাকেন চুপচাপ।

ঘরের কোণে একটি প্রদীপ মিটি-মিটি জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরের মধ্যে একটা মৃদু আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে।

শিবনাথ ফরাশের উপর শুয়ে পড়ল।

ঐ রাত্রে অতটা পথ হেঁটে এসে সে নিজেও কম ক্লান্ত হয় নি। পা দুটো যেন ভেঙে আসছিল। কিন্তু শয্যাগ্রহণ করেও চোখে নিদ্রা আসে না।

নানা ভাবনা মাথার মধ্যে একটার পর একটা এসে ভিড় করে। কাজটা কি ভাল হলো। নিজে এসেছিল এসেছিল—কিন্তু সেই সঙ্গে মৃন্ময়ীকেও নিয়ে আসাটা কি ভাল হয়েছে সঙ্গে করে।

প্রত্যুষে উঠে সুন্দর সাহেব যখন জানতে পারবে মৃন্ময়ী আর সে দুজনাই রাত্রে পলাতক হয়েছে—সহজে সে কি নিরস্ত হবে।

নিশ্চয়ই সে অনুসন্ধান করবে তাদের এবং তার পক্ষে খুঁজে বের করতে হয়তো তেমন কঠিন হবে না। আর একবার খুঁজে বের করতে পারলে সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে না সুন্দর সাহেব।

হাজার হোক পর্তুগীজ জলদস্যু। দয়া-মায়া-মমতা বলে কোন কিছু কি ওদের হৃদয়ে আছে নাকি। না—কাজটা ভাল হয় নি।

সে নিজে চলে এসেছিল এসেছিল—মৃন্ময়ীকে সঙ্গে করে আনতে গেল কেন! তার নিজেরই এই দুনিয়ায় মাথা গোঁজবার কোন ঠাঁই নেই—পরাশ্রিত—সঙ্গে সে নিয়ে এলো আর একজনকে। কিন্তু কি করবে শিবনাথ। মন যে তার চাইল না।

মৃন্ময়ীকে সুন্দর সাহেবের কবল থেকে উদ্ধার করার এক বীরত্ব মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অতঃপর—অতঃপর কি!

নিয়ে তো এলো উত্তেজনার মাথায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মৃন্ময়ীকে সঙ্গে করে—দুর্গা দেবী যদি শেষ পর্যন্ত এখানে ঠাঁই না দেন মৃন্ময়ীকে, কোথায় যাবে সে মৃন্ময়ীকে নিয়ে।

কেউ এখানে তার আর পরিচিত নেই।

তা ছাড়া পরিচিত হলেই কি দুম্ করে কেউ কাউকে গৃহে স্থান দেয়। সুন্দর সাহেবের গৃহে স্থান পাওয়ার পূর্বে কিভাবে তার দিন কেটেছে মনে কি নেই তার।

আবার সুন্দর সাহেবের কথা মনে পড়ে শিবনাথের। সাদরে একদিন তার

গৃহে সে তাকে স্থান দিয়েছিল। শুধু স্থান নয়, তার বিদ্যালয়ে শিক্ষারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

আর সে কি না সেই লোকটার সঙ্গেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এলো। বিশ্বাসঘাতকতা বৈ কি—ব্যাপারটাকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি বলা চলে।

শুয়ে থাকতে আর পারে না শিবনাথ, অন্ধকারেই শয্যার ওপর উঠে বসে। অদূরে শয্যায় শায়িত ও নিদ্রিত মহেশবাবুর মুখখানা সে অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর নাসিকাধ্বনি অন্ধকারে সমানে কানে প্রবেশ করছে।

কি করবে এখন শিবনাথ। কি তার কর্তব্য।

সামান্য বাকি রাতটুকু পোহালেই তো যা করবার তাকে করতে হবে। সে ভাবে না তার যা হবার হোক, কিন্তু মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ীকে দুর্গা দেবী যদি আশ্রয় না দেন।

পা জড়িয়ে ধরবে শিবনাথ দু'হাতে দুর্গা দেবীর—মা মেয়েটা সত্যিই দুর্ভাগিনী, ওকে আপনি পায়ে ঠেলবেন না। দয়া করুন মা—

নিজের শয়নঘরেই মৃন্ময়ীকে নিয়ে এসেছিলেন দুর্গা দেবী।

একটা ধোয়া শাড়ি এনে বললেন, শাড়িটা বদলে নে মা—ও রাস্তার শাড়িটা ছেড়ে ফেল।

ঘরের এককোণে দীপাধারে দীপ জ্বলছিল।

তারই মৃদু স্বল্পালোকে কেমন যেন ঘুম-ঘুম চোখে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে মৃন্ময়ী।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসে ঘুম এখনো তার চোখের পাতা থেকে একেবারে মুছে যায় নি। দু'চোখের পাতায় তখনো যেন ঘুমের অঞ্জন লেগে রয়েছে—চোখের পাতা দুটো ভারী ভারী।

দুর্গা দেবীর নির্দেশে মৃন্ময়ী পরিধেয় শাড়িটা ছেড়ে তাঁর দেওয়া শাড়িটা পরে নিল। হাত-মুখও পাশের বারান্দায় রাখা জলপাত্রে ধুয়ে এলো।

তথাপি দুর্গা দেবী খানিকটা গঙ্গাজল মৃন্ময়ীর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলেন। এবার এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হলেন, সহজ হলেন দুর্গা দেবী।

চোখে-মুখে জল দিয়ে হাত-পা ধুয়ে তাঁর দেওয়া শাড়িটা পরে যখন এসে মৃন্ময়ী দুর্গা দেবীর সামনে দাঁড়াল—প্রদীপের আলোয় মৃন্ময়ীর সদ্য জলে-ভেজা মুখখানির দিকে তাকিয়ে দুর্গা দেবীর যেন চোখের পলক পড়ে না। রাতের শিশিরে-ভেজা যেন একটি পদ্মকলি।

তোর নাম যেন কি বলছিল শিবনাথ ?

মৃন্ময়ী—মৃদু শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় মৃন্ময়ী।

ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবি ?

না—

বাইরে ভোলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মা—

কি রে ভোলা ?

কর্তাবাবু আসছেন।

কোথায় ?

এই ঘরে।

॥ ৩ ॥

ভোলা দোর-গোড়া থেকে কথাটা বাড়ির গিন্নীমার কর্ণগোচর করে কোনমতে যেন চলে গেল।

সত্যিই সে আর তখন দাঁড়াতে পারছিল না। বেচারার দু'চোখের পাতা যেন ঘুমে বুজে আসছিল—কোনমতেই যেন আর চোখের পাতা দুটো খুলে রাখতে পারছিল না।

সারাটা দিনের পরিশ্রমের পর এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকা তাও সে এক আধ দিন নয় প্রত্যহ, রাতের পর রাত—মানুষের শরীর তো, হলেই বা ভৃত্য—কত আর সয়।···

পেটের দায়ে না হয় পরের বাড়িতে চাকরিই করতে এসেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের শরীরের সহজাত বৃত্তিগুলোকে কিছু আর জয় করে ফেলে নি।···

ভোলা সোজা তার নির্দিষ্ট ভৃত্যমহলের দিকে চলে গেল। যেতে যেতে অবিশ্যি সে ভাবছিল ঐ সুন্দরী মেয়েটির কথাই।

মেয়েটা কে, কোথা থেকে এসময় মাঝরাত্রে এখানে এলো, কি বৃত্তান্ত কিছুই যদিও জানা নেই তবু এটা সে বুঝতে পেরেছিল কর্তাবাবুর হঠাৎ ঐ সময় গিন্নীমার মহলে যাওয়ার কারণটা।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাই বুঝি ভোলা আপন মনেই মৃদু হাসে।

ওদিকে ভোলা স্বামীর আগমন বার্তাটা জানিয়ে চলে গেল আর দুর্গা দেবী সংবাদ পেয়ে ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বিমূঢ় হয়ে গেলেন যেন।

স্বামী তার ঘরেই আসছেন ভোলা জানিয়ে দিয়ে গেল। এবং স্বামীর এত রাত্রে তার ঘরে আসাটা অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর হলেও তার আগমনের হেতুটা

অস্পষ্ট না থাকায় অকস্মাৎ যেন তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

কি করবেন, কি করা কর্তব্য ঐ মুহূর্তে ঠিক সেটা যেন ভেবে উঠতে—বুঝে উঠতে পারেন না।

কিন্তু চিন্তারও তো আর সময় নেই।

এখুনি হয়তো স্বামী এঘরে এসে পড়বেন এবং তখন আর সত্যি সত্যিই সময় থাকবে না। মৃদু একটা শব্দে দরজার দিক থেকে ঘরের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ালেন দুর্গা দেবী আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান মৃন্ময়ীর ওপরে গিয়ে নজরটা তাঁর পড়লো।

ঐ মুহূর্তে যেন নতুন করেই আবার দুর্গা দেবী মৃন্ময়ীকে ঘরের মধ্যে আবিষ্কার করলেন, তাঁর সামনে মৃন্ময়ীর উপস্থিতিটা উপলব্ধি করলেন।

দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী। তাঁরই দেওয়া শাড়িটা পরে একেবারে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী।

সদ্য সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে মুখে জলকণাগুলো শুকিয়ে যায় নি সব—ঘরের প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় চিক্ চিক্ করে যেন ছোট ছোট মুক্তার মত জ্বলছে—টল টল করছে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সব কিছু ভুলে যেন ঐ মুহূর্তে চেয়ে থাকেন দুর্গা দেবী মেয়েটার মুখের দিকে।

আরতির সময় আলো পড়লে দেবী প্রতিমার মুখখানি যেমন চক্ চক্ করে তেমনি যেন সেই জলবিন্দুগুলোতে মুখখানি চক্ চক্ করছে।

শুধু সুন্দর নয় মেয়েটা—সত্যিই যেন অপূর্ব।

অঙ্গে অঙ্গে যেন রূপের লাবণ্য ঢেউ খেলে যাচ্ছে। রূপের যেন অবধি নেই!

সদ্য বিকশিত অনাঘ্রাতা কুসুমটি যেন। প্রথম ভোরের শিশিরবিন্দু তার ওপরে পড়ে যেন চিক্ চিক্ করছে নির্মল শুচিশুদ্ধ।

কয়েকটা মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন দুর্গা দেবী।

সত্যিই চোখ যেন ফেরাতে পারেন না। এবং সেই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সত্যটা যেন আর অপ্রকট থাকে না।

তাঁর স্বামীর চোখে, সে দুটি চোখ এখন নেশায় রক্তিম হলেও, ঐ রূপ যখন একবার পড়েছে তখন মৃন্ময়ীর আর একটি মুহূর্তও এ গৃহে থাকা চলতে পারে না।

এখন থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সে যেমন করেই হোক—যে ভাবেই হোক মৃন্ময়ীর এ গৃহ থেকে চলে যাওয়াই মঙ্গল।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে।

এই মুহূর্তে এই রাত্রে কোথায় স্বামীর দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যাবেন দুর্গা দেবী মৃন্ময়ীকে।

সম্ভব অসম্ভব কোন রাস্তাই যেন সামনে দেখতে পান না দুর্গা দেবী ঐ মুহূর্তে, তাছাড়া এ কথাও তো মিথ্যা নয়, স্বামীকে তিনি খুব ভাল করেই চেনেন—দৃষ্টির বাইরে ওকে নিয়ে গেলেও ওকে কি তিনি স্বামীর মনের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন।

তবে—

কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এও মনে হয় দুর্গা দেবীর, সম্ভব না হলেও মৃন্ময়ীকে আপাততঃ তো এ গৃহ থেকে কোথায়ও না কোথায়ও তার স্বামীর এ ঘরে আসার পূর্বেই সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু কোথায়। কোথায় সরাবেন তিনি মৃন্ময়ীকে।

হঠাৎ যেন ঐ মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মতই একটা কথা মনে পড়ে যায় দুর্গা দেবীর, রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো।

গঙ্গাস্নানের অছিলায় মৃন্ময়ীকে সঙ্গে নিয়ে এই মুহূর্তে পাল্কিতে চেপে তো অনায়াসেই গৃহ হতে বের হয়ে পড়তে পারেন তিনি।

একবার বের হয়ে পড়তে পারলে কি যা হোক কিছু একটা উপায় আপাততঃ তিনি ভেবে বের করতে পারবেন না।

কেন এক কাজ করলে তো হয়—সঙ্গে সঙ্গে কথাটা যেন মনে পড়ে।

কেন—একটু আগেই তো ভাবছিলেন মৃন্ময়ীকে নিয়ে গিয়ে জ্যেষ্ঠ অনাদিনাথের আশ্রয়ে দেবেন—কিন্তু—মনে হয় এখন আবার কথাটা—মানুষটা যা ধর্মোন্মাদ—যদি মৃন্ময়ীর পরিচয় পেয়ে তাকে গৃহে স্থান দিতে অস্বীকার করে, তখন—তখন না হয় বলবেন, বেশ চিরদিনের জন্য না দাও আপাততঃ কটা দিনের জন্য স্থান দাও মেয়েটাকে দাদা।

এমনিতে যতই গোঁড়া ও ধর্মোন্মাদ হোক না কেন লোকটা উদারচেতা স্নেহবৎসল—কতজনকেই তো আশ্রয় দিয়েছেন ও দেন—ভাল করে তাকে যদি—যদি অভাগিনী মেয়েটার সব দুঃখের কথা খুলে বলা যায় অনাদিনাথ হয়তো অ-রাজী হবেন না।

কিন্তু অত ভাববারও আর সময় নেই।

এতক্ষণে স্বামী হয়তো এসে গেলেন—বেরিয়ে তো পড়ুন মৃন্ময়ীকে নিয়ে—

অনাদিনাথের গৃহে যদি স্থান নাও হয় একটা উপায় কি অন্তত তিনি বাতলে

দিতে পারবেন না। খুব পারবেন।

না—আর দেরি নয়—মৃন্ময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আয় আমার সঙ্গে—

কোথায়? মৃন্ময়ী প্রশ্নটা করে ফ্যালফ্যাল করে দুর্গা দেবীর মুখের দিকে তাকায়।

আয় না—এগিয়ে গিয়ে মৃন্ময়ীর একটা হাত ধরলেন শক্ত করে দুর্গা দেবী, ঘরের কোণে ঝুলন্ত দড়ির উপর থেকে রেশমের গাত্রবস্ত্রটা টেনে নিয়ে সেই বস্ত্রটা দিয়ে মৃন্ময়ীকে আগা-গোড়া মুড়ে দিয়ে সোজা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন মৃন্ময়ীর হাত ধরে।

বাঁ পাশ থেকে সরু যে গলিমত যাতায়াতের পথটা বারান্দা থেকে, সেই পথে অগ্রসর হলেন দুর্গা দেবী।

ওদিকটায় আলো নেই। অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকার হলেও দুর্গা দেবীর কোন অসুবিধা হয় না চলতে—দীর্ঘদিনের যাতায়াতের পরিচয়ে সবই যেন মুখস্থ।

পথটা চলে গিয়েছে দাসীদের আস্তানার দিকে।

মোক্ষদা তখনো শুতে যায়নি। শুতে যাবো যাবো করছে। এমন সময় ঘরের বাইরে দুর্গা দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মোক্ষদা—

কে?

আমি মোক্ষদা, শোন—

মোক্ষদা তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসে, মা—

যা চট্ করে বাইরে গিয়ে গোপালকে বলে আয় অন্দরে পাল্কি নিয়ে আসতে। আমি গঙ্গা নাইতে যাবো।

কিন্তু এখনো তো রাত অনেকটা আছে—ভোর হতে এখনো দেরি মা।

জানি। তোকে যা বলছি তাই কর, যা চট্ করে গোপালকে গিয়ে বলে আয় অন্দরের আঙ্গিনায় পাল্কি নিয়ে আসতে।

মোক্ষদা আর দ্বিরুক্তি করে না। নিঃশব্দে বহির্মহলের দিকে এগিয়ে যায়। দুর্গা দেবী দাঁড়িয়ে থাকেন মৃন্ময়ীর হাত ধরে।

অস্থিরতায় যেন মৃদু মৃদু কাঁপতে থাকেন। এতক্ষণ হয়তো তাঁর স্বামী এসে ঢুকেছেন তাঁর ঘরে—তাঁকে ঘরে দেখতে না পেয়ে হয়তো ফিরেই যাবেন বহির্মহলে কারণ ভাববেন তিনি হয়তো আবার পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন।

উঃ, ভাগ্যে কথাটা মনে হয়েছিল।

কিন্তু আজ ফিরে গেলেও এত সহজে স্বামীকে দুর্গা দেবী বুঝ দিতে পারবেন

না, এত সহজে বুঝ মানবার মত মানুষ নন সুরেন্দ্র মল্লিক।

জবাবদিহি তাঁকে দিতেই হবে।

তা দিতে হয় তিনি দেবেন, তবু মেয়েটাকে বাঁচাবার চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে। অনেক আশা করে শিবনাথ তাঁর আশ্রয়ে এনেছে মেয়েটাকে। বেচারী জানে না এক সর্বনাশ থেকে আর এক সর্বনাশের মধ্যে এনে তুলেছে মৃন্ময়ীকে।

আর জানবেই বা কেমন করে, জানবার তো কথাও নয়—তারই সহপাঠীর পিতা—

মা—

মোক্ষদা ফিরে এলো। চিন্তাজাল দুর্গা দেবীর যেন সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায়।

কি রে খবর দিয়েছিস্! উৎকণ্ঠিতা দুর্গা দেবী প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ—পাল্কি আনছে গোপাল। দারোয়ানকে খবর দিতে হবে তো মা?

হ্যাঁ—নাথু সিংকে খবর দে—আয়—বলে দুর্গা দেবী মৃন্ময়ীর হাত ধরে সামনের দিকে পা বাড়ালেন, আর দাঁড়ালেন না।

মৃন্ময়ী কেমন যেন বিমূঢ়—অভিভূত।

সন্ধ্যার পর থেকে একটার পর একটা ঘটনাগুলো যেন তাকে বিমূঢ়—বিহ্বল করে দিয়েছে।

দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল—সেই কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তোলায় এখনো ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে মৃন্ময়ীর।

কিন্তু সে কথা বলতে সাহস পায় না মৃন্ময়ী। দুর্গা দেবীর সামনে উচ্চারণ করতে ভরসা পায় না। কেমন যেন ভয়-ভয় করে।

দুর্গা দেবীর সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে চলে তার হাতের টানে অন্ধের মত সামনের দিকে। সোজা এসে পড়লেন মৃন্ময়ীর হাত ধরে দুর্গা দেবী অন্দরের প্রশস্ত আঙ্গিনায়।

আঙ্গিনা অন্ধকার। আশেপাশে কোথায়ও মনুষ্যজন নেই একেবারে। খাঁ খাঁ করছে। আঙ্গিনার শেষপ্রান্তে একটি দরজা—সেই দরজা অতিক্রম করলেই বহির্চত্বর।

প্রশস্ত চত্বর, অন্দরের শেষ সীমানা।

চত্বরও অন্ধকার।

কিন্তু সেই অন্ধকারেও ঝাপসা ঝাপসা চোখে পড়ে দুর্গা দেবীর পাল্কিবাহকেরা একধারে এনে পাল্কি নামিয়ে রেখেছে ইতিমধ্যেই তাঁর নির্দেশে।

অন্ধকারে ঝাপসা ঝাপসা চারটে মানুষ দেখা যায়।

গোপাল—

দুর্গা দেবী মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন।

মা—

এক মনুষ্যমূর্তি এগিয়ে এলো।

নাথু সিং আসে নি?

এখুনি এসে পড়বে হয়তো—কিন্তু মা রাত তো এখনো বেশ আছে। এত তাড়াতাড়ি গঙ্গায় যাবেন?

না গোপাল—গঙ্গায় যাবো না।

তবে?

শোভাবাজার একবার যেতে হবে।

শোভাবাজার?

হ্যাঁ, দাদার ওখানে।

ইতিমধ্যে লাঠি হাতে দৈত্যের মত নাথু সিং এসে হাজির হয়।

গোপাল বলে, ঐ যে নাথু এসে গিয়েছে মা।

নাথু? দুর্গা দেবী ডাকেন।

মা—এগিয়ে এসে নাথু সিং সেলাম জানায় দুর্গা দেবীকে।

শোভাবাজার যাবো।

চলিয়ে।

প্রথমে নিজে ও পরে মৃন্ময়ীকে পাল্কিতে নিয়ে উঠে বসালেন দুর্গা দেবী। কাহাররা পাল্কি কাঁধে তুলে নিল।

দুর্গা দেবী পাল্কির ভিতর থেকে আদেশ দিলেন, সাড়া দিস্ না গোপাল, চুপ-চাপ বের হয়ে যা।

গোপাল দুর্গা দেবীর নির্দেশমত নিঃশব্দে পাল্কি নিয়ে বের হয়ে গেল। কারণ ঐ ধরনের নির্দেশে তারা অভ্যস্ত।

রাস্তায়ও অন্ধকার তখন।

জনমনিষ্যি নেই। ত্রিযামা রাত্রি উষার মুহূর্তটির দিকে এগিয়ে চলেছে—ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি যেন।

নিঃশব্দে কাহাররা পাল্কি বহে নিয়ে চলে। নাথু সিং সঙ্গে সঙ্গে যায়। তার পায়ের ভারী নাগরা জুতোর লোহার নাল নির্জন নিস্তব্ধ রাস্তায় খট্ খট্ শব্দ তোলে।

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ির কিছু দূরেই দেওয়ান অনাদি-নাথ বসুর গৃহ।

পায়ে হেঁটে যেতে দশ থেকে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

নিমকমহলের দেওয়ানী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছেন অনাদিনাথ বসু। শোভাবাজার অঞ্চলে রাজা রাধাকান্ত দেবের পর বসু মহাশয়কেই সকলে অন্যতম ধনী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলে জানে।

সকলে মান্য করে শ্রদ্ধা করে আর ভয়ও করে।...দশের মাথা—শহরের মাথা।

রাজা রাধাকান্ত দেবের দলের অন্যতম চাঁইও বসু মহাশয়, তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে। সত্যিই অনাদিনাথ বসু একজন সচ্চরিত্র ধার্মিক ব্যক্তি।

তদানীন্তন কলকাতার ধনী ও বাবু সমাজের ব্যক্তিদের বিশেষ করে যে-সব দোষগুলো প্রায় প্রত্যেকেরই চরিত্রে ছিল সে রকম কোন দোষ বসু মহাশয়ের চরিত্রে সত্যিই ছিল না।

ধর্মপ্রাণ—ধর্মভীরু এবং সত্যিকারের চরিত্রবান লোক অনাদিনাথ বসু।

ইদানীং সমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত—ইংরাজী ভাবাপন্ন কতকগুলো নাম-করা লোক রাজা রামমোহন রায়কে সামনে রেখে যে সব কেলেঙ্কারি শুরু করেছে তাতে করে সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন অনাদিনাথ।

মনে ব্যথা পেয়েছেন। দিনে দিনে হচ্ছে কি—সমাজ কোন্ পথে চলেছে—মানুষের মতিগতি কোন্ পথে চলেছে।...

যুগযুগান্তের হিন্দুধর্মটাও কি এরা বিসর্জন দিতে চায়—এতদিনকার হিন্দুধর্মকে পর্যন্ত নস্যাৎ করে দিতে চায়। মিথ্যা অর্থহীন কুসংস্কার বলে সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে চায়।

এরা দেবতা মানবে না—তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী—চিরটা কাল তাদের পূর্বপুরুষেরা ও তারা পূজা করে এসেছেন, সে-সব নাকি একেবারে মিথ্যা। অর্থহীন—ঈশ্বর নাকি এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্—এবং তাও তাঁর কোন রূপ নেই—নিরাকার ঈশ্বর। প্রতিমা-পূজা অর্থহীন—যত সব উদ্ভট—আজগুবী কথা।...প্রলাপোক্তি।

সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব চেষ্টার ক্রটি করে নি। মাদ্রাজ থেকে সুবিখ্যাত পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে আনিয়ে বেদক্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন প্রতিমা-পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা কিন্তু তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর রাজা রামমোহন রায় প্রমাণ করে দিলেন তাঁর মতই ঠিক—পরাভূত হলেন সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। তাতে করে যেন

আরও ওদের দলটা পেয়ে বসেছে।

রামমোহন রায় বদ্ধপরিকর—এতকালের প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজের আজ নাকি সংস্কার প্রয়োজন।…নতুন করে সব কিছু নতুন বিচারবুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গড়ার প্রয়োজন।

আর ঐ হয়েছে এক হিন্দু কলেজের ক্রেস্তান শিক্ষক—ভিভিয়ান ডিরোজিও। রাজ রাধাকান্ত দেব ও তাদের দলের লোকেরা ঐ বিধর্মীটাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। ও আরো বেশী করে ছাত্রদের মাথা খাচ্ছে। তবে হিন্দু কলেজের হিন্দু সভ্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওকে তাড়াবেই কলেজ থেকে।

তাড়াতে ডিরোজিওকে হবেই। নচেৎ কারো মঙ্গল নেই। না সমাজের, না দেশের, না হিন্দুধর্মের।

আজকের ছাত্ররাই যদি নাস্তিক ম্লেচ্ছ হয়ে যায় তো দেশকে দেশ উচ্ছন্নে যাবে। হিন্দুধর্ম বলতে আর কিছু থাকবে না। মদ খাবে—গরুর মাংস খাবে—ক্রেস্তানী ভাষা আওড়াবে—দেব-দেবী পূজাপার্বণ মানবে না—বাপ মাকে মানবে না ভাই বোনকে বিয়ে করবে—হিন্দুধর্মের সমস্ত গৌরব মাটিতে মিশিয়ে যাবে।

তাদের এতদিনকার কৃষ্টি এতদিনকার সব তপস্যা ধূলায় মিশিয়ে যাবে।

অনাদিনাথের দলের একমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা এখন ঐ রাজা রাধাকান্ত দেব। গতকালও রাত্রে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে সকলে মিলিত হয়েছিলেন।

সেই একই আলোচনা—ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে হটাতেই হবে। ছলেবলে কৌশলে যেমন করেই হোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

খুব প্রত্যুষে বলতে গেলে প্রায় রাত্রি থাকতেই অনাদিনাথের চিরকাল শয্যা ত্যাগ করা অভ্যাস।

গত রাত্রের আলোচনা শেষ করে ফিরতে ফিরতে গৃহে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তারপর শয্যাগ্রহণ করেও নিদ্রাকর্ষণ হয় নি।

তাই আজ একটু তাড়াতাড়িই শয্যাত্যাগ করেছিলেন। এবং পদব্রজে গঙ্গা-স্নানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় দুর্গা দেবীর পাল্কিবাহকেরা এসে বহির্মহলের সামনে চত্বরে পাল্কি নামাল।

কে! কে এলো পাল্কি করে রামানন্দ—প্রশ্ন করলেন অনাদিনাথ।

রামানন্দ অনাদিনাথের গৃহ-সরকার।

বৃদ্ধ সরকার মশাইয়ের রাত্রে প্রায় ঘুমই হতো না, ঘন ঘন উঠে তামুক সেবন করতেন।

তিনি তখন তাঁর ঘরের সামনে বসে তামুক সেবন করছিলেন।

কর্তার গলার সাড়া পেয়ে শশব্যস্তে হুঁকা রেখে এগিয়ে আসেন রামানন্দ।

কিন্তু তাঁকে আর প্রশ্ন করতে হলো না—তার আগেই দুর্গা দেবী পাল্কি থেকে নেমে সাড়া দিলেন, দাদা—আমি—

কে! দু'পা এগিয়ে আসেন অনাদিনাথ। পশ্চাতে তাঁর রামানন্দ।

আমি—দুর্গা—

দুর্গা—এত ভোরে কি খবর।

অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন আছে দাদা! দুর্গা দেবী বলেন।

জরুরী প্রয়োজন—এখনো রাত শেষ হয় নি। এভাবে এ সময় না বের হয়ে নিজে নাথু সিংকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেই তো পারতিস। ছিঃ ছিঃ, মল্লিক মশাই জানতে পারলে—

দুর্গা দেবী অনাদিনাথের সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মৃন্ময়ীকে ডাকলেন, আয় পাল্কি থেকে বের হয়ে আয়।

মৃন্ময়ী চাদরে আপাদমস্তক আবৃত অবস্থায় পাল্কির ভিতর থেকে বের হয়ে এলো। আগে থাকতেই দুর্গা দেবী নিজের চাদরটা দিয়ে সযতনে মৃন্ময়ীর সর্বাঙ্গ ভাল করে আবৃত করে এনেছিলেন, কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল না অনাদিনাথের গৃহে মৃন্ময়ীর ওপরে কারো দৃষ্টি পড়ে।

দৃষ্টি পড়া মানেই কৌতূহলের সৃষ্টি। অহেতুক কৌতূহল!···ব্যাপারটা যথা-সম্ভব গোপন থাকাই মঙ্গল। মৃন্ময়ী পাল্কির বাইরে আসতেই প্রথম ভোরের আবছা আলোয় তার প্রতি দৃষ্টি পড়লো বসু মশাইয়ের।

প্রশ্ন করলেন সঙ্গে সঙ্গে অনাদিনাথ, কে রে দুর্গা···

জ্যেষ্ঠের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দুর্গা দেবী বললেন, চল দাদা—ঘরে—

অনাদিনাথ বুঝলেন, দুর্গা দেবী কথাটা এখানে রামানন্দের সামনে ভাঙতে ইচ্ছুক নন। তাই বললেন, আয়—

দুর্গা দেবীকে নিয়ে কাছারিঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন অনাদিনাথ।

বিরাট লম্বা কাছারিঘর—ঘর-জোড়া তক্তাপোশ পাতা···তার উপরে শতরঞ্জি ও চাদর। ঘরের এক কোণে দেওয়ালে দেওয়াল-বাতি জ্বলছিল তবে বাতির

শিখাটা কমানো। ঘর খালি।

দেওয়াল-বাতির মৃদু আলোয় ঘরের মধ্যে রহস্যময় একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। মৃন্ময়ীকে এগিয়ে দিলেন অনাদিনাথের দিকে দুর্গা দেবী এবং বললেন, প্রণাম কর।

মৃন্ময়ীর মাথার উপর থেকে চাদরটাও সরিয়ে দিলেন ঐ সঙ্গে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন অনাদিনাথ ফুল্লকুসুমবৎ মৃন্ময়ীর মুখখানির দিকে।

থাক, থাক—চিরসুখী হও মা—কিন্তু কে এ মেয়েটি দুর্গা! চিনতে পারলাম না তো! প্রশ্ন করলেন আবার অনাদিনাথ।

মৃন্ময়ী—মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেন দুর্গা দেবী।

মৃন্ময়ী।

হ্যাঁ—বড় হতভাগী মেয়েটা দাদা—

হতভাগী—

তা বৈকি। এই বয়সে সব হারিয়ে সব খুইয়ে যে বসে আছে সে হতভাগিনী নয় তো কে আর দাদা! ওরই জন্য তো এত রাত্রে এসময় ছুটে আসতে হলো তোমার কাছে—

কিন্তু—

তোমার এ গৃহে ও একটু আশ্রয় না পেলে একেবারে ভেসে যাবে।

আমার এখানে আশ্রয়!

হ্যাঁ—আশ্রয়ের কথা মনে পড়তে তোমার কথাই মনে পড়লো সর্বাগ্রে—

কিন্তু মেয়েটি কে দুর্গা—প্রশ্ন করলেন আবার বসুমশাই।

বললাম তো একান্ত নিরাশ্রয়—ত্রিসংসারে সবাই থেকেও আজ আর কেউ নেই ওর।

কি বলছিস কি? বললেন অনাদিনাথ, ব্যাপারটা বোধগম্য হয় না তাঁর।

ঠিকই বলছি দাদা—প্রায় নয় মাস দশ মাস আগে পর্তুগীজ দস্যুরা ওকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে আনে।

বলিস কি! অস্ফুট কণ্ঠে বিস্ময়ের মতই যেন প্রশ্নটা বসুমশাইয়ের কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে।

তবে আর কি বলছি দাদা।

দস্যুরা অপহরণ করে এনেছে ওকে! প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলেন অনাদিনাথ যেন।

হ্যাঁ।

তা এতদিন কোথায় ছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে শুধান আবার ভগ্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে।.

সে কথা আর বলো না। ছিল সেই দস্যুরই ঘরে।

মানে সেই একটা বিধর্মী পর্তুগীজ দস্যুর ঘরে।

হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে অনাদিনাথের মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। এবং কয়েকটা মুহূর্ত গম্ভীর থেকে ধীরে ধীরে বলেন, ওকে তুই আমার কাছে নিয়ে এলি আশ্রয়ের জন্য। তোর কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি দুর্গা।

চমকে ওঠেন দুর্গা দেবী ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে। বলেন, কি বলছো দাদা?

ঠিকই বলছি দুর্গা। তা আমার কাছে আনবার কি প্রয়োজন ছিল? তোর নিজের গৃহও তো খুব ছোট নয়, সেখানে বুঝি আশ্রয় দিতে সাহস হলো না—তাই আমার এখানে নিয়ে এলি।

ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে দুর্গা দেবী বললেন, না দাদা, তা নয়—বাকী কথাগুলো দুর্গা দেবীর কণ্ঠ হতে যেন আর বের হলো না।

অনাদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, তবে কি ভেবেছিলি—

দাদা—

ভেবেছিলি বুঝি—তিক্ত ও নীরস কণ্ঠে বলতে থাকেন অনাদিনাথ, তোর নিজের ওখানে যাকে আশ্রয় দেওয়া তোর পক্ষে সম্ভবপর হলো না, আজকের এই ঘোর দুর্দিনে একজন সমাজরক্ষক হিসাবে তাকে আমার গৃহে আশ্রয় দেওয়া চলতে পারে—আমি তাকে আশ্রয় দেবো?

পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে দুর্গা দেবী জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, না—তাও নয়। আমি ভেবেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা।

অন্য কথা? প্রশ্নটা করে বিস্মিত দৃষ্টিতে অনাদিনাথ কনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ।

তা কি ভেবেছিলি শুনি?

শান্ত কণ্ঠে দুর্গা দেবী এবারে বলেন, কি ভেবেছিলাম এর পর আর তোমারও শুনে কোন লাভ নেই, আমারও বলে কোন লাভ হবে না দাদা।

দুর্গা—

হ্যাঁ দাদা। কিন্তু যাক সে কথা। আমার গৃহ ছোট নয়—আর ছোট যদি হতোও, ঐ রকম একটা অভাগিনী মেয়ের স্থানাভাব যে সেখানে হতো না সে কথাটাও তোমার চাইতে আর কেউ বেশী জানে না। তবু কেন যে আমাকে উর্ধ্বশ্বাসে ঐ দুর্ভাগা মেয়েটাকে নিয়ে এত রাত্রে এভাবে তোমার এখানে ছুটে আসতে হয়েছে তাও তোমার অজানা নয়। তারপর একটু থেমে আবার দুর্গা দেবী বলেন, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। তবে এও বলে যাচ্ছি, যত বড় বেদনাদায়কই হোক না কেন এটাই এখানে এসে তোমার কাছ থেকে জেনে গেলাম যে মানুষের সহজাত হৃদয়বৃত্তি, স্নেহ বিবেক ভালবাসার চাইতেও তোমাদের সমাজের নামে কতকগুলো নিষ্ঠুর সংস্কার শুষ্ক নীতি আর কর্তব্যই তোমাদের কাছে বড়। সেই তোমাদের স্বর্গ—

কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে দুর্গা দেবীর গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে—লজ্জায় দুঃখে অভিমানে।

অনাদিনাথ বলেন, কি বলছিস?

দুর্গা দেবী রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ঠিকই। তা ছাড়া আর কি দাদা। আমি সামান্য অশিক্ষিত মুখ্যু মেয়েমানুষ, তোমাদের মত অত লেখাপড়াও জানি না—জ্ঞানগম্যিও নেই—

দুর্গা—

হ্যাঁ দাদা; তোমাদের ঐ ধর্মের মহিমাও যেমন বুঝি না, বুঝি না তেমনি তোমাদের ঐ ধর্ম মানুষকে কোন্ স্বর্গে নিয়ে যায়। যে ধর্মের হৃদয় নেই—বিবেক নেই—

অনাদিনাথ আর সহ্য করতে পারেন না। চাপা গলায় তর্জন করে ওঠেন, থাক—ছোট মুখে বড় কথা—তুই কি বলতে চাস বিধর্মী দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিতা—ধর্ষিতা—

ছিঃ ছিঃ দাদা, চুপ করো—আয় মৃন্ময়ী, দুর্গা দেবী মৃন্ময়ীর হাতখানা চেপে ধরে একটা টান দিয়ে খোলা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, চল—

দাঁড়া দুর্গা—

জ্যেষ্ঠের আহ্বানে ঘুরে দাঁড়ালেন দুর্গা দেবী।

বলি ঐ মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

আমার বাড়িতে।

মানে বিধর্মী ম্লেচ্ছ কর্তৃক—

তার জন্য তোমার মাথাব্যথা কেন? নিয়ে যাচ্ছি তো আমি আমার গৃহে—

নিয়ে যাচ্ছিস মানে ! নিয়ে অমনি গেলেই হলো ! সমাজ নেই—ধর্ম নেই—কানুন নেই—না ভেবেছিস ছেলেকে ইংরাজী স্কুলে দিয়ে দু'পাতা ইংরাজী শিখিয়েছিস বলে সেই সমাজ—সেই পুরুষ-পুরুষানুক্রমের ধর্মকে—

ওকে আমি আমার গৃহে স্থান দেবোই।

স্থান দিবিই !

হ্যাঁ।

সমাজ সুরেনকে জাতিচ্যুত করবে—পতিত করবে।

করুক। একঘরে হয়েই থাকব আমরা।

বেশ—দেখি তুই কেমন করে ওকে ঘরে স্থান দিস ! আমি বেঁচে থাকতে এত বড় অধর্ম—তুই আমার মায়ের পেটের বোন হলেও ইহকাল পরকালের ধর্মের চাইতে তুই আমার কাছে বড় নোস জানবি—যদি ভেবে থাকিস ক্ষমা—

ক্ষমা আমি চাই না তোমার—আয়—চল মৃন্ময়ী—

দুর্গা দেবী কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালেন না। মৃন্ময়ীর হাত ধরে দৃঢ়পদে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা গিয়ে চত্বরে পাল্কির সামনে দাঁড়ালেন।

গোপাল—ডাকলেন দুর্গা দেবী।

মা।

চলো—ঘর চলো।

কথাটা বলে মৃন্ময়ীকে নিয়ে দুর্গা দেবী পাল্কির মধ্যে উঠে বসলেন। অনাদিনাথ চত্বরে এসে দাঁড়ান, কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না দুর্গা। এ সমাজ—আগুন নিয়ে খেলা !

শেষবারের মত দুর্গা দেবী পাল্কি থেকে মুখ বের করে কঠিন শান্ত কণ্ঠে জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করে বললেন, আগুন কি জল জানি না তবে এটুকু তুমি শুনে রাখ দাদা পোড়ার ভয় আমার নেই—চলো গোপাল—

কথাটা শেষ না করেই দুর্গা দেবী হাত দিয়ে যেন জ্যেষ্ঠের মুখের ওপরেই পাল্কির পর্দাটা টেনে দিলেন।

বাহকেরা পাল্কি তুলে নিল।

নিঃশব্দে চত্বর অতিক্রম করে বাহকেরা পাল্কি নিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল।

গোপাল প্রশ্ন করে, কোথায় যাব মা !

বাড়ি চলো।

পাল্কি আবার গৃহাভিমুখে চলে।

॥ ২ ॥

মৃন্ময়ী এতক্ষণ যেন পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাকে কেন্দ্র করে ঘটে গেলেও সে যেন বোবা হয়ে ছিল।

যাওয়ার পথেও পাল্কির মধ্যে সে ঘুমের ঘোরে ঢুলছে—দু'চোখের পাতা কিছুতেই খুলতে পারছিল না, কিন্তু এখন আর ঘুমের বিন্দুমাত্রও চোখের পাতায় যেন কোথাও ছিল না তার অবশিষ্ট।

ঘুম কোথায় চলে গিয়েছিল যেন—মুছে গিয়েছিল দু'চোখের পাতা থেকে।

বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করবার পর মৃদু কণ্ঠে এক সময় মৃন্ময়ী ডাকে, মা—

চমকে ওঠেন দুর্গা দেবী সে ডাকে হঠাৎ যেন।

বলেন, অঁ্যা—

মা —

কিছু বলছিস্!

হ্যাঁ—আমাকে নামিয়ে দিন মা।

নামিয়ে দেবো!

হ্যাঁ—আমার জন্য কেন আপনি বিপদে পড়বেন মা!…

বিপদে পড়বো! বিস্মিত দৃষ্টিতে সামনে উপবিষ্ট মৃন্ময়ীর দিকে তাকান দুর্গা দেবী, কিন্তু পর্দা ফেলা পাল্কির মধ্যে অন্ধকার—চারিদিক ঢাকা, মৃন্ময়ীর মুখ স্পষ্ট দেখতে পান না।

তবু প্রশ্ন করেন, বিপদ!

হ্যাঁ মা। সত্যিই তো, উনি ঠিকই বলেছেন। আমার তো সত্যিই জাত নেই, ধর্ম নেই। ম্লেচ্ছ বিধর্মী ক্রেস্তানের ঘরে ছিলাম এতদিন—কথাটা শেষ করতে পারে না মৃন্ময়ী নিদারুণ ব্যথায় গলাটা বুজে আসে যেন তার। অশ্রুতে গলাটা রুদ্ধ হয়ে যায়।

এখানে যে নামিয়ে দেবো—কোথায় যাবি? দুর্গা দেবী শুধান।

কোথায় যাবো?

হ্যাঁ—কেউ তোর এ শহরে আপনার জন আছে!

না—

তবে! তবে নেমে কোথায় যাবি হতভাগী? এতেই ভেঙে পড়ছিস হতভাগী! এদেশে মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস, সারাটা জীবনই তো কাঁদতে

হবে—জন্মের সঙ্গে কান্নার শুরু, চিতায় উঠবি যেদিন সেদিন শেষ হবে।

কিন্তু মা—

চুপ কর তো হতচ্ছাড়ি! এসে যখন মা বলে ডেকে সামনে দাঁড়িয়েছিস—ফেলে দেবো না, ভয় নেই—

অন্ধকারে আন্দাজে ঠাওর করে সম্মুখে উপবিষ্ট দুর্গা দেবীর পা দুটো নিজের নরম ঠাণ্ডা হাত দিয়ে চেপে ধরে মৃন্ময়ী।

দুর্গা দেবী মৃন্ময়ীকে বুকের মধ্যে টেনে নেন, কেমন করে বুঝলি যে ফেলে দেবো—ওরে ফেলে দিতে পারব না বলেই তো ছুটে গিয়েছিলাম।

মা—

মেয়ে তো নেই, ভাবব না হয় তুই আমার মেয়ে।

ফিরে এলেন আবার নিজ গৃহেই মৃন্ময়ীকে সঙ্গে করে দুর্গা দেবী।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ।

পূবের আলোয় রাত্রিশেষের অন্ধকার ক্রমশঃ তরল হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে তখন। দাস-দাসীরা একে একে শয্যা ছেড়ে উঠতে শুরু করেছে।

সারাটা রাত্রি দুচোখের পাতা এক করতে পারেন নি—চোখ দুটো জ্বালা করছিল দুর্গা দেবীর।

মৃন্ময়ীর হাত ধরে পাল্কি থেকে নেমে সোজা নিজের শয়নঘরে গিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন দুর্গা দেবী।

তাঁর শয্যার ওপরে আলতোভাবে গা ঢেলে দিয়ে আলবোলায় তামুক সেবন করছিলেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

দুটি চক্ষু আবেশে মুদ্রিত ছিল। পদশব্দে চোখ মেলে তাকালেন, কে?

স্বামী-স্ত্রীর চোখোচোখি হলো।

পরস্পর পরস্পরের দিকে মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলে বুঝি? প্রশ্ন করেন সুরেন্দ্রনাথই স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

দুর্গা দেবী কোন জবাব দেন না।

সুরেন্দ্রনাথ আবার বলেন, তা স্নান না করে চলে এলে যে?

দুর্গা দেবী কল্পনাও করতে পারেন নি যে তাঁর স্বামী তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁরই অপেক্ষায় তাঁর ঘরের মধ্যে জেগে বসে থাকবেন।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আকণ্ঠ মদ্যপান করে গৃহে যখন প্রত্যাবর্তন করেন সুরেন্দ্র

মল্লিক তখন তাঁর আর জেগে থাকবার মত অবস্থা থাকে না।

কোনমতে শয্যায় গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন—কোন আর জ্ঞানই থাকে না।

নিদ্রাভঙ্গ হয় পরের দিন সেই অনেক বেলায়।

ঐ নিয়মের বড় একটা ব্যতিক্রম হতে দেখেন নি দুর্গা দেবী।

তাই বোধ করি ভেবেছিলেন ঘণ্টা দুই পূর্বে মৃন্ময়ীকে নিয়ে গৃহ হতে বের হয়ে যাবার সময় স্বামী তাঁর ঘরে এলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘরে না পেয়ে হয়তো নিজের শয়ন কক্ষেই ফিরে যাবেন সোজা এবং শয্যায় শুয়ে পড়বেন।

নেশার ঘোরে বেশী উৎসাহ আর থাকবে না আপাতত মৃন্ময়ী সম্পর্কে জানবার বা খোঁজ নেবার।

তারপর সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠে জিজ্ঞাসা করলে যাহোক একটা জবাব দিয়ে দেবেন।

কিন্তু তাঁর নিজের কক্ষে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া দূরে থাক—এখনো তাঁরই ঘরে জেগে বসে আছেন এবং কণ্ঠস্বরে নেশার লেশমাত্রও না দেখে সত্যি সত্যিই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন দুর্গা দেবী।

এবং মৃন্ময়ীর হাতটা ধরেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

কি করবেন—অতঃপর বা কি বলবেন যেন কিছুই বুঝে পান না।

এবং স্বামীর প্রশ্নের জবাবে তাই প্রথমটায় চুপ করেই থাকেন কয়েকটা মুহূর্ত।

স্বামী পুনরায় প্রশ্ন করেন, স্নান না করেই যেন চলে এসেছ মনে হচ্ছে বড় বৌ।

হ্যাঁ।

গঙ্গায় যাও নি?

না।

কিন্তু গঙ্গাস্নানেই তো বের হয়েছিলে পাল্কি নিয়ে মোক্ষদার কাছে শুনলাম।

মৃন্ময়ীকে পাশে নিয়ে তার হাতটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্বামীর প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন দুর্গা দেবী।

এবারে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন স্বামীকে, শরীর তোমার সুস্থ তো?

কেন—ও কথা কেন বড় বৌ!

না—এখনো ঘুমাও নি, জেগে বসে আছ—দুর্গা দেবী বলেন।

না, না—শরীর ভালই আছে—ঘুম আসছিল না—তারপরই সুরেন্দ্র মল্লিক এতক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা তাঁর গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করছিল সেই প্রশ্নটা

আর চেপে রাখতে যেন পারলেন না।

বললেন, ওটি কে?

দুর্গা দেবী স্বামীর প্রশ্নে স্মিত হাসি হাসলেন। বললেন, বল তো কে?

কেমন করে জানবো—

আমার মেয়ে—শান্ত ধীর কণ্ঠে এবারে দুর্গা দেবী বললেন।

তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ—আমাদের মেয়ে।

কথাটা যেন ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি সুরেন্দ্র মল্লিক—একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

দুর্গা পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর কথাটার, হ্যাঁ গো—মেয়ে তো আমাদের একটি ছিল না তাই ভগবান জুটিয়ে দিলেন—যা মা—তোর বাবাকে প্রণাম কর।

মৃন্ময়ী এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনছিল—হঠাৎ দুর্গা দেবীর আদেশে কেমন যেন থতমত খেয়ে আরো জড়সড় হয়ে পড়ে—দু'হাতে দুর্গা দেবীকে জড়িয়ে ধরে যেন নিজেকে তাঁর আড়ালে লুকোতে চায়।

দুর্গা দেবী মৃন্ময়ীকে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে আবার বললেন, ওকি রে বোকা মেয়ে, যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন—প্রণাম কর।

মৃন্ময়ী এবারে এগিয়ে যায় এবং সুরেন্দ্র মল্লিককে নিচু হয়ে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই সুরেন্দ্র মল্লিক তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, থাক—থাক।

থাক। থাক কেন—আশীর্বাদ কর মেয়েকে।

হ্যাঁ—হ্যাঁ করছি।

জান মেয়েটা এই বয়সেই চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে—

কী হয়েছে।

দুর্গা দেবী বললেন, কি হয় নি তাই বল—পর্তুগীজ ডাকাতে লুঠ করে এনেছিল—

বল কি?

হ্যাঁ—তারপর এতদিন সেখানেই ছিল—ঐ যে শিবনাথ ছেলেটি আমাদের নরেন্দ্রর বন্ধু—সে-ই মেয়েটিকে সেই ডাকাতের আশ্রয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

এতদিন তাহলে বিধর্মীর আশ্রয়ে ছিল?

উপায় কি বল। তারপরই একটু থেমে বলেন, নিজের মেয়ে, বিধর্মীর আশ্রয়ে যদি কিছুদিন থাকতেই হয়ে থাকে—তাকে তো আর ফেলে দিতে পারি

না—তুমিই বল—না সেটা হবে মানুষের মত!

কিন্তু গিন্নী—

ধর আজ যদি আমাদের নিজের সন্তানের অমনি বিপদ হতো ফেলে দিতে পারতে তাকে বাপ হয়ে?

কিন্তু গিন্নী—সমাজ আছে—আত্মীয়-স্বজন আছে—

তা থাকলেই বা—

তারা তোমাকে জাতিচ্যুত করবে—একঘরে করবে—

করলেই বা—

কি ছেলেমানুষের মত বলছো!

যা বলছি ঠিকই বলছি—আশ্রয় যখন ওকে একবার আমি দিয়েছি—ও আমার কাছেই থাকবে—ও আমার মেয়ে—

শোন গিন্নী শোন—এ গায়ের জোর বা কোন জিদের কথা নয়—দশজনকে নিয়ে সমাজ—সেই সমাজের কথা—সমাজের একটা শৃঙ্খলা আছে—আইন আছে—তাছাড়া ধর্ম বলে একটা বস্তু আছে—

সব আছে এবং সব চিরদিন থাকবেও, কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষকে অপমান করলে জেনো ভগবান ক্ষমা করবেন না। সমাজ—ধর্ম—কিসের সমাজ—কিসের ধর্ম বল তো। যে সমাজ রক্ষা করতে পারে না—কিন্তু শাস্তির বিধান দিতে পটু সে সমাজের মেরুদণ্ডে জেনো অনেকদিন ঘুণ ধরেছে। দেখ—মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—তায় আবার মেয়েমানুষ আমি—তোমাদের সমাজ—ধর্ম ঐ সব বড় বড় কথা ও তার মর্ম আমি বুঝতে পারি না—কিন্তু যে মানুষকে নিয়ে সমাজ—সেই মানুষকেই যদি অপমান আর লাঞ্ছনা কর—তবে জেনো তোমাদের সে সমাজব্যবস্থা আজ না হলেও দুদিন বাদে ভেঙে যাবেই—আর অন্ধ গোঁড়ামির মধ্যে জিদই আছে শ্রদ্ধা নেই—

ঠিক ঐ সময় দরজার বাইরে থেকে একটি পরিচিত ডাক শোনা গেল।

মল্লিক মশাই আছেন নাকি?

স্বামী-স্ত্রী দুজনাই যুগপৎ চমকে ওঠে।

অনাদিনাথের গলা।

দুর্গার জ্যেষ্ঠ সহোদর অনাদিনাথ।

তাড়াতাড়ি সুরেন্দ্রনাথ আহ্বান জানান, কে, বোসজা—আরে এসো এসো, ঘরে এসো—

॥ ৩ ॥

সুরেন্দ্র মল্লিকের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অনাদিনাথ ঘরের ভিতরে পা বাড়াচ্ছিলেন কিন্তু ভিতরে পা ফেলা আর তাঁর হলো না, পরমুহূর্তেই বাধা এলো এবং বাধাটা এলো তাঁর সহোদরার কাছ থেকেই।

ঘরের ভিতর থেকে সহোদরকে উদ্দেশ করে দুর্গা দেবী বলে উঠলেন, দাদা—তুমি ওঁর ঘরে গিয়ে বসো—উনি যাচ্ছেন—

অর্থাৎ স্পষ্ট নির্দেশ—ঘরে ঢুকো না।

অত্যন্ত আকস্মিক বাধাটা, কিন্তু অনাদিনাথকে থামতেই হলো দোরগোড়াতে, দাঁড়াতেই হলো।

দুর্গা তাঁর বাড়ি থেকে চলে আসবার পর অনাদিনাথ কয়েকটা মুহূর্ত যেন স্তব্ধ অনড় হয়ে রাত্রিশেষের আলোছায়ায় চত্বরের উপর দাঁড়িয়েছিলেন।

দুর্গা যে তাঁকে অমন কঠিন কঠিন কথাগুলো বলতে পারবে এ যেন তাঁর চিন্তারও অগোচর ছিল।

শুধু কঠিনই নয়, অমন স্পষ্ট ও রূঢ় করে কথাগুলো দুর্গা তাঁর মুখের ওপরে বলে আসতে পারে—কোন দিনই বুঝি ভাবতে পারেন নি অনাদিনাথ।

দুঃখে লজ্জায় অপমানে যেন অনাদিনাথের মুখখানা কালো হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় দুর্গা যা বলে গেল তা সে করবেই।

দুর্গাকে সেই ছোটবেলা থেকেই তিনি চেনেন, উচিত ও ন্যায় বলে যা সে বিবেচনা করে তা সে করবেই।

কারো সাধ্য নেই তা থেকে কেউ তাকে টলায়।

আর তাই যদি করে, ব্যাপারটা চাপা থাকবে না—এ-কান ও-কান হতে হতে ক্রমশঃ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

কারোরই আর জানতে বাকী থাকবে না এবং রাজাবাহাদুরের কানেও গিয়ে উঠবে। কি করে তখন অনাদিনাথ সমাজে মুখ দেখাবেন।

বড় বড় কথা কি কেবল মুখেই—শেষকালে কিনা তারই ঘরে বলতে গেলে দুর্নীতির প্রশ্রয়।

লোকে থুতু ছিটাবে—টিটকারী দেবে।

না—কিছুতেই তা হবে না—এ হতে পারে না—অনাদিনাথ তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে বললেন গাড়ি জুত্‌তে। স্নানে যাওয়া আর হলো না তাঁর।

কোনমতে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে গাড়ি করে বের হয়ে পড়লেন সুরেন্দ্র

মল্লিকের গৃহের দিকে।

দুর্গা দেবী গৃহে পৌঁছবার মিনিট কুড়ির মধ্যেই অনাদিনাথও পৌঁছে যান এবং গাড়ি থেকে নেমে সোজা অন্দরের দিকে পা বাড়ান।

সামনেই একজন ভৃত্যকে দেখে শুধান, কর্তাবাবু কোথায় রে?

কর্তাবাবু গিন্নীমার ঘরে—

সত্যি কথা বলতে কি কথাটা শুনে অনাধিনাথ একটু বিস্মিতই হন। সুরেন্দ্র মল্লিক ঐ সময় তাঁর স্ত্রীর ঘরে—অবিশ্বাস্য বৈকি।

সন্দেহটা নিরসনের জন্যই বোধ হয় প্রশ্ন করেন, জেগে আছেন?

আজ্ঞে—এই তো কিছুক্ষণ আগে তামুক দিয়ে এলাম।

অনাদিনাথ আর দাঁড়ালেন না—অন্দরে দুর্গা দেবীর কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কক্ষের দ্বারে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

কক্ষের মধ্যে দুর্গার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

দুর্গা দেবীর শেষের কথাগুলো তাঁর কানে গিয়েছিল।

একটু ইতস্তত করে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, মল্লিক মশাই আছেন নাকি?

তখনো ভাবেন নি অনাদিনাথ দুর্গা দেবী তাঁকে কক্ষে প্রবেশে বাধা দেবেন —তাই আকস্মিক বাধাটা পেয়ে পা আর বাড়ানো হলো না।

দাঁড়িয়ে গেলেন।

সুরেন্দ্র মল্লিকও যে একটু বিস্মিত হন নি তা নয়। তিনিও বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে সঙ্গে সঙ্গে তাকান।

দু'চোখের দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন যেন ঝিকিয়ে ওঠে।

দুর্গা দেবী ঈষৎ চাপা কণ্ঠে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, যাও—তোমার ঘরে গিয়ে দাদাকে বসাও—কি জন্য এসেছেন দেখ।

সুরেন্দ্র মল্লিক কি যেন বলবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেন দুর্গা দেবী।

বলেন, কি হলো যাও—দাদা বোধহয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

হ্যাঁ—এই যাই—

সুরেন্দ্র মল্লিক কথাটা বলে শয্যা ছেড়ে উঠে কোনমতে পাদুকা জোড়া পায়ে গলিয়ে ঈষৎ স্খলিত পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

দরজার গোড়াতেই তখনো স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনাদিনাথ।

পলকের জন্য দণ্ডায়মান শ্যালকের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনমতে বলেন সুরেন্দ্রনাথ, এই যে বোসজা—কি ব্যাপার হঠাৎ—

তাই সম্বোধনটাও কানে খট্ করে বেজেছিল সুরেন্দ্রনাথের। তাকালেন তাই বোধ করি একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই শ্যালকের মুখের দিকে।

বসবে না?

না।

কেন হে?

বসতে আমি আজ তো আসিই নি তোমার এখানে—ভবিষ্যতেও কোন দিন আর এ গৃহে বসা তো দূরের কথা, আসতে পারবো বলে মনে করি না।

কেন হে?

কেন আবার কি, তুমি তো জান একদিকে আমার ইহকাল পরকাল সব কিছু আর একদিকে আমার ধর্ম—

তোমার কথা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বোসজা!

বলি ঐ মেয়েটিকে এখানে স্থান দিয়েছো যে, জান ওর সত্যকারের পরিচয়?

কোন্ মেয়েটি, কার কথা বলছো?

ন্যাকামি আর নাই বা করলে মল্লিক মশাই—তোমার নিজের গৃহ অথচ তুমি কিছু জান না বলতে চাও—না আমাকে এড়াবার চেষ্টা করছো! তাই যদি হয় তো জেনো—আমি সব জানি—একটা ভ্রষ্টা কুলটা বিধর্মী মেয়েকে অন্দরে স্থান দেবার মত এত বড় স্পর্ধা তোমার কেমন করে হলো জানতে পারি কি?

ভোলা দুটো আলবোলায় কলকে বসিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

হঠাৎ অনাদিনাথ ভোলার দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে ওঠেন, বেরো হারামজাদা—তুই এখানে কি করতে এসেছিস!

ভোলা কোনমতে আলবোলা দুটো ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে থতমত খেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

অনাদিনাথ আবার বলেন, নাঃ, তুমি ছেলেকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ক্রেস্তান বিধর্মী করে—

না বসুজা—তোমাকে তো আগেও বলেছি—আজও বলছি—রাজা রামমোহন রায়ের যতই তোমরা নিন্দা করো না কেন—তার চিন্তাধারা মিথ্যা নয়—ইংরাজী শিক্ষা আমাদের জীবনে দেখো সত্যিই একদিন অপরিহার্য হয়ে উঠবে—হয়তো তোমার জীবনে হবে না, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের—

থামো—থামো—চিৎকার করে ওঠেন অনাদিনাথ, ছোট মুখে ঐ সব বড় বড় বুলি আর নাই বা আওড়ালে। ইংরাজী শিক্ষা—এর পর ঐ বিধর্মী ম্লেচ্ছগুলোর মত হয়তো বলবে—দেব-দেবী বলেও কিছু নেই—সব নিরাকার ব্রহ্ম—

স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্মটা মিথ্যা!

মিথ্যে তুমি রাগ করছো বন্ধুজা—এটা তোমার আমার ব্যক্তিগত দাবী বা দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এ যুগের দাবী—যুগ পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে—

যুগের দাবী—যুগ পাল্টানো—তবে যে কানে এসেছে আমার গোল্লায় গিয়েছো, উচ্ছন্নে গিয়েছো তুমি—কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়—

অনাদিনাথের কথাটা শেষ হলো না—দুর্গা দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন।

দাদা, মিথ্যে ওঁকে দোষারোপ করছো—বলতে এসেছো তুমি আমায়—কিন্তু আমার যা বলবার ছিল তা তো একটু আগে স্পষ্ট করেই তোমাকে জানিয়ে দিয়ে এসেছি দাদা।

দুর্গা—চিৎকার করে উঠলেন অনাদিনাথ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

স্বামী ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর আর একটি মুহূর্তও দেরি করেন নি দুর্গা দেবী।

অনাদিনাথ যে কেন ছুটে এসেছেন তাঁর গৃহে, সেটাও তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা অসম্ভব জিদ দেখা দেয়।

প্রতিজ্ঞায় মনটা লোহার মত কঠিন হয়ে ওঠে। ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন, যে দরজা-পথে একটু আগে তাঁর স্বামী নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন।

তারপর অন্দরের দিকে দরজাটা খুলে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, গৌরী—

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না গৌরীর—সাড়া এলো মোক্ষদার।

সে বলে, গৌরীদিদিকে ডেকে দেব গিন্নীমা!

শান্ত কণ্ঠে বললেন দুর্গা দেবী, হ্যাঁ, এখুনি আমার ঘরে পাঠিয়ে দে গৌরীকে।

গৌরীকে আর পাঠাতে হলো না, গৌরী বোধ করি ঐ সময় ঐ দিকেই আসছিল—সাড়া না দিলেও দুর্গা দেবীর ডাকটা তার কানে পৌঁছেছিল।

গৌরীকে আর ডাকতে হলো না।

গৌরীকে দেখে মোক্ষদা বলে ওঠে, এই যে গৌরীদিদি, গিন্নীমা তোমায় ডাকছেন গো—এখুনি—

গৌরী কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল দুর্গা দেবীর ঘরের দিকে।

তাই সম্বোধনটাও কানে খট্ করে বেজেছিল সুরেন্দ্রনাথের। তাকালেন তাই বোধ করি একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই শ্যালকের মুখের দিকে।

বসবে না?

না।

কেন হে?

বসতে আমি আজ তো আসিই নি তোমার এখানে—ভবিষ্যতেও কোন দিন আর এ গৃহে বসা তো দূরের কথা, আসতে পারবো বলে মনে করি না।

কেন হে?

কেন আবার কি, তুমি তো জান একদিকে আমার ইহকাল পরকাল সব কিছু আর একদিকে আমার ধর্ম—

তোমার কথা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বোসজা!

বলি ঐ মেয়েটিকে এখানে স্থান দিয়েছো যে, জান ওর সত্যকারের পরিচয়?

কোন্ মেয়েটি, কার কথা বলছো?

ন্যাকামি আর নাই বা করলে মল্লিক মশাই—তোমার নিজের গৃহ অথচ তুমি কিছু জান না বলতে চাও—না আমাকে এড়াবার চেষ্টা করছো! তাই যদি হয় তো জেনো—আমি সব জানি—একটা ভ্রষ্টা কুলটা বিধর্মী মেয়েকে অন্দরে স্থান দেবার মত এত বড় স্পর্ধা তোমার কেমন করে হলো জানতে পারি কি?

ভোলা দুটো আলবোলায় কলকে বসিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

হঠাৎ অনাদিনাথ ভোলার দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে ওঠেন, বেরো হারামজাদা—তুই এখানে কি করতে এসেছিস!

ভোলা কোনমতে আলবোলা দুটো ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে থতমত খেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

অনাদিনাথ আবার বলেন, নাঃ, তুমি ছেলেকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ক্রেস্তান বিধর্মী করে—

না বসুজা—তোমাকে তো আগেও বলেছি—আজও বলছি—রাজা রামমোহন রায়ের যতই তোমরা নিন্দা করো না কেন—তার চিন্তাধারা মিথ্যা নয়—ইংরাজী শিক্ষা আমাদের জীবনে দেখো সত্যিই একদিন অপরিহার্য হয়ে উঠবে—হয়তো তোমার জীবনে হবে না, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের—

থামো—থামো—চিৎকার করে ওঠেন অনাদিনাথ, ছোট মুখে ঐ সব বড় বড় বুলি আর নাই বা আওড়ালে। ইংরাজী শিক্ষা—এর পর ঐ বিধর্মী ম্লেচ্ছগুলোর মত হয়তো বলবে—দেব-দেবী বলেও কিছু নেই—সব নিরাকার ব্রহ্ম—

স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্মটা মিথ্যা!

মিথ্যে তুমি রাগ করছো বসুন্ধরা—এটা তোমার আমার ব্যক্তিগত দাবী বা দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এ যুগের দাবী—যুগ পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে—

যুগের দাবী—যুগ পাল্টানো—তবে যে কানে এসেছে আমার গোল্লায় গিয়েছো, উচ্ছন্নে গিয়েছো তুমি—কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়—

অনাদিনাথের কথাটা শেষ হলো না—দুর্গা দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন।

দাদা, মিথ্যে ওঁকে দোষারোপ করছো—বলতে এসেছো তুমি আমায়—কিন্তু আমার যা বলবার ছিল তা তো একটু আগে স্পষ্ট করেই তোমাকে জানিয়ে দিয়ে এসেছি দাদা।

দুর্গা—চিৎকার করে উঠলেন অনাদিনাথ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

স্বামী ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর আর একটি মুহূর্তও দেরি করেন নি দুর্গা দেবী।

অনাদিনাথ যে কেন ছুটে এসেছেন তাঁর গৃহে, সেটাও তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা অসম্ভব জিদ দেখা দেয়।

প্রতিজ্ঞায় মনটা লোহার মত কঠিন হয়ে ওঠে। ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন, যে দরজা-পথে একটু আগে তাঁর স্বামী নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন।

তারপর অন্দরের দিকে দরজাটা খুলে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, গৌরী—

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না গৌরীর—সাড়া এলো মোক্ষদার।

সে বলে, গৌরীদিদিকে ডেকে দেব গিন্নীমা!

শান্ত কণ্ঠে বললেন দুর্গা দেবী, হ্যাঁ, এখুনি আমার ঘরে পাঠিয়ে দে গৌরীকে।

গৌরীকে আর পাঠাতে হলো না, গৌরী বোধ করি ঐ সময় ঐ দিকেই আসছিল—সাড়া না দিলেও দুর্গা দেবীর ডাকটা তার কানে পৌঁছেছিল।

গৌরীকে আর ডাকতে হলো না।

গৌরীকে দেখে মোক্ষদা বলে ওঠে, এই যে গৌরীদিদি, গিন্নীমা তোমায় ডাকছেন গো—এখুনি—

গৌরী কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল দুর্গা দেবীর ঘরের দিকে।

মল্লিক-গৃহিণীর অশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল ঐ গৌরী মেয়েটি। এবং আজ প্রায় বছর চারেক মল্লিক-গৃহিণীর আশ্রয়ে আছে গৌরী।

গৌরী ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যা—বিয়ে হয়েছিল বছর পনের বয়সের সময়—যখন তার মা ও দাদা গণপতি তার বিয়ের ব্যাপারে একপ্রকার হতাশই হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু সে বিয়েও ঐ নামে মাত্রই বিয়ে। কারণ বিয়ের রাত্রেই গাঁটছড়া খুলে দু'একদিনের মধ্যেই আসছি বলে যে গৌরীর স্বামী তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল বাড়ির আর সকলের অজ্ঞাতে, তারপর আর দীর্ঘ পাঁচ বছর তার কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া যায় নি।

বিয়ের রাতটা ছিল এক বর্ষণমুখর রাত—যে রাতে গৌরীকে ফেলে তার স্বামী চলে গিয়েছিল—ফিরে এলো আবার এক বর্ষণমুখর রাত্রে তিন বছর বাদে।

বললে, স্ত্রীকে সে নিতে এসেছে। কাজের ভিড়ে এতদিন আসতে পারে নি—ফুরসত পায় নি।

বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল রমণীরঞ্জন গৌরীর মা বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে।

ঐ সময় বিন্ধ্যবাসিনী আর গৌরীই গ্রামের বাড়িতে ছিল।

একটি প্রৌঢ়া—একটি পূর্ণ যুবতী নারী। গণপতি ভাগ্যান্বেষণে বৎসর দুই আগে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিল।

মাকে ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু স্বামীর ভিটে ছেড়ে বিন্ধ্যবাসিনী যেতে চান নি, আর গৌরী—কেমন করে সে যাবে, তখনো যে তার দু'চোখে প্রতীক্ষার আলো জ্বলছে।

সে যে বলে গিয়েছে সে আসবে। গৌরী কি যেতে পারে।

ভাদ্রের মাঝামাঝি—সকাল থেকে আকাশ মেঘলা করে অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরছে—সেই সঙ্গে এলোমেলো হাওয়া।

রাত যত বাড়তে থাকে বৃষ্টি আর হাওয়া যেন বাড়তে থাকে। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছিল—সেই প্রদীপের আলোয় লজ্জানতা গৌরীর মুখখানি তুলে ধরে রমণীরঞ্জন বলে, ভেবেছিলে আর আসবো না, তাই না—

না তো—গৌরী মাথা নাড়ে।

তবে?

আমি জানতাম আপনি আসবেন—আবেগে কথা বলতে বলতে গৌরীর দুচোখের পাতা বুজে আসে।

স্বপ্ন নেমেছে তখন তার দু'চোখ ভরে বর্ষা-রজনীর জলতরঙ্গের রিমঝিম সুরে সুরে।

কিন্তু সে স্বপ্ন ভেঙে যেতে দেরি হলো না।

অপরূপ সাজে নিজে নিজেই সেজেছিল সেদিন গৌরী।

বিয়ের রাত্রের সেই লাল শাড়িটা পরনে এবং এতদিন যে গহনাগুলি তুলে রেখে দিয়েছিল গা থেকে খুলে সে-সব গহনা রাত্রে সে পরেছিল।

না সেজে কি পারে—সে যে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মধুরাত্রি জীবনের প্রথম মধুরাত্রি।

ঘরের মধ্যে প্রদীপটি কখন যেন নিভে গিয়েছে—কখন যেন গাঢ় ক্লান্তিতে স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে গৌরী।

অকস্মাৎ সুখনিদ্রা ভেঙে গেল একটা বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দে—নীল আলোয় সমস্ত ঘরটা মুহূর্তের জন্য যেন ঝলসে ওঠে।

আর সেই মুহূর্তেই নজরে পড়ে গৌরীর—শয্যা শূন্য, তার পাশে কেউ নেই—ঘরের দরজার কবাট দুটো হা হা করছে খোলা।

কবাট দুটো হাওয়ায় ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ তুলে এদিক ওদিক করছে।

চাপা অস্ফুট ভয়ার্ত কণ্ঠে তবু চিৎকার করে ওঠে, কোথায় তুমি—তুমি কোথায় গো?

কোন সাড়া নেই।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।

বুকের ভিতরটা যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় থর থর করে কাঁপছে গৌরীর। কোনমতে অন্ধকারে উঠে দরজাটা বন্ধ করে আলোটা জ্বালাল।

নেই। সত্যিই নেই কেউ আর ঘরে।

সে একা।

বৃষ্টির ছাটে সমস্ত মাটির মেঝেটা জলে থৈ-থৈ করছে—আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের দেহের দিকে নজর পড়ল যেন গৌরীর—এ সাজে কেন সেজেছে সে! ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল নাকি?

গলায় হাতে অলঙ্কারগুলো ঝলমল করছে। ভারী ভারী সোনার সব অলঙ্কার যা মা তার মেয়েকে বিয়েতে দেবেন বলে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং যে অলঙ্কারগুলো তাকে পরিয়ে সালঙ্কারা কন্যাদান করা হয়েছিল, সব সে আজ পরেছিল।

চিৎকার করে ডেকে ওঠে গৌরী, মা—মাগো—

পাশের ঘরেই ছিলেন বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁর ঘরের বন্ধ দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে দু'হাতে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকে গৌরী, মা মা, মাগো—

বিন্ধ্যবাসিনী দরজা খুলে বাইরে আসেন।

মা—

কি—কি হয়েছে?

নেই মা!

কে—কে নেই? শুধু শুধান বিন্ধ্যবাসিনী।

সে মা—সে চলে গেছে—চলে গেছে।

বিন্ধ্যবাসিনী দরজার গোড়াতেই বসে পড়লেন আর গৌরী মার কোলের ওপরে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

রাত্রি প্রভাত হলো না—তার আগেই বিন্ধ্যবাসিনী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবং যত বেলা হতে লাগল অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল।

কবিরাজ এলেন, বললেন, নিদারুণ বিসূচিকা।

সন্ধ্যার দিকে বিন্ধ্যবাসিনী শেষ নিঃশ্বাস নিলেন এবং গৌরীর জীবনের শেষ আশ্রয় ও সান্ত্বনাটুকুও যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

কি করবে—এখন কোথায় যায় গৌরী। পূর্ণ যুবতী—একাকিনী। গ্রামের সনাতন মুখুজ্জ্যে তাকে আশ্রয় দিলেন।

কিন্তু সনাতন দরিদ্র, অবস্থা দিন আনে দিন খায়।

সনাতন মধ্যে মধ্যে কলকাতায় যেতেন এবং সুরেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং দুর্গা দেবীকেও তিনি চিনতেন।

সনাতন কথায় কথায় একদিন দুর্গা দেবীকে গৌরীর কথা বলতে, তিনি তাঁর গৃহে গৌরীকে নিয়ে আসতে বললেন।

সনাতন একদিন সন্ধ্যায় গৌরীকে এনে দুর্গার সামনে দাঁড় করালেন।

গৌরী দুর্গা দেবীর আশ্রয় পেল। সেও আজ বছর চারেকের কথা।

গৌরীকে প্রথমটায় কোন কাজ দিতে চান নি দুর্গা দেবী, কিন্তু গৌরীই স্বেচ্ছায় মল্লিকবাড়ির রন্ধনশালার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

দুর্গা দেবী আর আপত্তি করেন নি।

থাক গে—মেয়েটা যদি ঐ নিয়ে থাকে তো থাকুক। কিছুই তো পেল না জীবনে।

রোগা ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম—কিন্তু মুখে ও সমস্ত দেহে একটা অপূর্ব শ্রী যেন ছড়িয়ে আছে। পরিধানে একটা লালপাড় শাড়ি। হাতে দু'গাছি শাঁখা।

মাথায় সিন্দুর।

গৌরী সামনে এসে দাঁড়াল, ডাকছিলেন মা?

হ্যাঁ, একে নিয়ে যা—মৃন্ময়ীকে দেখিয়ে দিলেন দুর্গা দেবী, আজ থেকে ও তোর কাছে তোর ঘরেই থাকবে—যা মৃন্ময়ী, ওর সঙ্গে যা।

গৌরী দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করে না।

মৃন্ময়ীর হাত ধরে বলে, এসো।

মৃন্ময়ীও নিঃশব্দে গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

দুর্গা দেবী আর দেরি করলেন না—ওরা চলে যেতেই ঘরের দরজা খুলে তিনি স্বামীর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। কারণ সমস্ত মনটা তখন তাঁর পড়ে ছিল স্বামীর ঘরের দিকেই।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই জ্যেষ্ঠ অনাদিনাথের শেষের কথাগুলো তাঁর কানে প্রবেশ করে—বুঝতে তাঁর আর কিছুই বাকী থাকে না। এক মুহূর্তও আর দেরি করেন নি অনাদিনাথ তাঁর চলে আসবার পর।

রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে ফুলতে সোজা এখানে চলে এসেছেন।

স্বামীকে অবিশ্যি দুর্গার ভয় নেই। যদিও ধনীগৃহে প্রাচুর্যতার জন্য তাঁর চরিত্রে কতকগুলো দোষ বর্তেছে, তাহলেও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ কুসংস্কার নেই। নচেৎ নিশ্চয়ই তিনি মৃন্ময়ীকে এ গৃহে ফিরিয়ে আনতে পারতেন না।

তাঁর যা কিছু দোষ চরিত্রে, ঐ নারী সম্পর্কে দুর্বলতা ও অত্যধিক মদ্যপান।

দুর্গার কথাটা কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন অনাদিনাথ এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে ওঠেন, দুর্গা!

হ্যাঁ দাদা, ওঁর হয়ে আমিই জবাবটা তোমার দিচ্ছি—তোমাদের ঐ ধর্মের চাইতে মানুষকে আমি অনেক বড় বলে মনে করি।

রক্তচক্ষে অনাদিনাথ সুরেন্দ্র মল্লিকের দিকে তাকালেন। দুর্বিষহ একটা আক্রোশের জ্বালায় পুড়ে তিনি যেন খাক্ হয়ে যাচ্ছিলেন। তিক্ত কণ্ঠে বললেন, মল্লিক মশাইয়েরও কি তাই মত নাকি?

এটা তুমি কি বললে দাদা, স্বামী-স্ত্রীর মত দুজনার দুরকম হয় নাকি!

সুরেন্দ্রনাথ চুপ করেই থাকেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি শুধু বিমূঢ়ই নয়, যেন বোবাও হয়ে গিয়েছেন।

বেশ, পূর্ববৎ তিক্ত কণ্ঠে জবাব দেন অনাদিনাথ, তবে তাই যদি তোমরা স্থির করে থাক তো এও জেনে রেখো অনাদিনাথ ধর্মের জন্য নিজের বোন হলেও তাকে ত্যাজ্য করতে দ্বিধা করবে না।

ধর্মে পতিত করে জাতিচ্যুত করবার জন্য ভয় দেখাচ্ছো দাদা—কিন্তু ও ভয় জেনো দুর্গার নেই।

ফেটে পড়লেন এবারে অনাদিনাথ। দেখা যাবে আছে কি নেই—ঠিক আছে আমি চললাম—আজ থেকে জানবো আমার একমাত্র সহোদরা বোনের মৃত্যু হয়েছে।

কথাগুলো একটানা বলেই ঝড়ের মত ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন অনাদিনাথ।

ঘরের মধ্যে যেন একটা পাষাণভার স্তব্ধতা নেমে আসে।

সুরেন্দ্র পালঙ্কের ওপর বসে আছেন। হাতে ধরা আলবোলার নলটি মুখে দিতেও ভুলে গিয়েছেন বুঝি—আর অদূরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে দুর্গা দেবী।

কয়েকটা মুহূর্ত কারো মুখ থেকেই কোন কথা বের হয় না। কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বললেন সুরেন্দ্রনাথই।

বললেন, কাজটা বোধহয় ভালো হলো না গিন্নী—

স্বামীর কণ্ঠস্বরে দুর্গা দেবী ওঁর মুখের দিকে তাকান।

মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলেন, ভয় করছে বুঝি।

ভয়?

হ্যাঁ!

কিসের?

কেন, জাতিচ্যুত হবার!

না, না ঠিক তা নয় গিন্নী।

তবে কি?

জাত্যাভিমান ও ধর্মের অভিমান যে আমার তেমন নেই তা তো তুমি জানই গিন্নী—আমি ভাবছি সমাজের কথা—এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে এমন একটা নোংরামি হয়তো ফেনিয়ে উঠবে, যেটা—

তোমার কথাটা যে আমি বুঝতে পারছি না তা নয়, কিন্তু তাই বলে অন্যায়কে

—জবরদস্তিকে সহ্য করে নেবো তাই বা কোন্ যুক্তি!

এ ঠিক যুক্তিতর্কের কথা নয় গিন্নী, বুঝতে পারছো না—রাজার দল যদি আমাদের পিছনে লাগে তো—

তার জন্য আমি প্রস্তুত।

গিন্নী!

হ্যাঁ—ওকে আমি ছাড়তে পারবো না—মা বলে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—আশ্রয় যখন একবার দিয়েছি—

কিন্তু মেয়েটা সম্পর্কে কোন কথাই তো এখনো আমাকে স্পষ্ট করে বললে না। কে মেয়েটা—কোথা থেকে এলো, কি ওর পরিচয়?

বললাম তো একটু আগে—এক ব্রাহ্মণকন্যা—দৈব-দুর্বিপাকে পর্তুগীজ দস্যু কর্তৃক ও একরাত্রে লুন্ঠিত হয়—এতদিন সে বিধর্মী দস্যুর আশ্রয়েই ছিল—শিবনাথ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আমার আশ্রয়ে এনে তুলেছে। শোন, আমি জানি এটা তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তোমার সংসার। যদি তোমার মনে কোন কিন্তু থাকে তো দ্বিধা করো না, স্পষ্ট করে আমাকে তাহলে জানিয়ে দাও আমি ওকে নিয়ে বাবার কাছে চলে যাবো শান্তিপুরে—

গিন্নী!

হ্যাঁ, পৃথিবীর কোথায়ও ঐ অভাগীর আশ্রয় না হলেও বাবার ঘরের দরজা ওর মুখের ওপরে বন্ধ হবে না।

আমি—আমি কি তোমাকে তাই বলেছি গিন্নী—থাক তুমি, এখানেই থাক—থাক ও এখানে যা হবার হবে—

দেখ—ধর্ম সমাজ কিছুই আমি অস্বীকার করি না—কিন্তু সব কিছুর উপরে আমি সন্তানের জননী, নরেন্দ্রের মা। আজ যদি ঐ অভাগী মেয়েটাকে বাড়ি থেকে বের করে মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিই তো সব কিছুর উপরে যিনি সেই ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না। না না—সে আমি পারবো না—কি একটা অমঙ্গল আশংকায় যেন দুর্গা দেবী শিউরে ওঠেন।

শিউরে উঠে চোখ বোজেন।

॥ ২ ॥

শেষ রাত্রের দিকে শিবনাথ বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দেহ ও মনের উপর দিয়ে গত কয়দিন ধরে যে অবিচ্ছিন্ন ঝড়টা বয়ে গিয়েছিল সেটাই যেন ক্লান্ত অবসন্ন করে দিয়েছিল শিবনাথকে।

তাই শয্যায় শুয়ে ঘুমোবো না ঘুমোবো না করেও কখন একসময় নিজের অজ্ঞাতেই দুচোখ ভরে ঘুম নেমে এসেছিল।

ঘুমটা ভাঙল মহেশবাবুর ডাকে।

ওহে ছোকরা—কত আর ঘুমোবে—ওঠো—ওঠো—

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে শিবনাথ।

প্রথমটায় ঠিক মনে পড়ে না কোথায় সে—কেন সে এখানে! ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকায়।

মহেশবাবুর মুখের দিকেও তাকায়।

চিনতে পারে না প্রথমটায় মহেশবাবুকে। মহেশ সামন্ত ইতিমধ্যে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন করে থেলো হুকায় ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ তুলে তামুক সেবন করছিলেন।

মাথা-জোড়া বিস্তীর্ণ টাক। মুখ-ভর্তি খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। নাদুস নুদুস গোলালো চেহারা।

গাত্রবর্ণ রীতিমত কালো।

হাঁটুর ওপরে পরনের ধুতিটা তোলা, কাঁধের ওপরে মলিন একটা গামছা।

মহেশ সামন্তও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন অপরিচিত শিবনাথকে তামুক সেবন করতে করতে।

মহেশ সামন্তই এক সময় প্রশ্ন করেন, নামটা কি?

আজ্ঞে শিবনাথ—

পদবী কি! জাত—কুল—মেল? নিবাস—

আজ্ঞে লাহিড়ী—কুলীন—মৃদুকণ্ঠে শিবনাথ প্রত্যুত্তর দেয়—নিবাসের কথাটা আর বলে না।

ভাল—ভাল—তা এখানে কি মনে করে আগমন?

আজ্ঞে কি বললেন!

বলি এখানে আগমনের হেতুটা কি?—আসা হচ্ছেই বা কোথা থেকে?

এবারেও প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে বলে, আজ্ঞে আমি নরেনের সহাধ্যায়ী—

মানে আমাদের নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ ম্লেচ্ছটার স্কুলে পড়ো তুমি?

আজ্ঞে—

কিন্তু কেন বাপু—এদিকে তো বলছো ব্রাহ্মণসন্তান—তা দেবভাষা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করে ঐ ম্লেচ্ছ স্কুলে পড়তে গেলে কেন? ইংরেজী শিক্ষা করে কি চতুর্বর্গ ফলটা লাভ করবে শুনি?

মহেশ সামন্তর গলা থেকে একটা কঠিন তিক্ততা যেন ঝরে পড়ে।...

আরো কিছু হয়তো বলতেন মহেশ সামন্ত কিন্তু সে অবকাশ আর পেলেন না তিনি—নরেন্দ্র এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, শিবনাথ—

নরেন—

কি ব্যাপার রে—ভোলার কাছে শুনলাম তুই নাকি কাল রাত্রে এসেছিস?

হ্যাঁ—

তা আমাকে জানাস নি কেন? ডেকে তুলিস নি কেন ঘুম থেকে?

অত রাত্রে জাগাবো তাই—

তাতে কি হয়েছে—যাক গে চল—মা ডাকছেন—

মা—

হ্যাঁরে মা—চল—

অন্দরে নিজের ঘরের সামনে অল্প ব্যবধানে বারান্দায় দুটি আসন পেতে অপেক্ষা করছিলেন দুর্গা দেবী।

নরেন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথকে প্রবেশ করতে দেখে শুধান, এসো শিবনাথ—হাত মুখ ধোয়া হয়েছে?

আসবার পথেই শিবনাথ হাত মুখ পুকুর থেকে ধুয়ে এসেছিল। বলে, হ্যাঁ মা—ধুয়ে এসেছি—

আজ আর দুর্গা দেবী নিজে দিলেন না, তাঁরই নির্দেশে গৌরী এসে নরেন্দ্র ও শিবনাথকে খেতে দেয়।

দুধের ক্ষীর—চিঁড়া—কদলী ও শর্করা প্রচুর পরিমাণে।

একে তো শিবনাথের সকালের দিকে আহারের কোন অভ্যাস নেই তার উপরে এত—সে মাথা নেড়ে বলে, না মা, এত আমি এখন খেতে পারবো না—

না, না,—খুব পারবে—কি আর এমন দেওয়া হয়েছে—নাও খেয়ে নাও, দুর্গা দেবী বলেন।

তথাপি শিবনাথ প্রতিবাদ জানায়, না মা, পারবো না—

বেশ, তবে তুমি যা পারো তাই খাও।

এবং খেতে খেতেই দুর্গা দেবী এক সময় প্রশ্ন করেন, তাহলে তুমি বলছিলে যে কাল রাত্রে বৌবাজারে জীবনকৃষ্ণ না কে থাকে তার ওখানেই এখন যাবে শিবনাথ?

শিবনাথ কথাটা শুনে হঠাৎ চমকে উঠে বলে, অ্যাঁ—

বলছিলাম তুমি জীবনকৃষ্ণের ওখানেই যাবে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

সেখানে যদি কোন অসুবিধা হয় তো—এখানেও এসে থাকতে পারো তুমি—

নরেন্দ্র ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না—মার কথাগুলোর অর্থ ঠিক সে বুঝতে পারে না। তাই বোধ করি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকায়।

শিবনাথ জবাব দেয়, না মা, সেখানে আমার কোন অসুবিধা হবে না—সে আমার বিশেষ বন্ধু তাছাড়া দু একবার আগেও আমাকে তাদের ওখানে গিয়ে থাকবার জন্য বলেছে। ওর বাবা কালীকৃষ্ণবাবু ককৃরেল ট্রেল এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান—রীতিমত ধনী—

কার কথা বলছিস শিবনাথ, জীবনকৃষ্ণর বাবার কথা? জিজ্ঞাসা করে নরেন্দ্র।

হ্যাঁ।

তুই সেখানে থাকবি?

হ্যাঁ।

সুন্দর সাহেবের ওখানে ছিলি তো তুই—

ছিলাম তো।

তবে? সেখানে বুঝি অসুবিধা হচ্ছে?

হ্যাঁ মানে—শিবনাথ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কতটুকু বলা যেতে পারে তার বন্ধু নরেন্দ্রকে—বুঝতে পারে না কতটুকু ইতিপূর্বে দুর্গা দেবী ছেলেকে বলেছেন।

নরেন্দ্র আবার প্রশ্ন করে, কি অসুবিধা হচ্ছিল রে সেখানে?

বড্ড দূর—

তাই—

হ্যাঁ—স্কুল থেকে যাতায়াত করতেই অনেক সময় চলে যায়—

আহারাদির পর বিদায়ের পূর্বে শিবনাথের একবার ইচ্ছা হয় মৃন্ময়ার সঙ্গে দেখা করে যায়, কিন্তু কেন যেন কথাটা কিছুতেই মুখ ফুটে দুর্গা দেবীর সামনে উচ্চারণ করতে পারে না।

কেমন যেন একটা লজ্জা এসে তার কণ্ঠরোধ করে।

দুর্গা দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, তবে যাই মা—

এসো বাবা—

কিন্তু চলতে গিয়ে শিবনাথ দাঁড়িয়ে থাকায় দুর্গা দেবী প্রশ্ন করেন, কিছু বলবে?

না—

সময় পেলে মধ্যে মধ্যে এসো—

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় শিবনাথ, আসবো—

আর কোন রকম অসুবিধা কিছু হলে এসে আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না বাবা—আমার নরেন্দ্র যেমন, তুমিও আমার কাছে তেমনটি—

আর দাঁড়ানো ভাল দেখায় না। শিবনাথ পায়ে পায়ে অতঃপর অন্দরের থেকে বহির্মহলের দিকে পা বাড়ায়।

যেতে যেতে তার তৃষিত দুটি চোখের দৃষ্টি একটি পরিচিত, আকাঙ্ক্ষিত মুখের দর্শনেচ্ছায় এদিক ওদিকে ফেরে, কিন্তু সেই পরিচিত মুখখানি কোথাও চোখে পড়ে না।

মৃন্ময়ীকে একটিবার বলে যাওয়া হলো না সে চলে যাচ্ছে।

মৃন্ময়ী হয়ত মনে মনে দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে!

হয়তো রাগ করবে—অভিমান করবে তার উপরে! বলবে হয়তো চলে গেলে অথচ আমার সঙ্গে একটিবার দেখাটি করে গেলে না!

একবার মনে হয় বুঝি যাই ফিরে যাই···গিয়ে বলি, মৃন্ময়ীকে একটিবার ডেকে দেবেন মা!

কিন্তু মনের বাসনা অনুচ্চারিত মনের বন্ধ কপাটের ওপরেই আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে, বাইরে তার প্রকাশ পায় না।

ধীরে ধীরে অন্দরমহল থেকে বহির্মহলে, সেখান থেকে কাছাড়ি বাড়ি—তারপর দেউড়ি—শিবনাথ রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ—চারিদিকে প্রখর সূর্যের আলো ঝলমল করছে। যে রাজপথটা গতকাল রাত্রে ছিল অন্ধকার জনপ্রাণীহীন—কেমন স্তব্ধ ভয়াবহ, এখন আর সে সব কিছুই নেই, বড়বাজার অঞ্চল গম গম করছে।

মানুষজন গাড়ি ঘোড়া পাল্কি—ভিড় রীতিমত।

কোনমতে তারই মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক ভাবে বৌবাজারের দিকে এগিয়ে চলে শিবনাথ।

জীবনকৃষ্ণ তার বিশেষ বন্ধু—শুধু বন্ধুই নয়, তাকে বিশেষ স্নেহও করে। আর শিবনাথের তো কথাই নেই, তাকে গুরুর মত ভক্তি করে।

কি বুদ্ধি—কি চমৎকার বিচার বিশ্লেষণ ও জ্ঞান জীবনকৃষ্ণর।

চোখ দুটো যেন আগুনের শিখা।

কিন্তু মৃন্ময়ী! মৃন্ময়ীর সঙ্গে আসবার সময় একটিবার দেখা হলো না! যদি

সে দুর্গা দেবীকে একটিবার দেখা করার কথা বলত তো কি এমন হতো?

নিশ্চয়ই মনে তিনি কিছু করতেন না।

কিন্তু সে পারল না। দুর্নিবার-লজ্জা এসে তাকে বাধা দিল। লজ্জা—সত্যিই এমন লজ্জা এলো যে কিছুতেই মুখ খুলতে পারল না।

সুন্দর সাহেবের কথাও মনে পড়ে।

এতক্ষণ হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা তার গোচরীভূত হয়েছে—তন্ন তন্ন করে হয়তো তাদের দুজনকে খুঁজছে সে।

সুন্দর সাহেব কি আর বুঝতে পারবে না এ তারই কাজ! সে-ই মৃন্ময়ীকে নিয়ে চলে এসেছে রাত্রে!

তখন কি সে সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে?

প্রথমে হয়তো অরিন্দম সরকারের ওখানেই সে যাবে তার খোঁজে—তারপর সেখানে না পেলে হয়তো গিয়ে উপস্থিত হবে তার স্কুলে।

হেয়ার সাহেবের কানেও হয়তো কথাটা তুলবে তখন।

হেয়ার সাহেব যদি জানতে পারেন কথাটা! হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো পথের মাঝখানেই শিবনাথ। পথশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে সারা কপালে।

॥ ৩ ॥

শিবনাথ হাঁটতে হাঁটতে একসময় জীবনকৃষ্ণদের গৃহদ্বারে এসে যখন উপস্থিত হলো, বেলা তখন অনেকটা হয়েছে।

জীবনকৃষ্ণর পিতা বেনিয়ান কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই শহরের মধ্যে একজন বিশিষ্ট-পরিচিত ধনী লোক।

কক্‌রেল ট্রেল এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান।

বৌবাজারে মস্ত বড় তিনমহলা বাড়ি।

শিবনাথ ভেবেছিল অত বেলায় হয়তো জীবনকৃষ্ণকে সে পাবে না—সে হয়তো কলেজে বের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল তার চিন্তাটা অমূলক। জীবনকৃষ্ণ সেদিন কলেজেই যায় নি।

বহির্মহলে বসে দু-চারজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর সঙ্গে কি সম্পর্কে যেন উচ্চকণ্ঠে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছিল।

জীবনকৃষ্ণর শেষের কথাগুলো ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কানে আসে ওর।

জীবনকৃষ্ণ বলছিল, তোমরা দেখে নিও এই আমি বলে রাখলাম, লর্ড আমহার্স্ট লোকটা ছিল ভীতু, কিন্তু এই নতুন গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক—

এ লোকটা বিবেচক ও বুদ্ধিমান এবং কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়—শুধু ঐ সহমরণপ্রথা নিবারণই নয়-ঠগী দমন—ইংরাজী শিক্ষার আরো প্রচলন ও করবেই—

ঠিক ঐ সময় শিবনাথ এসে ঘরে পা দেয়। তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সোল্লাসে বলে ওঠে জীবনকৃষ্ণ, এই যে শিবনাথ, এসো, এসো—শুনেছো তো তোমাদের সকলের সেই অঘটন সংঘটিত হলো শেষ পর্যন্ত—

অঘটন? কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করে শিবনাথ জীবনকৃষ্ণের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

হ্যাঁ হে—শুধু অঘটন সংঘটিত নয়, রাজা রাধাকান্ত দেবের দলের সকলের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে—লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ সম্পর্কে নতুন রেগুলেশন জারী করার সঙ্গে সঙ্গে—

নতুন রেগুলেশন?

হ্যাঁ হে—দেখ না দেখ, এই যে দেখ—লর্ড বেন্টিঙ্ক রাজা রামমোহন ও তাঁদের দলের প্রার্থনায় সতীদাহ প্রথা এদেশে আইনত অসিদ্ধ ও দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করেছেন—

সত্যি—

হ্যাঁ—

কই—দেখি—দেখি—

হাতে একটা কাগজ ধরা ছিল জীবনকৃষ্ণর—সেটার দিকে তাকিয়ে সে বলে, শোন, আমি পড়ি—

অতীব উৎসাহের সঙ্গে জীবনকৃষ্ণ পড়তে শুরু করে উচ্চকণ্ঠে: It is hereby declared, that after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment. Regulation of 4th December 1829.

ব্রেভো—হিয়ার-হিয়ার! শ্রোতার দল উল্লাসে আনন্দে গলা তুলে চিৎকার করে ওঠে জীবনকৃষ্ণ রেগুলেশনটা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই।

শিবনাথ আনন্দে গদ গদ হয়ে বলে, তাহলে সত্যি সত্যি এ দেশ থেকে

আমাদের পৈশাচিক সতীদাহ প্রথাটা উঠলো? উচ্ছেদ হলো এতদিনকার বর্বর একটা প্রথার—

জীবনকৃষ্ণ বলে, হ্যাঁ, উঠলো—বর্বর সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ হলো। Barbarism—inhuman torture—উঃ—I can't think of it—ভাবতেও গা শিউরে ওঠে—কি নৃশংস—কি নারকীয়, একটা অসহায় মেয়েকে জোর করে ধরে ধর্মের মিথ্যা অর্থহীন অন্ধ গোঁড়ামিতে তার মৃত স্বামীর সঙ্গে হাত পা বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা—একই চিতায়—

জীবনকৃষ্ণর অন্যতম বন্ধু রাজীবলোচন ঐ সময় ঘরে ঢুকলো।

সে বলে, কিন্তু ভাই যারা সব কিছুর চাইতে ধর্মকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলে জানে এবং সেই ধর্মের জন্য যারা হাসতে হাসতে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিয়েছে—

থাম তুমি রাজীবলোচন, ধমকে যেন থামিয়ে দেয় জীবনকৃষ্ণ রাজীবলোচনকে, হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে—তাদের হাসানো হয়েছে, forced to laugh—অনন্যোপায়ে তারা হেসেছে—ওর নাম হাসা নয়—বুকভাঙা কান্নায় দাঁত দেখান—

এ তুমি কি বলছো জীবনকৃষ্ণ?

ঠিকই বলছি। তারা যদি তোমার কথামত প্রথমটায় হেসেও থাকে, পরে জেনো চিতার আগুন স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদেছে। আর তোমরা, ধর্মধ্বজীরা জোরে ঢাক ঢোল কাঁসর বাজিয়ে তাদের সেই চিৎকার কারো কানে যাতে না পৌছায় তার ব্যবস্থা করেছো, brute—inhuman—

ঠিক—ঠিক বলেছো জীবনকৃষ্ণ—তার সমর্থনকারীরা সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠে, You are correct.

বেশ—হঠাৎ রাজীবলোচন বলে ওঠে, তা যেন হলো—রেগুলেশন করে না হয় তাদের মৃত্যু বন্ধ করলে। কিন্তু এবারে তারা কি করবে বলতে পার?…

তার মানে? সবিস্ময়ে জীবনকৃষ্ণ রাজীবলোচনের মুখের দিকে তাকায়।

মানে—তাদের—যারা মানে অল্প বয়েসে বিধবা হলো, তাদের কি হবে? বিয়ে তো তাদের কেউ করবে না—তারাও কাউকে বিয়ে আর করতে পারবে না—সমাজের মধ্যে অবহেলিত—

কেন—বিয়ে হবে না কেন, করুক তারা বিয়ে—

কি—কি বললে? চিৎকার করে ওঠে রাজীবলোচন, বিধবারা আবার বিয়ে করবে?

কেন করবে না শুনি? তোমরা এক স্ত্রী থাকতে আর একটা বিয়ে করতে পারো যখন, তখন তারাই বা এক স্বামী মরে গেলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবে না কেন? Why!...

গোল্লায় গিয়েছো জীবনকৃষ্ণ, তুমি একেবারে অধঃপাতে গিয়েছো—ছিঃ ছিঃ, দুহাতে কান চাপা দিয়ে রাজীবলোচন ঘর থেকে বের হয়ে গেল, বিধবার বিয়ে পর্যন্ত তোমরা ভাবছো—কুফল—ইংরাজী শিক্ষার এই কুফল—

জীবনকৃষ্ণ তার একজন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এরা—এই রাজীবলোচনরাই হচ্ছে দেশের শত্রু বুঝলে অবিনাশ। এখনো এদের দল—সেই মান্ধাতা আমলের অন্ধ কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে মরার পর স্বর্গলাভের স্বপ্ন দেখছে আর সেই সঙ্গে দোষ চাপাচ্ছে ইংরাজী শিক্ষার ঘাড়ে—ইংরাজী শিক্ষাই যেন যত অনিষ্টের মূল।

শিবনাথ একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল, সে হঠাৎ ঐ সময় বলে, যে সব অসহায় মেয়েদের ম্লেচ্ছ দস্যুরা ধরে নিয়ে যায় তাদের সমাজ ধর্মচ্যুত করতে পারবে না এমন একটা আইন হয় না জীবনকৃষ্ণ?

হবে—হবে, সব অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে। ধর্মের নামে যত অন্ধ গোঁড়ামি আর কুসংস্কার সব একে একে এদেশ থেকে আমরা তাড়াব।... নতুন দিন আসছে, নতুন শিক্ষা—নতুন সভ্যতা—নতুন ধর্ম—a new age—a new religion—

হবে—সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে কথাটা বলে শিবনাথ তাকায় বন্ধুর মুখের দিকে।

হবে বৈকি। হতেই হবে। দেশের নবযুগ এসেছে—আর সেই নবযুগের সারথি হচ্ছেন ঐ নবাগত ইংরাজ লর্ড বেন্টিঙ্ক আর আমাদের দেশের রাজা রামমোহন, ডিরোজিও আর মহামতি ডেভিড্ হেয়ার—

শেষের দিকে ভাবের দোলায় জীবনকৃষ্ণর কণ্ঠস্বর গদ গদ হয়ে ওঠে।

জীবনকৃষ্ণ বলে, আমি স্বপ্ন দেখি—এ দেশের সমস্ত রকম কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভেঙে সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—নতুন শিক্ষা, নতুন কৃষ্টি—নতুন সভ্যতার আলোয় আমরা নতুন ইতিহাস রচনা করছি!

কথাটা মিথ্যা নয়।

রাজা রামমোহন রায় চিৎপুর রোডে কয়েক মাস পূর্বে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ির বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন—আত্মীয় সভার বন্ধু—কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতির সহায়তায় ও সক্রিয় সমর্থনে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সেখানে যে কেবল ব্রহ্মোপাসনাই হচ্ছে

তা নয়—সেখানে সামাজিক আচার-ব্যবহার, তার দোষ-ত্রুটি এবং তার প্রতিকার নিয়েও আলোচনা চলছে—আর অন্য দিকে বিপ্লব শুরু হয়েছে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর শিক্ষায় তার ছাত্রদের মধ্যে।

তারপর ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েশন—

বাড়ির ভিতর থেকে ভৃত্য এসে ঐ সময় বলে, দাদাবাবু, মা জিজ্ঞাসা করছেন আজ কি আপনার কলেজ নেই ?

ভৃত্যের কথায় হঠাৎ যেন সকলের খেয়াল হয় বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে।

একে একে সকলে বিদায় নেয়, কেবল দাঁড়িয়ে থাকে শিবনাথ।

জীবনকৃষ্ণ শুধায়, শিবনাথ কিছু বলবে ?

বিশেষ বিপদে পড়েছি ভাই জীবনকৃষ্ণ। শিবনাথ সংকোচের সঙ্গে বলে।

বিপদ ! কি বিপদ।

সুন্দর সাহেবের বাড়ি ছেড়ে আমি চলে এসেছি—

কেন বল তো ! লোকটা ম্লেচ্ছ বলে নাকি !

শিবনাথ বলে, না, না— তা নয়—

তবে ?

বিশেষ কারণেই সেখানকার আশ্রয় আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে ভাই—তোমার কাছে এসেছিলাম যদি তুমি একটু থাকবার ব্যবস্থা করে দাও—

কোথায় আর ব্যবস্থা করে দেবো ! ইচ্ছা করলে তুমি আমাদের গৃহে থাকতে পার—

কিন্তু তোমার পিতাঠাকুর—শিবনাথ প্রশ্নটা করে ইতস্তত করে।

তিনি কিছু বলবেন না। আর তাছাড়া এসব দিকে তাঁর নজরই নেই। কে এলো, কে গেল, কে থাকল এসব দেখবার সময়ই বা কোথায় তাঁর ! তা তোমার জামাকাপড় বই খাতাপত্র সব কোথায় ?

আছে—নিয়ে আসি নি সঙ্গে করে।

তা তোমার স্নান আহার হয়েছে, না হয় নি !

ও হবে'খন—

হবে'খন মানে কি—চল, চল—আমার সঙ্গে ভিতরে চল—

শিবনাথ আপত্তি জানায় কিন্তু জীবনকৃষ্ণ তার কোন কথায় কান দেয় না, তাকে একপ্রকার জোর করেই সঙ্গে টেনে অন্দরের দিকে পা বাড়ায়।

স্থান তো পেল শিবনাথ।

দ্বিপ্রহরের দিকে আহারাদির পর বহির্মহলের একটা ঘরে চৌকির উপর শুয়ে ভাবছিল শিবনাথ।

গতরাত্রে চলে আসার সময় তাড়াহুড়োয় মধ্যে বই খাতাপত্র—বস্ত্রাদি কিছুই সঙ্গে করে আনা হয় নি।

সে সময় ওখান থেকে কোনমতে পালানটাই বড় কথা ছিল, কিন্তু এখন তো সব কিছুরই প্রয়োজন।

সব কিছুই নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কেমন করে? সুন্দর সাহেবের গৃহে আবার পা দেওয়ার কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে শিবনাথের।

সেখানে গেলেই হয়তো সুন্দর সাহেব তার টুঁটিটা টিপে ধরবে—বলবে, কোথায় মৃন্ময়ী বল।

কি জবাব দেবে তখন সে!

শীতের অপরাহ্ণেও ঘামতে থাকে শিবনাথ।

আবার সে গৃহে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস শিবনাথের নেই। সুন্দর সাহেব লোকটার মুখের দিকে তাকালেও বুকের ভিতরটা যেন কেমন কেঁপে ওঠে।

কিন্তু বই খাতাপত্রগুলোরও তো প্রয়োজন আছে। নচেৎ সে পড়াশুনা করবে কি করে! সুন্দর সাহেব কোন কোন সময় অবিশ্যি গৃহে থাকে না, কিন্তু সেই চাকরানী দাক্ষায়ণীটা সর্বক্ষণ বাড়িতে আছে।

সে তাকে দেখে ফেললেই হয়তো চিৎকার করে উঠবে। দাক্ষায়ণী ও সুন্দর সাহেব মৃন্ময়ীর ব্যাপারে নিশ্চয় তাকেই সন্দেহ করেছে—সেটাই তো স্বাভাবিক।

সে ছাড়া আর কে মৃন্ময়ীকে সরাতে পারে!

কিন্তু সুন্দর সাহেব থাকলেই বা—সে সোজা গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে সাহেব—তুমি এতদিন আমাকে স্থান দিয়েছিল তার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ—

সুন্দর সাহেব তাকে নিশ্চয়ই বাধা দিতে পারে না—আর দিতে যাবেই বা কেন!

তা হয়ত সে দেবে না, কিন্তু এ কথাটা তো সে জিজ্ঞাসা করতে পারে, আমি তোমায় একদিন বিপদে আশ্রয় দিয়েছিলাম বলেই বুঝি আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহারটা তুমি করলে শিবনাথ! মৃন্ময়ীকে তুমি এখান থেকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে গেলে?

কি জবাব দেবে তখন সে!

জবাব দেবার ও কথায় তার আছেই বা কি!

বলবে নিশ্চয়ই সুন্দর সাহেব, উপকারের চমৎকার প্রত্যুপকার দিলে!

কিন্তু তবু যেতে হবে তাকে! বই খাতাপত্রগুলোর তার দরকার! তাছাড়া সুন্দর সাহেবকে যখন সে এড়াতেই পারবে না তখন একটা এর মীমাংসা হয়ে যাওয়াই ভাল। এমনি করে বাকী জীবনটা একই শহরে থেকে সে কিছু সুন্দর সাহেবকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

সন্ধ্যার দিকে শিবনাথ বের হয়ে পড়ে সুন্দর সাহেবের গৃহের উদ্দেশে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু পশ্চিমমুখো কিছু দূর হাঁটবার পর কখন এক সময় যে আবার ঘুরে পূর্বমুখো হাঁটতে শুরু করেছে শিবনাথ নিজেও জানে না।

কুলীর বাজারের দিকে না গিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে বড়বাজারের দিকে—নরেন্দ্রের গৃহের দিকে।

মনের অজ্ঞাতে মৃন্ময়ীর চিন্তাটাই যে কখন তাকে বিপরীত পথে আকর্ষণ করেছে তা নিজেও বুঝি বুঝতে পারে নি। একটা অন্ধ আকর্ষণে কখন জানি পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে সুরেন্দ্র মল্লিকের গৃহের দেউড়ির সামনে হাজির হয়েছে শিবনাথ।

চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে তখন—ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে সন্ধ্যাপ্রদীপ।

দেউড়ির সামনেটা অন্ধকার—দারোয়ানকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। শিবনাথ ভিতরে প্রবেশ করে।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতই যেন বহির্মহল অতিক্রম করে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ায় আর ঠিক সেই মুহূর্তে মহেশ সামন্তর ভারী গলাটা শোনা গেল, কে যায়—কে যায় ভিতরে—

ভৃত্য তখনো বহির্মহলে বিশেষ করে কাছারি ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে যায় নি।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে। সেই অন্ধকারে চৌকির উপর বিস্তৃত ফরাশের ওপর বসে হুঁকায় তামুক সেবন করছিল মহেশ সামন্ত।

কে গো! কথা বলছো না কেন? মহেশ সামন্ত প্রশ্ন করে।

শিবনাথ ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এবং এতক্ষণের নেশাটা যেন হঠাৎ কেটে গিয়েছে। খেয়াল হয়েছে এতক্ষণে। তাই তো—এ সে কোথায় যেতে কোথায় এসেছে! কুলীর বাজারে সুন্দর সাহেবের গৃহে না গিয়ে বড়বাজারের

মল্লিক মশাইয়ের গৃহে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কেন!

মৃন্ময়ীর কথা ভাবতে ভাবতে? মৃন্ময়ীর অন্ধ আকর্ষণে! নিজের অজ্ঞাতে মনের নিভৃতে এতক্ষণ তাহলে সে মৃন্ময়ীর কথাই ভাবছিল!

কি গো সাড়া দিচ্ছ না কেন? কে?

মহেশ সামন্ত আবার প্রশ্ন করে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হরনাথের সত্যিই যেন বিস্ময়েরই অবধি নেই।

সুলোচনা—সেই সুলোচনা যে একদিন তার অন্যায়কে সহ্য করতে না পেরে তাকে সে ইহজীবনের দেবতা জ্ঞান করা সত্ত্বেও বর্জন করেছিল সেই সুলোচনার মুখে আজ একি কথা। সুলোচনা ক্ষীরোদাকে গৃহে নিয়ে আসবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে তাকে!

হরনাথের বুকের ওপরে মাথাটা রেখে পড়েছিল সুলোচনা আর তার দু চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

সুলোচনা—

বলো—

স্থির হও—তোলো, মাথা তোলো। চোখের জল মোছ—

আকস্মিক ভাবাবেগে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সুলোচনা বুঝি কয়েকটা মুহূর্তের জন্য, স্বামীর কথায় নিজেকে আবার সামলে নেয়।

স্বামীর বুকের ওপর থেকে মাথাটা তুলে নিয়ে চোখের জল মোছে আঁচলে।

পাপ কারো নয় সুলোচনা—পাপ আমারই—নচেৎ এমনটাই বা হবে কেন তুমি বেঁচে থাকতেও এই যে আমি বার বার অন্য নারীতে আসক্ত হয়েছি—কেমন করে হলাম তাই ভাবি—

থাক। ও কথা থাক—তোমার দোষ কি বল?—

না সুলোচনা, অন্যায়কে চোখ বুজে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেই কিছু এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এবং আমিই যখন অন্যায় করেছি আমাকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার জন্য আমি প্রস্তুতও। কিন্তু কয়দিন ধরে সেই কথাটিই ভাবছি—কি সে প্রায়শ্চিত্ত—কেমন করে সে অন্যায়—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার—

তাই তো বলছিলাম, চল তাকে এখানে নিয়ে আসি—

ছিঃ, তাই কি আজ আর হয়! সুনয়নার কাছে কি জবাবদিহি করবো—মুখ বুজে এতদিন সে থাকলেও ক্ষীরোদার সঙ্গে সম্পর্কটা সে বুঝতে পারে নি এত অল্প বয়স তো তার নয়—না সুলোচনা, তা আর হয় না।

কিন্তু তুমি আজ তাকে না দেখলে কে আর দেখবে সে অভাগিনীকে—আজ তুমি ছাড়া কে তার আর আছে—

সুলোচনার কথাটা শেষ হলো না—গৃহপ্রাঙ্গণে একটি অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মিশ্র মশাই গৃহে আছেন নাকি?

কে!

আজ্ঞে একটিবার অনুগ্রহ করে যদি বাইরে আসেন—

হরনাথ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়—এত রাত্রে কে আবার এলো তার গৃহে। তাছাড়া দরজাটাই বা খুলে দিল কে?

উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল হরনাথ যে সে-ই রাত্রে গৃহে প্রবেশের পর দরজাটা দিতে ভুলে গিয়েছিল। আবছা আলোছায়ায় কে একজন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে নজরে পড়ে হরনাথের।

কে গো?

মিশ্র মশাই কি গৃহে আছেন? বিনীত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে আগন্তুক।

মশাইয়ের নাম—পরিচয়, কোথা থেকে আগমন হচ্ছে? আবার শুধায় হরনাথ।

কিন্তু আগন্তুক পুনরায় সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে, মিশ্র মশাই কি আছেন—এই গৃহই তো মিশ্র মশাইয়ের—

হ্যাঁ, এই গৃহই—আমিই হরনাথ মিশ্র—

আপনিই মিশ্র মশাই, প্রণাম—আজ্ঞে আমাকে আর আপনি বলবেন না। আমি সামান্য ভৃত্য—আপনাদের শ্রীচরণের দাস—অধীনের নাম মানিক ঢোল—

তা কোথা হতে আসছো বাপু—আমার কাছে প্রয়োজনই বা কি!

আজ্ঞে আমার মুনিব ঠাকরুন আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—

মুনিব ঠাকরুন?

আজ্ঞে, বাঈজী কস্তুরীবাঈ—

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—সারাটা শহরে কে না নৃত্যগীতপটিয়সী অসামান্য সুন্দরী কস্তুরীবাঈয়ের নামটা জানে। বড় বড় ধনী বাবু মশাইদের গৃহে মাইফেল যাকে নিয়ে জমে ওঠে—যার গান শোনার জন্য—চোখে একটিবার যাকে

দেখবার জন্ত শহরের লোক পাগল সেই কস্তুরীবাঈয়ের ভৃত্য মানিক তার মত লোকের গৃহে এত রাত্রে! কয়েকটা মুহূর্ত বুঝি বাক্য সরে না হরনাথের। তার কাছে কস্তুরীবাঈয়ের কি প্রয়োজনটা থাকতে পারে—

চেনা তো দূরে থাক সে তো আজ পর্যন্ত কস্তুরীবাঈকে চোখের দেখাও দেখে নি।

ঠাকুর মশাই—

তা বাপু আমার কাছে তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন কেন বল তো?

আজ্ঞে আপনার নামে একটি পত্র দিয়েছেন তিনি—

পত্র—

আজ্ঞে—আর শুধু পত্রই নয় সঙ্গে তিনি তাঁর পাল্কি পাঠিয়েছেন—

পাল্কি পাঠিয়েছেন! কেন?

আপনাকে নিয়ে যাবার জন্ত—

সে কি বাপু—আমি—

আজ্ঞে এই পত্রটা পাঠ করে দেখুন—বলতে বলতে সসম্ভ্রমে একটি ভাঁজ করা পত্র হরনাথের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলো মানিক, পত্রখানি পাঠ করলেই হয়তো আজ্ঞে আপনি সব জানতে পারবেন।

কেমন যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পায়ের সামনে রাখা ভাঁজ করা পত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকেন হরনাথ।

কি বলবেন, কি করবেন কিছুই যেন তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় সুলোচনাও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং তার কানে সব কথাই প্রবেশ করে।

সে-ই বলে, দেখো না পত্রে কি লেখা আছে—

আজ্ঞে হঁ্যা—মানিক বলে, দেখুন আজ্ঞে—আমি ততক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করছি—তবে বাঈ বলে দিয়েছেন বড় জরুরী, একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

মানিক ঢোল বাইরে চলে গেল অতঃপর।

হরনাথ নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা পত্রখানি তুলে নিল।

চল, ঘরে চল—

কস্তুরীবাঈ তাকে পত্র দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে—কিন্তু কেন!

তাকে চেনা দূরে থাক আজ পর্যন্ত কোনদিন যে চোখেও দেখে নি—দু-চারবার নামটা শুধু লোকের মুখে শুনেছে।

কিন্তু।

সুলোচনা আবার তাগিদ দেয় স্বামীকে, চল না—ভিতরে গিয়ে আলোয় পত্রটা পড়েই দেখো না—। হয়তো সত্যিই কোন বিশেষ প্রয়োজনে—

হরনাথ অতঃপর ধীরপায়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল এবং ঘরের আলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে পত্রের ভাঁজটা খুলে পড়তে শুরু করে।

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু ঠাকুর মশাই,

শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন দাসীর সর্বাগ্রে। তারপর দাসীর নিবেদন এই শ্রীচরণে—হতভাগিনী ক্ষীরোদার অন্তিমকাল উপস্থিত। এ রাত্রি অতিবাহিত হয় কিনা সন্দেহ। হতভাগিনী গঙ্গার ঘাটে পড়িয়া মরিতেছিল, কোনমতে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় আমার গৃহে তাহাকে লইয়া আসিয়াছি। অজ্ঞান—তবে মধ্যে মধ্যে সামান্যক্ষণের জন্য যখনই জ্ঞান হইতেছে হতভাগিনী—পাপীয়সী আপনারই নাম স্মরণ করিতেছে—বলিতেছে কেবল, ঠাকুর এসো—তোমার ঐ পা দুখানি আমার মাথার ওপরে রাখ—।

আমি জানি একদিন সে আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল—তার পর হয়তো নিজের দোষেই সেই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিতা হইয়াছে। যত অপরাধই সে আপনার শ্রীচরণে করিয়া থাকুক আজ তাহাকে ক্ষমা করিয়া যদি একটিবার আসিয়া তাহাকে এই শেষ মুহূর্তে একটু পদধূলি দিয়া যান হতভাগিনীর হয়তো অক্ষয় স্বর্গবাস হইবে।

সঙ্গে পাল্কি পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া সত্বর আসিলেই ভাল হয়, দাসীর অপরাধ লইবেন না।

শতকোটি প্রণামান্তে
কস্তুরীবাঈ

একবার দুবার তিনবার পত্রটা আগাগোড়া পাঠ করে হরনাথ।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করে, কি লিখেছে পত্রে ?

দেখো পড়ে—

পত্রখানি এগিয়ে দেয় হরনাথ স্ত্রী সুলোচনার হাতে। সুলোচনা পত্রটি পাঠ করে স্বামীর দিকে ফিরে তাকায়।

সুলোচনা ?

বল !

কি করি আমি—

কি আবার করবে, শান্ত কণ্ঠে সুলোচনা বলে, যাবে—

যাবো!

হ্যাঁ—

কোথায়?

কেন—ক্ষীরোদার কাছে—

কিন্তু সুলোচনা—

জানি তুমি কি ভাবছো, কিন্তু না গেলেও মহাপাপ হবে—

সুলোচনা—

হ্যাঁ—সত্য হোক মিথ্যা হোক, ন্যায় হোক অন্যায় হোক, পাপ হোক পুণ্য হোক—সে যেমন একদিন তোমাকেই আশ্রয় করেছিল তেমনি তুমিও তো তাকে আশ্রয় দিয়েছিলে—

সুলোচনা—একটা চাপা আর্তনাদ যেন হরনাথের কণ্ঠ চিরে বের হয়ে আসে।

সুলোচনা বলে, সে সেই রাত্রে যাই করে থাকুক সে তার সহজাত নারী প্রবৃত্তিতেই করেছিল—একজন মেয়েমানুষের পক্ষে সে যে কত বড় বঞ্চনা—আর তার যে কি দুঃখ আর কেউ না জানুক আমি জানি। তাই আমি শুধু বলবো তোমাকে যেতে—

কিন্তু সুলোচনা—

আর জেনো যদি না যাও তো এত বড় অধর্ম আর হবে না।···

যাবো তবে?

হ্যাঁ যাবে বৈকি!

তাহলে—তবু বুঝি ইতস্তত করে হরনাথ—তবু বুঝি সংকোচ যায় না।

সুলোচনা বলে, আর দেরি করো না, যাও—

হরনাথ চাদরটা কাঁধে ফেলে লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ডাকে, কোথায় হে বাপু—

আজ্ঞে এই যে আমি, মাণিক সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভিতরে এসে প্রবেশ করে।

চল।

আজ্ঞে চলেন—

মাণিকের সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যায় হরনাথ। আর রাত্রির স্তব্ধ নির্জনতায় নির্জন দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিটা ধরে পাষাণপ্রতিমার মত দরজাটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুলোচনা।

পাল্কিতে কিন্তু ওঠে না হরনাথ।

বলে, না হে চল—হেঁটেই যেতে পারব আমি—

কিন্তু ঠাকুর মশাই পথটা অনেকখানি—

তা হোক চল—পা চালিয়ে গেলে কতক্ষণ আর লাগবে।

হন হন করে হাঁটতে শুরু করে হরনাথ।

মাণিক ও পশ্চাতে পাল্কি বাহকেরা শূন্য পাল্কি কাঁধে বয়ে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে।

রাত্রির তৃতীয় যাম।

এখনো প্রত্যুষের দেরি আছে—বিশ্বচরাচর নিদ্রামগ্ন—কেউ কোথাও জেগে নেই।

জনহীন রাস্তা।

কয় জোড়া পদশব্দ শুধু সেই নির্জনতায় বিচিত্র এক শব্দ জাগাতে থাকে। হরনাথ পথ চলতে চলতেই ভাবে, আশ্চর্য নারী ঐ সুলোচনা—একমাত্র সুলোচনার পক্ষেই বুঝি তাকে আজ ক্ষমা করা সম্ভব ছিল।

জীবনে তার প্রথম নারী ঐ সুলোচনা—বলতে গেলে একমাত্র স্ত্রী। অন্য নারী তার জীবনে এসেছে বটে—গ্রহণও করেছে সে তাদের কিন্তু সুলোচনা যেন অনন্যা—সুলোচনার যেন সত্যিই কোন তুলনা নেই।

আজ সুলোচনা ছাড়া কি কেউ তাকে এমনি করে ক্ষীরোদার মৃত্যুশয্যার পাশে পাঠিয়ে দিতে পারত।

অথচ সুলোচনা কি পেয়েছে আজ পর্যন্ত তার কাছে। কি তাকে দিতে পেরেছে হরনাথ।

লজ্জা—অপমান—বেদনা ছাড়া আর কি দিয়েছে সুলোচনাকে হরনাথ।

তবু আশ্চর্য—সুলোচনার ক্ষমার অন্ত নেই।

দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা পথ হেঁটে হরনাথ কস্তুরীবাঈয়ের গৃহদ্বারে এসে পৌছায়। ত্রিযামা রাত্রি তখন শেষ হতে চলেছে।

পূর্বাশার প্রান্তে একটা আবছা আলোর আভাস যেন থির থির করে কাঁপছে।

এই বাড়ি—মাণিক বললে, ভিতরে যান ঠাকুর মশাই—

হরনাথ ভিতরে প্রবেশ করলেন, মাণিক তাঁকে অনুসরণ করে।

নীচের তলাতেই একটা ঘরে ভূশয্যায় ক্ষীরোদা শুয়ে ছিল। কোন মতে

গঙ্গাতীর থেকে বহন করে এনে মাটিতেই একটি শয্যা পেতে ক্ষীরোদাকে কস্তুরী বাঈ শুইয়ে দিয়েছিল।

তারপর আর নাড়া-চাড়া করতে সাহস পায় নি।

কবিরাজ এসে দেখেও রোগিণীকে নাড়া-চাড়া করতে বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নাড়ীর গতি অতীব ক্ষীণ—অত্যন্ত দুর্বল—রোগিণী ঠিক যেমন আছে তেমনি থাকবে এতটুকু নাড়া-চাড়াও যেন না করা হয়।

আশা আছে তো কবিরাজ মশাই? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল কস্তুরীবাঈ।

কবিরাজ মাথা দুলিয়ে বলেছিলেন, মিথ্যা স্তোক দিয়ে তো কোন লাভ নেই মা—আর বড় জোর একটা কি দুটো দিন—

ঔষধ দিতে চান নি কবিরাজ। কিন্তু ছাড়ে নি কস্তুরী। বলেছিল, ঔষধ দিন—

দিতে বলছো আমি দিচ্ছি তবে কোন ঔষধেই এখন আর ওর কিছু হবে বলে মনে হয় না—

সত্যিই হতভাগিনী মেয়েটাকে বুঝি ভালবেসেছিল নর্তকী কস্তুরীবাঈ। হতভাগিনীর দুঃখ ওর হৃদয়কে সত্যিই দোলা দিয়েছিল।

সেদিন তাই প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে সিঁড়িটার ধারে অচৈতন্ত জীর্ণ ধূলিমলিন বস্ত্রে ক্ষীরোদাকে পড়ে থাকতে দেখে কেঁদে ফেলেছিল কস্তুরী।

চিনতে তার কষ্ট হয় নি ক্ষীরোদাকে।

গঙ্গা-স্নান করে কালীঘাটে পূজো দেবে বলে গিয়েছিল কস্তুরী কিন্তু গঙ্গা-স্নান পূজো সব রয়ে গেল মাথায়—দাসীর ও ভৃত্য মাণিকের সাহায্যে কোন মতে অচৈতন্য ক্ষীরোদাকে নিজের পাল্কিতে তুলে নিজ গৃহে নিয়ে আসে।

অচৈতন্য ক্ষীরোদা শুধু মধ্যে মধ্যে একটি কথা বলছিল—তাও অস্পষ্ট—ক্ষীণ—শুনতে পাওয়া যায় কি যায় না।

প্রথমটায় তো বুঝতেই পারে নি কস্তুরী—অনেকক্ষণ কান পেতে থেকে তবে বুঝতে পেরেছিল সে।

ঠাকুর এসো—তোমার ঐ পা দুটো আমার মাথার ওপরে রাখ।

বুঝতে পারে নি প্রথমটায় কথার অর্থটা কস্তুরী—হঠাৎই পরে এক সময় কথাগুলো যেন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ক্ষীরোদার ইতিহাসটা মনের পাতায় ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কথার অর্থ টাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে।

একটা চিঠি লিখে পাল্কি দিয়ে মাণিককে হরনাথ মিশ্রর গৃহে প্রেরণ করে কস্তুরী।

॥ ২ ॥

ক্ষীরোদার মুখ থেকেই একদিন কস্তুরী হরনাথ মিশ্রের গৃহের ঠিকানাটা শুনেছিল।

মাণিককে চিঠি দিয়েও বলে দেয় বার বার করে, যেমন করেই হোক ঠাকুর মশাইকে আনা চাই-ই। বুঝেছিস তো আমার কথা—

বুঝেছি মা। মাণিক ঘাড় নাড়ে।

ঘরের এক কোণে মৃৎপ্রদীপ জ্বলছিল পিলসুজের উপরে মিটিমিটি। প্রদীপের ম্লান আলো ভূমির ওপরে শয্যায় শায়িতা অচৈতন্য ক্ষীরোদার মুখে এসে পড়েছে।

ক্ষীরোদাকে আজ আর চেনবারও উপায় নেই।

চামড়া দিয়ে ঢাকা দেহের প্রতিটি হাড় এক দুই করে গোনা যায়। শয্যার সঙ্গে যেন একেবারে মিশিয়ে গিয়েছে।

শিয়রের ধারে মাথা নীচু করে ক্ষীরোদার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্নিমেষে বসে ছিল কস্তুরীবাঈ।

আজ দুদিন থেকে কস্তুরীর স্নানাহার পর্যন্ত নেই।

মাণিককে পাঠাবার পর থেকে কস্তুরীর মনে হচ্ছিল ক্ষীরোদা যেন আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

সত্যিই ক্ষীরোদা ক্রমশঃ আরো বেশী নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল।

শ্বাস-প্রশ্বাসও আরো মন্দ হয়ে আসছিল। কবিরাজ মশাই মিথ্যা বলেন নি—বুঝতে পারছিল কস্তুরী।

প্রদীপ নিভে আসছে।

কথা জড়িয়ে আরো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—শুধু একটি কথাই শোনা যাচ্ছিল তখন, ঠাকুর এসো, ঠাকুর এসো—

পদশব্দে কস্তুরী মুখ তুলে তাকাল।

মাণিকের সঙ্গে হরনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। হরনাথকে পূর্বে কখনো দেখে নি কস্তুরী—চিনতে পারে না তাই।

মাণিকই বলে, মা, ঠাকুর মশাই এসেছেন—

কস্তুরী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়, এসেছেন ঠাকুর—একটু আগেও আপনাকেই ডাকছিল—হতভাগিনীর মাথায় পা-টা একটিবার আপনি রাখুন—

হরনাথ এগিয়ে যায়।

তাকায় ক্ষীরোদার দিকে। এই কি সেই ক্ষীরোদা—যৌবন ঢল ঢল লাবণ্যময়ী ক্ষীরোদা!

স্তম্ভিত নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে হরনাথ ক্ষীরোদার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতই তার শয্যার পাশে—

ঠাকুর মশাই, মাথায় ওর পা-টা আপনার রাখুন—

হরনাথ ক্ষীরোদার শিয়রের ধারে ধীরে ধীরে বসল।

ডাকল, ক্ষীরোদা—দেখ আমি এসেছি—

—আর ও সাড়া দেবে না ঠাকুরমশাই—প্রাণটুকু থাকতে থাকতে ওর জীবনের শেষ বাসনাটা পূর্ণ করুন—ওর মাথায় আপনার চরণ রাখুন—

হরনাথ ডান পা-টা একবার ছোঁয়াল ক্ষীরোদার মাথায়।

আশ্চর্য! ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষীরোদা একবারের জন্য চোখ মেলে তাকিয়েই চোখ বুজিয়ে নিল।

তার বোজা চোখের কোল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ওর সমস্ত দেহটা বারেকের জন্য বুঝি কেঁপে উঠল। তারপরই সব স্থির হয়ে গেল।

মুহ্যমানের মত বসেছিল হরনাথ।

কস্তুরীই এক সময় মৃদু কণ্ঠে ডাকে, ঠাকুর মশাই—

মুখ তুলে তাকাল হরনাথ কস্তুরীর দিকে।

একটা কথা বলবো ঠাকুর মশাই?

বল!

হতভাগিনীর প্রতি যখন আপনি এতই দয়া করলেন—আর একটু দয়া করলে হয়ত আপনাদের শাস্ত্রানুযায়ী ওর স্বর্গে প্রবেশের অধিকার না থাকলেও মনে শান্তি পাবে—

হরনাথ চেয়ে থাকে কস্তুরীবাঈয়ের মুখের দিকে, সাধারণ একজন পতিতা নারীর মত কথাগুলো তো নয়।

বলে হরনাথ, দয়ার কথা থাক বাঈজী—কি করতে হবে বল?

বলছিলাম, কস্তুরী বলে, ওর মুখাগ্নিটুকু যদি করেন।

হরনাথ মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, বেশ—

শুধু মুখাগ্নিই নয় হরনাথ ক্ষীরোদার রোগজীর্ণ মৃত্যুশীতল দেহটা চিতায় তুলে দিয়ে নিজ হাতেই মুখাগ্নি করল।

দেখতে দেখতে সর্বগ্রাসী হুতাশন ক্ষীরোদার দেহকে ঘিরে লক লক করে ওঠে।

দাউ দাউ করে চিতা জ্বলতে থাকে।

হরনাথের দিকে তাকিয়ে কস্তুরী বলে, আর আপনাকে কষ্ট দেব না ঠাকুর মশাই, অনেক কষ্ট আপনাকে দিয়েছি। এবার আপনি যেতে পারেন—শ্মশানের বাইরেই আমার পাল্কি অপেক্ষা করছে, পৌঁছে দেবে আপনাকে গৃহে।

হরনাথ কোন জবাব দিল না—নিঃশব্দে প্রজ্বলিত চিতা থেকে কিছু দূরে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে বসল।

একটা বড় বটগাছের ছায়ায় জায়গাটা ছায়াবৃত।

অদূরে ক্ষীরোদার চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর সামনেই ভাগীরথী বয়ে চলেছে একটানা।

জোয়ারের শেষে বোধহয় ভাঁটি শুরু হয়েছে, পলি মাটি জাগিয়ে জল অনেকটা নেমে গিয়েছে।

মাথার ওপরে সূর্য অগ্নিবর্ষণ করছে যেন।

এই তো মানুষের জীবন!

শুধু দুদিনের খেলা, সংসার-সংসার খেলাঘর। তার জন্য কতই না আয়োজন—কত রঙ, কত হাসি—কত মিথ্যা—কত সংস্কার—

সবই তো ঐ রকম করে একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ক্ষীরোদা চলে গেল—তাকেও একদিন যেতে হবে। সুনয়নার মাও একদিন অমনি করেই চলে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কথাই মনে পড়ে হরনাথের।

ক্ষীরোদার প্রতি কি সত্যিই সে অবিচার করেছে—সত্যিই কি অপরাধী সে ক্ষীরোদার কাছে!

আজ মনে হচ্ছে ক্ষীরোদার ঐ চিতাগ্নির দিকে তাকিয়ে ক্ষীরোদার প্রতি সত্যিই সে অপরাধী—শুধু ক্ষীরোদা কেন—সুলোচনার কাছেও সে অপরাধী——দাক্ষায়ণীর কাছে অপরাধী—নয়নতারার কাছেও সে অপরাধী—আর আরো

একজনের কাছেও সে অপরাধী—আরো একজনের কথা আজ হঠাৎই যেন মৃত্যুর সামনাসামনি বসে মনে পড়ে হরনাথের।

সেই কালো কষ্টিপাথরের মত এক শিশু—যে শিশু তার নিকট হতেও নিকটতম—পরমাত্মীয়, যে তারই আত্মজ—তারই সন্তান সেই সন্তান—তার কাছেও কি তার অপরাধের সীমা-পরিসীমা আছে!

ধর্মান্ধতা—অন্ধ কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে তাকেও সে বলি দিয়েছে একদিন।

কি ভয়াবহ ব্যাপার, জীবন্ত এক অসহায় শিশুকে সলিলসমাধি দিয়েছে।

আজ মনে হচ্ছে যেন হরনাথের—জীবনের সমস্ত অপরাধের হিসাব-নিকাশের দিন এগিয়ে আসছে—নিক্তির ওজনে সব অন্যায়—পাপ—অপরাধের হিসাব চুকিয়ে দিতে হবে তাকে।

কি জানি কেন একটা হাহাকারে হরনাথের বুকটা ভরে যায়।

জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আজ পিছনের দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হচ্ছে সব—সবই একটা ব্যর্থ হাহাকার।

আদিগন্ত একটা শূন্যতা শুধু।

কতক্ষণ ঐ ভাবে গঙ্গার ধারে বসেছিল হরনাথ খেয়াল নেই—কখন সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে—কখন গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। কখন ধীরে ধীরে ক্ষীরোদার চিতা নির্বাপিত হয়েছে কিছুই টের পায় নি হরনাথ।

হঠাৎ দেখল হরনাথ কলসী করে জল ঢেলে দিচ্ছে কস্তুরী চিতাগ্নিতে।

কি ভেবে হরনাথও উঠে দাঁড়াল এবং এগিয়ে গিয়ে কস্তুরীর হাত থেকে মাটির কলসীটা নিয়ে গঙ্গা থেকে জল এনে চিতায় ঢেলে দিল।

নির্বাপিত চিতাশেষ থেকে একটা ধুঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে উপরে উঠতে থাকে ক্রমশঃ।

ওঁ শান্তি।

মনে মনে বলে হরনাথ, ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু!

কস্তুরী বার বার অনুরোধ করেছিল হরনাথকে তার পাল্কি তাকে গৃহে পৌঁছে দেবে কিন্তু হরনাথ সম্মত হয় নি।

বলেছে, না, আমি পদব্রজে চলে যেতে পারব—

গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে সিক্ত বস্ত্রেই হাঁটতে শুরু করে হরনাথ এবং প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি হরনাথ গৃহে এসে পৌঁছাল।

গভীর উৎকণ্ঠায় সুলোচনা কেবলই ঘর আর বার করছিল। সেই যে

মানুষটা মধ্যরাত্রে চলে গেল এখনো দেখা নেই।

রান্না করে সুনয়নাকে খাওয়াল কিন্তু নিজে কিছু খেল না।

সিক্ত বস্ত্রে মাথা নীচু করে হরনাথকে গৃহে প্রবেশ করতে দেখে সুলোচনার আর বুঝতে কিছুই বাকী থাকে না।

হরনাথ সুলোচনাকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল, কস্তুরী ছাড়ল না—তাই শেষকৃত্যটুকু তার করেই এলাম—

বেশ করেছো—যাও ঘরে গিয়ে জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল।

হরনাথ সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করে এবং সুলোচনাই একটা শুকনো ধুতি এগিয়ে দেয়।

তুমি একটু বসো—এক গ্লাস শরবৎ এনে দিই—

সুলোচনা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সে রাত্রে কেন যেন হরনাথের চোখে ঘুম আসে না। ঘুরে ফিরে কেবল ক্ষীরোদা আর কস্তুরীবাঈয়ের কথাই মনে হয়।

ক্ষীরোদাকে একদিন লাথি মেরে গৃহ থেকে বহির্গত করে দিয়েছিল হরনাথ। কুলটা বলে অপমান করেছিল অথচ একদিন ঐ ক্ষীরোদাকেই একান্ত দৈহিক প্রয়োজনে নিজের নিশীথ রাত্রের শয্যাসঙ্গিনী করে বুকে জড়িয়ে ধরতে রুচিতে বাধে নি—কোন সংস্কার বা ন্যায়-অন্যায় বোধে বাধে নি।

তবে কেন সে সেদিন অকস্মাৎ হিতাহিতজ্ঞানটুকু হারিয়ে ফেলেছিল—লাথি মেরে গৃহ থেকে দূর করে দিয়েছিল!

সুলোচনার ভয়ে কি! সুলোচনার কাছে তার জঘন্য পাশবিকতাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল বলেই কি সে নিজের বিবেচনাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল সেই মুহূর্তে!

কিন্তু ক্ষীরোদা কি সত্যিই কুলটা!

নীচকুলোদ্ভব সে নিঃসন্দেহে, কিন্তু নীচ চরিত্র তার নিশ্চয়ই নয়। নচেৎ ঐ মহেন্দ্র সাহা কি চেষ্টাই না করেছিল একদিন ঐ ক্ষীরোদাকে পাওয়ার জন্য।

টাকা-পয়সা দুহাতে ঢেলে দেবে, গহনা দিয়ে গা মাথা মুড়ে দেবে—বাড়ী ঘর সব কিছু দেবে—তবু কোন প্রলোভনেই তো ধরা দেয় নি সেদিন মহেন্দ্র সাহার হাতে ক্ষীরোদা নিজেকে।

নিঃস্ব গরীব ব্রাহ্মণ হরনাথকেই আশ্রয় করেছিল সে।

শুধু নিঃস্ব গরীবই তো সে নয়—প্রৌঢ় তখন সে—তবু ক্ষীরোদা তাকেই

আশ্রয় করেছিল—

কেন ?

কেন, সে কি পেয়েছিল ? কি আশা করেছিল সেদিন ক্ষীরোদা তার মত এক নিঃস্ব অসহায়—বিপত্নীক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের কাছে ?

তবে কি সত্যি সত্যিই ক্ষীরোদা তাকে ভালবেসেছিল ! তার মত এক বিপত্নীক প্রৌঢ়কে নবযৌবনা এক যুবতী নারী ভালবেসেছিল !

কথাটা অবিশ্বাস্যই তবু না বিশ্বাস করেও তো আজ আর পারছে না কথাটা হরনাথ।

কথাটা ভাবতে গিয়েও আজ হরনাথের চোখের কোল অশ্রুসজল হয়ে ওঠে বুঝি।

সত্যিই কি বিচিত্র নারীর মন।

সেদিন যেটা হরনাথের কাছে একটা অর্থহীন হিংসা ও আক্রোশ ছাড়া কিছুই মনে হয় নি—আজ সেটাই ভালবাসার রঙ লেগে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল।

অন্য এক রূপ যেন পরিগ্রহ করে।

আর তাইতেই আজ মনে হয়—সেদিন শুধু পদাঘাতের বেদনাটাই নয়—পদাঘাতের অপমান ও লজ্জাটাও ক্ষীরোদার বুকখানা বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে মনে বলে হরনাথ, ক্ষমা করো ক্ষীরোদা, আমাকে ক্ষমা কর—আমি অন্ধ—আমি পশু, আমি নরাধম—

চোখ বুজেই নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল হরনাথ—হঠাৎ পায়ে সুলোচনার মৃদু করস্পর্শে চমকে ওঠে, কে—

আমি—ঘুম আসছে না বুঝি। সুলোচনা প্রশ্ন করে।

না—

তখন থেকে দেখছি শয্যায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছো—এপাশ ওপাশ করছো বার বার—

সুলোচনা—

কিছু বলছিলে ? অন্ধকারে সুলোচনা স্বামীর পায়ে হাত বুলোতে থাকে।

হ্যাঁ বলছিলাম—আর কেন, বাকী জীবনটা তীর্থে তীর্থে ঘুরে কাটাব—

বেশ তো—নয়নের বিয়ে দিয়ে তাই চল, দুজনে বের হয়ে পড়ি—

তুমিও যাবে ?

যাবো বৈকি—গত জীবনে ও এ জীবনে যা পাপ করলাম নচেৎ তার স্খালন

হবে কিসে—

পাপ !

নয়—করেছি বৈকি—নচেৎ এত দুঃখই বা পেলাম কেন ?

না সুলোচনা—পাপ তোমার নয়—পাপ আমার—তোমার স্বামীর—আমার পাপেই তোমার এই—

না, না—ছিঃ, ও কথা উচ্চারণ করা পাপ—শোনা মহাপাপ !

সত্যি আশ্চর্য লাগে—

কি আশ্চর্য লাগে ?

যত তোমাদের কথা ভাবি—এ দেশের হিন্দু মেয়েরা কোন্ ধাতুতে তৈরী ভাবি—

আচ্ছা, নয়নের বিবাহের কথা কিছু তুমি ভেবেছো ?

না—

সৎ পাত্রের সন্ধান তো এবারে একটা করতে হয় ।

আমার অবস্থা তো জান—সম্বলহীন—

ও কথা কেন ভাবছো, মেয়ে আমাদের দেখতে কুচ্ছিত নয় ।

কুচ্ছিতই হোক বা সুন্দরই হোক—বরপণ দিতেই হবে জেনো ।

দেখো, আমি তোমাকে কিন্তু একটি সৎপাত্রের সন্ধান দিতে পারি ।

তাই নাকি ? কোথায়—কোথায় সে পাত্র ?

আছে—মৃদু হেসে বলে সুলোচনা ।

কোথায় বলই না ।

দিন কুড়ি আগে মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম—সেখানেই আমাদের নয়নকে এক ঠাকরুন দেখেন—দেখে আমাদের পরিচয় নেন—

কে আবার ঠাকরুন দেখল আমাদের সুনয়নাকে ? প্রশ্নটা করে হরনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় ।

তার নাম সত্যবতী ।

সত্যবতী ?

হ্যাঁ গো—নামধাম আমি জেনে নিয়েছি, তার কত্তাটি মস্ত বড় লোক—পরম কুলীনও—ঐ যে গো তোমাদের কাকুরুল কোম্পানী না কি—তারই বেনিয়ান ।

কাকুরুল কোম্পানী—সে আবার কি !

সুলোচনা মাথা নেড়ে বললে, তাই তো শুনলাম গো । বৌবাজারে থাকে—সত্যবতীর কত্তার নামটি হচ্ছে কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না সুলোচনা। কাকৃকল কোম্পানীর বেনিয়ান—বৌবাজারে থাকে—নাম কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কি তুমি বলছো একটু স্পষ্ট করে বল তো?

আহা, তার একটি ছেলে আছে—জীবনকৃষ্ণ—খুব মেধাবী ছেলে, কলেজে পড়ে—গিন্নী মানে সত্যবতীর যখন আমাদের সুনয়নাকে পছন্দ হয়েছে তুমি একটিবার বৌবাজারে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে যাও না?

হরনাথ হাসে।

সুলোচনা বলে, হাসছো যে?

তাছাড়া কি! তোমার মাথার গণ্ডগোল আছে সুলোচনা—

গণ্ডগোল আছে মানে!

নয় তো কি—কোথায় কোন্ ধনী বেনিয়ানের ছেলে আর কোথায় আমি—ট্যাঙ্গোপালের নাতি—হরনাথ মিশ্র—দিন আনি দিন খাই—সে কোন্ দুঃখে আসবে আমার সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে!

কেন আসবে না শুনি? তুমিই বা কম কিসে? নবদ্বীপের মিশ্র বংশের সন্তান—তোমার মেয়ে কি ফ্যালনা—

না ফেলনা নয়, কিন্তু দিন কাল কেমন বদলে যাচ্ছে দেখছো না—আজকের সমাজের ওরা হলো বাবু বংশ—টাকাকড়ি মান প্রতিপত্তি—ওরা কেন আমাদের সঙ্গে কাজ করবে! টুলো পণ্ডিতের নাতনীকে বিয়ে করবে আজকের ইংরাজী-পড়া কলেজে-পড়া ছেলে? না—স্বপ্নেও ওসব ভেবো না—

না গো না—গিন্নীর সঙ্গে আলাপ হলে দেখতে···মাটির মানুষ—কি নম্র, কি ভদ্র—তাছাড়া আমি কি সাধে বলছি—গিন্নীর আমাদের সুনয়নাকে ভারী পছন্দ হয়েছে গো—

কথাটা মিথ্যে বলে নি সুলোচনা।

॥ ৩ ॥

ব্যাপারটা হয়েছিল এই।

সেদিন ছিল পৌষ সংক্রান্তি—সুলোচনা সুনয়নাকে সঙ্গে নিয়ে কালীবাড়ীতে পূজো দিতে গিয়েছিল।

লোকে-লোকারণ্য সেদিন মন্দিরপ্রাঙ্গণ। পা ফেলে কার সাধ্য! অত ভিড় কোন দিনই সুলোচনার সহ্য হয় না।

বুকের ভিতর যেন কেমন কাঁপে। তাছাড়া সঙ্গে রয়েছে আবার সুনয়না।

জনস্রোতের যেন অন্ত নেই।

অগণিত মানুষের স্রোত—চলেছে তো চলেছেই—খালি কালো কালো মাথা। কালোর সমুদ্র যেন।

পাণ্ডাকে সুলোচনা বলে, দরকার নেই পাণ্ডা ঠাকুর—ভিড়টা একটু কমুক—

ভিড় তো কমবে না মা জননী—আজ সারাটা দিন এমনিই চলবে—

বল কি ঠাকুর!

তবে আর বলছি কি।

তবে আমার আর দেখছি এ যাত্রায় পূজা দেওয়া হলো না—

ওকি কথা ভাই—মন্দিরে এসে পূজো দেওয়া হলো না বলতে আছে বুঝি!

কথাগুলো কানে যেতেই সুলোচনা ঘুরে চেয়ে দেখে মধ্যবয়সী এক মহিলা। মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস গড়ন।

গাত্রবর্ণে শ্যামা হলেও চোখে মুখে দেহে অপূর্ব একটি লাবণ্য যেন ঢল ঢল করছে। কপালে তার সিঁথি-ভর্তি সিঁদুর।

চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ি পরিধানে। গা-ভর্তি স্বর্ণালঙ্কার—পাশে দু-তিনটি দাসী তাকে ঘিরে রয়েছে।

সুলোচনা কথা বলার আগে ভদ্রমহিলাই আবার কথা বলে, পূজো দিতে আসা হয়েছিল মায়ের মন্দিরে তো?

হ্যাঁ—মৃদুকণ্ঠে সুলোচনা বলে, কিন্তু যা ভিড়—

কোথা হতে আসা হচ্ছে?

কাছেই—চেতলা থেকে—

আর আমি আসছি সেই কোন্ বৌবাজার থেকে—তা সঙ্গে ওটি কে গা?

আমার মেয়ে—মৃদু কণ্ঠে বলে সুলোচনা।

হাত বাড়িয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে পার্শ্বেই দণ্ডায়মান সুনয়নার চিবুকটি ছুঁয়ে মুখ স্পর্শ করে বলে, আহা—মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী ঠাকুরুণটি—

সুনয়না সুলোচনার চোখের ইঙ্গিতে তাড়াতাড়ি নত হয়ে মহিলার পদধূলি নিতেই মহিলা বলে ওঠে, আহা থাক মা, থাক—বেঁচে থাকো—মেয়েটি বড় লক্ষ্মীমন্ত—

সুলোচনা তৃপ্তির হাসি হাসে।

তা হ্যাঁগো—আমার নাম সত্যবতী—তোমার নামটি জানতে পারি না?

সুলোচনা—

বাঃ বেশ তো—সুলোচনার কন্যা সুনয়না—সত্যবতী হাসতে হাসতে বলে।

দাসীরা তাড়া দেয় ঐ সময়, মা বেলা যে বাড়ছে, পুজো দেবে নি—

তুই থাম তো আন্না—বেলা তো যাচ্ছেই, তাই বলে ঠাকুরের থানে এসেও বেলা গেল গো—বেলা গেল গো বলে চেঁচাতে হবে নাকি! সত্যবতী ঝাঁঝিয়ে ওঠে দাসী অন্নদাকে।

সাধে কি বলি মা, কাল থেকে যে নিরুম্বু উপবাস করে আছো—

আছি তো আছি—তারপরই সুলোচনার দিকে তাকিয়ে সত্যবতী বলে, চল—আমার সঙ্গে সঙ্গে চল পুজো দেবে—কই ঠাকুরকে ডাক—

ঠাকুর মানে কালী মন্দিরের একজন সেবাইত।

অন্নদা বলে, ঠাকুর মশাই তো ঐ যে কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছেন গো—

সেবাইত নিবারণ হালদার এগিয়ে আসে, অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি মা—অনেক বেলা হলো—

চলুন ঠাকুর মশাই, এসো ভাই—সুলোচনার দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকেও আহ্বান জানায় সত্যবতী এবং যেতে যেতে ফিস্ ফিস্ করে বলে, মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছো না ভাই—

ভাবছি বৈকি—সুলোচনা বলেছিল।

সুলোচনা লক্ষ্য করছিল বিদায়ের সময়ও সত্যবতী বারে বারে সুনয়নার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল।

আর সেই মুহূর্ত থেকেই সুলোচনার মনের মধ্যে সম্ভাবনাটা উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। কেন সত্যবতী ঐভাবে যাবার সময়ও বার বার ঘুরে ঘুরে তার সুনয়নাকে দেখছিল? আর কেনই বা সুনয়নার বিবাহের কথাটা উত্থাপন করল?

সত্যবতীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারে নি সুলোচনা। সংকোচ হয়েছে. লজ্জা হয়েছে, কিন্তু সত্যবতী চলে যাবার পরই সেবাইত ঠাকুরকে প্রশ্নটা না করে পারে নি সুলোচনা।

ঠাকুর মশাই—

কেন মা জননী!

দেখে ওঁকে মনে হলো মস্ত বাড়ির গিন্নী—

মস্ত বলে মা জননী, মস্ত—বিরাট ধনী—বাবু কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নিকষ কুলীন বন্দ্যোবংশ খ্যাত—ককৃরেল ট্রেল কোম্পানীর বেনিয়ান।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ মা জননী—মস্ত বাড়ি বৌবাজারে—ঝি চাকর আমলা কর্মচারী—দরোয়ান—সরকার—দিবারাত্র বোলবোলাও। আর একটি মাত্র ছেলে—বুঝলে মা—ইংরাজী পড়ে—কলেজে পড়ে—ছেলে তো নয় যেন হীরার টুকরো—তারপরই হঠাৎ গলাটা নামিয়ে সেবাইত ঠাকুর ফিস্ ফিস্ করে বলে, শোন মা জননী, একটা কথা বলি।

কি ঠাকুর মশাই?

উনি ওঁর একটি মাত্র ছেলের বিবাহ দেবেন বলে অনেক দিন থেকেই একটি সুলক্ষণা—সুশ্রী কন্যার সন্ধান করছেন—তোমার কন্যাটিকে যেন আমার মনে হলো বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণীর চোখে ধরেছে। চেষ্টাচরিত্র করে দেখ না—

সুলোচনা বলেছিল, পাগল হয়েছেন ঠাকুর মশাই, অত বড় ধনী—নৈকষ্য কুলীন, আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে আসবেন কেন—দীনদরিদ্র আমরা—

সেবাইত ঠাকুর বলেছিলেন, সে কি কিছু বলা যায় মা জননী—কার কোন ঘরে অন্ন মাপা আছে।

সুলোচনা মুখে যাই বলুক, মন থেকে কিন্তু সেবাইত ঠাকুরের কথাটা মুছে ফেলতে পারে না। কথাটা মনে মনে ভাবে।

ভাবে একটিবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতিই বা কি!···কন্যার বিবাহ বলে কথা তুললেই যে হয়ে যাবে তা তো নয়। কথায় বলে লাখ কথায় বিবাহ।

মনে মনে স্থির করে সুলোচনা স্বামীকে মনের কথাটা তার বলবে, কিন্তু বলি বলি করেও এতদিন বলা হয় নি—বলা হয়ে ওঠে নি।

আজ হঠাৎ কথাটা প্রকাশ করে সুলোচনা।

সুলোচনা বলে, তুমি বরং একটিবার কাল যাও বৌবাজারে—

হরনাথ বলে, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই যদি আমার সঙ্গে দেখাই না করেন—

সে আবার কেমন কথা, ভদ্রলোক—ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবেন না? তাই কখনো হয় নাকি—তুমি যাও।

বেশ—তুমি বলছো আমি যাবো, কিন্তু আমি জানি সেখানে ঐ প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া বাতুলতা—

সুলোচনা তবু নিবৃত্ত হয় না।

দুদিন পরে বলে বলে হরনাথকে সত্যিই বৌবাজারে কালীকৃষ্ণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠায়।

ককুরেল ট্রেল এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধনী-লোক এইটুকুই ধারণা করে নিয়েছিল হরনাথ মনে মনে। কিন্তু ধারণা করতে পারে নি সেই ধনের প্রাচুর্যটা সত্যি কতখানি।

অনেকটা পথ—হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে ঘরে ঘরে তখন সবে আলো জ্বলে উঠেছে।

বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই বলায় ভৃত্যরা বাধা দেয় নি—তারা বহির্মহলে কাছারি ঘর দেখিয়ে দেয়।

কার্যস্থল থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন কালীকৃষ্ণ কাছারি ঘরে বসে কয়েকজন অনুগ্রহপ্রার্থী মোসাহেব প্রতিবেশীর সঙ্গে বসে তামাকু সেবন করতে করতে খোশ গল্প করছিলেন।

হরনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়াল।

আট দশজন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বিস্তৃত ফরাশের উপর বসে উচ্চৈস্বরে কথাবার্তা বলছে—ঘরের দুদিকের দেওয়ালে দুটো দেওয়ালগিরি—আলোর প্রাচুর্য ঘরের মধ্যে যথেষ্ট।

রীতিমত কৃষ্ণবর্ণ—মোটা-সোটা চেহারা—মাথা-ভর্তি টাক—গলায় শুভ্র উপবীত—যে ব্যক্তিটি গড়গড়ার নলটি হাতের মধ্যে ধরে ফরাশের মধ্যস্থলে বসে আছেন, হরনাথের মনে হয় উনিই হয়ত কালীকৃষ্ণ।

চেহারার মধ্যেও জৌলুস আভিজাত্য আছে সকলের চাইতে ওঁরই বেশী।

তবু সাহস করে কথা বলতে পারে না হরনাথ।

দাঁড়িয়েই থাকে।

আসরে আলোচনা চলছিল দুটি ব্যাপার নিয়ে—রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার জন্য আয়োজন করছেন এবং কে খ্রীষ্টীয় মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডফ্ নামে সাহেব নাকি শীঘ্রই কলকাতা শহরে আসছে—

দেশ উচ্ছন্ন যাবেই—এ তারই পূর্বাভাস, দেখছো কি চাটুয্যে—হিন্দু বলে আর কিছু থাকবে না—সব ক্রেস্তান হয়ে যাবে—

বাধা দিলেন কালীকৃষ্ণ, তা কেন হবে হে বোসজা—ইংরাজী শিক্ষা যা আমাদের আজ বিশেষ করে দরকার হয় তো সেটারই আরো সুবিধা হবে।

বোসজা বলে, তুমি তো তা বলবেই হে বাঁড়ুজ্যে—হিন্দু কলেজ থেকে যাতে করে ফেরিঙ্গী—ডিরোজিওকে না তাড়ান হয়—তাড়ালে ছত্রেদের সমূহ ক্ষতি হবে—তুমি তো সেই দলে—ভুলেই গিয়েছিলাম—তা নিজের একটিমাত্র

ছেলেকে তো ক্রেস্তানী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছোই—শেষটুকু আর বাকী থাকে কেন, এবারে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে দাও—হরি ছেড়ে যিশুর ভজনা শুরু করে দাও—

কথাগুলো বলে রামকমল বসু মহাশয় আর দাঁড়ালেন না—সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে সভা ছেড়ে—ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের এক পাশে দরজার সামনে দণ্ডায়মান হরনাথের প্রতি নজর পড়ে কালীকৃষ্ণর।

কে ওখানে? কে দাঁড়িয়ে? প্রশ্ন করেন কালীকৃষ্ণ।

আজ্ঞে আমার নাম হরনাথ মিশ্র—

এখানে কি প্রয়োজন?

এসেছিলাম একটিবার কালীকৃষ্ণ মহাশয়ের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়—

আমিই কালীকৃষ্ণ—আজ্ঞা করুন—

আজ্ঞে কথাটা একটু নিরিবিলিতে বলতে চাই—

নিরিবিলিতে!

আজ্ঞে—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

গৌরী মৃন্ময়ীর হাত ধরে ঈষৎ আকর্ষণ করে বললে, এসো—

চেয়েছিল মৃন্ময়ী গৌরীর মুখের দিকে—ওরই হাতে মুহূর্ত-পূর্বে মৃন্ময়ীকে সঁপে দিয়ে দুর্গা দেবী চলে গিয়েছেন।

কালো ছিপ্‌ছিপে গড়নের একটি মেয়ে—তার চাইতে বয়স আট-দশ বছর তো বেশী হবেই।

মাথায় সিঁদুর—হাতে শাঁখা মাত্র—ময়লা একটা লালপাড় শাড়ি পরিধানে।

কি দেখছো আমার মুখের দিকে চেয়ে অমন করে, এসো! মৃদু হেসে কথাগুলো বলে গৌরী আবার মৃন্ময়ীকে বুঝি আকর্ষণ করে।

মৃন্ময়ী আর আপত্তি করে না—নিঃশব্দে গৌরীকে অনুসরণ করে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে—মল্লিক-বাড়ির অন্দরমহলের এক এক করে ঘুম ভাঙছে।

সরু একটি অলিন্দপথ ধরে মৃন্ময়ীকে নিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

গৌরী যদিচ মল্লিক গৃহিণীর আশ্রিতা এবং রন্ধনের ব্যাপারটা তার মাথার উপরে—তথাপি দুর্গা দেবীর তার প্রতি বোধ হয় একটু বেশী প্রশ্রয়—একটু বেশীই স্নেহ ছিল।

অন্যান্য দাস দাসীদের সঙ্গে নয়, তাদের থেকে পৃথক ভাবেই তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন দুর্গা দেবী।

সম্পূর্ণ একটি আলাদা—যদিও আকারে ছোট—একটি ঘর দিয়েছিলেন তাকে থাকতে।

নিরিবিলিতে সেই ঘরটিতে একাকী থাকতো গৌরী।

ঘরটির পরেই বাগান—বাগানের মধ্যে একটা দীঘি।

গৌরী কারো সঙ্গেই বড় একটা মিশত না। নিজের কাজটুকু শেষ হলে নিজের ঘরে ঢুকে বাগানের দিককার জানালাটার সামনে এসে বসত।

জানালা-পথে তাকালে দীঘির খানিকটা অংশে ও দীঘির পাড়ে বিরাট শাখা পত্রবহুল বকুল গাছটার খানিকটা চোখে পড়ে।

দ্বিপ্রহরের সূর্য ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে দীঘির কালো জলে বকুল গাছের ছায়া মিশে একাকার হয়ে যায়।

গোটা কয়েক রাজহাঁস আছে—ধবধবে সাদা রঙ।

দীঘির কালো জলে ভেসে ভেসে বেড়ায় আপন মনে। চৈত্র বৈশাখ মাসে বকুল গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে দীঘির কালো জলে হাওয়ায় থেকে থেকে ঝরে ঝরে পড়ে—এদিক ওদিক ভাসে।

বর্ষাকালে অজস্র বকুল ফুল ফোটে—দিবারাত্র দীঘির জলে ঝরে ঝরে পড়ে।

প্রতিদিন যেন ঐ দীঘির জল আর বকুল গাছটির রূপ বদলায়। প্রতিটি রূপের সঙ্গে যেন গৌরীর পরিচয়।

বসো—গৌরী মৃন্ময়ীর হাত ধরে নিজের ঘরে ঢুকে ছোট পালঙ্কটি দেখিয়ে বললে, বসো—

মৃন্ময়ী সত্যিই বড় ক্লান্ত তখন, দাঁড়াতে আর যেন সত্যিই পারছিল না, দ্বিতীয়বার আর কোন অনুরোধ করতে হলো না, বসলো।

তোমার নামটি তো এখনো জানা হলো না—কি নাম তোমার?

মৃদু কণ্ঠে মৃন্ময়ী জবাব দেয়, মৃন্ময়ী—

এ বাড়িতে কবে এলে?

কাল রাত্রে। আবার জবাব দেয় মৃন্ময়ী গৌরীর প্রশ্নের।

কাল রাত্রে? কখন গো! দেখি নি তো!

সে অনেক রাত্রে!

কোথা থেকে এসেছো?

জানি না তো।

গৌরী মৃদু হাসে। তারপর আবার বলে, মা দুর্গা তোমার কে হন!

মা দুর্গা! প্রশ্নটা করে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায় গৌরীর মুখের দিকে মৃন্ময়ী।

ওকে আমি মা দুর্গাই বলি। ঠিক যে দুর্গা ঠাকরুনটির মত দেখতে—নামও দুর্গা—

তাই বুঝি!

হ্যাঁ—জানতে না?

না।

ওঃ, তা ওঁর তুমি কে হও?

কেউ না তো!

কেউ না!

না।

তবে এখানে এলে—

আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

কে?

শিবনাথ! বলতে বলতে মুখটা মৃন্ময়ীর রাঙা হয়ে ওঠে। নজরে পড়ে গৌরীর।

শিবনাথ কে? গৌরী প্রশ্ন করে সকৌতুকে এবারে।

শিবনাথকে বুঝি তুমি চেনো না!

না।

দেখো নি!

না—কে শিবনাথ?

শিবনাথই তো সেই দস্যুটার বাড়ি থেকে কাল রাত্রে আমাকে নিয়ে এসেছে—সে খুব ভাল—

খুব ভাল?

হ্যাঁ খু-উ-ব ভাল।

গৌরী আবার হাসে, তারপর বলে, আচ্ছা শুনবো'খন তোমার খুব ভাল শিবনাথের কথা। তুমি এখানে থাক, আমি স্নানটা সেরে আসি—তুমি স্নান করবে নাকি?

না।

তবে তুমি থাক।

গৌরী গামছাটা কাঁধে ফেলে ঘরের কোণ থেকে কলসীটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মৃন্ময়ী এসে বাগানের ধারের জানালাটার সামনে দাঁড়াল।

দীঘি আর বকুল গাছটা চোখে পড়ে।

চোখ দুটো যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কাল রাত থেকে একটানা বলতে গেলে যে ঝড় মৃন্ময়ীর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সে ক্লান্ত হবে না তো কি! সত্যিই আর যেন পারছিল না মৃন্ময়ী।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সামনের শয্যায় গা ঢেলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে।

গৌরী স্নান সেরে ফিরে এসে দেখলো অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার শয্যায় শুয়ে মৃন্ময়ী। কিছুক্ষণ ঘুমন্ত মৃন্ময়ীর মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে গৌরী।

আশ্চর্য একটা বিশ্বাস আর নিশ্চিন্ততা যেন মৃন্ময়ীর মুখে। অবিশ্বাস বা সন্দেহের জ্বালা নেই—আঘাতের বেদনা নেই—কোথাও।

হঠাৎ মনে পড়ে গৌরীর—শিবনাথ নামটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মুখখানি সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠেছিল।

শিবনাথ মেয়েটির কে—কি সম্পর্ক মৃন্ময়ীর শিবনাথের সঙ্গে।

হাতের ওপরে মাথাটা রেখে ঘুমোচ্ছে মৃন্ময়ী—গৌরী মাথাটা সামান্য তুলে একটা বালিশ দিয়ে দিল মাথার নীচে।

বেলা দশটা নাগাদ একবার গৌরী মৃন্ময়ীর খোঁজ নিতে এলো ঘরে—দেখলো মৃন্ময়ী অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখনো। কোন সাড় নেই।

আবার ফিরে গেল গৌরী রন্ধনশালায়। এখনো দুই প্রস্থ রান্না বাকী। দুটো উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে। টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে ভাত। ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে গৌরী।

শিবনাথ মেয়েটির কে! কথাটা আবার মনে হয় গৌরীর শিবনাথের কথা বলতে গিয়ে মুখটা অমন রাঙা হয়ে উঠলো কেন মৃন্ময়ীর।

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি মনে পড়ে হঠাৎ গৌরীর।

গৌরীর সমস্ত জীবনটাই তো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ যেন কয়েকটা ঢেউ—

না, সে মানুষটা তার কেউ নয়।

অভিশাপ। তার জীবনের একটা নিষ্ঠুর অভিশাপ—একটা অপরিসীম লজ্জা—একটা কলঙ্ক।

তার কথা সে তো ভুলেই গিয়েছে। জীবনের পাতা থেকে সে দু রাত্রির স্মৃতি কবে তো মুছে গিয়েছে।

গৌরী—

হঠাৎ দুর্গা দেবীর কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকাল গৌরী।

মৃন্ময়ী কি করছে রে?

একটু আগে ঘরে গিয়েছিলাম, দেখি ঘুমোচ্ছে—

আহা—ঘুমোক—যে ঝড়টা যাচ্ছে মেয়েটার উপর দিয়ে—

প্রশ্ন করে না বটে গৌরী, তবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় দুর্গা দেবীর মুখের দিকে নিঃশব্দে।

বামুনের ঘরের মেয়ে, দুর্গা দেবী নিজে থেকেই বলতে থাকেন, হার্মাদে লুঠ করে এনেছিল—এতদিন সেই ক্রেস্তানটার ঘরেই বন্দিনী ছিল। শিবনাথ ছেলেটি বড় ভাল, সে ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে—

মা? দাসী ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকলো।

কি রে?

কত্তাবাবু আপনাকে বলতে বলে দিলেন, হালীশহর থেকে ওঁর এক পরিচিতকে একটি বাবুমশাই আসবেন আজ দুপুরে, এখানেই আহার করবেন—

ঠিক আছে তুই যা—

দাসী চলে গেল।

দুর্গা দেবী আবার গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আবাগী মেয়েটার কোথায়ও জায়গা হলো না, তাই কি করি, রাস্তায় তো আর বের করে দিতে পারি না—এখানেই রেখে দিলাম। থাক এখানেই—অমন আগুনের মত রূপ—ঐ বয়স—একটু চোখে চোখে রাখিস মা—কথাগুলো বলে দুর্গা দেবী রন্ধনশালা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাইরে দু পা এগিয়ে আবার ফিরে এলেন, দেখিস, বেরুতে দিস না ঘর থেকে—

গৌরী আবার নিঃশব্দে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল দুর্গা দেবীর মুখের দিকে। দুর্গা দেবী বললেন, আমি চাই না ও যে আমার কাছে আছে কেউ জানুক—

কথাটা বলে দুর্গা দেবী রন্ধনশালা ছেড়ে চলে গেলেন।

গৌরী দুর্গা দেবীর শেষ কথাগুলোর অর্থ ঠিক যেন সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে

পারে না।

ও কথা কেন বললেন দুর্গা মা! মৃন্ময়ীর এখানে থাকার ব্যাপারটা বোঝা গেল গোপন রাখতে চান তিনি। কিন্তু কেন!

ওঁর স্বামীর জন্যই কি?

কিন্তু সুরেন্দ্র মল্লিক তো এ মহলে কোন দিন পাও ফেলেন না। তবে কেন এ সাবধানতা।

কিন্তু বেশী আর ভাববার সময় পায় না গৌরী—ভাতের হাঁড়ির ভাত সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়ি দুটো উনুন থেকে একটি একটি করে নামিয়ে ফেললো গৌরী।

হালীশহর—হালীশহর নামটা শুনেই চমকে উঠেছিল গৌরী, সেখান থেকে কর্ত্তাবাবুর বন্ধু মানুষ আবার কে আসছে।

সেই মানুষটারও বাড়ি হালীশহরে শুনেছিল গৌরী। মনে আছে আজও। শুনেছিল হালীশহরের পরম কুলীন মুখোটি বংশ।

আশ্চর্য। মানুষটার মধ্যে যে অমন একটা নীচতা—একটা শয়তানী একটা মিথ্যা আছে এ যেন সেদিন স্বপ্নেও একবার ভাবতে পারে নি গৌরীরা।

তপ্তকাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ—কন্দর্পকান্তি পুরুষ—

বাইরে আকাশ ভেঙে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছে। ভরা শ্রাবণ মাস।

খাল বিল মাঠ পুকুর নদী নালা জলে একেবারে টৈটম্বুর—থৈ থৈ করছে।

রাত এগারটায় ছিল লগ্ন এবং পঞ্জিকায় সেদিন নাকি ঐ একটি মাত্র বিবাহ লগ্নই ছিল।

সেদিন মনে হয়েছিল গৌরীর ভাগ্যে সে রাত্রে পঞ্জিকায় ঐ লগ্নটি ছিল। নচেৎ কি হতো—

রমণীরঞ্জন—হ্যাঁ লোকটির নাম রমণীরঞ্জন। দৈবক্রমেই গৌরীর দাদা গণপতির সঙ্গে নদীর ধারে বাজারে দেখা এবং নিজেই যেচে আলাপ করেছে লোকটি গণপতির সঙ্গে। বলেছিল তার নাকি বিরাট চালের কারবার—নদে হুগলী মুর্শিদাবাদ—বিরাট দশ মাল্লাবাহী নাও নিয়ে চাল সংগ্রহ করে করে বেড়ায়। তারপর সেই চাল চেতলার হাটে বিক্রী করে, ওদের গাঁয়েও চাল সংগ্রহের জন্য এসেছিল।

বাজারে নেমে তারই সুলুক সন্ধান নিতে গণপতির সঙ্গে আলাপ। গণপতির একটা কেমন বদভ্যাস ছিল, কোন বিদেশী এলেই তার সঙ্গে পরিচয় করতো যেচে গায়ে পড়ে—একমাত্র ভগ্নী গৌরী তখন পঞ্চদশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হতে চলেছে।

ব্রাহ্মণের ঘরের পঞ্চদশী অরক্ষণীয়া কুমারী কন্যা—গলার কাঁটা। সর্বদা যেন সমাজ ছি ছি করেই চলেছে।

জাত গেল—ধোপা নাপিত বন্ধ হবার যোগাড়।

বিধাতা যদিও রূপ ঢেলে দিতে কার্পণ্য করেন নি গৌরীর দেহ ভরে, কিন্তু ঘরের লক্ষ্মীর ঝাঁপি যে শূন্য—নিষ্ঠুর দারিদ্র্য চারিদিকে—সংসারে সাতটি প্রাণী!

গণপতির মা বিন্ধ্যবাসিনী—অনূঢ়া ভগ্নী গৌরী—স্ত্রী কমলমণি—তিনটি সন্তান নিজের ও সে নিজে।

ভাত জোটে তো ডাল জোটে না—ডাল জোটে তো তরকারী জোটে না।

কেমন করে কি হলো কে জানে—দ্বিপ্রহরে এসেছিল অতিথি হয়ে রমণীরঞ্জন গণপতির গৃহে এবং সেখানেই দেখে গৌরীকে।

তার পছন্দ হয়ে গেল গৌরীকে এবং বললে, দশ-কুড়ি নগদ টাকা পেলে সে গণপতিকে ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার করতে পারে।

গণপতি কি আর জবাব দেবে—চুপ করে থাকে কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী কথাটা পুত্রের মুখ থেকে শুনে বললেন, দেবো—তাই দেবো। তুই দিন দেখ গণপতি—

গণপতি বলে, সেকি মা—অত টাকা তুমি কোথায় পাবে?

আছে, তুই বলগে আমরা রাজী—

কিন্তু মা—

তুই যা না—বল গে আমরা রাজী—

বিন্ধ্যবাসিনী কিছু নগদ টাকা ও সোনার অলঙ্কার ঠাকুরঘরের মেঝেতে মাটি খুঁড়ে একটা তামার কলসের মধ্যে পুঁতে রেখে দিয়েছিলেন গোপনে!

তাঁর জীবনের শেষ সম্বলটুকু ঐ মেয়েটার জন্যই গোপনে মাটির তলায় রেখে দিয়েছিলেন।

রমণীরঞ্জন কথাটা শুনে বললে, তবে আর কি—দিন দেখুন—আজ-কালকের মধ্যে যে দিন আছে বিবাহ হবে—

গণপতিকে কিছু করতে হলো না, বিন্ধ্যবাসিনীই নিজে ছুটলেন পুরুতবাড়ি। আড়াল থেকে রমণীরঞ্জনকে দেখে তিনিও বুঝি ঐ মুহূর্তে সব ভুলেছিলেন।

॥ ২ ॥

কুলপুরোহিত কেশব পাঠক বললেন পঞ্জিকা দেখে, ঐ দিনই রাত্রি এগার ঘটিকায় একটি লগ্ন আছে তার পর আর সারা মাসে কোন লগ্ন নেই।

ইতিমধ্যে শ্রাবণ আকাশ ভেঙে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমেছে।

ভিজতে ভিজতে বিন্ধ্যবাসিনী যখন এসে গৃহে পৌঁছালেন পুত্রবধূ কমলমণি ও কন্যা গৌরী সবে তখন ভাতের থালা নিয়ে বসেছে।

হুমড়ি খেয়ে এসে যেন পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী, থাম, থাম—ভাত মুখে দিসনে —দিসনে মুখপুড়ি—

তাড়াতাড়ি হাত টেনে নেয় গৌরী। আহার্য আর মুখে তোলা হয় না।

তোর উপবাস—

গৌরী মার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। উপবাস কেন আবার।

বিন্ধ্যবাসিনী কমলমণিকে বলেন, বৌমা যাও, শিগ্‌গির গণপতিকে ডেকে নিয়ে এসো—আজ রাত্রেই বিয়ের লগ্ন আছে—আজ রাত্রেই বিয়ে হবে—

কার বিয়ে মা?

গৌরীর—

কমলমণির মুখে হাসি, ওমা—তাই নাকি—যাচ্ছি—আমি এখুনি যাচ্ছি—

গৌরীর ব্যাপারটা তখনো বোধগম্য হয় নি—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তখনো সে মার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

আমি বলি নি—বলি নি আমি—আমার গৌরীর শিবের মত বর আসবে—এলো তো—কথা আমার ঠিক হলো তো—আনন্দের আতিশয্যে বক্ বক্ করতে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী।

ছেলে ছুটে আসে, আমায় ডাকছিলে মা!

হ্যাঁ বাবা, আজই বিয়ে—ছেলেটি কোথায়?

বাইরে বিশ্রাম নিচ্ছে—

যা তাকে গিয়ে বল—রাত্রি এগারটায় লগ্ন।

ঘরের মধ্যেই কোনমতে বিবাহের আসর পাতা হয়।

দু পাশে দুটো আলো জ্বলছে—বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে—অসংখ্য বাদলা পোকা আলোর চারপাশে ঘুরছে।

কিছুতেই চোখ মেলবে না গৌরী—কমলমণিও ছাড়বে না, ওলো ঠাকুরঝি দেখ চোখ মেলে, দেখ্ লো—সাক্ষাৎ কন্দর্প—

ভীরু কাঁপা দৃষ্টিতে দেখা সেই ঝাপ্‌সা আলোয় রমণীরঞ্জনের মুখখানা যেন গৌরীর হৃদয়পটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল প্রথম দর্শনেই।

মনে মনে বার বার তার পর সে বলেছিল, দেবতা—আমার এমন কি তপস্যা

ছিল যে দাসী তোমার চরণে আশ্রয় পেল!

শুতে শুতে বিবাহ সেরে সে প্রায় রাত দুটো হয়ে গিয়েছিল।

ঝম্ ঝম্ করে তখনো বৃষ্টি ঝরছে।

ঘরে মাটির হাঁড়িতে সোহাগ-প্রদীপ জ্বলছে—শিখাটা তার বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

গৌরীর লাজরক্তিম চন্দনচর্চিত মুখখানির ওপরে সেই কাঁপা আলোর শিখা যেন আলতো স্পর্শ দিয়েছে।

ক্লান্ত গৌরীর চোখে বুঝি কখন রাত্রি-শেষে ঘুম নেমেছিল—হঠাৎ হাত ধরে কে টানছে মনে হওয়ায় ঘুমটা ভেঙে যায় গৌরীর।

চেয়ে দেখে ও, ওর একখানি হাত রমণীরঞ্জনের হাতের মধ্যে ধরা।... সোহাগ-প্রদীপের মিটিমিটি আলোয় সমস্ত ঘরটা যেন কেমন স্বপ্ন-আবেশে আচ্ছন্ন বলে মনে হয়।

গৌরী—

রমণীরঞ্জনের ডাকে গৌরী সাড়া দেবে কি—আরো মাথাটা নীচু করে দেয়।

শোনো গৌরী, একটা বিশেষ কাজে এখুনি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে। এই রাত্রেই নৌকা নিয়ে আমায় বের হয়ে পড়তে হবে।

লজ্জা তখন কোথায় পালিয়েছে গৌরীর—কি একটা আশংকায় বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

রমণীরঞ্জন বলছে তখন, কোন চিন্তা করো না—দু-চার দিনের মধ্যেই আমি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো—

গৌরী কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলে, দাদাকে ডেকে আনবো—

না, না—কাউকে ডাকতে হবে না। ওঁরা হয়তো জানতে পারলে বাধা দেবেন—আমি তো বলছি দু-চার দিনের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফিরে আসছি—

মাকে ডাকি! আবার বলে গৌরী।

না—বলতে বলতে ততক্ষণে গাঁটছড়া খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে রমণীরঞ্জন। এবং গৌরীকে কোন রকম কথা বলবার বা বাধা দেবার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে ঘরের দরজা খুলে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়ে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় গৌরী তখন হতভম্ব—বিমূঢ়—বোবা। কতক্ষণ যে সে ঐভাবে শয্যার উপর বিমূঢ় অচেতন-প্রায় বসে ছিল মনে পড়ে না তার।

খোলা দরজার কপাট দুটো হাওয়ায় তখনো এদিক ওদিক করছে আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলছে। বৃষ্টির ছাটে ঘরের মেঝেটা জলে থৈ থৈ করছে।

পরের দিন ভোরবেলা গৌরীর মুখে সংবাদটা শুনে বৃথাই জল কাদার মধ্যে গণপতি চারিদিকে রমণীরঞ্জনের খোঁজে ছোটাছুটি করলো। কিন্তু কোথায় রমণীরঞ্জন!

নৌকাও নেই, সেও নেই।

উত্তেজনায় ও আনন্দে দেশ কোথায়—কোথাকার মানুষ কিছুই সংবাদ পর্যন্ত নেওয়া হয় নি।

সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসল।

কিন্তু একা বিশ্বাস হারায় নি সেদিন গৌরী। কেন যেন মনে হয়েছিল তার রমণীরঞ্জন তার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না।

আসবে সে—নিশ্চয়ই আবার সে ফিরে আসবে। গ্রামের লোকেরা অবিশ্যি রমণীরঞ্জন নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় তেমন বিশেষ কিছুই আশ্চর্য হয় নি। কারণ কুলীন কন্যার ঐ ধরনের বিবাহ ও তারপর কন্যাকে ফেলে বরের অন্তর্ধান এমন কিছুই নতুন ঘটনা নয় দেশে গ্রামে।

তবু তো গৌরীকে তার স্বামী না জানিয়ে যায় নি।

কিন্তু দু-চার দিন ছেড়ে মাস বছর ঘুরে গেল, রমণীরঞ্জন যখন এলো না তখন তার আশা আর কেউ বড় একটা করে নি।

সবাই ভেবেছে বাকী জীবনটা গৌরী সিন্দুরই পরবে হাতে লোহা আর শাঁখাই পরবে—স্বামীর ঘর করতে হবে না।

কুমারীত্বটুকুই ঘুচলো—ঐ পর্যন্ত—তার বেশী কিছু নয়।

গৌরী কিন্তু তবু আশা ছাড়ে নি।

পথ চেয়ে রয়েছে—কত রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছে সামান্য শব্দে—ঐ বুঝি এলো সে—ঐ বুঝি ডাকছে, গৌরী—আমি এসেছি দরজা খোলো—

তারপর হয়তো ভুল ভেঙেছে—চৈত্ররাত্রে ঝরা পাতা উড়ে উড়ে চলেছে তারই শব্দ—বুকখানা খালি করে দীর্ঘশ্বাস পড়েছে।

দেখতে দেখতে দুটো বছর পার হয়ে গেল হঠাৎ এমন সময় কলকাতায় চেতলার এক চালের আড়তে একটা চাকরি পেয়ে গেল গণপতি।

চাকরিটা গণপতি পেয়ে সবাইকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যেতে চাইলো কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী সম্মত হলেন না স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে। আর গেল না গৌরী; তার যে চলেছিল তখন শবরীর প্রতীক্ষা। রমণীরঞ্জন যে

বলে গিয়েছে সে আসবে।

হঠাৎ একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ নাকে যেতেই গৌরী চমকে ওঠে।

চেয়ে দেখে উনুনে ডালের পাত্রে ডাল পুড়ছে—কখন তলা ধরে গিয়েছে জানতেও পারে নি।

তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলল পাত্রটা গৌরী—জল ঢেলে দিল কিন্তু সমস্ত ডাল ধরে গিয়েছে তখন।

ছি ছি, এ কি করল, এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো কি করে সে।

ডাল পোড়ার গন্ধে মোক্ষদাও ছুটে আসে রন্ধনশালায়, কি হলো গৌরী দিদি—কি পোড়া লাগলো গো।

সব ডাল পুড়ে গিয়েছে মোক্ষদা—কি হবে ?

কি আবার হবে ? পাত্রটা দাও সৌরভীকে—মেজে দিক—আবার ডাল উনুনে চড়িয়ে দাও—মোক্ষদাই সৌরভীকে ডেকে ব্যবস্থা করে দেয়।

রান্নাটা একটু ভাল হয় যেন আজ গৌরী দিদি—রন্ধনশালাতেই গৌরীর পাশে জাঁকিয়ে বসে বলে মোক্ষদা।

কে আসছে মোক্ষদা ?

প্রশ্নটা আর না করে পারে না গৌরী।

তাও জানি না—তবে পরশু শুনছিলাম কত্তাবাবু বলছিলেন, কে একজন পরিচিত লোক আসবেন—দুপুরে এখানে আহারাদি করবেন—

এর আগে বুঝি কখনো উনি এ বাড়িতে আসেন নি ?

তা অতশত জানি না বাপু! তবে খাতির দেখে মনে হচ্ছে বোধ হয় আসেন নি—

কেন ?

কারণ আগে তো কখনো কারো সম্পর্কে কত্তাবাবুকে বলতে শুনি নি গিন্নী-মাকে। আসে-যায় তো কত কেউ এ বাড়িতে—ভিতরে কাউকেও খেতে ডাকা হয় না, অতিথিশালেই খেয়ে চলে যায়। তাই মনে হচ্ছে বিশেষ কেউ হবে।

বিশেষ যে কেউ সেটা বোঝা গেল—দ্বিপ্রহরের দিকেই।

দুর্গা দেবী স্বয়ং রন্ধনশালে এলেন খোঁজখবর নিতে। এবং শোনা গেল দুর্গা দেবীর মুখেই—একজন নয় দুজন।

ব্যবস্থা হলো দুর্গা দেবী দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করে দেবেন আর গৌরী

পরিবেশন করবে। অন্দরের দালানে আসন পাতা হলো।

রূপার গ্লাসে জল দেওয়া হলো।

অতিথিদের সঙ্গে সুরেন্দ্র মল্লিকও আহারে বসলেন—

হালীশহর থেকে অতিথি আসছে শুনে গৌরীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ভিতরে ভিতরে সে অতিথিদের পরিচয়টা পাবার জন্ত ছটফট করছিল। প্রশ্নটা তাই না করে আর পারে না।

ওনারা কারা দুগগা-মা—?

ভাবী বৈবাহিক—দুর্গা দেবী বললেন।

ভাবী বৈবাহিক।

হ্যাঁ—ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার নরেন্দ্রর বিয়ের কথাবার্তা চলেছে—হালীশহরের দত্তবাড়ি—

দত্তবাড়ি—

কথাটা শুনে গৌরী তখন কেমন দমে যায়।

কৌতূহলটা যেন কেমন ঝিমিয়ে যায়।

॥ ৩ ॥

তাহলে সে নয়—তার রমণীরঞ্জন নয়।

সমস্ত উৎসাহ যেন গৌরীর নির্বাপিত হয়ে যায়। তবু দুর্গা দেবীর নির্দেশ তাকেই পরিবেশন করতে হবে অতিথিদের।

মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে ভাতের থালা হাতে দালানের দিকে পা বাড়ায় গৌরী।

একে একে শেষ থালাটি নামিয়ে—মৎস্য ও ব্যঞ্জনাদির পাত্রগুলো থালার পাশে পাশে নামিয়ে রাখছে গৌরী হঠাৎ কত্তাবাবুর কথাটা তার কানে গেল।

নিন আরম্ভ করুন প্রাণকৃষ্ণবাবু—

কিন্তু এত আয়োজন কেন—প্রাণকৃষ্ণ বলে ওঠে।

কিছু না—কিছু না—সামান্য—

কিন্তু ততক্ষণে কাঁপতে কাঁপতে কোনমতে ফিরে এসেছে গৌরী রন্ধনশালায়। ঐ কণ্ঠস্বর তো সে আজও ভোলে নি—ভুলতে কি পারে—রমণীরঞ্জনের কণ্ঠস্বর যে বুকের ভিতরটিতে একেবারে গাঁথা হয়ে আছে—তাই রন্ধনশালার দরজার গোড়া থেকে মাথার গুণ্ঠনটা ঈষৎ তুলে অদূরে তাকিয়ে কত্তাবাবুর পাশেই উপবিষ্ট প্রাণকৃষ্ণ লোকটিকে দেখে যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল গৌরী।

কে ও। কে—ও তো প্রাণকৃষ্ণ নয়—রমণীরঞ্জন। দীর্ঘ নয় বছর—তবু

পলকমাত্র দৃষ্টিপাতেই চিনতে দেরি হয় না রমণীরঞ্জনকে গৌরীর।

সেই কন্দর্পকান্তি পুরুষ।

সেই অপরূপ লাবণ্য।

এই নয় বছরে বলতে গেলে কোন পরিবর্তনই হয় নি। একটু স্থূল হয়েছে বটে দেহে, কিন্তু আর কোন পরিবর্তনই বুঝি হয় নি।

সেই চোখ, সেই নাক—সেই মুখ—সেই ওষ্ঠের প্রান্তে মৃদু হাসির রেখাটি—এমন কি বাম চোখের কোলে লাল ছোট তিলটি পর্যন্ত।

আর অবিকল সেই হাসি—মধুর হাসি।

দু-রাত্রিতে প্রদীপের আলোয় ভীরু সলজ্জ দৃষ্টিতে দীর্ঘ ব্যবধানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য দেখেছিল বটে গৌরী ঐ মুখ কিন্তু ভোলে নি তো সে আজও।

অন্তরের অন্তস্তলে যে কেটে বসে আছে।

ভুলতে কি সে পারে।

পরম দয়াময়ের বেশে এসে যে নিমেষে তার নারী-জীবনের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে চলে গিয়েছিল। দয়িতের বেশে এসে বক্ষের মধ্যে নিষ্ঠুরতম আঘাত হেনে চলে গিয়েছিল।

তার নারী-জীবনের প্রথম ও শেষ পুরুষ—তার কৌমার্যহরণকারী—লুণ্ঠনকারী ঘৃণিত দস্যু। যাকে সে যেমন ভালবেসেছে—যেমন শ্রদ্ধা করেছে ঠিক তেমনি ঘৃণা করেছে, তেমনি অভিশাপ দিয়েছে। যার জন্য চোখের জল ফেলেছে—অভিসম্পাত দিয়েছে। আবার যাকে তিক্ত ব্যথায় সমস্ত দেহ ও মন দিয়ে কামনা করেছে।

ভুলতে কি তাকে সে পারে!

নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে ঘোমটা তুলে সেই মানুষটার মুখের দিকে।

কত্তাবাবু বলেন, কই দত্তমশাই, শুরু করুন—

প্রাণকৃষ্ণ হেসে বলে, হ্যাঁ এই যে—

কত্তাবাবুর অন্য পাশে যে লোকটি বসে তার বয়েস হয়েছে—ষাটের উর্ধ্বে তো নিশ্চয়ই—আবক্ষ সাদা দাড়ি।

এবারে বৃদ্ধ লোকটি বলেন, কিন্তু সত্যি বলছি এত তো আমি খেতে পারব না মল্লিকমশাই—

না, না—কি আর যৎসামান্য—সুরেন্দ্র মল্লিক বলেন, নিন আরম্ভ করুন—

না মল্লিক মশাই, বৃদ্ধ হয়েছি—এত সব খেতে পারব কেন—প্রাণকৃষ্ণর অল্প বয়স ও যা পারে আমি কি তা পারি—সজোরে বৃদ্ধ লোকটি বললেন ঐ সময়।

প্রাণকৃষ্ণ এবারে বলে, না খুড়োমশাই, আপনি যা পারেন থান—

গৌরী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

রন্ধনশালার মধ্যে প্রবেশ করে মেঝেতে বসে পড়ে থপ্ করে। দুর্গা দেবী তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন—

কি হলো, অমন করে বসে পড়লি কেন মা ?

মাথাটা—মাথাটা কেমন ঘুরছে মা—কোনমতে কথাগুলো বলে গৌরী।

তবে থাক তুই বোস—আমি দেবো'খন বাকীটা—দুর্গা দেবী বলেন।

সত্যিই যেন গৌরীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে তখন।

চিনতে মানুষটাকে তার ভুল হয় নি—হতে পারে না, কিন্তু একি শুনলো সে।

হালীশহরের দত্তবাড়ির দত্ত।

রমণীরঞ্জন মুখোটি নয়—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত…। মানুষটাকে চিনতে যে তার ভুল হয় নি তার চাইতে তো কেউ বেশী জানে না। কিন্তু হে ভগবান, একি শুনলো সে! এ কথা শোনার আগে সে বধির হয়ে গেল না কেন!…তার সমস্ত স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে গেল না কেন।

আমার মাথাটার মধ্যে যেন কেমন করছে মা—আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি—

কথাগুলো কোন মতে বলে টলতে টলতে গৌরী রন্ধনশালা থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ইতিমধ্যে এক সময় মৃন্ময়ীর ঘুম ভেঙেছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে সে শয্যার উপরেই শিথিল অলস ভঙ্গিতে বসে ছিল, পদশব্দে ফিরে তাকায়।

গৌরী টলতে টলতে ঘরে ঢুকে কোনমতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। জ্ঞান হারিয়ে দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল।

চিৎকার করে ছুটে আসে মৃন্ময়ী ভূপতিত গৌরীর সামনে। পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত লেগে কপালটা কেটে গিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে তখন।

কি—কি হলো ?

ঘণ্টা দুই বাদে সেদিন গৌরীর জ্ঞান আবার ফিরে এসেছিল বটে, কিন্তু সে চোখ মেলেও তাকায় নি, মেঝে থেকেও ওঠে নি।

মেঝের ওপরে যেমন পড়েছিল, তেমনিই পড়ে থাকে নিঃসাড়ে।

মৃন্ময়ী শিয়রের ধারে বসে হাওয়া করতে থাকে।

দুর্গা দেবী বার দুই এসে সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন—মোক্ষদা, আর সৈরভীও সংবাদ নিয়ে গিয়েছে।

দুর্গা দেবী বলেছেন ওকে যেন বিরক্ত না করা হয়—

ঘরের থেকে সেদিন কেন, তারপরও দুটো দিন গৌরী আর বেরই হয় নি।

ঘর থেকে বের হতে পারে নি।

আর শিবনাথ সেই দিন হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মল্লিকবাড়ির ফটকের সামনে এসে অনেকক্ষণ ভূতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে গিয়েছিল বৌবাজারে। একবার ভেবেছিল নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু তাও করে নি।

নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই হয়তো কথাটা শেষ পর্যন্ত দুর্গা দেবীর কানেও উঠবে। তখন তিনি কি ভাববেন।

ভাববেন হয়তো ছেলেটা কি নির্লজ্জ। মৃন্ময়ীর জন্যই ছুটতে ছুটতে আবার এসেছে। তাছাড়া মৃন্ময়ী—সে যদি কথাটা শোনে, সে-ই বা কি ভাববে।

চোরের মতই নিঃশব্দে আবার পালিয়ে এসেছিল শিবনাথ বৌবাজারে।

ফিরে এসে নিজের ঘরে অন্ধকারে চৌকিটার ওপরে চুপচাপ শুয়ে ছিল। শিবনাথ। নিজের ভাগ্যের কথাই ভাবছিল।

মা বলতে গেলে জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছিল, আর বাপ মারা যায় যখন তার বয়স আট কি নয়—সে তখন দিনাজপুরে তার মামা-বাড়িতে মানুষ হচ্ছে।

মা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপ হরিচরণ লাহিড়ী তাকে শ্বশুরালয়ে রেখে গিয়েছিল। নিজে নীলের দালালী করত—সর্বদা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হতো।

গৃহে থাকতই না বলতে গেলে সারাটা বছর।

মাতুল অম্বিকাপ্রসাদের গৃহেই সে মানুষ।

মাতুল অম্বিকাপ্রসাদ যদিও দিনাজপুরে রাজার অধীনে কাজ করতেন তথাপি বিষয়-আশয় ও উপার্জনের চাইতে বেশী ব্যস্ত থাকতেন তিনি নানা ধর্মানুষ্ঠান ও গৃহদেবতা বালগোপালকে নিয়ে।

এক কথায় অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

অম্বিকাপ্রসাদের স্ত্রী ভবসুন্দরীও স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন।

স্বামী-স্ত্রী কখনো সঞ্চয়ের দিকে মন দেন নি। রাজার অধীনে কাজ করে

অম্বিকাপ্রসাদ নেহাত মন্দ উপার্জন করতেন না, কিন্তু পূজা-পার্বণ অতিথি-সেবা—দানধ্যানেই সব নিঃশেষ হয়ে যেত।

সঞ্চয়ের থলি শূন্যই থাকত।

চারটি সন্তান—দুটি কন্যা ও দুটি পুত্র। কন্যা দুটির বিবাহ হয়ে গিয়েছিল পুত্র দুটি কাছেই থাকতো। শিবনাথ তাদের সঙ্গেই মানুষ হচ্ছিল। অম্বিকাপ্রসাদের পুত্র দুটি লেখাপড়া করে নি—লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় নি—সে কারণে অম্বিকাপ্রসাদের দুঃখের অন্ত ছিল না।

বালককাল থেকেই শিবনাথের শিক্ষার ব্যাপারে প্রবল অনুরাগ দেখে অম্বিকাপ্রসাদ তাকে বরাবর উৎসাহ দিতেন।

নিজে সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হলেও শিবনাথকে উৎসাহ দিতেন ইংরাজী শিক্ষার জন্য।

অম্বিকাপ্রসাদ নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু কিছু ইংরাজী ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন এবং তিনি মনে করতেন যুগের পরিবর্তন হচ্ছে—ঐ পরিবর্তনে ইংরাজী শিক্ষা অন্যতম স্থান অধিকার করবে।

মাতুলের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শিবনাথের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মায়।

কিন্তু ইংরাজী ভাল করে শিক্ষা করতে হলে শহর কলকাতা ভিন্ন উপায় নেই।

ইংরাজী শিক্ষার পীঠস্থানই হচ্ছে শহর কলকাতা, এও লোকপরম্পরায় শিবনাথ শুনেছিল।

কিন্তু কলকাতায় যে শিবনাথ যাবে—থাকবে কোথায়; থাকবার একটা জায়গা না হলে তো কিছুই হবে না।

হঠাৎ ঐ সময় অম্বিকাপ্রসাদের মনে পড়ে তার বিশেষ পরিচিত বিশিষ্ট ধনী কলকাতা শহরবাসী কুমারটুলীর অরিন্দম সরকারের কথা।

অম্বিকাপ্রসাদ অরিন্দম সরকারের গুরুবংশ—তাছাড়া পণ্ডিত রাজানুগৃহীত লোক—অরিন্দম সরকার তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতো তেমনি মান্য করতো।

অম্বিকাপ্রসাদ অবিশ্যি জানতেন লোকটা একটা অর্থপিশাচ এবং নানা ধরনের ব্যবসা আছে অর্থোপার্জনের কিন্তু তৎসত্ত্বেও দান-ধ্যান করতো।

বার বার দুইবার বিবাহ করেছে, কিন্তু কোন সন্তানাদি হয় নি।

চেতলা অঞ্চলে আসল ব্যবসা অরিন্দম সরকারের—চালের আড়ত।

অম্বিকাপ্রসাদ স্থির করলেন অরিন্দম সরকারকেই তিনি শিবনাথকে আশ্রয় দেবার জন্য অনুরোধ করবেন। এবং একদিন ভাগিনেয় শিবনাথকে নিয়ে তিনি

নৌকাযোগে কলকাতা শহরের দিকে রওনা হলেন।

অরিন্দম সরকার অম্বিকাপ্রসাদকে প্রত্যাখ্যান করলো না—সাদরে শিবনাথকে তাঁর গৃহে স্থান দিল এবং বিদ্যালয়েও ভর্তি করে দিল।

কিন্তু ভাগ্য তার বিরূপ—বৎসর দুইয়ের বেশী সেখানে থাকতে পারল না—এলো সে আবার ভাসতে ভাসতে ভাগ্যের স্রোতে সুন্দরসাহেবের গৃহে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সেখানেও থাকা হলো না।

আবার এক রাত্রে ভাসতে হলো এবং ভাসতে ভাসতে এখানে এসেছে জীবনকৃষ্ণর আশ্রয়ে।

কিন্তু এখানে—এখানেও কি সে টিকে থাকতে পারবে। আজকের দিনে শহর কলকাতার যে নূতন ধনী সমাজ গড়ে উঠেছে সেই সমাজের অন্যতম এরা।

কেবল যে অর্থ উপার্জনই করেছেন তাই নয়—নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে সমাজ ইংরাজী শিক্ষা ও তাদের চালচলন আচরণের সঙ্গে ক্রমশ গড়ে উঠেছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, কালীকৃষ্ণ যেন সেই দলেরই একজন—সেই সমাজেরই একজন।

একমাত্র ছেলে জীবনকৃষ্ণকেও তাই সেই পথে এগিয়ে যেতে সকল প্রকারে উৎসাহ যোগাচ্ছেন। হিন্দু কলেজে কিছুদিন হলো ভর্তি হয়েছে সে।

এবং সে মিশছে এখন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে এবং ওরাই জীবনকৃষ্ণর অন্তরঙ্গ বন্ধু—সাথী—পরামর্শদাতা।

জীবনকৃষ্ণ আগে গঞ্জিকা সেবন করত মধ্যে মধ্যে, এখন হিন্দু কলেজে ঢোকবার পর নিয়মিত সুরা পান করে।

অথচ মনেপ্রাণে ঐ সুরাপানকে ঘৃণা করে শিবনাথ।

জীবনকৃষ্ণর প্রতিভা—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—বন্ধুপ্রীতি ও উদারমনের প্রশংসা করে, ভালবাসে শিবনাথ তাকে, কিন্তু তবু কোথায় যেন পরস্পরের মধ্যে একটা গণ্ডি আছে।

সেই গণ্ডিটা যেন কিছুতেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

জীবনকৃষ্ণর ওখানেই দিন দশ-বারো কেটে গেল। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলির অভাবে রীতিমত অসুবিধা হতে থাকে শিবনাথের।

প্রতিদিনকার ক্লাসের পড়া করে উঠতে পারে না—শিক্ষকরা যা পাঠ দেন প্রত্যহ সেটা হয় না—বোঝা যায় না।

শেষ পর্যন্ত একদিন মরীয়া হয়েই সুন্দর সাহেবের গৃহের দিকে পা বাড়ালো

শিবনাথ। এবং সুন্দর সাহেবের কুলীর বাজারের বাড়ির সামনে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যখন পৌঁছাল শিবনাথ—সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে।

এখানে ওখানে সন্ধ্যার ঝুপসি ঝুপসি অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে। বাড়িটাও অন্ধকার। বাড়ির কোথায়ও আলোর চিহ্নমাত্রও নেই।

থমকে দাঁড়ায় শিবনাথ।

বাড়িটা অন্ধকার কেন! দাক্ষায়ণী কি এখনো আলো জ্বালে নি—সন্ধ্যাপ্রদীপ দেয় নি। সুন্দর সাহেব কি তাহলে এখনো ফেরে নি।

সুন্দর সাহেব যদি বাড়িতে না থাকে তো ভালই হয়। এক ফাঁকে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে বই ও খাতাপত্রগুলো নিয়ে চুপি চুপি বের হয়ে আসতে পারে।

পিছনের বাগানের দিক দিয়েও ভিতরে প্রবেশ করা যায়। সেই ভাল, পিছনের দরজা দিয়েই শিবনাথ ভিতরে প্রবেশ করবে।

এগিয়ে গেল শিবনাথ বাগানের দিকে, বাগানের মধ্যেও অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে কিন্তু শিবনাথের বিশেষ অসুবিধা হয় না চলতে—সবই তো তার অনেক দিনের পরিচিত।

নিঃশব্দে আন্দাজেই অন্ধকারে এগিয়ে চলে শিবনাথ।

যে ঘরে সে থাকত—সেই ঘরের পিছনের দরজার সামনে এসে সে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে যায়। থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

অন্ধকার হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না শিবনাথের—ঘরের দরজাটা খোলা।

অন্ধকারে খোলা দরজার কপাট দুটো বাতাসে এদিক ওদিক করছে—মৃদু একটা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আশ্চর্য!

দরজাটা খোলা কেন?

কয়েকটা মুহূর্ত শিবনাথ যেন ইতস্তত: করলো—কি করবে না করবে বোধ করি ভাবে, তার পর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে।

অন্ধকার ঘরটা।

এতক্ষণ বাইরে তবুও অন্ধকারে ঝাপ্সা ঝাপ্সা কিছু কিছু অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু ঘরের মধ্যে তাও বোঝা যায় না।

মনে হয় যেন হঠাৎ চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

উপায় কি? দাঁড়িয়ে যায় শিবনাথ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল মনে নেই—হঠাৎ একটা মৃদু আলোর শিখা মনে হলো

যেন ঐ দিক থেকেই আসছে।

আলোর শিখাটা কাঁপছে যেন।

চেয়ে থাকে শিবনাথ একদৃষ্টে সেই দিকে। ক্রমশঃ আলোর শিখাটা এগিয়ে আসে এবং শিবনাথের চোখে পড়ে একটা প্রদীপ হাতে ঘরের সামনে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে দাক্ষায়ণী।

প্রদীপের মৃদু আলো দাক্ষায়ণীর চোখে পড়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে।

শিবনাথ যেন নড়তেও ভুলে যায়।

যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেন দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রদীপ হাতে দাক্ষায়ণী এগিয়ে আসে। এবং ঘরের সামনাসামনি এসেই শিবনাথকে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে বোধ হয় দেখতে পায়।

দাঁড়াল দাক্ষায়ণী।

কে?

শিবনাথ নিশ্চুপ। দাক্ষায়ণী আবার এগিয়ে আসে।

কে?

চিনতে পারে দাক্ষায়ণী শিবনাথকে, শিবনাথ!

শিবনাথ নিঃশব্দে চেয়ে আছে দাক্ষায়ণীর মুখের দিকে।

শিবনাথ তুমি···তারপরই একটু যেন চুপ করে থেকে বলে, সুন্দর সাহেব তো নেই—

সুন্দর সাহেব –

শিবনাথের ওষ্ঠের ভঙ্গী দেখেই দাক্ষায়ণী বোধ করি কথাটা বুঝতে পেরে আবার বলে, না—সাহেব নেই—

কোথায়?

আবার ভঙ্গিকে পাঠ করে দাক্ষায়ণী বলে, জানি না–চলে গিয়েছে—

চলে গিয়েছে!

হ্যাঁ—

কোথায়?

জানি না—বলেই বলে, মৃন্ময়ীও নেই—

মৃন্ময়ী নেই!

না—মৃন্ময়ীও নেই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সত্যিই সুন্দর সাহেব নেই।

দিন সাতেক হলো সে যে কোথায় চলে গিয়েছে দাক্ষায়ণী জানে না। কিছু তো বলে যায় নি, জানবেই বা কি করে।

ফিরে এলো সুন্দরম্ চার দিন পরে আবার সেই কুলীর বাজারের সেই গৃহে।

একটা নিষ্প্রাণ মানুষ যেন কোনমতে ফিরে এলো।

সব শূন্য হয়ে গিয়েছে, সব ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। কেবল বিরাট একটা অন্ধকার—একটা হাহাকার যেন তার সমস্ত অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দিতে চাইছে।

অক্টোপাশের মত অষ্টবাহু বাড়িয়ে কুক্ষিগত করতে চাইছে।

সে একটা মানুষ—অথচ না হিন্দু—না মুসলমান না ক্রিশ্চান! কোন জাত্ নেই—ধর্ম নেই—পরিচয় নেই।

অজ্ঞাতকুলশীল এক হতভাগ্য।

সেই যে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পায়চারি করতে থাকে সুন্দরম্—তার যেন বিরাম নেই। পায়চারি করছে তো করছেই।

দাক্ষায়ণী খাবার নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছে—ডেকে ডেকে কোন সাড়া পায় নি। এবং সেদিন যখন সকালে এসে দাক্ষায়ণী জানাল, মৃন্ময়ী তার ঘরে নেই—তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও—সুন্দরম্ একবার মাত্র কথাটা শুনে দাক্ষায়ণীর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়েছিল।

একটি কথা বলে নি। একটি শব্দ করে নি। কথাটা যেন তার কর্ণকুহরে প্রবেশই করে নি।

মৃন্ময়ী নেই গো—তাকে দেখতে পাচ্ছি না কোথাও, দাক্ষায়ণী আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে।

সুন্দরম্ চেয়ে থাকে দাক্ষায়ণীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে—কোন কথা বলে না।

শিবনাথও নেই—দাক্ষায়ণী আবার বলে।

সুন্দরম্ পূর্ববৎ চুপচাপ—কোন কথা নেই মুখে। দাক্ষায়ণী কি করবে অতঃপর বুঝে পায় না।

সুন্দরম্ তখন আবার পায়চারি শুরু করেছে। দাক্ষায়ণী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থেকে ঘর থেকে একসময় বের হয়ে যায়।

আরো দুটো দিন ঐ ভাবে চলে গেল।

সুন্দরম্ ঘর থেকে বেরুল না।

তৃতীয় দিনের দিন দ্বিপ্রহরে এলো বুড়ো মাঝি এমানুল্লা।

চালের নৌকা এসেছে—সুন্দরবন থেকে কাঠ এসেছে, আড়তে—গোলায় তুলতে হবে। সংবাদটা সুন্দরম্‌কে দিতে এসেছে এমানুল্লা।

সুন্দরম্ কোন কথা না বলে অনেকক্ষণ কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে এমানুল্লার দিকে।

অনেক বয়স হলো মাঝির। তা প্রায় সত্তর তো হবেই।

তবে অত বয়েস হলেও শরীরের বাঁধন এখনো যেন বেশ শক্ত আছে। গায়ে শক্তি আছে, পরিশ্রমও করতে পারে।

কাপিতান রোজারিওর সময়কার লোক। এককালে এমানুল্লা মাঝি রোজা-রিওর ডান হাত ছিল।

ভৃত্যকে ভৃত্য—বন্ধুকে বন্ধু—পরামর্শদাতাকে পরামর্শদাতা।

সুন্দরম্‌কে দরিয়ায় একপ্রকার ঐ এমানুল্লাই তো মানুষ করেছে।

এমানুল্লা তাই বোধ হয় সুন্দরম্‌কে ভালও বাসত খুব।

সুন্দরম্‌কে তার মুখের দিকে অমন ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে শুধায়, কি হলো সাহেব—কি হয়েছে তোমার—শরীর কি খারাপ?

হঠাৎ ঐ সময় সুন্দরম্ ডাকে, এমানুল্লা—

সাহেব! এমানুল্লা কেমন যেন একটা বিস্মিতই হয়েছে—সাহেবের মুখখানা যেন কেমন শুকনো শুকনো।

তুমি তো অনেক কালের লোক এমানুল্লা?

হ্যাঁ সাহেব—তোমার ফাদারের আমলের—

অনেক বছর হলো আমাদের সঙ্গে আছো তুমি—

তা হবে বৈকি—দু-কুড়ি সাল—তোমার ফাদার কাপিতান সাহেবের কাছে যখন প্রথম নোয়াখালী থেকে কাজ করতে এলাম আমার বয়স তখন কত আর হবে—তাগড়াই জোয়ান—বড় জোর এক কুড়ি পাঁচ বছর মত হবে—

তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা জান এমানুল্লা? কথাটা বলে তীক্ষ্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুন্দরম্ মাঝির মুখের দিকে।

এমানুল্লা সুন্দরমের শেষ কথায় হঠাৎ যেন থমকে যায়। এতক্ষণ মনটা তার হাসি হাসি ছিল। সুন্দরমের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই হাসিটা যেন মুছে গেল

মুখ থেকে।

দু চোখের দৃষ্টিতে এমামুল্লার কেমন যেন শঙ্কাও ঘনিয়ে ওঠে বলে মনে হয়।

একটু থেমে আস্তে আস্তে শুধায়, কি হয়েছে সাহেব?

কিছুই তো হয় নি মাঝি—

হ্যাঁ—তোমার মুখটা যেন কেমন শুকনো-শুকনো দেখছি—কি হয়েছে সাহেব?

তুমি আমার মাকে নিশ্চয়ই দেখেছো মাঝি।

ভয়লা বিবিকে তো—হ্যাঁ, কাপিতান সাহেবের বিবিকে দেখেছি বৈকি—ভয়লা বিবি বড় ভালবাসত কাপিতানকে। আর কাপিতান সাহেবের নাও নিয়ে হেথা-হোথা ডাকাতি করে বেড়ানটা আদৌ দেখতে পারত না। সেজন্য দুজনে কত ঝগড়া হয়েছে। কান্নাকাটি রাগারাগি, কিন্তু কাপিতান সাহেব কি কুঠীতে হাত-পা কোলে করে বসে থাকবার লোক—দরিয়ার নেশা যে বড় চড়া নেশা—আর ঐ লুঠতরাজ—খুনখারাপি—আরে তোমাকে তো বিবিসাহেবা প্রথমটায় ছাড়তেই চায় নি। জোর করে তোমার মার বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিল কাপিতান—বলে শেরের বাচ্চা শেরই হয়—বিল্লী হয় না কোনদিন—তা বুড়ি—এখন বুড়িই বৈকি—আমিই তো বুড়ো হয়ে গেলাম—ব্যাণ্ডেলে পড়ে আছে—একা একা হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে, নিয়ে এসো না সাহেব তাকে এখানে।

মা আর নেই এমামুল্লা—

নেই—বিস্ময়াভূত ভাবে কথাটা উচ্চারণ করে এমামুল্লা।

মা—মা মারা গেছে।

আহা—কবে গো?

দিন তিনেক হলো।

আহা বড় ভাল ছিল গো বিবিসাহেবা—এমামুল্লার চোখের কোল দুটো কথা বলতে বলতে জলে ভরে ওঠে।

এমামুল্লা—

তা আর দুঃখ করে কি করবে বল সাহেব! খোদাতাল্লার ডাক তো সবাইয়ের কাছেই একদিন পৌঁছাবে—

আচ্ছা, এমামুল্লা তুমি নিশ্চয়ই জান?

কি সাহেব? কি জানি—

আমি কাপ্তেন সাহেবের সন্—মানে—লেড়কা নই—

না, না—কে বললে এ কথা—সেই তোমার ফাদার—তুমি তারই সন্—

না এমামুল্লা, আমি জানি আমি তার সন্ নই—সে আমার ফাদার নয়—মেরী ভায়লা আমার মাদার নয়—

কে—কে বলেছে তোমাকে এসব কথা সাহেব? ঝুট্—সব ঝুট্! এমামুল্লা প্রতিবাদ করে ওঠে।

না এমামুল্লা ঝুট্ নয়—কারণ মাদার মেরীই মরবার আগে কথাটা আমাকে বলে গিয়েছে—আমি তাদের সন্ নই—সে আমার নিজের মাদার নয়—কাপ্তেন রোজারিও আমার ফাদার নয়—আমি তাদের কেউ নই। তাদের কোন ছেলে মেয়ে ছিল না, তারা সন্-এর মত আমাকে লালন-পালন করেছে মাত্র—

ভয়লা—ভয়লা বিবি একথা তোমাকে বলেছে সাহেব?

এমামুল্লার কণ্ঠে তথাপি যেন কিসের দ্বিধা—কিসের একটা অবিশ্বাসের সুর—চেয়ে আছে তখনো সে সুন্দরমের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—বলেছে—She told me this truth—তুমি হয়তো শুনলে আশ্চর্য হবে এমামুল্লা—আমারও কতদিন মনে হয়েছে—

কি—কী মনে হয়েছে তোমার সাহেব? ব্যাকুল দৃষ্টিতে এমামুল্লা সুন্দরমের মুখের দিকে তাকায়।

আমি যদি ওদের সন্‌ই হবো—ওরাই যদি আমার নিজের ফাদার এণ্ড মাদার হবে তবে হোয়াই আমার গায়ের রঙ এত কালো কেন? হোয়াই আই অ্যাম্ সো ব্ল্যাক—ওরা অমন সুন্দর টক্‌টকে ফর্সা লাল কেন? হোয়াই?—

মেরী ভায়লা তাহলে সব তোমাকে বলেছে?

হ্যাঁ—

কিন্তু তাদের তুমি নিজের ছেলে না হলেও—তারা তোমায় নিজের ছেলের মতই তো ভালবাসত সাহেব?

তা বাসত—কিন্তু তবু তো আমি তাদের কেউ নই। তাদের ব্লাড্—আমার ব্লাড্ এক নয়—আমি তবে কে?—হিন্দু—মুসলমান—ক্রিশ্চান—কি আমি?... এমামুল্লা—আমি জানতে চাই কে আমি? কি আমার আইডেনটিটি—কার ছেলে আমি—হু ইজ মাই ফাদার—হু ইজ মাই মাদার—are they still living or dead—

ওসব কথা আর কেন সাহেব—

না এমামুল্লা, আমাকে জানতেই হবে—I must know—must know—কে আমার ফাদার—কে আমার মাদার—কাদের ব্লাড্ আমার শরীরে—কাদের সত্যিকারের সন্ আমি—

মনে কর না তুমি গডের সন্—আল্লার সন্—

না, না—I am not a saint—not a পাদ্রী—I don't want to be their son—আমি মানুষ ফাদার মাদারের সন্ হতে চাই—আমার মানুষ ফাদার—মানুষ মাদারকে আমি জানতে চাই—বলতে বলতে বিরাট ঐ দৈত্যাকৃতি পুরুষটার দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। আমি জানতে চাই—আমি—ক্রিশ্চান না হিন্দু না মুসলমান!……এ অপরিচয়ের অন্ধকার অসহ্য মাঝি—এ অন্ধকারে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—এ আমি ভাবতে পারছি না যে আই অ্যাম নো ওয়ানস্ সন্—I don't belong to anybody—

সাহেব স্থির হও—সান্ত্বনা দেবার বুঝি চেষ্টা করে সুন্দরম্‌কে এমামুল্লা।

পৃথিবীতে সবার মা—মাদার—বাপ—ফাদার আছে—একটা পরিচয় আছে—একটা জাত আছে—দেশ আছে—সমাজ আছে কিন্তু আমার যে কিছু নেই। শূন্যে এক বিরাট অন্ধকারের মধ্যে অসহায়ের মত ভাসছি, নো হোয়ার—মাঝি—

সাহেব?

নিশ্চয়ই সে রাত্রের কথা তোমার মনে আছে—

কোন রাত্রের কথা সাহেব?

যে রাত্রে দরিয়ার পানি থেকে—ভাসমান আমার মার বুক থেকে তোমরা আমাকে তুলে এনেছিলে—ছিনিয়ে এনেছিলে—

মৃদুকণ্ঠে এমামুল্লা বলে, মনে আছে বৈকি—খুব মনে আছে—

কে—কে এনেছিল আমার মার বুক থেকে আমাকে ছিনিয়ে মাঝি! Who—

আমি—

তু-তুমি এনেছিলে!—Then you—

হ্যাঁ—

তাহলে—তাহলে তুমি নিশ্চয়ই জান—তখন আমার মা বেঁচে ছিল না মারা গিয়েছিল?

তখনো বেঁচেই ছিল। দরিয়ায় ভাসতে দেখেই তো তাকে আমরা নাওয়ের ওপরে তুলে নিই—

তারপর—বল মাঝি। থেমো না, তারপর? What next—

দেখলাম—তার তখন জ্ঞান নেই বটে—একে ঠাণ্ডার সময় তায় জলে ভিজে ভিজে বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিল। তুমি বাঁধা ছিলে শক্ত করে তার পিঠের

সঙ্গে শাড়ির আঁচল দিয়ে—

তারপর—

কাঁদছিলে তুমি ট্যাঁ-ট্যাঁ করে—সেই কান্না শুনে ভায়লা বিবি নাওর কেবিন থেকে বের হয়ে এসে তোমাকে দেখতে পেয়ে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে নেয়। ভায়লা বিবির কোন ছেলেপিলে ছিল না, অথচ একটি ছেলের জন্য হেদিয়ে মরত। হেদিয়ে মরলে কি হবে। আল্লা রসুল না দিলে কি হয়—

তারপর—তারপর আমার মার কি হলো বলো! **What happened to my mother**—

জ্ঞান ফিরে এসে পাছে তার ছেলেকে ফিরিয়ে নেয় ভায়লা বিবির কাছ থেকে তাই কাপিতান সাহেব, তোমার ফাদার, আদেশ দিল সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই পাড়ে কোথাও তাকে ফেলে দিতে—

সেকি—তার পর!

কিনারায় নাও লাগিয়ে—বালুর ওপরে তোমার অজ্ঞান মাকে শুইয়ে দিয়ে আমরা চলে এলাম—

তোমরা এত ক্রুয়েল—

কি করি বল—কাপিতানের আদেশ—

আচ্ছা মাঝি—আমার মাদার—মা—কেমন ছিল দেখতে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে—

অনেক সালের কথা—তাহলেও মনে আছে আজো। খুব খুপসুরত জেনানা ছিল তোমার মাদার—তবে তোমার মতই গায়ের রঙটা কিন্তু কালো—ব্ল্যাক ছিল না—

আর, আর—কিছু মনে নেই তোমার মার সম্পর্কে?

কপালের ওপরে—ডান দিকে একটা বড় কালো জরুল ছিল—মাথায় সিন্দুর, হাতে শাঁখা—

তবে—তবে নিশ্চয়ই হিন্দু ছিল কি বল মাঝি?

হ্যাঁ—হিন্দুই আমার মনে—

নিশ্চয়ই তাই—ক্রিশ্চান—মুসলমান তারা তো···সিন্দুর দেবে না কপালে—হাতে শাঁখাও পরবে না—তবে আমি হিন্দুর সন্—আই অ্যাম এ হিন্দু—আই অ্যাম্ এ হিন্দু—আমি খুঁজে বের করব—যেমন করে হোক আমার মাকে আমি খুঁজে বের করব।

কিন্তু—মাঝি যেন কি বলবার চেষ্টা করে।

সুন্দরম্ বলে, আই অ্যাম্ সিওর—আমার মা আজো বেঁচে আছে—লিভিং—মাই মাদার ইজ লিভিং—

কিন্তু কোথায় খুঁজবে তাকে সাহেব—সেই নির্জন দূর সমুদ্রতীর থেকে কি আর সে বেঁচে ফিরতে পেরেছে—

ফিরেছে—ফিরেছে বৈকি। আমার মন বলছে ফিরেছে—মন বলছে শি ইজ লিভিং—আছে আমার মা বেঁচে আছে—

কিন্তু এত সাল পরে—তুমি তখন এতটুকুটি ছিলে—এখন কত বড় হয়েছো—চিনবে কি করে তোমার মাকে?

আমি না চিনতে পারি—মাদার, আমার মাও কি আমায় চিনবে না। সে নিশ্চয়ই আমাকে ঠিক ঠিক রিকগ্নাইজ্ করবে—আমি যে তার সন্—তার ব্লাড্ যে আমার ব্লাড্—তার বুকের মিল্ক্ যে আমি পান করেছি—মাদার—আমার মা—ও গড্—মাদার—আমার মা—হেলপ্ মি। হেলপ্ মি টু ফাইণ্ড হার আউট—

হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'চোখ বুজে বুকে ক্রস এঁকে বলতে থাকে সুন্দরম্—আমেন—আমেন—

দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বলতে বলতে আবার হঠাৎই উঠে দাঁড়ায় সুন্দরম্—আমি আজই টেম্পলে—মন্দিরে যাবো পূজা দিতে—গডেস আমার—হিন্দুর কালীকে পূজো দোবো—

পূর্ববৎ দু'চোখের কোল বেয়ে সুন্দরমের জল গড়াতে থাকে।

॥ ২ ॥

এমানুল্লাও যেন কেমন বিহ্বল হতভম্ব হয়ে যায়।

দৈত্যাকৃতি মানুষটার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে– সে কাঁদছে অসহায় একটা বাচ্চার মত।

আজকে কি বার জান মাঝি? সেটারডে না—

হ্যাঁ—

আজই আমি যাবো—হোলি গ্যাঞ্জেসে—গঙ্গায় ডাইভ দিয়ে মাদার কালীকে পূজো দেবো—প্রায়শ্চিত্ত করব—এগেন আমি হিন্দু হবো—আমি চল্লাম—

সুন্দর সাহেব বের হয়ে যাচ্ছিল এমানুল্লা ডাকে, শোন সাহেব, শোন—দাঁড়াও একটা কথা আছে—

দাঁড়াও আগে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হই, তারপর—

শোন—শোন—তার জন্য তাড়াতাড়ি কি—সে তো কালও হতে পারে—

না—না—আর একটা মুহূর্তও নয়—

শোন—তোমাকে আমি একটা জিনিস দিতে চাই—

কি ?

তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি নাও থেকে সেটা নিয়ে আসছি—হয়তো—হয়তো, কে জানে তোমার মা যদি আজও সত্যি বেঁচে থাকে সেগুলো থেকেই তোমাকে চিনে নিতে পারবে—

কি—কি সেগুলো !

এক জোড়া মল—

মল !

হ্যাঁ, পায়ে ছিল তোমার আর তোমার জামাটা যেটা তোমার গায়ে ছিল—আর—

আর কি ?

একটা চিঠি !

কিসের চিঠি, কার চিঠি !

তা তো জানি না—তোমার পরনের কুর্তার ঘেরে ছিল—

কি—কি লেখা ছিল তাতে ?

আমি তো লেখাপড়া জানি না সাহেব—পড়তে পারি নি তো—তবে চিঠিটা আছে—রেখে দিয়েছি আমার কাছে—

চল—চল এখুনি আমি সেগুলো নেবো—দেখবো—

চল।

তখুনি দুজনে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

যদি—যদি সেই চিঠির মধ্যে কোন সন্ধান পাওয়া যায় তার মা-বাবার—কোন জন্মপরিচয় তার পাওয়া যায়।

কার ছেলে কি বৃত্তান্ত—কোথায় দেশ—কি নাম—

যদি সেই চিঠির কোথাও লেখা থাকে তার মা ও বাবার সত্যিকারের পরিচয়টা।

পথে বের হয়ে সুন্দরম্ শুধায়, এতদিন—তবে তুমি আমাকে চিঠিটা দাও নি কেন এমাসুল্লা ?

বুঝতে পারি নি সাহেব যে তুমি কোন দিন সে চিঠিটা চাইবে—চিঠিটা কোনদিন তোমার প্রয়োজন হবে—তাছাড়া সাহেব, চিঠিটার কথা আমার তো

মনেই ছিল না—

মনে ছিল না?

না। সে রাত্রে তোমার গা থেকে ভিজে কুর্তাটা দরিয়ার পানিতে ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কুর্তার ঘেরে চিঠিটা আমার নজরে পড়ে। একটা ভাঁজ করা কাগজ, খুলে দেখি তাতে কি সব লেখা আছে। কি খেয়াল হলো, চিঠিটা ঘেরের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে রেখে কুর্তাটা তুলে রেখেছিলাম একটা বাক্সর মধ্যে।

তার পর?

বাক্সটা নৌকার খোলেই থাকত—কিছুদিন আগে এনে আড়তঘরে রাখি—এখন সেখানেই আছে—এটা ওটা বাক্সটার মধ্যে যখন যা দরকার রেখে দিয়েছি—কখনো খুলি নি—খোলার দরকার হয় নি। বাক্সটায় পোকা হয়েছে বলে দিন পনের আগে রৌদ্রে টেনে বের করে সব ঝাড়তে গিয়ে চোখে পড়ল তোমার সেই মল দুটো ও কুর্তাটা—আর ঘেরের মধ্যে সেই চিঠিটা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল অনেক সাল আগের কথা। মনে পড়লো সেই রাতটার কথা—তোমার কথা, এতটুকু বাচ্চা তোমাকে কাপিতানের হুকুমে কেমন করে দরিয়া থেকে তুলেছিলাম। সেই সেদিনকার বাচ্চা তুমি আজ কত বড়টি হয়েছো—জোয়ান মরদ—

সুন্দরম্ কোন জবাব দেয় না আর।

বুকের মধ্যে তার একটা আশার আলো জ্বলছে আর নিভছে।

নিশ্চয়ই চিঠির মধ্যে তার পরিচয় আছে—যদি না থাকে—ভাবতে পারে না আর সুন্দরম্।

কদিন থেকেই ভাবছিলাম—জিনিসগুলো তোমায় দেখাব—কিন্তু সাহস হয় নি—পারি নি দেখাতে—

দুজনে এসে আড়তঘরে ঢুকল। চারিদিকে চালের বস্তা—লঙ্কা—গোলমরীচ-দারুচিনি নানা মসলার বস্তা—থরে থরে সাজান।

এমাদুল্লা বাক্সর মধ্য থেকে একটা পুঁটলি বের করে এনে সুন্দরমের হাতে দিল। লোভীর মত পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখল সেটা—রূপার এক জোড়া ছোট মল—ঠং করে মেঝেতে পড়ল।

তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে মল জোড়া মাটি থেকে তুলে নেয় সুন্দরম্।

এক জোড়া রূপার মল।

অযত্নে—অব্যবহারে কালো হয়ে গিয়েছে—ছোট ছোট ফাঁদ মলের। একদিন

যে শিশুর পায়ের এই মল জোড়া ছিল আজ সেই শিশু সে-ই— সুন্দরম্।

কুর্তাটা— ছোট্ট কুর্তা।

একটা লাল কাপড়ের কুর্তা।

চিঠি—চিঠিটা কোথায় এমানুল্লা?

ঐ কুর্তারই ঘেরে আছে দেখ সাহেব—

ঘের ঠিক নয়—কুর্তার ভাঁজের মধ্যে চিঠিটা ছিল—ভাঁজ থেকে টেনে চিঠিটা বের করে সুন্দরম্।

থর থর করে কাঁপছে যেন তখন সুন্দরমের সমস্ত শরীর। বুকের মধ্যে যেন দরিয়ার একটা সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে।

অবোধ্য অশ্রু আবার দু'চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করে দিচ্ছে।

কি আছে—কি আছে চিঠির মধ্যে—

জীর্ণ হয়ে গিয়েছে কাগজটা—লালচে হয়ে গিয়েছে। খুলতে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে খসে যাবার যোগাড়।

আঁকাবাঁকা হাতে দ্রুত কয়েকটি লাইন লেখা।

মা গঙ্গা,

আমার ছেলে গোপালকে আমি তোমার গর্ভে বিসর্জন দিতে পারলাম না। অপরাধ নিও না মা— তাই তাকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলাম। মরতে হয় তো মা ছেলে এক সঙ্গেই মরব। অভাগিনী সুলোচনা আর তার গোপালকে বুকে তুলে নিও মা।

মা—মা—তার মা—সুলোচনা—মা-ই তাহলে তাকে বুকে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

সেই অবস্থায় তাকে তোলা হয়েছিল—তার মার সঙ্গেই—তারপর তাকে রেখে মাকে তার আবার সাগরতীরে রোজারিও ফেলে রেখে চলে যায়।

তার জন্য আসলে দায়ী কে।

শুধু কি কাপিতান রোজারিও—পর্তুগীজ দস্যু রোজারিও—ঐ মাঝি এমানুল্লাও নয় কি—এমানুল্লাও—হ্যাঁ এমানুল্লা—

ঐ তাকে তার সমস্ত পরিচয়—সমস্ত জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। ঐ তাকে পরিচয়হীন—নামগোত্রহীন করেছে।

তারপর সব জেনে শুনেও এতদিন কোন কথা তাকে বলে নি। জানতে দেয় নি—সব কিছু তার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছে।

তাকাল সুন্দরম্ এমানুল্লার দিকে—

দু'চোখে অগ্নি-ঝরা দৃষ্টি যেন হিল হিল করে ওঠে সুন্দরমের—সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় যেন একটা আক্রোশের অগ্নিস্রোত বয়ে যায়।

বিশাল শালপ্রাংশু সমান দুই বাহু বাড়িয়ে সহসা এমানুল্লার গলাটা চেপে ধরে ক্ষুধার্ত একটা সিংহের মত সুন্দরম্।

সাহেব! একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে প্রাণভয়ে বৃদ্ধ মাঝি এমানুল্লা।

কিল—আই উইল কিল ইউ—তুমি—তুমি সব কিছুর জন্য দায়ী!

না—না সাহেব—সাহেব, খোদা রসুল জানে আমি—

নো—নো—নো—আই মাস্ট—আই মাস্ট কিল ইউ।

একটা ক্ষ্যাপা সিংহের মত সুন্দরম্ যেন বৃদ্ধ এমানুল্লার শীর্ণ গলাটা তার লোহার থাবার মত কঠিন দুটো থাবার মধ্যে দশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।

ক্ষেপে গিয়েছে যেন তখন সুন্দরম্।

তার বুদ্ধি-বিবেচনা সব কিছুই যেন তখন লোপ পেয়েছে। এমানুল্লা কি করে—কোন মতে তখন সুন্দর সাহেবের লৌহকঠিন থাবা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য আঁচড়ে কামড়ে সুন্দরম্‌কে বিপর্যস্ত করে তোলে।

হয়তো সুন্দরম্ সেদিন এমানুল্লাকে গলা টিপে মেরেই ফেলতো শেষ পর্যন্ত যদি না অকস্মাৎ ডি'কুনহা ওদের মাঝখানে এসে পড়তো।

সুন্দরম্‌কে তার মা ভায়লার খবরটা দেবার পর সেই যে কয়দিন আগে নাও ভাড়া করে সপ্তগ্রামের দিকে গিয়েছিল তারপর আর ডি'কুনহা তার কোন সংবাদ নিতে পারে নি। আজ তাই বাড়িতে সন্ধান না পেয়ে আড়তে সুন্দর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল অবশেষে।

আড়তঘরে পা দিয়ে দেখে ঐ বিভ্রাট।

একি—একি করছো কাপ্তান—ছেড়ে দাও, লিভ্ হিম—কোনমতে ডি'কুনহা এমানুল্লাকে সুন্দর সাহেবের কবল থেকে ছাড়িয়ে দিল।

বৃদ্ধ এমানুল্লার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই তখন—সে ঝুপ্ করে মেঝেতে বসে পড়ে। তারপর শুয়ে চোখ বোজে।

সুন্দরম্ তখনো হাঁপাচ্ছে।

ডি'কুনহাই শুধায়, কি ব্যাপার, একি—বুড়োটার গলা টিপে অমন করে ধরেছিলে কেন—ও যে আর একটু হলে মরে যেত—

হঠাৎ সুন্দর সাহেব সমস্ত ক্রোধ ভুলে গিয়ে হাউ হাউ করে একটা বাচ্চার

মত কেঁদে ওঠে, হি ইজ এ ডেমন—

কাপ্তান—

ও আমার যে কি ক্ষতি করেছে তুমি জান না ডি'কুনহা—না, না—ক্ষতি তো করে নি ও—হি হ্যাজ সেভড্ মি—হি ইজ নট এ ডেমন—হি ইজ এ গড্—গড্, গড্—বলেই সহসা ভূপতিত এমামুল্লার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত একত্র করে বলে সুন্দরম্—ক্ষমা করো—পার্ডন মি এনামুল্লা—সত্যিই তুমি গড্—ইউ আর নট এ ম্যান—ইউ আর এ গড্—পার্ডন—পার্ডন মি—

সুন্দরমের দু'গাল বেয়ে অজস্রধারায় জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। একটা শিশুর মত কাঁদতে থাকে সুন্দরম্।

বোকার মত ক্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে ডি'কুনহা—কি হলো, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

সুন্দরম্ আবার উঠে আসে হঠাৎ—ডি'কুনহার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে, ডি'কুনহা জান—জান—ইউ নো—আই অ্যাম নট এ ক্রেস্তান—আই অ্যাম এ হিন্দু—সন্ অফ্ এ হিন্দু—হিন্দুর ব্লাড আমার শরীরে—আমার ফাদার—আমার মাদার—বাবা-মা হিন্দু—দেয়ার সন্—আমিও হিন্দু।

ডি'কুনহা চেঁচিয়ে ওঠে, সাহেব—কাপ্তান, কি হলো তোমার—তুমি কি সুস্থ বোধ করছো না? নট ফিলিং ওয়েল? এনিথিং রং—

বুঝতে পারছি ডি'কুনহা, সুন্দর সাহেব বলে, তুমি নট বিলিভিং মি, বিশ্বাস করছো না আমাকে—বাট আসক্—জিজ্ঞাসা করো—জিজ্ঞাসা করো ওকে—ফিরে তাকাল কথাগুলো বলতে বলতে আবার এমামুল্লার দিকে—এমামুল্লাও তখন কোনমতে আবার উঠে বসেছে। মিটি মিটি ওদের দিকে তাকাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করো ওকে—হি নোজ—নোজ্ এভরিথিং—সব জানে ও আমার কথা—আই অ্যাম নট এ পর্টুগীজ ক্রেস্তান—আই অ্যাম এ হিন্দু। হিন্দু ফাদার—মাদার—হিন্দুর ব্লাড আমার শরীরে, আমি হিন্দু।

॥ ৩ ॥

ডি'কুনহা চেয়ে আছে বোকার মত সুন্দরমের মুখের দিকে।

তার তখন ধারণা হয়ে গিয়েছে সুন্দর সাহেব প্রকৃতিস্থ নয় যে কোন কারণেই হোক।

নচেৎ অমন ব্যবহার করছে কেন, অমন উল্টোপাল্টা কথা বলছে কেন মানুষটা। আবার মনে হয় ডি'কুনহার—কাপ্তেন প্রচণ্ড মদ্যপান করে নেশা

করে নি তো। নেশার ঘোরে মানুষটা আবোল-তবোল বকছে না তো!

কিন্তু ডি'কুনহা যতদূর জানে সুন্দরম্ তো সে রকম মদ্যপান করে না। মদ্যপান করে কদাচিৎ কখনো, তাও সামান্য মাত্রায়—কিন্তু তাও আগে করতো, ইদানীং নাও বেচে দিয়ে বিয়ে করে ব্যবসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সে নেশাও বন্ধ করে দিয়েছিল জানে ডি'কুনহা।

তবে কি হলো মানুষটার।

ডি'কুনহার সত্যিই কেমন যেন ভয়-ভয় করে। আর সুন্দর সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হয় না, তাই বুঝি এক পা এক পা করে পিছু হাঁটতে শুরু করেছিল ডি'কুনহা।

হঠাৎ সুন্দরম্ ডাকে, ডি'কুনহা—

বল! ভয়ে ভয়ে তাকায় ডি'কুনহা সুন্দরমের মুখের দিকে।

কোন একজন ভাল—ব্রাহ্মিনের খবর আমাকে দিতে পার!

কেন—কি হবে ব্রাহ্মিন দিয়ে—

আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।

কেন?

প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হবো—

আমি তো তেমন কাউকে চিনি না—তুমি বরং কালীর টেম্পলে গিয়ে খোঁজ কর। সেখানে অনেক ব্রাহ্মিনস্ আছে—তারা গডেস্ কালীর পূজা করে—

সেই ভাল—আমি চললাম—

সুন্দর সাহেব আর দাঁড়াল না—ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ডি'কুনহা এতক্ষণে এমানুল্লার মুখের দিকে তাকায়, কি ব্যাপার মাঝি?…কি হলো কাপ্তানের।…

এমানুল্লা তখন ধীরে ধীরে ব্যাপারটা যা ঘটেছিল ডি'কুনহাকে সংক্ষেপে বিবৃত করে। সব শুনে ডি'কুনহারও যেন বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

বলে, বল কি—সত্যি—সব ফ্যাক্‌ট্স্—

হ্যাঁ সাহেব—সত্যি—ও বুড়ো কাপিতান রোজোরিও ও ভায়লা বিবির ছেলে নয়। ভায়লা বিবির ছেলে ছিল না, ওকে দরিয়া থেকে তুলে নিয়ে নিজের ছেলের মত করে বিবি মানুষ করে—মরার সময় কি ভেবে ওকে সব কথা জানিয়ে গিয়েছে বুড়ি।

ও গড্—এ যে একটা রীতিমত স্টোরি—ডি'কুনহা আপন মনেই কথাটা উচ্চারণ করে।

আড়তঘর থেকে বের হয়ে হন হন করে পথ চলছিল সুন্দরম্।

ব্রাহ্মিন্—একজন ভাল ব্রাহ্মিন্—হোয়ার, কোথায় পাবে সে—যে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার এগেন হিন্দু করে দেবে, তার জন্মস্বত্ব—সত্যকারের পরিচয় আবার সে ফিরে পাবে—

ব্রাহ্মিন্—ব্রাহ্মিন্—

হঠাৎ মনে পড়ে সুন্দর সাহেবের, কেন ঠাকুর মশাই তো তার বিশেষ পরিচিত—ঠাকুর মশাই—সেই কানা কবিরাজ।

কানা কবিরাজ করালীচরণ ভিষগ্‌রত্ন।

করালীচরণ ইজ অলসো এ ব্রাহ্মিন্। সে-ই তো ইচ্ছা করলে তাকে এগেন হিন্দু করে দিতে পারে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে।

ঠিক—করালীচরণ—কানা কবিরাজই যোগ্য ব্যক্তি।

বেলা তখন অপরাহ্ণ।

কিন্তু তার আগে হোলি গ্যান্‌জেসের ওয়াটারে—গঙ্গার জলে একটা ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে যেতে হবে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটলো সুন্দরম্ তখন গঙ্গার ঘাটের দিকে। গঙ্গার ঘাটে ভিড় তখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে সেদিনকার মত।

দু একটি বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া স্নান করছে কেবল।

একটু আগে অমাবস্যার জোয়ার এসেছে—অনেক দূর পর্যন্ত ঘোলাটে জল এগিয়ে এসেছে—সোজা গঙ্গার জলে নেমে গিয়ে সুন্দরম্ ঝপ্ করে পর পর গোটা চার পাঁচ ডুব দিয়ে উঠে এলো।

কিন্তু এভাবে তো নয়—হিন্দুরা যেমন পরে তেমনি একটা পরিধেয়র দরকার। ঘাটের কিছু দূরেই একটা তাঁতঘর ও কতবার দেখেছে—সেখানে সোজা গেল সুন্দরম্।

একটা ধুতি কিনে সেটা কোনমতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঐ ভিজা কুর্তা ও পাত্‌লুনের উপরে জড়িয়ে নিয়ে ছুটলো করালীচরণের গৃহের দিকে।

মাথায় লম্বা লম্বা চুল ও দাড়ি বেয়ে তখনো টপ্ টপ্ করে জল ঝরছে। বিচিত্র বেশ।

কানা কবিরাজ সৌভাগ্যক্রমে গৃহেই ছিল—একাই দুদিন ধরে করালীচরণ গৃহে আছে। জগদম্বা দিন দুই হলো করালীচরণের পৃষ্ঠে একটা চ্যালা কাঠ দিয়ে গোটা দুই বাড়ি দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়েছে কেউ জানে না।

তবে ভিষগ্‌রত্নর ধারণা ওর ভাইয়ের কাছে বরাহনগরেই গিয়েছে।

রাগটা সত্যিই সেদিন মাথায় চড়ে গিয়েছিল চড়াৎ করে যেন ভিষগ্‌রত্নের। ইদানীং ছদিন রোজগারপত্তর নেই তো কি হবে।

চেষ্টার তো সে ক্রটি করে না।

কিন্তু জগদম্বার ধারণা সর্বক্ষণ মানুষটা নেশায় ভোম্ হয়ে আছে লোকজন আসবে কেন, অত নেশা করলে কেউ আসে।

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি।

কোনমতে চেয়েচিন্তে এক ভাঁড় সুরা এনে সবে দাওয়ায় বসেছিল করালীচরণ —হঠাৎ জগদম্বা এসে সেই পাত্রটা তুলে নিয়ে আঙ্গিনায় আছড়ে ভেঙে দিল চুরমার করে। ক্রোধ হয় না তাতে করে!

চড়াৎ করে ক্রোধটা মাথায় চড়ে গিয়েছিল করালীচরণের—চুলের মুঠি ধরে জগদম্বাকে শুইয়ে ফেলে মাটিতে গোটা দুই লাথি মেরেছিল।

জগদম্বা তখন উঠে গিয়ে একটা চ্যালা কাঠ এনে ভিষগ্‌রত্নের পিঠে দুম্ দুম্ করে বসিয়ে সোজা দরজা দিয়ে বের হয়ে যায় ভিষগ্‌রত্ন তাকে ধরবার আগেই। সেই থেকে দুদিন পাত্তা নেই।

বসেছিল ঝিম্ দিয়ে ভিষগ্‌রত্ন দাওয়ার ওপরে।

বিচিত্র বেশে সুন্দরম্ এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলে, ঠাকুর মশাই—ঠাকুর মশাই আছো—

কে?

আমি—

ভিতরে আয়।

সুন্দরম্ এসে আঙ্গিনায় দাঁড়াল।

সুন্দরমের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যায় কানা কবিরাজ। ক্যাল্ ক্যাল্ করে চেয়ে থাকে—

ঠাকুর মশাই—

একি রে ব্যাটা বোম্বেটে—

ঠাকুর মশাই—যত টাকা চাও তুমি পাবে, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে—

তোর সেই বৌটা তো—বেটা মুখ-খু—বোম্বেটে—ঘটে যদি তোর এতটুকু বুদ্ধি থাকে—তার কোন রোগ নেই—সে সম্পূর্ণ সুস্থ—

না, না—ঠাকুর মশাই—তার কথা নয়—আমার কথা।

তোর কথা! তোর আবার কি কথা রে—

আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো।

প্রাচিত্তির করবি—কেন রে—কিসের জন্য—লুঠ রাহাজানী—খুন জখম করে বেড়াস সেই জন্য—

বলতে বলতে হো হো করে হেসে ওঠে কানা কবিরাজ।

না—ঠাকুর মশাই না—সে কথা নয়—

তবে আবার কি?

আমি তোমার ঐ প্রাচিত্তির করে এগেন—আবার হিন্দু হতে চাই—

কি বললি বেটা বোম্বেটে?

বললাম তো—হিন্দু—হিন্দু হতে চাই—আমার ফাদার মাদার মা-বাবা সব হিন্দু। আই অ্যাম এ হিন্দু। হিন্দু ব্লাড আমার শরীরে— আমি পর্টুগীজ নই—ক্রিশ্চান নই—

কি রে বেটা বোম্বেটে—কয় বোতল টেনে এসেছিস বল তো?

ঠাকুর মশাই— যা বলছি সত্যি—বলতে বলতে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে ভিষগ্‌রত্নর পায়ের সামনে পড়ে কান্না-ঝরা কণ্ঠে বাকী কথাগুলো শেষ করে, দয়া কর—ঠাকুর মশাই—হ্যাভ্ মারসি—আমাকে তুমি আবার হিন্দু করে দাও। আই অ্যাম্ এ হিন্দু—

আ মোলো যা—এ ভরসন্ধ্যাবেলা ছুঁয়ে গঙ্গাচান করাবে নাকি অলপ্পেয়ে বোম্বেটে—বিরক্তিভরে কথাগুলো বলতে বলতে সরে যায় কানা কবিরাজ।

ঠাকুর মশাই—তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না—নট বিলিভিং মি—সত্যি—সত্যি আমি পর্টুগীজ নই—হিন্দু—হিন্দুর ব্লাড্ আমার শরীরে—আমার ফাদার—আমার মাদার হিন্দু—

ভিষগ্‌রত্ন কি করবে অতঃপর ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

বোম্বেটেটা যে রকম গোঁয়ার গোবিন্দ—হঠাৎ হয়তো তুলে আছাড়ই মেরে ফেলে দেবে।

ওরে বাবা—এ আবার কি ফ্যাসাদ।

ঠাকুর মশাই আমি হোলি গ্যাঞ্জেসে ডুব দিয়ে এসেছি—আপনি আমাকে প্রাচিত্তির না কি তাই করে এগেন হিন্দু করে দিন—

দানবটার দুই চোখের কোল বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

চলুন ঠাকুর মশাই—আপনি যত টাকা চান আমি দেবো—আমাকে শুধু হিন্দু করে দিন—নচেৎ আমার আত্মীয়—আপনার জন—আমার রিয়েল মাদারের কাছে

যে ফিরে যেতে পারব না, দে ওণ্ট্ এ্যাকসেপ্ট্ মি—আমাকে তারা গ্রহণ করবে না। দে উইল হেট মি—ওণ্ট্ টাচ্ মি—আমাকে ছোঁবে না।

কিন্তু কে বললে তোকে যে তুই হিন্দু—ক্রেস্তান পর্তুগীজ নোস। কোনমতে ঢোক গিয়ে ভয়ে ভয়ে কথাটা উচ্চারণ করে ভিষগ্‌রত্ন সুন্দরমের মুখের দিকে তাকিয়ে।

যে মা আমাকে পালন করেছিল সে মরার সময় বলে গেছে—টোল্ড্ মি এভরিথিং—

কি বলে গেছে?

সে আমার রিয়েল মাদার নয়—আমার ট্রু মাদার নয়—আমাকে সে পালন করেছিল মাত্র। তার কোন ছেলেপিলে ছিল না—আমি তার সন্—ছেলে নই।

আর অমনি সে কথা তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস! উজবুগ কোথাকার—

না না ঠাকুর মশাই, সে আমায় মিথ্যে কথা বলবে কেন—হোয়াই টেল লাই—তাছাড়া আমার রিয়েল মাদার—মার চিঠি পর্যন্ত আছে—

চিঠি—

হ্যাঁ—এই দেখুন ঠাকুর মশাই—বলতে বলতে সযত্নে—গভীর মমতায় চিঠিটা কুর্তার জেব থেকে বের করে দেয়—এবং সেই সঙ্গে বের করে ছোট সেই লাল জামাটা ও রুপার মল দুটো—

এ সব—

এই সব ছিল এমাতুল্লার কাছে যখন তারা দরিয়ার পানি থেকে আমার রিয়েল মাদার আর আমাকে উদ্ধার করে—এই জামা—এই মল—এই চিঠি সব ছিল—পড়ুন—পড়ে দেখুন না। এভরিথিং লেখা আছে—আমার মাদার—আমাকে বাঁচাতে না পেরে জলে ঝাঁপ দেয় আমাকে নিয়ে—আমার রিয়েল নেম সুন্দরম্ নয়—গোপাল—হিন্দু নেম—গোপাল—

দাঁড়া বেটা, সব কেমন যেন আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়া আগে বাতিটা জ্বালি—

বলতে বলতে উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই ভিষগ্‌রত্নর মনে হলো কে যেন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে, আব্ছা আব্ছা দেখা যাচ্ছে।

থমকে দাঁড়ায় ভিষগ্‌রত্ন—কে—কে ওখানে—

জগদম্বার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। খন্‌খনে গলায় সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, অলপ্পেয়ে—অনামুখো মিনষে চোখের মাথাও খেয়েছো নিজের মেয়েছেলেকে চিনতে পারছো না—

কে—জগদম্বা—

আনন্দ যেন চেপে রাখতে পারে না ভিষগ্‌রত্ন। কণ্ঠস্বরেই তা প্রকাশ পায় জগা তুই—তুই এসেছিস—কখন এলি অ্যাঁ—

আ মরণ—বলতে বলতে জগদম্বা পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ওরে ও জগা, শোন—শোন—

কিন্তু জগদম্বার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

ভিষগ্‌রত্নের একবার ইচ্ছা হয় জগদম্বার পিছনে পিছনে সে ছুটে যায় কিন্তু আনন্দের সে বেগ কোন মতে রোধ করে আপাতত।

মনে পড়ে যায় বোম্বেটেটা তখনো হাপিত্যেশ করে বাইরে বসে আছে।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে আসে কবিরাজ। চেঁচিয়ে বলে, একটা আলো দাও তো গিন্নী—

গিন্নী।

মনের আনন্দে এক যুগ পরে যেন কানা কবিরাজ জগদম্বাকে গিন্নী বলে সম্বোধন করে।

সত্যি জগদম্বা যে ফিরে আসবে এ যেন ভাবতেও পারে নি করালীচরণ। কিন্তু এলো কোথা দিয়ে—কোন্ পথে এলো?

সর্বক্ষণ তো সে দাওয়াতেই বসে। তবে বোধহয় পিছনের দরজা দিয়ে এসেছে।

জগদম্বা প্রদীপ আনতেই গিয়েছিল—একটা প্রজ্বলিত প্রদীপ হাতে করে এসে দাওয়ার একপাশে নামিয়ে রেখে আবার চলে গেল।

ভিষগ্‌রত্ন সেই আলোয় চিঠিটা পড়লো বেশ কষ্ট করেই।

খুব দ্রুত লেখা।

বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা এবং ভুলও আছে। অনেক দিনকার লেখাটা কেমন ক্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

পড়তে তাই কষ্ট হয়।

তবু সেই আলোয় ভিষগ্‌রত্ন জীর্ণপত্রটা পড়লো। একবার দুবার তিনবার পড়লো। তারপর এক সময় পত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে সুন্দরমের মুখের দিকে তাকাল।

পড়লেন ঠাকুর মশাই ?

উৎকণ্ঠিত সুন্দরম্ প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, পড়লাম—কিন্তু—

এখন তো বিশ্বাস হলো আপনার সত্যিই আমি সন্ অফ এ হিন্দু—আমি পর্টুগীজ নই—আই অ্যাম এ হিন্দু—পর্টুগীজের ঘরে মানুষ হয়েছি—তাদের খেয়েছি—পাপ করেছি—তাই প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হতে চাই—

হুঁ। ক্ষীণ কণ্ঠে কোন মতে শব্দটা উচ্চারণ করে ভিষগ্‌রত্ন।

তাহলে আর দেরি করো না ঠাকুর, চল—আমাকে প্রাচিত্তির করে হিন্দু করে দাও—

কিন্তু আমি তোকে হিন্দু করে দিলেই কি তোকে সমাজ হিন্দু বলে মেনে নেবে রে ?

কেন নেবে না ?

তাই কখনও নেয়—হিন্দুর একটা সমাজ আছে—সমাজের মাথা আছে—যাদের কথায় সমাজ চলে তাদের সকলের মত হলে তবে তো ?

মত হবে না—কেন হবে না ঠাকুর—

তোকে আবার হিন্দু করে নেবার বিধান তো সমাজ দেবে না সাহেব—

আঃ কি সাহেব-সাহেব করছো—পড়লে না আমার নাম গোপাল -কিন্তু বলছো সমাজ নেবে না ?

না—তোর জাত গেছে—ক্রেস্তানের ঘরে তুই মানুষ—ক্রেস্তানের অন্নে পালিত, পুষ্ট—আর তোর তো হিন্দু হবার উপায় নেই—

উপায় নেই ?

কান্নার মতই যেন প্রশ্নটা করে সুন্দরম্।

না—

কেন ? কেন ঠাকুর—

বিধান নেই হিন্দু সমাজে—তা আমি কি করব বল!

প্রাচিত্তির করলেও নয় ?

না—

কিন্তু আমার—আমার কি দোষ ঠাকুর। আমি তো ইচ্ছা করে ক্রেস্তানের ঘরে যাই নি—ক্রেস্তানের ফুড্ খাই নি—

তা কি হবে—এ বড় কঠিন সমাজ—বড় কঠিন নিয়ম কানুন—

ঠাকুর দয়া করো—

আমি দয়া করবার কে রে—সমাজ মেনে নেবে না। স্মৃতিরত্ন—বাচস্পতি কেউ মেনে নেবে না। তাছাড়া সমাজের মাথায় যারা বসে আছে—

তাহলে কি আমি হিন্দু হতে পারব না ঠাকুর মশাই ?

মুশকিল—

তাহলে আমি পর্টুগীজই থেকে যাবো। আমার তো কোন দোষ নেই ঠাকুর মশাই—

ভিষগ্‌রত্ন চুপ করে থাকে।

আবার বলে সুন্দরম্‌, আমার তো কোন ফল্ট্‌ নেই—নো ফল্ট্‌—

বুঝলাম—তুই বরং এক কাজ কর—

কি ঠাকুর মশাই ?

শোভাবাজার জানিস তো!

হ্যাঁ—

তুই সেখানে বরং রাজবাড়িতে চলে যা—

রাজবাড়িতে!

হ্যাঁ—রাজা গোপীমোহনের পুত্র রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর—কিম্বা মতিলাল শীল বা রামকমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে তোর নিবেদন পেশ কর। ওরাই এখন হিন্দুসমাজের মাথা, ওরা যদি তোকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করবেন বলেন তো বাচস্পতি—স্মৃতিরত্নদেরও তোকে গ্রহণ করতে হবে। তারাই তখন দেখবি প্রাচিত্তির ক'রে তোর ব্যবস্থা করে দেবে—

তাহলে ঠাকুর মশাই তুমি পারবে না ?

না রে—আমি সমাজের কে—দীন দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ—সামান্য আয়ুর্বেদের ব্যবসা করে কোনমতে দিন গুজরান করি। আমাকে মানবেই বা কে—আমার কথা শুনবেই বা কে—

নিদারুণ একটা হতাশা নিয়েই সুন্দরম্‌ কানা কবিরাজের গৃহ থেকে বের হয়ে এলো।

তাহলে কি সত্যিই তার আর কোন আশা নেই। যে অপরাধের জন্য—যে পাপের জন্য সে নিজে এতটুকু দায়ী নয় সেই অপরাধ—সেই পাপের বোঝাই তাকে বাকী জীবনটা বয়ে বেড়াতে হবে।

জাতহীন ধর্মহীন এক অভিশাপের মত সে কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। ক্লান্ত অবসন্ন অনেক রাত্রে সুন্দরম্‌ ফিরে এলো তার গৃহে।

রাত অনেক তখন।

শিবনাথ নেই—মৃন্ময়ী নেই·—তারা কোথায় গিয়েছে আজ কয়দিন থেকে কে জানে। যেখানে যার খুশি যাক, কারো কথাই আজ আর ভাবতে চায় না সুন্দরম্।

সব স্পৃহা সমস্ত আকাঙ্ক্ষার যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

কি রইলো আর কি না রইলো তার জন্য আর কোন মাথাব্যথা নেই—দুশ্চিন্তা নেই। আর এই বাড়ি রেখেই বা কি হবে!

কার জন্যই বা বাড়ি—কার জন্যই বা ঘর।

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার।

একটা প্রেতের মতই যেন বাড়িটার মধ্যে এসে ঢুকলো সুন্দরম্। ঢুকলো এসে নিজের ঘরে।

অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইল তারপর একসময় উঠে আলোটা জ্বালাল।

ভিজে কুর্তা—পাতলুন ইতিমধ্যে গায়ে গায়েই শুকিয়ে গিয়েছিল—সেগুলো গা থেকে একে একে খুলে ফেলল।

হিন্দু বলে আজ তাকে কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক ঐ বিজাতীয় পোশাকগুলো যেন গা হতে নামিয়ে একটা স্বস্তি অনুভব করে সুন্দরম্।

হিন্দুদের মত করে তো ধুতি পরতে জানে না সুন্দরম্—পরেও নি কখনও—দেখেছে কেবল বাবুদের পরতে।

মনে মনে হেসেছেও সুন্দরম্ ওদের বেশভূষা দেখে। বিশেষ করে নব্যবাবুদের বেশভূষা দেখে।

ফিনফিনে কালো চওড়া পাড়ের ধুতি পরনে—গায়ে উৎকৃষ্ট কেমব্রিকের বা মসলিনের বেনিয়ান, গলদেশে চুনোট-করা উড়ানী—পায়ে পুরু বগলেস্ সমন্বিত চীনা বাড়ির বুট জুতো—মাথায় বাবরি চুলে বাঁকা সিঁথি—দাঁতে মিশি—দেখে হেসেছে সুন্দরম্।

আর বয়স্কদের ধুতি ও উড়ানী—

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সুন্দরমের ঐ সব বেশভূষার মধ্যে একটা জাতের বৈশিষ্ট্য আছে—নিজস্ব ভূষা একটা জাতের। জাতের পরিচয় একটা আছে ওর মধ্যে।

হিন্দুর পরিচয় যেন রয়েছে ঐ বেশের মধ্যে।

সুন্দরম্ ধুতিটা কোন মতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরিধান করল। বেনিয়ান নেই, একটা চাদর পাকিয়ে গায়ে তুলে দেয়।

একটা আরশি—আরশি হলে—দেখতে পারত কেমন দেখাচ্ছে তাকে। কেমন মানিয়েছে তাকে।

আরশিটা কোথায় আছে কে জানে।

এক পাশে সেই ছোট লাল জামাটা—রূপার ছোট ফাঁদের মল দুটো ও চিঠিটা নামিয়ে রেখেছিল সেগুলো তুলে নিল।

ভাগ্যে বাংলা ভাষাটা সে পড়তে ও কিছু কিছু লিখতে শৈশবে শিখেছিল। শৈশবের জননী ভায়লার কাছে যখন সে ছিল, রোজারিও যখনও তাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে আসে নি, তখন ভায়লাই তাকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিল। পাঠশালায়ও কিছুদিন পড়েছিল। কারণ ভায়লা তাকে ডাকাত করতে চায় নি, করতে চেয়েছিল অন্য কিছু। নরোত্তমের পাঠশালায় তার প্রথম হাতেখড়ি।

সেখানেই প্রথমে তার মাটিতে খড়ি দিয়ে বর্ণপরিচয় হয়—তারপর স্বরবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শতকিয়া, কড়াকিয়া লেখা। তালপত্র থেকে কদলীপত্রে—তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী—এবং সর্বশেষ চিঠিপত্র লেখা শেখা। মৌলভীর কাছে কিছুদিন পারসী ও আরবী শিক্ষাও করেছিল সুন্দরম্।

নিজের ইচ্ছায় এবং পর্তুগীজ পাদ্রী ফার্ণাণ্ডিজের কাছে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেছে—বেশ চলছিল। কিন্তু সব কিছু ওলোট-পালট করে দিল একদিন রোজারিও এসে।

রোজারিও তার মনের মধ্যে নীল দরিয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দিল।

রোজারিওর হাত ধরে বের হয়ে এলো গৃহ থেকে—নীল দরিয়ায় নাওয়ের মধ্যে জীবনের হলো শুরু।

সে আর এক জীবন—আর এক অধ্যায়।…আজকের সুন্দরমের প্রথম পাঠগ্রহণ।

লুণ্ঠন—রাহাজানি—ডাকাতি—বন্দুক—গোলাগুলি—উদ্দাম বেপরোয়া হিংস্র—নীতিহীন এক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পাঠ।

আর একমাত্র শিক্ষাদাতা সেদিন তার কাপিতান রোজারিও। পর্তুগীজ দস্যু রোজারিও।

॥ ২ ॥

চিঠিটা আবার তুলে নিল সুন্দরম্ আলোর সামনে।

আবার চিঠিটা সুন্দরম্ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে। কতবার পড়লো তবু

যেন আশ মেটে না।

বুক ভরে না।

তার মা সুলোচনা আর তার ছেলে সে গোপাল। মা আর ছেলে—মাদার এণ্ড সন্।

কোথায় মা তুমি—কোথায়? এই পৃথিবীতেই আজো আছো না হেভেনে—স্বর্গে। যেখানেই থাকো আমার স্যালুট নাও—না, না, আমার প্রণাম নাও!…

মাদার—মাই মাদার। মাই ওন মাদার।

মল দুটো আর জামাটা হাতে তুলে নিয়ে বার বার মুখের ওপরে চেপে ধরে সুন্দরম্।

গোপাল—গোপাল! হোয়াট ইজ্ দি মিনিং অফ গোপাল। গোপালের অর্থ কি?

এক সময় সেইগুলো বুকে করেই মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে সুন্দরম্। ক্লান্ত চোখের পাতায় কখন যেন ঘুম নেমে আসে।

ঘুম ভাঙল পরদিন অনেক বেলায়।

শিয়রের ধারে আলোটা জ্বলছে তখনো।

উঃ, ধড়ফড় করে উঠে বসে সুন্দরম্। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। শোভাবাজারে যেতে হবে—রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

প্রাচীন হিন্দু সমাজের তিনিই নাকি অন্যতম মাথা। কানা কবিরাজ বলে দিয়েছে তাকে। তিনি কৃপা করলেই তার মুক্তি সম্ভব। আবার সে হিন্দু হতে পারবে।

সুন্দরম তো জানত না যে ধর্ম বলতে হিন্দু সমাজে কি বোঝায়। তখনকার দিনে হিন্দুরা ধর্ম বলতে কি বুঝতো…

স্বল্পশিক্ষাজনিত অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের মিথ্যা দম্ভটাই তাদের কাছে ধর্মের একমাত্র পরিচয় ছিল সেদিন। বেদের কর্মকাণ্ড—উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের দরজা তখনো তাদের কাছে বন্ধ—সে এক অজ্ঞাত জগৎ।

দুর্গোৎসব—বলিদান—নন্দোৎসব কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল—ঐ সব ছিল তাদের যাবতীয় ধর্মকর্ম।

কোন পাপ কর্মই তাদের বাধত না।

এবং পাপের পরিত্রাণের পথ ছিল তখন গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দান, পায়ে হেঁটে হেঁটে দূর দূর দুর্গম তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি—অন্নশুদ্ধিই ছিল চিত্তশুদ্ধি। স্বপাকে হবিষান্ন ভোজন অপেক্ষা পবিত্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। কিছু ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত—পূজার্চনা করে, শিবচিন্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর মত কাউকে পাদোদক দিয়ে, কাউকে পদধূলি দিয়ে নানা অপকৌশলে উপার্জন করে বেড়াত। তাদের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের মাপমাঠি ছিল ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিকার—অথচ তারা আদিশাস্ত্র বেদ অবহেলা করে সকাল সন্ধ্যায় যে মন্ত্র পাঠ করত তার অর্থ অনেকে জানত কিনা সন্দেহ।

ঐ দুষ্কৃতি—অশিক্ষা—কুসংস্কার ও গোঁড়ামিই যে হিন্দু সমাজের হিন্দু জাতির মূলে ঘুণ ধরিয়েছিল এ মজার এক ভয়াবহ অধঃপাতের পথে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের অজ্ঞাতে আর কেউ না হলেও দেওয়ানজী। রাজা রামমোহন সেদিন সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তাঁর শিক্ষা জ্ঞান পাণ্ডিত্য তাঁকে দিয়েছিল অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি।

হিন্দুদের প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি প্রথম অশ্রদ্ধা জন্মায় কোরান পাঠ করে—লিখলেন একখানি বই। সেই সম্পর্কে—পিতার সঙ্গে ঐ নিয়েই হলো মনোমালিন্য।

গৃহত্যাগ করলেন রামমোহন।

নানা দেশ—নানা তীর্থ ঘুরে ঘুরে পায়ে হেঁটে হেঁটে পৌছালেন একদিন তিব্বতে। সেখানে কিন্তু তাঁর মতবাদ শুনে তিব্বতীরা ক্ষেপে ওঠে—কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন।

এলেন কাশীধামে। সংস্কৃত ভাষায় অনুশীলন সেখানেই তাঁর। ইংরাজী ভাষা শিক্ষাও নিজের চেষ্টাতেই। পিতার সঙ্গে আবার মিলন হলো। পিতার মৃত্যুর পর মন দেন ধর্মসংস্কারে।

১৮১৪ খ্রীঃ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। এক বৎসর পরে আত্মীয়সভা স্থাপন করলেন—বললেন ঈশ্বর এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই পরম ব্রহ্ম। আর বললেন ফারসী আর সংস্কৃত শিক্ষা করে কিছু হবে না—যে যুগ আসছে—সে যুগে ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত কোন পথ নেই।

জাত আবার কি, সব মানুষের এক জাত—সে মানুষ, সেটাই তার একমাত্র সত্য পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গোলমাল—শহরের একদল প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি মানতে চাইল না রামমোহনের কথা।

দুটো দল হয়ে গেল।

রামমোহনের দল আর রাজা রাধাকান্ত দেবের দল।

দুই দলে মধ্যে মধ্যে তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়।

সুন্দরম্ যখন গিয়ে শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে উপস্থিত হলো, তখন বহির্বাটিতে রাজাকে ঘিরে অনেকেই উপস্থিত ছিল।

সেদিনকার সভায় বর্তমান হিন্দুধর্মের ক্রমশঃ যে অধঃপতন হচ্ছে সেই সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল—বিশেষ করে রাজা রামমোহনকে ও হিন্দু কলেজের বিধর্মী শিক্ষক ডিরোজিওকে নিয়ে।

স্মৃতি লাহিড়ী বলছিলেন, শুনেছেন দেব—Athenium ইংরাজী মাসিক-পত্রে ঐ বিধর্মী ডিরোজিওর ছাত্র মাধব মল্লিক কি লিখেছে?

সকলে শুধান, কি—কি লিখেছে হে লাহিড়ী?

কুৎসিত কথা লিখেছে- স্মৃতি লাহিড়ী কাগজটা বের করে পড়ে শোনান, শুনুন—কি লেখেছে: If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism—

চিৎকার করে ওঠেন বাচস্পতি—হৃদয় থেকে হিন্দুধর্মকে ওরা ঘৃণা করে—উচ্ছন্নে যাবে—বুঝলে মিত্তির উচ্ছন্নে যাবে। ঐ মহাপাষণ্ড দেওয়ানজী—আর ঐ বেটা ফিরিঙ্গী—ওরাই দেশটাকে জাহান্নামে দেবে।

মিত্তির মশাই বলেন, হ্যাঁ—ঐ ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক এসোসিএশন না কি—আর দেওয়ানজীর ঐ আত্মীয়সভা—ব্রাহ্মসমাজ, ওগুলো যেমন করে হোক শহর থেকে তুলে দিতেই হবে দেব মশাই। এত বড় পুণ্য কাজ সতী হওয়া, সেটা বলে পাপ অন্যায়—আইন হয়ে গেল ওসব আর চলবে না—ইংরাজী-শিক্ষা—মদ্যপান—কুখাদ্য সব—

বোসজা বলেন, শুধু কি তাই—ব্রহ্মোপাসনা—একেশ্বর—পরমব্রহ্ম—কালী দুর্গা বলে কিছু নেই, সব নাকি এক ব্রহ্ম—

তা হ্যাঁ হে—মিত্তির আবার বলেন, ঐ বেটা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে তাড়ানোর কি হলো?

মল্লিক বলেন, হবে—হবে—মিত্তির ব্যস্ত হচ্ছো কেন—শনৈঃ শনৈঃ—একজন তো চলেছে—আর একটিও যাবে—

চলেছে কে আবার? বোসজা শুধান।

কেন, শোন নি কিছু—দেওয়ানজী—ঐ রামমোহনও শিগগিরী বিলাত চললো—

বল কি?

হ্যাঁ—

চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণও উপস্থিত ছিলেন সভায়। তিনি বললেন,

হ্যাঁ—খ্রীষ্টীয় মিশনারী আলেকজেণ্ডার ডফ, তার হাতেই ইংরেজী শিক্ষার ভার দিয়ে রাজা এবারে বিলাত চললেন—

ডফ আবার কে হে বাঁড়ুয্যে? মিত্তির শুধান।

শোন নি তাঁর কথা—তিনি তো শিগগির এখানে আসছেন। ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়িতে নাকি থাকবে ঠিকও হয়ে গিয়েছে—

মানে যেখানে ঐ দেওয়ানজীর ব্রাহ্মসমাজ ছিল? মিত্তির শুধান পুনরায়।

হ্যাঁ—বলেন ভবানীচরণ।

প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক ও চেঁচামেচি চলেছে, সুন্দরম্ একপাশে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

হঠাৎ রামধন মিত্তিরের নজর পড়ে তার ওপরে—

কে হে! কে ওখানে দাঁড়িয়ে? কি চাও—

আজ্ঞে আমি রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই—আই ওয়াণ্ট্ টু স্পিক উইথ হিম—

সুন্দরমের মুখে ইংরাজী শুনে সবাই ওর মুখের দিকে তাকায়।

রাধাকান্ত দেবও তাকান।

আমিই রাধাকান্ত দেব—তুমি কে বাপু—

মাই নেম ইজ্ গোপাল।

গোপাল—গোপাল কি?

তা জানি না—ঐটুকুই জানি।

হুঁ—তা আমার কাছে তোমার দরকারটা কি বাপু?

আই ওয়াণ্ট্ টু বি এ হিন্দু এগেন—আবার আমি হিন্দু হতে চাই—

কি বলছো তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না বাপু? রাধাকান্ত বলেন।

ইংরাজী বাংলায় মিশিয়ে কোন মতে তখন সুন্দরম্ তার বক্তব্যটা পেশ করে রাধাকান্ত দেবের কাছে।

সভাস্থ সবাই শুনে তো থ। যেন বাক্যহারা।

স্মৃতিরত্ন বলে ওঠেন, ওহে বাচস্পতি—বেটা ক্রেস্তান বলে কি—নেশা ভাঙ করে এলো নাকি না বুদ্ধিভ্রংশ—সারাটা জন্ম ক্রেস্তানের ঘরে কাটিয়ে; ক্রেস্তানের অন্ন খেয়ে এখন বলে কিনা আবার হিন্দু হবো—

বাচস্পতি ব্যঙ্গভরে বলে ওঠেন, ভাগ্যে বলে নি ব্রাহ্মণ হবো—

হো হো করে সবাই হেসে ওঠে।

রাধানাথ মল্লিক বলেন, কোথায় সব দেশসুদ্ধ ক্রেস্তান হবো বলে ক্ষেপে উঠেছে—আর ও বলে কিনা হিন্দু হবো !

রামকমল সেন বলেন, তবেই বোঝ—হিন্দুধর্মের মহিমা—

আর একজন ঐ সময় বলে ওঠে, পাঠিয়ে দাও হে—ওকে দেওয়ানজীর কাছে কাছে তার ব্রাহ্মসমাজে পাঠিয়ে দাও—

হ্যাঁ—ঠিক বলেছো—তাই দাও পাঠিয়ে ওকে, শুনুক দেখুক- হিন্দুধর্মের মহিমাটা—

সুন্দরম্ দেখল তার কথাটা বুঝি চাপা পড়ে—সে তাই আবার রাধাকান্ত দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ জানায়—মশায়, আমার সম্পর্কে তাহলে আপনি কি ব্যবস্থা দিচ্ছেন ?

ব্যবস্থা—

আজ্ঞে—প্রায়শ্চিত্ত করলে আমি আবার হিন্দু হতে পারব তো—

বাচস্পতি তখন ব্যঙ্গভরে বলেন, বাপু হে—তোমার ব্যবস্থা আমরা কিছু করতে পারব না—

পারবেন না ?

না—এ তো আর ছেলেখেলা নয় বাপু যে ছিলে হিন্দু- হলে ক্রেস্তান—আবার আজ হিন্দু হবে—

আজ্ঞে আমি তো স্বেচ্ছায় ক্রেস্তান হই নি—

স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাত হোক—ও পাপ যখন একবার তোমার দেহে প্রবেশ করেছে—তোমার আত্মা ও দেহকে কলুষিত করেছে, তখন বাকী জীবনটা ও পাপের বোঝা তোমাকে বয়ে বেড়াতেই হবে—মুক্তি নেই তার। বুঝেছো !

কিন্তু বাবু মশাই আমার কি তবে কোন আশাই নেই ? আবার আমি কি তাহলে কোন দিনই হিন্দু হতে পারব না।

বাচস্পতি মাথা আর লম্বা টিকি দুলিয়ে বলেন, না হে না—এ বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ব্যাপার। বহুপুণ্যে মানুষ হিন্দু হয়ে জন্মায়—তা থেকে একবার পতিত হলে কি আর রক্ষা আছে—আর রক্ষা নেই—কোন উপায়ই নেই।

নিরুপায় সুন্দরম্ শেষবারের মতই বুঝি মিনতিকরুণ চক্ষে রাধাকান্ত দেবের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু রাধাকান্ত মাথা নীচু করে রইলেন।

কি করবেন তিনি। যেখানে স্মৃতিরত্ন—বাচস্পতি বিমুখ সেখানে আর উপায় কি। সুন্দরম্ মাথা নীচু করে রাধাকান্তর গৃহ থেকে বের হয়ে এলো।

খররৌদ্রে তখন আকাশ ঝলসে যাচ্ছে।

তার মধ্যেই অনির্দিষ্ট ভাবে হাঁটতে শুরু করে সুন্দরম্। তাহলে কি সত্যিই তার আর এ জীবনে হিন্দু হওয়া হবে না।

তার অজ্ঞাত পাপের—অনিচ্ছাকৃত পাপ যার জন্যে সে আদৌ দায়ী নয় তার কোন ক্ষমা নেই!

এমনি নিষ্ঠুর—এমনি কঠিন সমাজ এমনি বিধান।

তবে আর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি। কি হবে আর এ জীবনে—

মাগো তোমার কাছে আর ফেরা হলো না—

তোমার পরিচয় পেয়েও তোমায় মা বলে ডাকবার অধিকার পেলাম না।

ক্লান্তিহীন—শ্রান্তিহীন—অভুক্ত অস্নাত এ রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সুন্দরম্।

একি নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা—মুহূর্তে আলোর ঝলকানি দিয়ে চির অন্ধকারের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করল।

এক সময় ঘুরতে ঘুরতে এসে গঙ্গার ধারে বসল সুন্দরম্। ক্লান্ত পা দুটো যেন লোহার মত ভারী।

দিনমণি অস্তাচলমুখী—পশ্চিম আকাশটা রক্তের মত লাল।...

গঙ্গায় বোধহয় জোয়ার কানায় কানায় ভরা। ছল ছল ঢেউগুলো এসে পায়ের সামনে তীরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কি যেন বলছে।

দরিয়ার মানুষ তুই দরিয়ায় চল। সেখানে জাত নেই ধর্ম নেই—সেখানে মানুষ মানুষকে জাতিচ্যুত ধর্মচ্যুত করে না।

সেই তো ভাল—আবার দরিয়ায় ভেসে পড়লেই তো হয়।

আকাশের দিকে তাকাল সুন্দরম্—সন্ধ্যাকাশে একটি দুটি করে ইতিমধ্যে অনেক তারা উঠছে।

ঐ তো সপ্তর্ষি—

হঠাৎ—হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়ে সুন্দরমের।

সকালে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে কি এক যেন রাজার নাম করছিল ওরা—রাজা রামমোহন না কি।

বলছিল তিনি হয়ত ওকে বিধান দিতে পারেন, ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়িও জানে সুন্দরম্। চিৎপুর রোডে।

সেখানেই নাকি রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এও শুনেছিল শনিবার শনিবার নাকি সেখানে সকলে মিলিত হয়ে ব্রহ্মোপাসনা করে।

কালই তো শনিবার—

কাল নিশ্চয়ই উপাসনা হবে—রামমোহনকে হয়তো সেখানেই পাওয়া যাবে।

পরের দিনই সুন্দরম্ চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর গৃহে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উপস্থিত হলো।

উপাসনা চলছিল তখন। দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করার পর উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও তারপর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ থেকে পাঠ করে শোনালেন।

তারপর একটি সংগীতের পর সভা ভঙ্গ হলো।

॥ ৩ ॥

এক পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে শুনছিল সুন্দরম্।

সব সে ভাল করে বুঝতে পারছিল না তবু শুনতে যেন কথাগুলো ভালই লাগছিল। আরো ভাল লাগছিল কারণ গতকাল রাধাকান্ত দেবের গৃহে যে কচকচানি শুনে এসেছে এখানে সে সব কিছুই নয়।

শান্ত - স্নিগ্ধ সুন্দর একটি পরিবেশ।

অনেকেই সেদিন সভাতে উপস্থিত ছিল—স্বয়ং দেওয়ানজী রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, মথুরানাথ মল্লিক এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব।

উপাসনার পর দ্বারকানাথ বললেন, তাহলে দেওয়ানজী আপনার বিলাত যাওয়া স্থির ?

হ্যাঁ -মনে আছে তো দ্বারকানাথ আগামী পরশু ১১ই মাঘ—আমার নব-নির্মিত গৃহে ব্রহ্মসভাকে স্থাপন করবো—

নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈকি—

দেওয়ানজী বললেন, একটা ট্রাস্টডীড্ ভবনটির আমি তৈরী করেছি—

কি রকম ?

তাতে থাকবে এই লেখা : আমার ঐ ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহার্থে থাকবে এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হবে তাছাড়া কোন পরিমিত দেবতার পূজা হবে না।

দ্বারকানাথ শুনে মৃদু হেসে বললেন, ওদিকে শুনেছেন বোধহয় দেওয়ানজী—

কি ?

আপনাকে পাল্টা জবাব দেবার জন্য রাধাকান্ত দেব সারথি হয়ে ধর্মসভা নামে

এক সভা স্থাপন করেছেন—আর চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এবারে আরো বেশী করে সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হবেন—

দেওয়ানজী ও সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করলেন না। অন্ত কথা হয়তো ভাবছিলেন। ধীরে ধীরে ঐ সময় সুন্দরম্ এগিয়ে আসে—দেওয়ানজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কে আপনি ?

মাই নেম ইজ গোপাল—

গোপাল—তা আমার কাছে কি প্রয়োজন বলুন! রামমোহন প্রশ্নটা করে সুন্দরমের মুখের দিকে তাকালেন।

একটা নিবেদন ছিল—

বলুন!

সংক্ষেপে সুন্দরম্ রামমোহনকে তার সকল কথা বলে গেল। অবশেষে বললে, আমি এ্যাগেন প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হতে চাই—

কিন্তু সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত কেন করতে হবে তোমাকে গোপাল! মৃদু হেসে দেওয়ানজী বললেন।

করতে হবে না!

না—মানুষের ধর্মটা কি এতই ভঙ্গুর যে এত সহজে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে—কে বলেছে তোমাকে তুমি পর্তুগীজ—তুমি হিন্দু। হিন্দু মায়ের গর্ভে জন্ম তোমার—হিন্দুর সন্তান তুমি হিন্দু।

আনন্দে যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সুন্দরম্। বলে, সত্যি বলছেন—ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করবে—গ্রহণ করবে—

করবে বৈকি!...ঈশ্বরের সন্তানের কি আলাদা আলাদা জাত আছে—না আলাদা আলাদা ধর্ম আছে।

নেই—

না। ও সব হচ্ছে কুসংস্কার—ধর্মের নামে মিথ্যাচরণ—অশিক্ষা-জনিত ব্যাধি।

কোন প্রায়শ্চিত্তই তাহলে আমাকে করতে হবে না ?

না, না—কি অন্যায় বা পাপ করেছো তুমি যে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত—

সুন্দরমের দু চোখের কোল বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। বুকটা ভারী হয়ে ছিল লোহার মত যেন এখন হাল্কা হয়ে গিয়েছে একেবারে।

আপনার সমাজে যদি আমি নিয়মিত আসি দেওয়ানজী—

সুস্বাগতম্—নিশ্চয়ই আসবে—

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।

সুন্দরম্ ছুটছিল।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গৃহের দিকে ছুটছিল।

হঠাৎ মনে হলো—আজ তো আর কোন বাধা নেই—আজ তো হিন্দু সে—কালীবাড়িতে একবার ঘুরে যাবে—

গডেস্ কালীকে একবার প্রণাম করে যাবে।

মন্দিরে এসে যখন পৌঁছাল সুন্দরম্—সন্ধ্যারতি তখন হয়ে গিয়েছে। তথাপি দর্শনার্থীর ভিড় কমে নি।

দলে দলে মেয়ে পুরুষ তখনও মায়ের দর্শনে আসছে যাচ্ছে। তবে অন্যান্য সময়ের চাইতে ভিড়টা কমই বলতে হবে।

এতদিন কতবার কাজে-অকাজে মন্দিরের আশেপাশে এসেছে সুন্দরম্ কিন্তু মন্দিরপ্রাঙ্গণে বা চত্বরে কখনো পা দেয় নি।

প্রয়োজন বোধ করে নি—মনের মধ্যে কোন ইচ্ছাও জাগে নি। তা ছাড়া কথাটা কখনো মনেও তো হয় নি।

গির্জা দেখলে তার দিকে তাকিয়েছে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, কিন্তু মন্দিরের দিকে কখনো তাকায় নি।

ধূপ গুগ্‌গুল ফুল ও চন্দনের অদ্ভুত মিষ্টি একটা মিশ্র গন্ধ মন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করেছিল সুন্দরমের।

আর কানে আসছিল মন্দিরের ঘণ্টার বিলম্বিত ঢং ঢং শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যেন আজ একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগে সুন্দরমের। বিচিত্র একটা শ্রদ্ধার আবেশে মনটা যেন টলমল করে ওঠে আজ। ভরে ওঠে।

ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে চাতাল থেকে মূল মন্দিরের অংশে উঠে যায় সুন্দরম্।

সামনেই খোলা দরজা মূল মন্দিরের।

ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে।

সেই প্রদীপের আলোতেই চোখে পড়ে সুন্দরমের মা কালীর মূর্তি। রক্তাক্ত লোল রসনা—ভয়ংকর দুটি চক্ষু—একহাতে বরাভয় অন্য হাতে খড়্গ—আর এক হাতে রক্তাক্ত নরমুণ্ড।

ঐ—ঐ গডেস্ কালী।

ঐ হিন্দুর আরাধ্য দেবতা—গডেস্ কালী।...তারও আরাধ্য দেবতা—

মনে মনে সেই দিকে তাকিয়ে বার বার বলতে থাকে সুন্দরম্, হে গডেস্ কালী—হোলি মাদার - পার্ডন—পার্ডন মি—ক্ষমা করো আমাকে। হিন্দু হয়েও তোমার কাছে এতদিন আমি আসি নি—আমি অন্যায় করেছি, আমি পাপ করেছি।

কথাগুলো মনে মনে বলতে বলতে আরো এগুতে যাচ্ছিল হঠাৎ সেই সময় সুন্দরমের চোখে পড়ল।

গডেস্-এর একেবারে মুখোমুখি চোখ বুজে দুই হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে কে ঐ নারী!

মন্দিরাভ্যন্তরে ম্লান প্রদীপের আলোয় চিনতে মুহূর্তের জন্যও কষ্ট হয় না সুন্দরমের সুলোচনাকে।

পরনে লালপাড় একটা শাড়ি। মাথায় ঈষৎ গুণ্ঠন। গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে চুলের রাশ ডান-দিক করে বক্ষের ওপরে নেমে এসেছে।

দুটি চক্ষু মুদ্রিত।

কপালে গোলাকার বড় একটি সিন্দুরের টিপ।

ঐ শ্যামা রমণীর দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন মনে হয় কেন সুন্দরমের—ঐ নারী বুঝি জাগ্রত গডেস্ কালী।

মৃন্ময়ীকে লুণ্ঠন করে আনবার কয়েক দিন বাদে গঙ্গার ঘাটে নৌকার ওপরে দূর থেকে ঐ রমণীকে দেখেছিল সুন্দরম্।...

এবং সেদিন ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গিয়েছিল নৌকা নিয়ে—ভয় হয়েছিল পাছে মৃন্ময়ীকে ওরা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়—ছিনিয়ে নেয় এই ভেবে।

ঐ নারীই সেরাত্রে মৃন্ময়ীকে চুরি করে আনবার সময়ে তাকে বাধা দিয়েছিল। সামান্যা এক নারী এক দুর্দান্ত দস্যুর মুখোমুখি অমন করে অকুতোভয়ে দাঁড়াতে পারে কথাটা ভাবতে গিয়ে সেদিন সত্যিই সুন্দরমের যেন বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

সেই কারণেই আরো ঐ নারীমূর্তি কি এক শ্রদ্ধায় যেন তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে ছিল।

মন থেকে ওর সে ছবি মুছে যায় নি।

তবে সেদিন পালিয়েছিল আজ পালাল না।

আজ দাঁড়িয়েই থাকে সুন্দরম্ সুলোচনার দিকে চেয়ে, আজ আর তার ভয় কি। আজ তো আর মৃন্ময়ী নেই।

মৃন্ময়ীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার ভয় নেই।

এমন কি আশ্চর্য তার মনের মধ্যে মৃন্ময়ীর জন্য বুঝি আজ আর কোন

আকর্ষণও অবশিষ্ট নেই। বরং মৃন্ময়ীকে আজ সে ভুলতে পারলেই বুঝি বাঁচে।

মৃন্ময়ী তার অতীত জীবনের যে পৃষ্ঠাগুলো অধিকার করে আছে সেই লজ্জার পৃষ্ঠাগুলো যদি সে কোন মতে মুছে ফেলতে পারত।

আই অ্যাম সরি—হোলি মাদার—হে মাতঃ। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার সেদিনকার কৃতকর্মের জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত—লজ্জিত। পার্ডন মি, ক্ষমা কর আমাকে, ক্ষমা কর।

কি জানি কেন বার বার সুন্দরম্ কালীর মূর্তির দিকে তাকায় আর একবার ধ্যানমগ্না মুদ্রিত চক্ষু প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান সুলোচনার মুখের দিকে তাকায়।

একবার প্রতিমার মুখখানি দেখে—একবার সুলোচনার মুখখানি দেখে।

সুলোচনাকে যেন তার মনে হয় জীবন্ত গডেস্ কালী।

একটা অদৃশ্য আকর্ষণ যেন তাকে সুলোচনার দিকে টানছে। কেবলই টানছে—ওর কাছে কি সেদিনকার অপরাধের জন্য গিয়ে সুন্দরম্ ক্ষমা চাইবে।

হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে বলবে, মাদার—তুমি বোধহয় আমাকে রিকগ্‌নাইজ করতে পারছো না আমি সেই লোক—ছাট্ ভয়ংকর নৃশংস ডেকয়েট—আমিই তোমার মেয়েকে চুরি করে এনেছিলাম। আমি পাপী—আমাকে তুমি যে দণ্ড দিতে চাও দাও—আমি মাথা পেতে নেব তোমার দণ্ড। হিয়ার আই এ্যাম্—দাও আমাকে দণ্ড দাও মাদার—দণ্ড দাও।

মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে সুন্দরমের। এবং অনেকক্ষণ পরে চোখ যখন খুলে আবার সামনের দিকে তাকাল সুন্দরম্—সেই নারী আর যেন সেখানে নেই।

সুলোচনা কখন চলে গিয়েছে জানতেও পারে নি সুন্দরম্।

বের হয়ে এলো সুন্দরম্ মন্দির থেকে। বিচিত্র একটা চিন্তা সহসা তার মনের মধ্যে এসে উদয় হয়।

সত্যি-সত্যিই যদি ঐ রমণী তার সেই হারান মা-ই হতো। যে মায়ের স্নেহ থেকে সে জন্মাবধি বঞ্চিত দুর্ভাগ্যক্রমে—সেই মা-ই যদি তার ঐ রমণীই হতো।

মা। তার রিয়েল মাদার হতো।

তা কি হতে পারে না। এমনই কি অসম্ভব ব্যাপারটা। কোন বাধা তো নেই হতে।

পরক্ষণেই মনে হয় পাগলের মত আবোল-তাবোল এসব কি ভাবছে সে!

যা সে এই মুহূর্তে মনে মনে ভাবছে যদি সত্যিই তা হতো—কেমন করে কোন্ মুখ নিয়ে গিয়ে ও ঐ রমণীর সামনে দাঁড়াত।

একটা তস্কর—একটা ঘৃণ্য লুঠেরা—নারীহরণকারী—ঘৃণায় কি উনি ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না।

নিশ্চয়ই নিতেন—

মন্দির থেকে এক সময় বের হয়ে এলো সুন্দরম্ এবং অন্যমনস্কভাবে পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় সুন্দরম্—একটা গানের সুর ও সেই সঙ্গে গানের কথাগুলো কানে ভেসে আসছে।

মহিম হালদারের বাড়ির নাটমন্দিরে কবিগান হচ্ছে।

জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারব নাক তরাতে।

কে গায়—গলাটা যেন চেনা-চেনা—কবিয়াল—মাতঙ্গী কবিয়ালের গলা বলে মনে হচ্ছে।

আর জাত ফিরিঙ্গী কাকে বলছে!

তবে কি কবিয়াল এণ্টুনী ফিরিঙ্গী কবিগান করতে এসেছে হালদার বাড়িতে!

লোকটা ভারি সুন্দর কবিগান বানায় ও গায়।

মনে পড়ে শুনেছিল ওর কবিগান কৃষ্ণনগরে সেই রায়বাড়িতে—মৃন্ময়ীকে যেদিন—

আবার সেই মৃন্ময়ী—আবার সেই দুষ্কৃতির কথা। যত ভাবে সুন্দরম্ ভাববে না, ততই যেন ঘুরে ফিরে সেই কথাটাই মনে পড়ে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সুন্দরম্।

বিরাট চাঁদোয়ার নীচে বহু জনসমাগম হয়েছে—কবিগান চলেছে।

এণ্টুনী ফিরিঙ্গী আর নীলু ঠাকুরের দল। মাতঙ্গী নীলু ঠাকুরের দলে আবার যোগ দিয়েছে।

এণ্টুনী আবার গায়:

ওমা মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তুতি, জেতে আমি ফিরিঙ্গী।

চমৎকার মানিয়েছে এণ্টুনী সাহেবকে।

গরদের ধুতি পরনে—গলায় পাকানো উড়নী—গোড়ের মালা।

মাতঙ্গী উত্তর দেয়:

যিশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে,
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারব নাক তরাতে॥

নীলু ঠাকুর দলপতি মধ্যখানে বসে মৃদু মৃদু হাসছে আর মাথা দোলাচ্ছে।

ভাল লাগে না কথাগুলো শুনতে সুন্দরমের। বের হয়ে আসে আসর থেকে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কালীকৃষ্ণ ধনী হলেও কোন ধনের ঐশ্বর্যের অহংকার ছিল না। এবং স্বভাবটি ছিল তার যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র।

নামকরা কোম্পানীর বেনিয়ান সেই কারণে এবং অর্থশালী ব্যক্তি নানা জনে নানা দরবার নিয়ে প্রত্যহই আসতো তার গৃহে তার সঙ্গে দেখা করতে।

নানা দরবার—কেউ চায় চাকরি—কেউ অর্থসাহায্য—কারো কন্যাদায়—কারো পিতৃমাতৃদায়।

কালীকৃষ্ণ কাউকে পারতপক্ষে বিমুখ করতেন না। কাজেই সকলে তার গুণগান করতো।

হরনাথকেও সেইরকম একজন প্রার্থী ভেবেছিলেন কালীকৃষ্ণ।

তথাপি সে যখন নিরিবিলিতে কথা বলতে চায়, ঘর থেকে সকলে বিদায় নেবার পর কালীকৃষ্ণ হরনাথের মুখের দিকে তাকালেন, মহাশয়, আপনার নামটা তো শোনা হলো না—পরিচয়—

আজ্ঞে আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আমি সামান্য লোক একজন · দরিদ্র ব্রাহ্মণ—নাম হরনাথ মিশ্র—নবদ্বীপবাসী।

বসতে আজ্ঞা হোক—তামুক ইচ্ছা করেন নিশ্চয়ই—

তা—

বিলক্ষণ—কালীকৃষ্ণ ভৃত্যকে ডেকে হরনাথকে তামাকু দিতে বললেন আর নিজের গড়গড়ার কলিকাটাও বদলে দিতে বললেন।

ভৃত্য হুঁকা দিয়ে গেল আর কলকে বদলে দিয়ে গেল।

গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে কালীকৃষ্ণ বললেন, নবদ্বীপ থেকেই আসা হচ্ছে বুঝি?

আজ্ঞে না—বর্তমানে অন্নের ধান্ধায় এই শহরেই থাকতে হচ্ছে—

কি করা হয়?

সামান্য একটু ব্যবসা আছে—

হুঁ। তা আমার কাছে প্রয়োজনটা—

আজ্ঞে আমি এসেছিলাম—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে সংকোচের সঙ্গে কথা শেষ করে, যদি অভয় দেন তো নিবেদন করি—

বিলক্ষণ, বলুন—

আপনার একটি বিবাহযোগ্য পুত্র আছে—

জীবনকৃষ্ণর কথা বলছেন? হ্যাঁ কালেজে পড়ছে—হিন্দু কালেজে—

আমার কন্যাটির সঙ্গে আপনার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব এনেছিলাম—যদিও জানি আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা বামন হয়ে আমার চাঁদে হাত দেবার মত—

ছি ছি ওকথা বলবেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে তো আমি অদ্যাবধি কোন কিছু ভাবিই নি—

তাহলেও পুত্রের তো বিবাহ দেবেন বাঁড়ুয্যে মশাই—

তা দিতে হবে বৈকি—

তাহলে আপনি আমার কন্যাটিকে যদি একদিন অনুগ্রহ করে দেখবার ব্যবস্থা করেন। অবিশ্যি গিন্নী ঠাকরুণ—

কে?

আপনার সহধর্মিণী কন্যাটিকে আমার দেখেছেন ইতিপূর্বে।

তাই নাকি? কোথায় বলুন তো?

মায়ের মন্দিরে—

তাই বুঝি? তা বেশ—তাহলে আমি গৃহিণীকেই না হয় বলবো কথাটা। দেখি তার মতামত কি? আসলে বুঝলেন না মিশ্র মশাই, পুত্রের জনক আমি হলেও জননী—তিনিই এ ব্যাপারে কর্ত্রী। তিনি যদি মনে করেন যে পুত্রের বিবাহ দেবেন তো নিশ্চয়ই হবে।

তাহলে আমি আবার কবে আসব?

আসুন না কিছুদিন বাদে—পুত্রের জননীকে জিজ্ঞাসাবাদ করি আর বুঝতেই তো পারছেন আজকালকার ইংরাজী-শিক্ষিত কালেজে-পড়া ছেলে—তাদেরও হয়তো একটা নিজস্ব মতামত আছে—

তা তো বটেই। তাহলে আজ আমি উঠি।

আসুন।

প্রণাম।

প্রণাম—প্রত্যুত্তরে বললেন কালীকৃষ্ণ।

হরনাথ কালীকৃষ্ণর বৈঠকখানা হতে বের হয়ে রাস্তায় এসে নামল।

সন্ধ্যারাত্রি তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কালীকৃষ্ণ বোধ করি তার পুত্র জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে মিথ্যা বলেন নি।

নবযুগের সঙ্গে পা ফেলে চলবেন বলে একমাত্র পুত্র বংশধর জীবনকৃষ্ণকে

তিনি হিন্দু কালেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন যাতে করে সে শুধু ইংরাজী শিক্ষাই নয় যুগের হাওয়া ও মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। কিন্তু ইদানীং তিনি লক্ষ্য করছিলেন কোথায় যেন একটু বেসুরো মনে হচ্ছে।

পুত্রের চালচলন যেন কেমন কেমন একটু মনে হচ্ছে। ছেলে মদ্যপান করে—হিন্দুর ধর্ম—কুসংস্কার ও গোঁড়ামিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করে করুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু মনে হচ্ছিল কিছু দিন থেকে তার ছেলে যেন আরো বেশী এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

খবরটা তিনি মাসখানেক আগেই তাঁর গৃহসরকার রসিকলালের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

কে এক সিবিলিয়ান এসেছে মাস কয়েক হলো কলকাতা শহরে মিঃ মট্—তার এক অনূঢ়া ভগ্নী রেবেকার সঙ্গে নাকি পুত্র জীবনকৃষ্ণর বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, মিঃ মট্ হিন্দু কালেজের অধ্যাপক ডিরোজিওর পরিচিত।

সেই সূত্রেই ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভায় ভগ্নীসহ মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করে থাকেন। মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতেই ঐ সভা বসে।

সভায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন মিঃ মট্।

অবিশ্যি ডিরোজিওর ঐ একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভায় অনেকেই যান কালীকৃষ্ণ শুনেছেন।

মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার, বিশপ কলেজের অধ্যাপক ডাঃ মিলস্, এমন কি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্নেল বেনসনও মধ্যে মধ্যে নাকি যান—সভায় আলোচনা করেন—উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক তাঁরা।

ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্ররা সবাই প্রায় সেখানে যায়—জীবনকৃষ্ণও যায়।

মানিকতলার বাগানবাড়ির ঐ একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভায় যে কি সব নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে তাও জানতেন কালীকৃষ্ণ।

যাবতীয় হিন্দু ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও নোংরামির বিরুদ্ধে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণ-হীন চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, এমন কি নাকি মধ্যে মধ্যে দেবতার অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও গরম গরম আলোচনা হয়।

তাতেও কোন আপত্তি ছিল না কালীকৃষ্ণর—কিন্তু আপত্তি দেখা দিয়েছে ঐ মট্ সাহেবের অনূঢ়া কিশোরী ভগ্নী রেবেকার প্রতি তাঁর পুত্রের মনোভাবটায়

যেটা রসিকলাল তাঁর কর্ণগোচর করেছে—সেইখানে।

কি ভাবে কি জানি রেবেকার সঙ্গে নাকি ইদানীং কিছুদিন হলো জীবন-কৃষ্ণর বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—রসিকলাল বিশ্বস্তসূত্রে নাকি সংবাদটা সংগ্রহ করেছে।

চৌরঙ্গী অঞ্চলে মট্ সাহেবের গৃহে প্রায়শঃই যাতায়াত করছে জীবনকৃষ্ণ।

কালীকৃষ্ণ জানতেন না সে রাত্রেও জীবনকৃষ্ণ মট্ সাহেবের চৌরঙ্গীর গৃহেই উপস্থিত ছিল—ডিরোজিও ও তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে।

মিঃ মট্ সে রাত্রে ডিরোজিও ও তাঁর অনুরাগীদের নিয়ে একটি নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন আলোচনা অন্তে তাঁর চৌরঙ্গীর বাসভবনে।

কলকাতা শহরকে ইংরাজরা যে তখনই সিটি অফ প্যালেসেস্ বলত সে বোধ হয় ঐ চৌরঙ্গীর সুদৃশ্য ভবনগুলির জন্যই।

গঙ্গার তীরে ময়দানের সামনে বিরাট গভর্ণমেণ্ট হাউস—তার পশ্চাতে আওজ চার্চ ও কলকাতা শহর।

সেই শহরেরই বাঁ দিককার জায়গাটি তখন চৌরঙ্গী নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

সারা অঞ্চল জুড়ে ছাড়া ছাড়া বাগান-ঘেরা বাড়ি। বাড়িগুলোরও প্যাটার্নের একটা বিশেষত্ব ছিল যেন।

বড় বড় স্তম্ভের উপর টানা টানা বারান্দা, নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত বাড়ি-গুলোর চেহারায় ভারী মনোরম একটা গাম্ভীর্য ছিল যেন।

সেই রকমই একটি বাড়ি মিঃ মট্ ভাড়া নিয়েছিলেন বসবাসের জন্য চেষ্টা করে।

মেঝেতে মির্জাপুরী কার্পেট বিছানো এবং ঘরে ঘরে দামী দামী সুদৃশ্য ফরাসী ফার্নিচার। বড় বড় মার্বেল পাথরের টেবিল। সুন্দর সুন্দর বিরাট বিরাট আয়না, আরাম-কেদারা ঘরে ঘরে।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছিল—মিঃ মটের চৌরঙ্গীস্থিত আবাসের মধ্যস্থিত আলোকোজ্জ্বল বিরাট হলঘরের মধ্যে সকলে জমায়েত হয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান করছিল।

আলোচনার প্রধান বক্তব্য ছিল—হিন্দু কলেজ কমিটির প্রতিপত্তিশালী হিন্দু সভ্যরা বদ্ধপরিকর হয়েছেন ডিরোজিওকে কলেজ থেকে তাড়াবার জন্য। শ্রীযুক্ত

বাবু রামকমল সেন মহাশয় নাকি হিন্দু সভ্যদের মুখপাত্র হয়ে বিশেষ এক সভা আহ্বান করেছিলেন ইতিমধ্যে অনুরোধপত্র প্রেরণ করে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বললে, সে সভায় শেষ পর্যন্ত কি হলো জানো কিছু রামগোপাল?

জানি বৈকি—সভা ডেকে ওরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন আমাদের অধ্যাপকের স্বভাবচরিত্র নাকি এমনি খারাপ যে তাঁর সংসর্গে আমাদের ছাত্রদের অপকার হচ্ছে—বলে রামগোপাল ঘোষ।

রামকৃষ্ণ মল্লিক বলে ওঠে, ননসেন্স—

রাধানাথ শিকদারও সেদিন ঐ সভায় ও ভোজে উপস্থিত ছিলেন—তিনি বললেন, তাই—তবে ভয় নেই যতদূর শুনেছি তাদের সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন মহামতি হেয়ার ও ডাক্তার উইলসন—আর তাঁরাই তো ওঁকে সংবাদটা দিয়েছেন—

কৃষ্ণমোহন বলে, I know they like Mr Derozio.

ডিরোজিও ঐ সময় বলেন, কি সব বলেছে জান তারা আমার নামে—হেয়ার বলছিলেন—আমি নাকি তোমাদের কাছে নাস্তিকতা প্রচার করছি—ভাই বোনের বিবাহে কোন অন্যায় নেই—পিতামাতার অবাধ্যতা দোষণীয় নয় এই সব শিক্ষা দিই তোমাদের—কিন্তু তোমরা তো জান—ঈশ্বরের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দুই যুক্তি দিয়ে তোমাদের বিচারে উৎসাহিত করেছি বটে কিন্তু নাস্তিকতা আমি কখনও প্রচার করিনি—ভাই-বোনের বিয়ে হতে পারে কখনো তোমাদের আমি বলেছি কি—

না—নেভার—সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে সমস্বরে।

আমিও তাই হেয়ার আর ডক্টর উইলসনকে বলেছি, বাপ-মার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সেরকম কাউকে করতে দেখলে আমি তাকে সাজাই দিয়েছি—

মট্ ঐ সময়ে বলে ওঠে, আসল ব্যাপার কি জান ডিরোজিও, ওরা মনে করেছে—কিরিঙ্গী দলের তুমি একজন নেতা—

ঘরের মধ্যে যখন তুমুল আলোচনা চলেছে—বাগানে অন্ধকারে একটা নির্জন শ্বেতপাথরের বেঞ্চের উপর পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ছিল জীবনকৃষ্ণ ও রেবেকা।

রেবেকা—মাই সুইট—

গাঢ় স্বরে ডাকে জীবনকৃষ্ণ রেবেকাকে ঈষৎ আকর্ষণ করে নিজের বুকের কাছে।

বলো মাই ডার্লিং—জবাব দেয় রেবেকা।

এমন করে আর কতদিন কাটাতে হবে?—এই বিরহ আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না মাই হানি—

কিন্তু আমার ভাইকে তো তুমি জান! How he hates black natives—ভারতীয়দের কিরকম ঘৃণা করে। আমি একজন ভারতীয়কে ভালবেসেছি জানলে হয়তো সে অনর্থ ঘটাবে।

তাহলে কি আমার কোন আশাই নেই মাই ডার্লিং? এ জীবনে কি তাহলে তোমাকে আর আমি পাবো না? বিরহের সমুদ্রের দুই তীরে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি কেবল দীর্ঘশ্বাসই ফেলব। উই উইল শেড্ টিয়ারস—

রেবেকা জীবনকৃষ্ণর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, মাই ডার্লিং—মাই সুইট—অমন করে নিষ্ঠুরের মত বলো না। প্লিজ—আমি হয়তো এখুনি কেঁদে ফেলব।

কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না রেবেকা—কি ভাবে—how I am passing my days—কি ভাবে আমার ডে এণ্ড নাইট্ কাটছে—

কে বললে পারছি না—পারছি বৈকি! I always feel for you my darling—কিন্তু তুমি তো জান how I am helpless—কি অসহায় আমি—এক দুর্বলা নারী—যে একজনকে ভালবেসে তার সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছে—

এ অসম্ভব—এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না—আমি বলবো।

শংকিত হয়ে ওঠে রেবেকা। বলে, কি বলবে? কাকে বলবে?

বলবো তোমার ব্রাদারকে—মিঃ মট্‌কে—

কি—কি বলবে?

বলবো আমি—আমি তোমার পাণিগ্রহণ করতে চাই—I want to marry you—

সর্বনাশ!

কি বলছো?

Never—কখনো ও-কথা তাকে বলো না—he will shoot you down with his pistol—

কিন্তু গুলি করবে কেন আমাকে—why! এ তো কোন পাপ বা অন্যায় নয়—পবিত্র বিবাহ—আমি বলব তাকে যদি তার একান্তই ভারতীয় হিন্দুর সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দিতে আপত্তি থাকে—আমি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে—

না না শোন—জীবনকৃষ্ণ শোন, এতদিন তোমাকে আমি বলি নি—এ

বিবাহে সত্যিই সে মত দেবে না—তুমি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও নয়—

কেন—কেন দেবে না রেবেকা—why not?

কারণ তরুণ আর্মী অফিসার লেফটেনেণ্ট মিঃ আর্নল্ড-কে জান তো তুমি?

কে সে?

কেল্লার গ্যারিসনের অফিসার লেঃ জে. আর্নল্ড—

কি হয়েছে তার?

তার সঙ্গে আমার বিবাহের কথাবার্তা হয়েছে—আমি এখানে এসে পৌঁছাবার আগেই নাকি আমার ব্রাদার তাকে কথা দিয়েছে। আমার photo দেখেই সে আমাকে নাকি পছন্দ করেছিল। এবং বিবাহের প্রস্তাব করেছিল।

সে কি? এসব তুমি কি বলছো রেবেকা?

ঠিকই বলছি—

॥ ২ ॥

কয়েকটা মুহূর্ত কথাটা শোনার পর জীবনকৃষ্ণর যেন বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

রেবেকা কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সে স্তব্ধ হয়ে যায়, কি বলছে এসব রেবেকা?

তার রেবেকা তার সঙ্গে তবে এই ছয়মাস ধরে মেলামেশা করল কেন? কেন এমন করল তার সঙ্গে?

ও—তাই—তাই আজকের ডিনার পার্টিতে সেই তরুণ আয়ারল্যাণ্ডবাসী লেঃ অফিসারটি ঘন ঘন রেবেকার দিকে ও মধ্যে মধ্যে তার দিকে তাকাচ্ছিল।

লেঃ আর্নল্ড!

তুমি—তুমি আমাকে একথা আগে বল নি কেন রেবেকা?

বলতে পারি নি—

কেন বলতে পার নি?

পাছে তুমি দুঃখ পাও—মন তোমার ভেঙে যায়।

জীবনকৃষ্ণর একবার ইচ্ছা হয় চিৎকার করে বলে, ক্রুয়েল উওম্যান—এখন বুঝি কথাটা শুনে আমি দুঃখ পাচ্ছি না—কিন্তু কোন কথাই বলতে পারে না। বুকের ভিতর একটা কান্না যেন তোলপাড় করতে থাকে।

ডার্লিং জীবনকৃষ্ণ—রেবেকা ডাকে।

কী?

দুঃখ পেলে কি তুমি?

না—

দুঃখ পেও না মাই সুইট্‌—মাই হানি চাইল্ড।—দেখ কথাটা তোমাকে আমি কোন দিন বলবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি তো জান how much I love you—তোমাকে কি গভীর আমি ভালবাসি তাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে না বলে পারলাম না কথাটা—আমাকে তুমি ক্ষমা করো—

ঠিক আছে রেবেকা—তুমি আমাকে কথাটা জানতে দিলে ভালই হলো। তবে এত সহজে এর মীমাংসা হবে না এও তুমি জেনে রেখো।

কি বলছো তুমি? রেবেকা শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

তাই—আমি তোমার ব্রাদারের কাছে প্রোপোজালটা দেবো—

বল কি—এর পরও—no no—please, you don't know him—তাকে তুমি জান না—

শোন, দিতে আমাকে হবেই—কারণ তুমি যখন আমাকে ভালবাস—আমি তোমাকে ভালবাসি, পরস্পর আমরা পরস্পরকে ভালবাসি তখন—why—কেন এত সহজে একটা ভীরু কাপুরুষের মত ঐ লেঃ আর্নল্ডের দাবী আমি মেনে নেবো? আমি কি পুরুষ নই!

না, না, তুমি জান না জীবনকৃষ্ণ he is an army man—a soldier—

তাতে কি—শোন, দু'এক দিনের মধ্যেই আমি তোমার ব্রাদারের সঙ্গে দেখা করছি এসে—আজকের মত good night—

জীবনকৃষ্ণ আর দাঁড়াল না—সোজা অন্ধকার বাগানের পশ্চাৎ দিকে যে দ্বারপথ সেই দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু বেশীদূর সে এগোতে পারে না।

সহসা আবছা এক মনুষ্যমূর্তি তার পথরোধ করে দাঁড়ায়—Just a minute—young man—একটু দাঁড়াও যুবক, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—

কে? Who are you!—জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করে।

আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই বটে তবে আমাকে তোমার না জানার কথা নয়—একটু আগেও রেবেকা তোমাকে আমারই কথা বলছিল—

তুমি—তুমি তাহলে—

Yes young man—আমিই লেঃ আর্নল্ড।—গ্যারিসন অফিসার ফোর্টের—

তুমি!

হ্যাঁ আমি।—

কি চাও ?

তোমাকে আমার কাছে ও আমার ভাবী স্ত্রীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে ?

হ্যাঁ—আমার কাছে ও রেবেকার কাছে।

কিন্তু কেন—why ? কিসের জন্য ক্ষমা চাইব আমি ?

তুমি তাকে অপমান করেছো, আমাকে অপমান করেছো—

অপমান করেছি !

হ্যাঁ—সে আমার ভাবী স্ত্রী জেনেও তার কাছে বিবাহের অসঙ্গত প্রস্তাব করেছো—

জীবনকৃষ্ণ তো থ !

কি বলবে অতঃপর ভেবে পায় না। কয়েকটা মুহূর্ত বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি যুবক—why are you keeping silent—জবাব দাও আমার কথার—what is your decision—কি তুমি স্থির করলে। অ্যাপলজি চাইবে কি ?

জীবনকৃষ্ণর ইচ্ছা হয় একবার সে বলে, এতে যদি তোমার অপমান হয়ে থাকে তো আমি নাচার। আমি মিঃ মটের কাছে বিবাহের প্রোপোজালটা দোবই। সঙ্গে সঙ্গে তার আহত পৌরুষ ও যৌবন যেন গ্রীবা সোজা করে প্রতিবাদ জানাতে চায়। বলতে ইচ্ছা হয় অপমান বুঝি একা তোমারই, আমার নয় ? আমি বুঝি অপমানিত হই নি—

যুবক, উত্তর দাও—answer my question—লেঃ আর্নল্ড আবার অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করে।

শোন লেঃ আর্নল্ড, আমি ক্ষমা চাইব না—

চাইবে না—স্পর্ধা তোমার—

না, চাইব না। কারণ তুমি যেমন মনে মনে রেবেকাকে মনোনীতা করেছো তেমনি আমিও তাকে ভালবেসেছি—সেও আমাকে ভালবেসেছে—we love one another—I have got every right—

Stop—stop—

চিৎকার করে ওঠে আর্মী অফিসার লেঃ আর্নল্ড।

শোন, হয় তুমি ক্ষমা চাইবে নচেৎ আমারও শেষ কথা—আমার সঙ্গে

তোমাকে ডুয়েল লড়তে হবে—

ডুয়েল?

হ্যাঁ—ডুয়েল লড়তে হবে—are you prepared!

আহত যৌবন যেন কল্লোলিত হয়ে ওঠে জীবনকৃষ্ণর বুকের মধ্যে। সে মুহূর্তে সব কিছু ভুলে যায়।

বলে, ঠিক আছে আমি accept করলাম তোমার চ্যালেঞ্জ—একজন ভারতীয় বাঙ্গালী যুবক ডুয়েল লড়তে ভয় পায় না বুঝলে ইংরাজ যুবক—প্রণয়িনীর জন্য এ দেশের বহু যুবক পূর্বে অমন কত ডুয়েল লড়েছে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি যে আমার জীবনে সে সুযোগ এলো। ডুয়েল আমি লড়বো—বল, কবে কোথায় তুমি ডুয়েল লড়তে চাও লেঃ আর্নল্ড!

আগামী ওয়েডনেসডে ভোর পাঁচটায় বেলভেডিয়ার হাউসের পিছনে খোলা ময়দানে এসো পিস্তল নিয়ে—একজন বন্ধুকে সঙ্গে আনবে তুমি—আমিও সঙ্গে আনব একজন বন্ধুকে। রাজী?

রাজী।

কথাটা বলে আর্নল্ড চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ আবার ফিরে দাঁড়াল, ভাল কথা যুবক—তোমার পিস্তল আছে তো?

না—গাদা বন্দুক আছে—

ঠিক আছে। আমিই তাহলে দুটো পিস্তল আনব। পিস্তল তুমি ছুঁড়তে জান তো?

না জানলেও ভয় নেই তোমার, পারব ছুঁড়তে—

বেশ—তবে সেই কথাই রইলো।

লেঃ আর্নল্ড অন্ধকারে বাগানের অন্তপ্রান্তে মিলিয়ে গেল।

জীবনকৃষ্ণ কিন্তু আর নড়ে না। সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্যাপারটা হঠাৎ কি হলো মাথার মধ্যে কিছুই যেন তার প্রবেশ করে নি তখনো।

ডুয়েল—ডুয়েল লড়তে হবে লেঃ আর্নল্ড-এর সঙ্গে! শুনেছে বটে সে ডুয়েলের কথা, কিন্তু ডুয়েল তো জীবনে কখনো লড়ে নি!

তাহলে?

তাহলে কি সে দুঃখ করে ক্ষমা চাইবে?

ক্ষমা—সঙ্গে সঙ্গে আহত যৌবন মনের মধ্যে যেন গর্জন করে ওঠে, কিসের

জন্য ক্ষমা, কার কাছে ক্ষমা আর কেনই বা ক্ষমা!

জীবনকৃষ্ণ—

কে!

আমি—আমি জীবনকৃষ্ণ—আমি রেবেকা—

রেবেকা?

ইয়েস মাই ডার্লিং—এগিয়ে আসে রেবেকা। একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে জীবনকৃষ্ণের বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়ায়। ভয়ে তখনও সে কাঁপছে ভীরু কপোতীর মত।

বলে, পালাও তুমি জীবনকৃষ্ণ—পালাও—

পালাব? কেন?

বুঝতে পারছো না কেন—আড়াল থেকে তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। তুমি পালাও—

ভীরু—একটা কাপুরুষের মত পালিয়ে যাবো। কি বলছো তুমি রেবেকা?

ঠিকই বলছি—ও একজন আর্মী অফিসার, ট্রেইণ্ড্ অফিসার—তুমি কোনদিন কোন পিস্তল ছুঁড়েছো কি—এক গুলিতে তুমি সাবাড় হয়ে যাবে—

তা হয় না রেবেকা—

জীব—

না রেবেকা—আমি পুরুষ মানুষ। হতে পারি আমি পিস্তল ছুঁড়তে জানি না, তাই বলে এ যে আমার ভালবাসার চ্যালেঞ্জ—একে কি আমি অপমান করতে পারি রেবেকা—না— ও রিকোয়েস্ট তুমি আমাকে করো না।

জীবন—

তাছাড়া মরলামই বা—মৃত্যু না হয় আমার হলোই—আমার ভালবাসার জন্য—আমার প্রণয়িনীর জন্য—for the sake of my love—for my sweet heart—এ প্রাণ যদি আমার যায়ই, গদ গদ কণ্ঠে যেন জীবনকৃষ্ণ বলতে থাকে, তার চাইতে গৌরবের—সান্ত্বনার আর কি থাকতে পারে বল আমার প্রিয়তমা।

বেদনাবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেয় রেবেকা, না, না জীবনকৃষ্ণ, এ কখনো তোমাকে আমি করতে দেবো না, তুমি ওকে জান না জীবন, ওর হাতের এইম আমি জানি—he is so accurate—

জীবনকৃষ্ণ হাসে নিঃশব্দে।

বল, বল প্রিয়তম তুমি সামনের ওয়েডনেস্‌ডেতে বেলভেডিয়ারে যাবে না। ডুয়েল লড়বে না।

তা হয় না রেবেকা, যেতে আমাকে হবেই, তাছাড়া তুমি এত চিন্তিতই বা হচ্ছো কেন ?

না না, চিন্তা নয়—

তবে কি ভয় ? কিন্তু ভয়ই বা কিসের বল তো ! শেষ পরিণতি হয়তো মৃত্যু—তার বেশী তো কিছু নয় ?

জীবনকৃষ্ণ—চাপা কণ্ঠে যেন একটা আর্তনাদ করে ওঠে রেবেকা।

হ্যাঁ যদি মরিই—তুমি আমাকে কোন শান্ত নির্জন পরিবেশে—কোন একটি গাছের ছায়াতলে মাটির নীচে কবর দিতে পারবে না প্রিয়া আমার ?

Oh Krishna—don't be so cruel—don't be so cruel—প্রায় বলতে বলতে কেঁদে ফেলে বুঝি রেবেকা।

মাই ডিয়ার—তাই দিও—জীবনকৃষ্ণ বলে চলে, গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়বে আমার কবরের উপরে—তার পর হয়তো কোন দিন মাটির বুকে সবুজ ঘাসের আস্তরণ দেখা দেবে—তারই মধ্যে একটি লাল ঘাস ফুল ফুলবে—কথা-গুলো বলতে বলতে জীবনকৃষ্ণরও গলার স্বরটা বুজে আসে বুঝি।

আর ও বলতে পারে না।

তোমার আমার ভালবাসা যে মিথ্যা নয় সেই লাল ঘাসের ফুলটিই সাক্ষ্য দেবে—

বলো না আর বলো না, চুপ কর—তোমার ঐ অসংবৃত রসনা সম্বরণ কর—প্রিয়তম, আমাকে আর তুমি কত আঘাত দেবে ! তুমি কি এতই নিষ্ঠুর এই কোমল বালিকার বুকের ব্যথাটা তুমি উপলব্ধি করতে পারছো না—আমার চোখের জল কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না।

রেবেকার কথা শেষ হলো না অদূরে ওর ভাই মিঃ মটের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রেবেকা—where are you—কোথায় তুমি—my dear sister !··· আমার আদরের ভগিনী—

মট্ ডাকছে, আমি যাই—আবার কবে আমাদের দেখা হবে প্রিয়তম বল !

রেবেকা—রেবেকা—মটের কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়।

জানি না—আমি চললাম—যাবার জন্য জীবনকৃষ্ণ পা বাড়ায়।

বলে যাও প্রিয়তম কবে আবার দেখা হবে ! রেবেকা একেবারে বুকের কাছে এসে দাঁড়ায়।

জীবনকৃষ্ণর ইচ্ছা হলো যে বলে, সে আমার ভাগ্যবিধাতাই জানে—কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারে না।

হঠাৎ ক্ষিপ্রপদে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রেবেকা চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল কিন্তু ডাকা আর হলো না। অল্প দূরে ওর ভাইয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রেবেকা কোথায় তুমি?

রেবেকা সাড়া দেয়, এই যে—এখানে—

এগিয়ে আসে মট্, বলে, একি! এই রাত্রে, অন্ধকারে এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাগানে একা দাঁড়িয়ে কেন ভগিনী!

রেবেকা কোন সাড়া দেয় না।

॥ ৩ ॥

বিচিত্র একটা মনের অবস্থা নিয়ে জীবনকৃষ্ণ সে রাত্রে গৃহে ফিরে এসেছিল।

সামনের ওয়েডনেস্‌ডে—বুধবার, মানে মাঝখানে আর মাত্র ছয়টা দিন আছে। তারপরই প্রেমের মর্যাদা রাখতে হলে লেঃ আর্নল্ড-এর পিস্তলের গুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাকে ডুয়েল লড়তে বুক পেতে বেলভেডিয়ারের নির্জন ময়দানে।

রেবেকা বলছিল তার হাতের লক্ষ্য নাকি অব্যর্থ। না হবেই বা কেন! আর্মী অফিসার একজন। শিক্ষিত আর্মী অফিসার।

গোলাগুলি চালানই তো ওদের কাজ এবং সেই শিক্ষাই ওদের জীবন-মরণের শিক্ষা।

সে যদিও কখনো পিস্তল ছোঁড়া তো দূরে থাক চোখেও পিস্তল দেখে নি তবু তাকে পিস্তল ছুঁড়তেই হবে।

বাড়িতে তার বাপের একটা সখ করে কেনা গাদা বন্দুক আছে বটে তার শোবার ঘরে দেওয়ালে ঝোলানো কিন্তু সেটা ব্যবহার করা দূরে থাক—হাতে কখনো স্পর্শও করে নি—জানে ওটা একটা গাদা বন্দুক—ঐ পর্যন্ত।

তাছাড়া ডুয়েল ব্যাপারটা যে কি তারও ঠিক কোন ধারণা নেই জীবনকৃষ্ণর। শুনেছে সে ইংরেজরা মধ্যে মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে, কিন্তু ঐ শোনা পর্যন্তই। ডুয়েলে কি যে হয়—কি করতে হয়, কি নিয়মকানুন কিছুই সে জানে না।

সর্বক্ষণ মনের মধ্যে একটা চিন্তার ঝড় বইতে থাকে যেন জীবনকৃষ্ণর। অথচ কারো কাছে বলবার মতও নয়, কারো যে পরামর্শ নেবে তারও কোন উপায় নেই।

পড়াশুনা কাজকর্ম কিছুই ভাল লাগে না।

আহারে রুচি নেই—রাত্রে চোখে নিদ্রা নেই। বাড়ির মধ্যে যাতায়াত ছেড়ে দেয় জীবনকৃষ্ণ।

মাতা সত্যবতী সর্বক্ষণ তার গৃহস্থালী, ধর্মকর্ম ও অতিথি-অভ্যাগতদের দেখা-শোনা নিয়েই আছে।

স্বামী ও পুত্রের কল্যাণে সত্যবতী প্রাণও দিতে পারে এবং তার পরিচিত জগৎটা ওরই মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মাত্র আট বছরের এক বালিকা সত্যবতী মাথা-ভর্তি সিন্দূর ও একবুক ঘোমটা টেনে স্বামীর ঘরের প্রাঙ্গণে দুধেআলতায় পা ফেলেছিল একদিন সেই কবে!

এবং সেই যে পা ফেলেছিল স্বামীর গৃহে আর কোন দিন পিত্রালয়ে যায় নি। স্বামীর সংসারের মধ্যেই সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল।

স্বামীর সংসার—সেই সংসারের পূজা-আর্চা—অতিথি-অভ্যাগত স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনা ও সেবা ছাড়া সে জানতও না কিছু।

বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও ছিল না।

কোথায় ইংরাজদের হাতে কেমন করে ক্রমশঃ একটু একটু করে সমস্ত দেশ—তার মানুষগুলো তাদের আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা—পাল্টে যাচ্ছিল—কেমন করে দীর্ঘদিনের নবাবী শাসনের সমস্ত কিছু নতুন এক শাসন ব্যবস্থায় নতুন এক রূপ পরিগ্রহণ করছিল—কোথায় রাজা রামমোহন, ডেভিড্ হেয়ার, ডিরোজিও ইংরাজ শাসকদের জ্ঞান ও শিক্ষার অম্লান একটি দীপশিখা একটু একটু জ্বলে উঠেছে।

অনেক কালের দুর্নীতি কুসংস্কার ধর্মান্ধতা দুশ্চরিত্রতা প্রবঞ্চনাপরতার অন্ধকার একটু একটু করে দূরীভূত হয়ে নতুন এক ইতিহাস রচিত হচ্ছিল সেদিনকার শহর কলকাতায় তার কোন সংবাদই রাখত না সত্যবতী।

রাখার প্রয়োজনও হয়নি তার, জানবার চেষ্টাও করে নি সে।

তার পরম কামনা ছিল মাথার সিন্দূর ও হাতের নোয়া বজায় রেখে যদি স্বামীর পায়ের তলে শেষ প্রণামটি জানিয়ে চোখ দুটো বুজতে পারে সেই তো নারীজীবনের অক্ষয় স্বর্গ।

তার চাইতে স্ত্রীলোকের আর কি শ্রেষ্ঠ কামনার আছে।

তাছাড়া স্বভাবটিও ছিল বড় সরল ও স্নিগ্ধ সত্যবতীর।

সেদিন স্বামী এসে যখন হরনাথের প্রস্তাবটি সত্যবতীর কাছে প্রকাশ করে বললেন, দেখেছো নাকি কন্যাটিকে তুমি মিশ্র মহাশয়ের?

প্রথমে তো মনেই করতে পারে না সত্যবতী কাকে কবে কোথায় দেখেছে।

তারপর অনেক কষ্টে মনে পড়ে—হ্যাঁ কালীমন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে একটি বালিকাকে দেখেছিল বটে।…সেই কিনা কে জানে—

বলে, হ্যাঁ গো—মনে পড়েছে। আহা সত্যিই সুন্দর গো—যেন দেবী প্রতিমার মতই মায়ের আমার মুখখানি—তা হ্যাঁ গা সে কথা শুধাচ্ছো কেন?

তাদের কাছে বুঝি তুমি তোমার পরিচয় দিয়েছিলে গিন্নী!

ওমা আমি দেবো কেন?

তবে জানল কি করে যে আমাদের একটি বিবাহযোগ্য পুত্রসন্তান আছে… তুমিই নিশ্চয় বলেছো সত্যবতী—হাসতে হাসতে কালীকৃষ্ণ কথাগুলো বলেন স্ত্রী সত্যবতীকে।

না, না—তবে হয়তো পাণ্ডা ঠাকুর বলতে পারে—তা হ্যাঁ গা—কি হয়েছে?

মিশ্র মশাই এসেছিলেন যে।

কেন?

কন্যাদায় আবার কেন—তাঁর সেই কন্যাটির সঙ্গে তোমার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্মণ।

ওমা তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তা তুমি কি বললে?

কি আর বলব—

কেন—মেয়েটি তো ভাল—সদ্‌বংশ-কুলীন—দেখ না—যদি কুলশীল মেলে!

কালীকৃষ্ণ চৌকির ওপরে বসে গড়গড়ার নলটা হাতে তামাকু সেবন করছিলেন—স্ত্রীর ঐ কথার জবাবে কোন সাড়া দিলেন না।

সত্যবতী প্রশ্ন করে, চুপ করে আছো যে?

না এমনি।

এমনি কি—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে বল না গো—বুকটার মধ্যে ভক্সে কেমন যেন আমার ঢিপ্ ঢিপ্ করছে—

কয় দিন থেকেই একটা কথা মনে হচ্ছিল গিন্নী!

কি গো?

জীবনকৃষ্ণকে বোধ হয় ইংরাজী শিক্ষা না দিলেই পারতাম—হিন্দু কালেজে না ভর্তি করালেই পারতাম।

ও কথা বলছো কেন? তুমিই তো শখ করে দিলে ছেলেকে কালেজে।

তা দিয়েছিলাম কিন্তু এখন—ঐ শিক্ষা ভাল কি মন্দ বুঝতে পারছি না। তখন ভেবেছিলাম যুগ পাল্টাচ্ছে—যুগের সঙ্গে চলাই হয়তো মঙ্গল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—

কী? কি মনে হচ্ছে?

ধারণাটা বোধ হয় আমার ভ্রান্ত।

তুমি কি সব কথা বলছো। কিছুই যে আমি বুঝতে পারছি না, ভয়ে হাত পা বুক যে আমার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

দেখ গিন্নী জীবনকৃষ্ণ সুরা পান করে, ডিরোজিওর সঙ্গে মেশে—সবই আমার সহ্য হয়েছে কিন্তু—

ওগো বল না স্পষ্ট করে কথাগুলো। ব্যাগত্তা করি—অনুনয়ে ভেঙে পড়ে যেন সত্যবতী।

কালীকৃষ্ণর একবার মনে হয় রসিকলালের কাছে পুত্র সম্পর্কে যে সব কথা তিনি শুনেছেন সব স্ত্রীর কাছে বলেন কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, আহা সরলা নির্বোধ স্ত্রীলোক ঐ সত্যবতী—ব্যাপারটার গুরুত্ব কিছুই বুঝবে না—কেঁদে হয়তো অনর্থ করবে। বিশ্রী এক অশান্তি হবে। থাক—বলেন নি যখন আর বলবেন না।

কি হবে সত্যবতীকে ব্যস্ত করে? সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তাই সামলে নেন কালীকৃষ্ণ। বলেন, গিন্নি, ঠাকুর-দেবতায় তোমার অগাধ বিশ্বাস, তাই না?

ওকি কথা। ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস থাকবে না তো কিসে থাকবে। ছি ছি, ওকথা মুখে উচ্চারণ করাও মহাপাপ।

তবে আর কি, তোমার সেই ঠাকুর-দেবতাকেই ডাক। তোমার ছেলের সমস্ত অমঙ্গল দূর হবে।

কী অমঙ্গল হলো তার! অমন করে কথা বলছো কেন? সত্যিই আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে!

জীবনকৃষ্ণ কোথায়—তার ঘরে আছে কি?

কেন?

একবার ডাক না—

ডাকছি—আমি এখুনি তাকে ডাকিয়ে আনছি—বলতে বলতে সত্যবতী বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

সাধারণত ঐ সময়টা জীবনকৃষ্ণ বহির্মহলে তার ঘরে বসে অধ্যয়ন করে। ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিল বটে সত্যবতী, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য ফিরে এসে বলল,

দাদাবাবু ঘরে নেই।

ঘরে নেই কি রে—নিশ্চয়ই আছে, তুই ভাল করে দেখে আয়।

না মা ঠাকরুন দাদাবাবু ঘরে নেই—সরকার মশাই বললেন।

কি বললেন?

আজকাল দাদাবাবু ঐ সময় নাকি ঘরেই থাকেন না।

থাকেন না?

না।

কেন?

তা কি করে বলব মা ঠাকরুন—

সেদিন তো পুত্রের সঙ্গে দেখা হলোই না—তারপরও দু'তিনদিন মায়ে-ছেলেতে দেখা হলো না।

ছেলে যে কখন অন্দরে আসে—কখন চলে যায় সত্যবতী জানতেই পারে না।

এমন সময় জীবনকৃষ্ণ অন্দরে আসে যখন সত্যবতী পূজার ঘরে পূজা নিয়ে ব্যস্ত।

যে ভৃত্য জীবনকৃষ্ণর দেখাশোনা করে তাকেই অবশেষে একদিন সত্যবতী ডেকে পাঠিয়ে শুধায়, হ্যাঁরে—তোর দাদাবাবু কখন ভিতরে আসে বল তো—দেখতেই পাই না!

কি জানি মা ঠাকরুণ, দাদাবাবুর আজকাল যে কি হয়েছে তা দাদাবাবুই জানে—ভাল করে খায় না দায় না ঘুমোয় না, ভাল করে কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।

সে কি রে?

তবে আর বলছি কি!

ভৃত্যের মুখে জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে ঐ সব কথা শুনে সত্যবতীর দুশ্চিন্তা যেন আরো বেড়ে যায়।

হে মা মঙ্গলচণ্ডী, এ কি হলো—হে মা কালী—ঐ যে আমার একমাত্র সন্তান—ওকে আমার ভাল করে দাও মা—বুক চিরে রক্ত দেব।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শুধু ভৃত্য নয় শিবনাথেরও নজরে পড়েছিল ব্যাপারটা।

জীবনকৃষ্ণ যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। কথাই বলতে চায় না। সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কি একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে জীবনকৃষ্ণ কয়দিন থেকে।

এমনটা তো কোন দিন জীবনকৃষ্ণকে দেখে নি শিবনাথ। মানুষটাকে বরাবর হাসিখুশি প্রাণোচ্ছলই দেখেছে।

হঠাৎ যেন রাতারাতি মানুষটা বদলে গিয়েছে।

ইদানীং দু'তিনদিন ধরে জীবনকৃষ্ণ অন্দরেও শুতে যাচ্ছিল না। বহির্মহলে তার পড়ার ঘরেই সে শুচ্ছিল।

জানতে পেরেছিল সেটা শিবনাথ, কারণ শিবনাথের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল ঠিক তার পাশেরই ঘরটায়।

সেদিন রাত্রে কি ভেবে শিবনাথ নিজের ঘর থেকে বের হয়ে জীবনকৃষ্ণর ঘরের আধখোলা দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। জীবনকৃষ্ণ জেগেই আছে—তখনো ঘুমোয় নি।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল বোঝা গেল।

আর একটু এগিয়ে আধখোলা দরজা-পথে ভিতরে উঁকি দিল শিবনাথ—জীবনকৃষ্ণকে ঠিক দেখতে পেল না বটে তবে চোখে পড়ল তার দীর্ঘ একটা ছায়া দেওয়ালে এদিক থেকে ওদিক চলাচল করছে।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল শিবনাথ, তারপর সন্তর্পণে কবাটটা আরো একটু ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল।

জীবনকৃষ্ণ জেগেই আছে।

ঐ ঠাণ্ডায়ও গায়ে সামান্য একটা চাদর খালি পা—সে ঘরের মধ্যে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

মাথার চুল এলোমেলো।

ঘরের দেওয়ালগিরির আলোয় জীবনকৃষ্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে শিবনাথের কেমন যেন মায়া হয়।

কি বিষণ্ণ মুখখানা মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণর!

শিবনাথ যে ঘরে প্রবেশ করেছে জীবনকৃষ্ণর সেটা নজরেও পড়ে না। সে

যেমন মাথা নীচু করে পায়চারি করছিল তেমনিই করতে থাকে।

শিবনাথ ঠিক কি করবে বুঝে পায় না। তাকে ডাকবে না ঘর থেকে আবার বের হয়ে যাবে স্থির করে উঠতে পারে না।

হঠাৎ ঐ সময় শিবনাথের কানে এলো সে যেন বিড় বিড় করে কি বলছে অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনে।

সব কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু কয়েকটা শব্দ শিবনাথের কানে আসে।

রেবেকা মাই ডার্লিং—ডুয়েল—

জীবনকৃষ্ণ!

মৃদুকণ্ঠে ডাকে শিবনাথ।

কে?

চমকে থেমে মুখ তুলে তাকাল জীবনকৃষ্ণ। দু'চোখের দৃষ্টিতে তার যেন একটা কিসের ঘোর। সে যেন ঐ মুহূর্তে এ জগতের কেউ নয়। অনেক—অনেক দূরের কেউ। অস্পষ্ট, ঝাপ্‌সা।

জীবনকৃষ্ণ!

কে? ও তুমি—শিবনাথ! কেমন যেন তন্দ্রাজড়িত মনে হয় কণ্ঠস্বর জীবনকৃষ্ণর।

জীবনকৃষ্ণ! আবার ডাকে শিবনাথ।

কিছু বলবে শিবনাথ?

জীবনকৃষ্ণ যেন আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসে। সে যেন আবার সম্বিৎ ফিরে পায়।

কি হয়েছে তোমার বল তো জীবনকৃষ্ণ? প্রশ্নটা করে জীবনকৃষ্ণর মুখের দিকে তাকায় শিবনাথ।

কেন, ও কথা বলছো কেন? কি হবে আমার—কিছু তো হয় নি—আস্তে আস্তে বলে জীবনকৃষ্ণ।

না, নিশ্চয়ই কিছু তোমার হয়েছে—বল, কি হয়েছে?

কিছু হয় নি শিবনাথ।

জীবনকৃষ্ণর কণ্ঠস্বরে তখনো যেন কেমন একটা ক্লান্তির সুর। যেন বড় ক্লান্ত সে।

তুমি আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা করছো জীবনকৃষ্ণ। তোমার কিছু হয়েছে আমি বুঝতে পারছি—কি হয়েছে বল? আমি তোমার বন্ধু আমার কাছে সঙ্কোচ করো না।

শিবনাথ!

বল।

ভেবেছিলাম কাউকেই জানাব না কথাটা। তোমার সন্দেহ মিথ্যা নয় ভাই। সত্যিই আমি যেন কিছু ভেবে পাচ্ছি না। অথচ বলবো যে আমার কথা কাউকে তাও পারছি না। আমি কি দ্বন্দ্ব, কি সংশয়ের মধ্যেই যে পড়েছি—

কিসের সংশয়, কিসের দ্বন্দ্ব তোমার?

ঘরের খোলা জানালা-পথে শীতের মধ্যরাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে থেকে এসে ঘরের মধ্যে দেওয়ালগিরির শিখাটা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কোথায় একটা কুকুর মাঝে মাঝে নৈশ রাত্রির স্তব্ধতা যেন বিদীর্ণ করছে তার করুণ ডাকে।

শিবনাথ!

বল?

তোমাকে আমি বলবো—আর নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করতে পারছি না, আচ্ছা শিবনাথ তুমি কখনও কাউকে—

কী?

ভালবেসেছো?

হঠাৎ যেন জীবনকৃষ্ণর উচ্চারিত কথাটা তার বুকে এসে একটা ধাক্কা দেয়, ভালবাসা! কে জানে ভালবাসা কাকে বলে—ভালবাসার সত্যিকারের অর্থ কি? অকস্মাৎই যেন মৃন্ময়ীর মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে স্পষ্ট হয়ে। যে মুখখানা সর্বক্ষণ, গত কয়দিন ধরে তার অবচেতন মনের পাতায় ভেসে ভেসে উঠছিল—জীবনকৃষ্ণর কথায় সেই মুখখানাই সহসা যেন নতুন করে আবার তার চেতনার মুকুরে উজ্জ্বল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ী!

সেদিন মৃন্ময়ীর সঙ্গে দেখা করবে বলে একটা অন্ধ আকর্ষণে মল্লিকবাড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়েও আবার চোরের মত পালিয়ে এসেছে এবং এই কয়দিনে যাকে একটি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছে না সেই মৃন্ময়ীর কথাটাই যেন ঐ মুহূর্তে আবার নতুন করে মনে পড়ে যায়।

সংকোচ লজ্জা তার পথরোধ করেছে অথচ সে তো কই কিছুতেই মৃন্ময়ীকে ভুলতে পারছে না।

শিবনাথ যেন সহসা কেমন একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল জীবনকৃষ্ণর কথায়, হঠাৎ আবার সম্বিৎ ফিরে পায়।

জীবনকৃষ্ণ বলছে, ভালবাসার মধ্যে যে এত দুঃখ এত কষ্ট তা যদি জানতাম—

তুমি কাউকে বুঝি ভালবেসেছো জীবনকৃষ্ণ?

বোকার মতই যেন প্রশ্নটা করে বলে শিবনাথ।

হ্যাঁ—তুমি তাকে দেখ নি। Just an angel—স্বর্গের দেবী—গোলাপের মত সুন্দর—my Rebeca —my sweet Rebeca. আমার জীবনের স্বপ্ন—আমার ভালবাসা, my love—my sweet love. ভোরের শিশিরের মতই সে স্নিগ্ধ—নির্মল—শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ—

যেন স্বপ্নের ঘোরে, নেশার ঘোরে একটানা কথাগুলো বলে যায় জীবনকৃষ্ণ। আর শিবনাথেরও শুনতে যেন ভারী ভাল লাগে।

যেন মনে হয় সে একটা কবিতা—একটা গান শুনছে।

রেবেকা কে জীবন?

দেখবে—তাকে তুমি দেখবে—কারণ ভেবে দেখলাম শিবনাথ তুমিই একমাত্র আমার বন্ধু যখন তখন ডুয়েলের দিন তুমিই আমার সঙ্গে যাবে—তোমাকেই আমি সঙ্গে নেবো বন্ধু—

ডুয়েল! অবাক হয়ে গিয়েছে যেন শিবনাথ। বলে, ওসব কি বলছো তুমি জীবনকৃষ্ণ?

হ্যাঁ বন্ধু, আমাকে ডুয়েল লড়েই প্রেমের পরীক্ষা দিতে হবে—আমি দেবো—my sweet রেবেকা—তোমার প্রেম—তোমার স্বর্গীয় ভালবাসাকে আমি ছোট করব না my darling—এ প্রাণ তোমার জন্য যাবে তার চাইতে আর কি বেশী আমার কাম্য থাকতে পারে।

এসব কি বলছো জীবনকৃষ্ণ, আমার যে বড় ভয় করছে ভাই।

ভয়ের কি আছে এতে, প্রেমের জন্য আমাকে ফোর্টের গ্যারিসন অফিসার লেঃ আর্নল্ড-এর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে হবে and I will do it. ডুয়েল আমি লড়বো। যদিও রেবেকার ইচ্ছা নয় যে আমি ডুয়েল লড়ি আর্নল্ড-এর সঙ্গে, কিন্তু তুমি বল শিবনাথ তাই কি হয়! এ তো শুধু পরাজয় নয়—এ যে আমার প্রেমের অপমান!

আর্নল্ড কে?

একজন আর্মী অফিসার—রেবেকাকে সেও ভালবাসে and wants to marry her—তাকে বিবাহ করতে চায়।

আমাকে সব কথা খুলে বল ভাই জীবনকৃষ্ণ। দোহাই তোমার!

জীবনকৃষ্ণ তখন সংক্ষেপে রেবেকা-কাহিনী বিবৃত করে গেল শিবনাথের কাছে।

শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে বসে শুনে গেল।

এখন তুমিই বল—আমি কি ডুয়েল না লড়ে পারি।

কিন্তু তুমি কি কোন দিন পিস্তল ছুঁড়েছো জীবনকৃষ্ণ?

না।

তবে?

কি তবে?

কেমন করে তবে তুমি তার সঙ্গে ডুয়েল লড়বে! ও সবের মধ্যে যেও না—আমি বলি রেবেকাকে তুমি ভুলে যাও।

ভুলে যাবো!

হ্যাঁ, রেবেকা ক্রিশ্চান মেয়ে—অন্য জাত—শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার সব তাদের আলাদা—আমাদের সঙ্গে কোন মিল নেই। তাছাড়া মা বাবার তুমি একমাত্র সন্তান। ভেবে দেখো তুমি যদি অন্য জাতের বিধর্মী একটা মেয়েকে বিয়ে কর তাঁরা কিরকম দুঃখ পাবেন।

শিবনাথ, তুমি তো জীবনে কখনও কাউকে ভালবাস নি তাহলে বুঝতে ভাল যে বেসেছে সে তার জন্য কোন মূল্য দিতেই পেছপাও হয় না। আর তুমি বলছো অন্য জাত—অন্য ধর্ম, কিন্তু দেওয়ানজী কি বলেন জান? জাত-ধর্ম সব মানুষেরই রচনা—ঈশ্বর এক—সেই নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর—তাঁকে উপাসনা করাই মানুষের একমাত্র সত্যধর্ম—the ignorance and superstition—অশিক্ষা ও কুসংস্কারই হিন্দুদের মধ্যে—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এনেছে জাতিভেদ-ধর্মের নামে যত জঘন্য কদাচার আর বুজরুকি—

না, না—ছি, ওকথা বলো না জীবনকৃষ্ণ—ও বলাও মহাপাপ। দেবতা মিথ্যা—ঐ কালীঘাটের মা কালী মিথ্যা—শিব মিথ্যা—কৃষ্ণ মিথ্যা—

হো হো করে হেসে ওঠে জীবনকৃষ্ণ, মিথ্যা, মিথ্যা—সব মিথ্যা কল্পনা—দেখছো না আজকালকার ছেলেরা উপনয়নের সময় উপবীত ধারণ করছে না, কেউ সন্ধ্যা-আহ্নিক আর করে না—ডিরোজিও taught us the evil effects of idolatry and superstition—truth is our mottow—we denounce the Hindu religion as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational being.

শিবনাথ যেন একেবারে বোবা।

এসব জীবনকৃষ্ণ কি বলছে! হিন্দুধর্মকে তারা vile ও corrupt বলছে—তবে তো সে যা কিছুদিন আগে শুনেছিল—বৃন্দাবন ঘোষাল বলছিল, ডিরোজিও

ছেলেদের বলে, ঈশ্বর নেই, ধর্মাধর্ম নেই, পিতামাতাকে মান্য করা কোন কর্তব্যই নয়, ভাই বোনে নাকি বিবাহ হওয়াতেও কোন দোষ নেই—তবে তো সে মিথ্যা বলে না!

সব সত্যি।

যাক ওসব কথা যেতে দাও শিবনাথ—আগামী পরশু আমি লেঃ আর্নল্ড-এর সঙ্গে বেলভেডিয়ারে ডুয়েল লড়তে যাবো, তুমি থাকবে আমার সঙ্গে।

আমি!

হ্যাঁ—একজন বন্ধুকে থাকতে হয় সঙ্গে।

কিন্তু—

তাছাড়া তুমি না গেলে ধর যদি আমার মৃত্যুই হয়, কে সংবাদটা এনে দেবে আমার প্রিয়তমা রেবেকাকে—আমার মা বাবাকে—

কোন কথাই তখন যেন শিবনাথের মাথার মধ্যে প্রবেশ করছিল না। একটু আগে জীবনকৃষ্ণ যে কথাগুলো বললে সেগুলোই তার মধ্যে তখনো তোলপাড় করে ফিরছিল।

সে বলে, আচ্ছা জীবনকৃষ্ণ—

কী?

তুমি একটু আগে যা যা বললে সত্যিই তুমি সে সব বিশ্বাস কর?

মনেপ্রাণে করি। কেন তুমি কর না?

আমি!

হ্যাঁ, তুমি?

প্রশ্নটা এত আকস্মিক ও স্পষ্ট যে শিবনাথ সহসা যেন বুঝে উঠতে পারে না কি জবাব দেবে।

সত্যিই সে যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে যায়।

এবং শিবনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে জীবনকৃষ্ণ বলে, শিবনাথ তুমি আজকের দিনের মানুষ নও। নচেৎ আজকের যে এক নতুন সমাজ ও দেশের শিক্ষিত সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে—দেওয়ানজী রামমোহন, ডেভিড্ হেয়ার ও ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে—তা থেকে তুমি দূরে থাকতে পারতে না।

তাহলে তুমি কি বলতে চাও জীবনকৃষ্ণ আগে আমাদের যা ছিল সবই খারাপ—আমাদের এতদিনকার ধর্ম সমাজরীতি আচার আচরণ—অবিশ্যি অভ্রান্ত সত্য বলে সে-সব কিছুকেই আমি সমর্থন করছি না, কিন্তু—

এতকাল তো বিধাতার ইচ্ছায় সে কেঁদেছে—আজ আর এই সময়ে কাঁদবে কেন!

পায়ে পায়ে এসে দীঘির বাঁধানো রানার উপর বসল গৌরী।

চাঁদের আলোয় বকুল গাছের ছোট ছোট পাতাগুলো মৃদু মৃদু কাঁপছে। কোথায় যেন একটা ঝিঁঝি ডাকছে।

হঠাৎই যেন মনে হয় কথাটা গৌরীর।

যাবার আগে একটিবার দেখা করে লোকটাকে বলে যাবে না!

বলে যাবে না, এ প্রতারণা তুমি আমার সঙ্গে—আমার মায়ের সঙ্গে কেন করলে। ধনীর দুলাল তুমি, এ দুঃখিনী মেয়েটা তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেছিল যে তার এত বড় সর্বনাশটা করলে তুমি।

মাথার উপর দিয়ে একটা রাত-জাগা পাখী বকুল গাছটার ডাল থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল।

দীঘির জলে যেন কি পড়ল, টুপ্ করে একটা শব্দ হলো।

হ্যাঁ—সে যাবে।

রমণীরঞ্জনের সঙ্গে একবার সে দেখা করে যাবে, নিশ্চয়ই বহির্মহলে কাছারি ঘরের পাশের ঘরে শুয়েছে তারা।

সাধারণত মানী অতিথি এলে ঐ ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা এ বাড়িতে হয়ে থাকে।

কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় গৌরী! লজ্জা-অপমানের সীমা হয়তো থাকবে না। কিন্তু যে অপমান যে লজ্জার পঙ্কে সে আজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত তার চাইতে বেশী কি লজ্জা কি অপমান হবে আর।

দুগ্‌গা মা হয়তো বলবেন, ছি ছি, এমনি নষ্টচরিত্রের মেয়ে তুই—পরপুরুষ অতিথির ঘরে মধ্যরাত্রে গিয়েছিলি তুই! আর তোকেই কিনা কন্যা মনে করে আমার ঘরে স্থান দিয়েছিলাম। কলঙ্কিনী, এর চাইতে ও কালা মুখ নিয়ে দীঘির জলে ডুবে মরলি না কেন তুই।

মরবে দুগ্‌গা মা—তাই মরবে গৌরী।

দীঘির জলেই সে আশ্রয় নেবে, কিন্তু তার আগে একটিবার—একটিবার শুধু ঐ প্রতারক লম্পটটার সঙ্গে দেখা করতে চায় গৌরী।

কেন সে গৌরীর এত বড় সর্বনাশটা করল।

গৌরী উঠে দাঁড়াল।

একটার পর একটা দীঘির ধাপ অতিক্রম করে উঠতে লাগল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর নজরে পড়ল—আবছা-আবছা চাঁদের আলোয় ঠিক বকুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে যেন একটা ছায়ামূর্তি।

ছাঁৎ করে ওঠে গৌরীর বুকের ভিতরটা—হঠাৎ একটা অজ্ঞাত ভয়ে যেন সে হিম হয়ে যায়—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি।

আর সেই মুহূর্তেই পুরুষকণ্ঠে একটা প্রশ্ন ভেসে আসে, কে ওখানে?

আর একবার বুঝি চমকে ওঠে গৌরী।

কে গা—কে ওখানে?

গৌরীর বুকের ভিতরটা তখন কাঁপতে শুরু করেছে, শুধু বুকের ভিতরটা কেন—সারাটা দেহই তখন তার কাঁপতে শুরু হয়েছে থর থর করে।

রমণীরঞ্জনের কণ্ঠস্বর।

গৌরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁপতে থাকে। ঘামতে থাকে ঐ ঠাণ্ডাতেও তার সর্বাঙ্গ।

রমণীরঞ্জন দু'পা এগিয়ে আসে।

দুজনে একেবারে মুখোমুখি—মাত্র হাত কয়েকের ব্যবধান দুজনার মধ্যে।

রমণীরঞ্জন আবার বলে, দেখুন কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি, অনুমানে বুঝতে পারছি আপনি মল্লিকবাড়িরই কোন অন্তঃপুরিকা—ঘুম আসছিল না তাই আমি ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে এসে বেড়াচ্ছিলাম, বেড়াতে বেড়াতে এখন আর যে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম সেই ঘরের দরজাটা খুঁজে পাচ্ছি না—কাছারি ঘরের পাশেই যে ছোট ঘরটা সেই ঘরটাতেই আমি ছিলাম—আপনি যদি একটু অনুগ্রহ করে সেই ঘরটা কোথায় দেখিয়ে দেন—

রমণীরঞ্জন একটানা কথাগুলো বলে যায় এবং গৌরীও ইতিমধ্যে আকস্মিক পরিস্থিতিটাকে সামলে নিয়েছিল।

তার আর রমণীরঞ্জনের ঘরে যেতে হলো না, ভগবানই তাকে তার সামনে এনে দিয়েছেন যখন তখন আর বাধা কি।

তার যা বলবার সে তো এই মুহূর্তে এখানেই বলতে পারে।

কিন্তু কি ভাবে, কেমন করে সে তার বক্তব্য শুরু করবে। সোজা স্পষ্ট করেই কি বলবে। তুমি প্রতারক—তুমি হীন লম্পট মিথ্যাবাদী—

কিন্তু কি আশ্চর্য—চেষ্টা করেও কথাগুলো যেন উচ্চারণ করতে পারে না গৌরী। যে আক্রোশ আর ঘৃণায় সেই সকাল থেকে—রমণীরঞ্জনকে দেখা অবধি অন্তরে অন্তরে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল—সেই ঘৃণা আক্রোশই যেন নিঃশেষে কখন ইতিমধ্যে এক সময় সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে।

সে আক্রোশও নেই—সে জ্বালাও নেই বিন্দুমাত্রও যেন মনের মধ্যে কোথাও অবশিষ্ট। তার বদলে যেন একটা দুর্বার তীক্ষ্ণ অযৌক্তিক অন্যায় আকাঙ্ক্ষা বুকটার মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে, যেন বলতে ইচ্ছা করে, ওগো আমি তোমার গৌরী—তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু সেদিন এত বড় প্রতারণাটা কেন আমার সঙ্গে করেছিলে। অসহায় অরক্ষণীয়া এক অভাগিনী দরিদ্র কুলীনকন্যা কি এমন অপরাধ তোমার শ্রীচরণে করেছিল গো।

ওদিকে কোন সাড়া না পেয়ে রমণীরঞ্জন বিব্রত বোধ করে। সে ভাবে বুঝি অন্তঃপুরিকার সামনে ঐভাবে আচমকা এসে তাকে সে বিপদেই ফেলেছে।

তাই সে বুঝি চলে যাবার জন্য পা পাড়ায়।

কিন্তু বাধা পড়ল।

পশ্চাৎ থেকে ডাক শোনা গেল, দাঁড়ান—

চলতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় রমণীরঞ্জন।

দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

বিস্ময়ে অভিভূত যেন রমণীরঞ্জন গৌরীর কথাটা শুনে। ভদ্রমহিলা কি বলছেন। বলে, আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি—

আমি যদিও এই মল্লিকবাড়িতেই থাকি তাহলেও এদের আমি কেউ নই—

তবে আপনি কে? আর আমার সঙ্গে আপনার কি কথাই বা থাকতে পারে, আমি তো আপনাকে চিনি না।

চেনেন আপনি আমাকে।

চিনি আপনাকে?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

মল্লিকপুরের নাম আপনি কখনো শুনেছেন!

মল্লিকপুর?

শোনেন নি নামটা, কখনো যান নি সেখানে?

কে—কে আপনি?

রমণীরঞ্জনের গলার স্বরটা যেন হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

অবিশ্যি আজকের কথা নয়—অনেকগুলো বছর—নয়টা বছর আগেকার কথা, গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে পড়ে—মনে পড়ছে না আপনার?

আ-আপনি—

সহসা মাথার গুণ্ঠন হাত দিয়ে মাথার উপর তুলে দিল গৌরী, ম্লান চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট দেখা যায় গৌরীর মুখখানা।

দেখুন তো—চিনতে পারেন কি না আমাকে!…

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রমণীরঞ্জন গৌরীর মুখের দিকে—মধ্যরাত্রে সে ভূত দেখছে নাকি!

না ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু ভূত নয়, ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্নও নয়—নিষ্ঠুর সত্য—রূঢ় বাস্তব। যার চাইতে আর বড় সত্য হতে পারে না। তাই। সত্যিই গৌরী।

কি, চিনতে পারছেন না এখনো আমাকে—না ভাবছেন এমন অঘটন কি করে ঘটলো, আমি এখানে কি করে এলাম!

রমণীরঞ্জন তখনো নির্বাক—স্তব্ধ—যেন পাথর।

কিন্তু কোন্‌টা আপনার সত্য নাম বলুন তো! সেদিন নয় বছর আগে আমার সাদাসিধে বোকা সরল দাদা গণপতির কাছে যে নামটা আপনার বলেছিলেন সেটাই সত্যি, না আজ এখানে যে নামটা আপনার শুনলাম সেটাই সত্যি।

একটা নিষ্ঠুর জিঘাংসা যেন তখন গৌরীকে পেয়ে বসেছে—তাকে যেন উন্মাদ করে তুলেছে, ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, হিংস্র করে তুলেছে।

একটা ধারালো তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে যেন রমণীরঞ্জনকে একটা উন্মাদ জিঘাংসায় বার বার বিঁধে বিঁধে চলেছে গৌরী।

আর কোন্‌টাই বা আপনার সত্য পরিচয়—সেদিন গণপতিকে যা বলেছিলেন তাই, না আজ এখানে যা শুনলাম সেটাই।

রমণীরঞ্জন তথাপি নিশ্চুপ।

কিন্তু আপনার তো শুনলাম অবস্থা খুবই ভাল তবে সেদিন আমার মায়ের কাছ থেকে চাপ দিয়ে বরপণ হিসাবে অতগুলো টাকাই বা আদায় করে নিয়েছিলেন কেন? কি চুপ করে আছেন কেন! ভাবছেন বুঝি আবার কোন এক নতুন মিথ্যা রচনা করে আমাকে শোনাবেন, আমাকে বোঝাবেন—

গৌরী?

চিনতে পেরেছেন তাহলে আমায়—নামটা তাহলে আজো মনে আছে!

না গৌরী, আজ আর কোন মিথ্যাই তোমাকে বলব না গৌরী—আজ যদি বলতে হয় তো সত্য কথাই বলবো। কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে?

সে কথা জেনে আপনার লাভ কি, নাই বা শুনলেন—

কাছে অকপটে খুলে বলবো, তারপর যদি তুমি আমায় ক্ষমা কর তো—সহধর্মিণীর যোগ্য মর্যাদায় তোমায় গৃহে নিয়ে আসব কিন্তু—এবং সেদিন সমাজ যদি আমাদের ত্যাগ করে তো—সমাজকে ত্যাগ করেই সমাজের বাইরে স্বামী-স্ত্রী আমরা নতুন করে ঘর বাঁধব—কিন্তু অত সুখ ভাগ্যে আমার ছিল না- সে সুযোগ ভগবান আমায় দিলেন না। তোমার সঙ্গে দেখা হলো না। তুমি যে কলকাতায় কোথায় গিয়েছো অনেক অনুসন্ধান করে তাও জানতে পারলাম না—হতাশ হয়ে গৃহে ফিরে গেলাম।

তারপর একটু থেমে আবার বলে রমণীরঞ্জন, আর একটা কথাও তোমার জানা প্রয়োজন—তুমিই আমার একমাত্র স্ত্রী। তোমাকে ছাড়া আর দ্বিতীয় নারী আমার জীবনে আজো পর্যন্ত আসে নি।

গৌরীর সমস্ত শরীরটা তখন টলছে। সমস্ত পৃথিবীটা পায়ের তলায় যেন ঘুরছে।

এ সে কি শুনল।

গৌরী—

গৌরী পড়ে যাচ্ছিল দু'বাহু বাড়িয়ে রমণীরঞ্জন সহসা গৌরীর পতনোন্মুখ দেহটা ধরে ফেলল।

বক্ষের মধ্যে টেনে নিল।

গৌরী তখন জ্ঞান হারিয়েছে রমণীরঞ্জনের বক্ষের ওপরে।

গৌরী, গৌরী—চিৎকার করে ওঠে রমণীরঞ্জন। কিন্তু গৌরীর কোন সাড়া পায় না।

গভীর স্নেহে বক্ষের ওপরে তুলে নিয়ে রমণীরঞ্জন দীঘির রানার উপর গিয়ে গৌরীকে শুইয়ে দিল।

আঁজলা ভরে জল এনে এনে গৌরীর চোখে মুখে দিতে লাগল। কয়েকবার চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিতেই গৌরী এক সময় চোখ মেলে তাকাল। কৃষ্ণা-চতুর্দশীর চাঁদ তখন ঢুলতে ঢুলতে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়েছে।

গৌরী—

কে!

আমি—এখন কেমন বোধ করছো?

ভাল—ক্লান্ত-অবসন্ন ক্ষীণকণ্ঠে গৌরী বলে।

উঠে বসতে পারবে কি? রমণীরঞ্জন শুধায়।

পারব।

চলতে পারবে?

পারব।

তাহলে চল এই মুহূর্তে এখান থেকে আমরা বের হয়ে পড়ি।

কেন?

আমার গৃহে নিয়ে যাবো তোমায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুরেন্দ্র মল্লিকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বাঃ চমৎকার— চমৎকার দত্তমশাই—

কে! চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় রমণীরঞ্জন—প্রাণকৃষ্ণ।

তা এই বুঝি মশাইয়ের রীতি, যাঁর গৃহে রয়েছেন তাঁরই শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করে সেই গৃহের নারীর অমর্যাদা করা।

এ সব কি বলছেন আপনি মল্লিকমশাই-- আপনি জানেন না গৌরী—কথাগুলো বলবার চেষ্টা করে প্রাণকৃষ্ণ, কিন্তু তাকে থামিয়ে দেন সুরেন্দ্র মল্লিক, থামুন—

মল্লিকমশাই শুনুন—গৌরী—

ইতিমধ্যে প্রাণকৃষ্ণর খুল্লতাত রামকৃষ্ণ দত্তমশাই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন—তাঁকে সম্বোধন করে সুরেন্দ্র মল্লিক বলেন—

এই যে দত্তমশাই আসুন, ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না— দেখুন তার কীর্তিকলাপ।

সবই শুনেছিলেন রামকৃষ্ণ দত্ত—ভ্রাতুষ্পুত্রের ঈদৃশ আচরণে তখন তিনি অপমানে লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছেন।

চাপা কঠিন কণ্ঠে ডাকলেন, প্রাণকেষ্ট—

খুড়োমশাই—

ছি ছি, এর চাইতে তুমি গলায় দড়ি দিলে না কেন! এমনি করে দত্তবংশের মুখে, তোমার বাপ পিতামহের মুখে কালি লেপে দিলে!

খুড়োমশাই শুনুন, প্রাণকৃষ্ণ বলে ওঠে, আপনারা যা বুঝেছেন তা ভুল—আমি কোন অন্যায় কাজ করি নি—বংশের মুখেও কালি দিই নি।

এখনো তুমি তোমার দুষ্কর্মের সাফাই গাইবার চেষ্টা করছো! লজ্জা হচ্ছে না তোমার, এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোমার!

শুনুন খুড়োমশাই, শুনুন মল্লিকমশাই—দয়া করে আমার কথাগুলো আপনারা আগে শুনুন— যার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম সে আমার স্ত্রী—সহধর্মিণী—

কি বললে, স্ত্রী—সহধর্মিণী! ব্যঙ্গভরে যেন কথাটার পুনরাবৃত্তি করেন খুড়োমশাই রামকৃষ্ণ দত্ত।

হ্যাঁ, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন—নয় বৎসর আগে গৌরীকে আমি বিবাহ করেছিলাম—গৌরী আমার বিবাহিতা ধর্মপত্নী—গৌরী এদের বল—

কিন্তু গৌরী কোথায়। গৌরী তো নেই। আশেপাশে কোথায়ও নেই তখন। কোথায় গৌরী—কথাটা শেষ হলো না আর প্রাণকৃষ্ণর।

গৌরী—গৌরী—

চিৎকার করে ডাকে প্রাণকৃষ্ণ স্ত্রীর নাম ধরে। কিন্তু কোথায় গৌরী—গৌরী নেই।

আশ্চর্য!

কোথায় গেল গৌরী। ইতিমধ্যে এক ফাঁকে কখন যেন নিঃশব্দে গৌরী গা-ঢাকা দিয়েছে, ওরা কেউ টের পায়নি। কথায় ব্যস্ত, কেউ জানতেও পারে নি।

কিন্তু গৌরী নামটা শুনে সুরেন্দ্র মল্লিকের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কি বললেন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

গৌরী তার বিবাহিতা স্ত্রী?

গৌরী তো ব্রাহ্মণ ঘরের কুলীনকন্যা এবং কুলীন ব্রাহ্মণ স্বামী তার বিবাহের রাত্রেই নিখোঁজ—তাই তো তার স্ত্রী দুর্গার মুখে তিনি শুনেছেন। তাই তো বরাবর জেনে এসেছেন। তবু প্রশ্ন করেন আবার সুরেন্দ্র মল্লিক।

এসব আপনি কি বলছেন মশাই! গৌরী বলে একটি মেয়ে আমার গৃহে আমার গৃহিণীর আশ্রিতা আছে বটে, কিন্তু সে তো এক স্বামী-পরিত্যক্তা কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই আমার স্ত্রী—সহধর্মিণী।

ব্রাহ্মণকন্যা আপনার সহধর্মিণী!

হ্যাঁ।

আপনার কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি হলো নাকি—এসব কি বলছেন—আপনি কায়স্থ আর আপনার স্ত্রী ব্রাহ্মণী—

হ্যাঁ—সবই সত্যি, গৌরী ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও আমার স্ত্রী।

এবার খুড়োমশাই-ই কথা বলেন, কি বলছো তুমি প্রাণকেষ্ট—এসব কি বলছো। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ঠিকই বলছি খুড়োমশাই—নয় বৎসর পূর্বে মল্লিকপুরে একবার গিয়ে নদীর ঘাটে গৌরীকে দেখে মুগ্ধ হই—পরিচয় নিয়ে জানতে পারি সে ব্রাহ্মণকন্যা, গৌরীর রূপে মুগ্ধ আমি তখন, প্রবঞ্চনা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে কুলীন ব্রাহ্মণ যুবক বলে পরিচয় দিয়ে গৌরীকে বিবাহ করি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কথাটা শুনে যেন খুড়োমশাই রামকৃষ্ণ দত্ত ও মল্লিকমশাই দুজনেই যুগপৎ বজ্রাহত হয়ে যান। প্রাণকৃষ্ণ প্রবঞ্চনা করে এক ব্রাহ্মণ কুলীনকন্যার পাণিগ্রহণ করেছে।

নারায়ণশিলা ও পবিত্র অগ্নির সামনে বসে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে এক ব্রাহ্মণ কুলীনকন্যার জাতি ও ধর্ম নষ্ট করেছে।

এও কি সম্ভব!

খুড়োমশাই ক্ষীণকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করেন, তুমি সত্য বলছো প্রাণকৃষ্ণ?

আজ্ঞে—সত্যই বলছি।

তাই কি তুমি বিবাহ কর নি—করতে চাও নি আমাদের সকলের বারংবার অনুরোধ ও উপরোধেও।

আজ্ঞে। একে তো একবার প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এক ব্রাহ্মণ কুলীনকন্যাকে বিবাহ করে মহাপাতক করেছি, আবার বিবাহ করে সেই স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার প্রবঞ্চনা করব—তাই সম্মতি দিই নি।

এসব কথা এতদিন তাহলে আমাদের জানতে দাও নি কেন?

সাহস হয় নি।

ঐ সময় সুরেন্দ্র মল্লিক বলে ওঠেন, মশাই আপনাদের খুড়ো ভাইপোর ঐ সব অবান্তর আলোচনা থামান তো। একটি নিরপরাধিনী ব্রাহ্মণকন্যার যে জাত ও ধর্ম নষ্ট করেছেন তার কি করবেন—

সে ভাবনা আপনাকে না ভাবলেও চলবে মশাই, আমাদের ভাবনা আমরাই ভাবব—খুড়োমশাই বলে ওঠেন এতক্ষণে।

তাই নাকি তা ভাল, ভাল—এখন বোধ হয় সকলে মিলে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করবেন?

রাগে রামকৃষ্ণর সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। শ্লেষভরা কণ্ঠে বলেন, খৃষ্টান হবো কি মুসলমান হবো সে আমরা ভাবব—আপাতত আমার বধূমাতাকে—

কি বললেন, বধূমাতা!

হ্যাঁ—আমাদের বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ—তাকে ডেকে দিন, সসম্মানে তাকে নিয়ে আমরা চলে যাই।

নিশ্চয়ই যাবেন, নচেৎ কি ভেবেছেন সেই ধর্মত্যাগিনী জাতিচ্যুতা মেয়ে-

মানুষটাকে আমার ঘরে আর স্থান দেবো—

ভদ্র ভাবে—সমীহ করে কথা বলবেন মল্লিকমশাই, সে হালিশহরের দত্ত-বাড়ির সম্মানিতা বধূ।

বধূ—বলুন বারবধূ—বারবনিতা—

সাবধান মল্লিকমশাই! রামকৃষ্ণ দত্ত যেন বাঘের মতই গর্জন করে ওঠেন।

চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে—এটা আপনার জমিদারী নয় রামকৃষ্ণ দত্ত - এটা সুরেন্দ্র মল্লিকের গৃহ—কি বলবো আপনি অতিথি, নচেৎ আপনাদের খুড়ো ও ভাইপোর যোগ্য সমাদরই করতাম আমি—এবং যে সমাদর জীবনে কখনো ভুলতেন না।

সে কি আর বুঝতে পারছি না? কি দরের লোক আপনি সে পরিচয় কি পেতে আর আমাদের বাকী আছে—কিন্তু আর সময় নষ্ট করবেন না, যান—আমার পুত্রবধূকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

দেবো—তবে এখানে নয় বাইরে—রাস্তায় যান—

বলে, ভোলা—ভৃত্যের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকলেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

ভৃত্য ভোলা অল্প দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল ছুটে আসে, কত্তাবাবু—

তোর গিন্নীমাকে গিয়ে বল এখুনি গৌরীকে পাঠিয়ে দিতে।

যে আজ্ঞে।

ভোলা ছুটে অন্দরের দিকে অগ্রসর হতেই তাকে আবার ডেকে থামালেন সুরেন্দ্র মল্লিক, শোন, দাঁড়া—

আজ্ঞে—ফিরে দাঁড়াল প্রভুর ডাকে ভোলা।

এঁদের বাড়ির বাইরে বের করে দে—বের করে দিয়ে ভিতরে যা—তোর গিন্নিমার কাছে, কথাটা বলে আর দাঁড়ালেন না সুরেন্দ্র মল্লিক—ওদের দিকে ফিরে তাকালেন না পর্যন্ত। একটা রাজকীয় গাম্ভীর্যে স্থানত্যাগ করলেন।

খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র দুই জনে তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে—কারো মুখেই কয়েকটা মুহূর্ত কোন কথা নেই।

কথা বলে প্রথমে প্রাণকৃষ্ণ, খুড়োমশাই আপনি একটু আগে যা বললেন তা কি সত্য—সত্যই কি গৌরীকে আপনি—

নিশ্চয় গ্রহণ করবো।

কিন্তু সমাজ—

এত বড় সত্যকে সমাজ যদি না মেনে নেয়ই—সে সমাজকে আমি চাই না।

প্রাণকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি রামকৃষ্ণর পদধূলি নিয়ে বলে, আমাকে মার্জনা করুন

খুড়োমশাই, ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক ঘটে গেল—এতকাল পরে যে আবার গৌরীর দেখা পাবো, যে গৌরীকে এত খুঁজেছি কিন্তু পাই নি এবং ভেবেছিলাম সে হয়তো আত্মহত্যাই করেছে, এখানে এমনি ভাবে যে তার দেখা পাবো আমার স্বপ্নাতীত ছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে তোমাকে পাশে না দেখে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি—ভোলাকে ডেকে অনুসন্ধান করতে বলি, ঠিক ঐ সময় সুরেন্দ্র মল্লিক গৃহে ফিরে এসেছে—সেও শোনে কথাটা, তখন সে-ই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাগানে আসে—

কিন্তু এখনো যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না খুড়োমশাই, গৌরীকে সত্যই আপনি নিয়ে যাবেন?

যাবো বৈকি, দত্তবাড়ির জ্যেষ্ঠা বধূ সে—তার স্থান সবার উপরে—

কিন্তু সমাজে কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে—

একটু আগে তো বললাম—তবে হ্যাঁ—একটা গোলমালের সৃষ্টি হবে আমি জানি কিন্তু সে জন্য আমি ভাবি না—ভাবছিও না—ভাবছি ঐ সুরেন্দ্র মল্লিকের কথাই—যদিও ও সহজে হয়তো ভুলবে না ব্যাপারটা—তবে ওরও ভয় আছে—ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সমাজে—নচেৎ ও এত সহজে বধূমাতাকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিত না। তৎসত্ত্বেও আমি ভাবছি অন্য কথা—

কি খুড়োমশাই?

এতদিন বধূমাতা সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অপরিচিত এই সুরেন্দ্র মল্লিকের গৃহে ছিল—সমাজে ওর খুব সুনাম নেই—

না, না—আপনি জানেন না খুড়োমশাই সে আগুনের মতই পবিত্র—

ঠিক ঐ সময় ভোলা ফিরে এলো—সঙ্গে তার মৃন্ময়ী।

অন্তঃপুরে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তখন—কারণ গৌরীকে নাকি অন্তঃপুরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি—পাওয়া যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত দুর্গা দেবীই মৃন্ময়ী আর ভোলাকে এবং একজন দাসীকে বাগানে প্রেরণ করেছেন ভাল করে সর্বত্র গৌরীকে খুঁজে দেখবার জন্য।

বাবুমশাই—

কি রে?

আজ্ঞে গৌরী দিদিঠাকরুনকে তো অন্দরে কোথাও পাওয়া গেল না।

সে কি রে—

আজ্ঞে, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম এতক্ষণ আমরা সকলে, তিনি সেখানে নেই। তাই মা ঠাকরুন পাঠিয়ে দিলেন বাগানটাই ভাল করে আর একবার সন্ধান

নিয়ে দেখতে।

কথাটা শুনে প্রাণকৃষ্ণও যেন হঠাৎ কেমন চমকে ওঠে।

বলে, সেকি! তবে সে গেল কোথায়?

তাই তো ভাবছি আজ্ঞে, ভোলা বলে, অন্দরে তো দিদিঠাকরুন নেই আজ্ঞে—

তবে কি বাগান থেকেই সে কোথাও চলে গেল?

আজ্ঞে তাই বা যাবেন কি করে—এদিক থেকে কোথাও বেরুবার পথ নেই—

তবে—তবে কোথায় গেল গৌরী।

তন্ন তন্ন করে সমস্ত বাগানটা চারজনে মিলে অনুসন্ধান করল, কিন্তু গৌরীকে পাওয়া গেল না।

গৌরী কোথাও নেই।

অন্দরেও নেই, বাগানেও নেই। তবে কোথায় গেল গৌরী!

ইতিমধ্যে ভোরের আলো পূর্বাকাশে দেখা দিয়েছিল। রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত হয়ে প্রত্যূষের প্রসন্ন আলোয় চারিদিক ভেসে ওঠে।

আর সেই আলোতেই প্রথমে নজরে পড়ল প্রাণকৃষ্ণর। ছড়ানো চুল একটা নারীদেহ দীঘির জলে ভাসছে।

ওটা—ওটা কি—কী ভাসছে জলে, ওই যে—

প্রাণকৃষ্ণ চিৎকার করে নিজেই ছুটে গিয়ে দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতরে গিয়ে জলে ভাসমান মৃতদেহটি বুকে করে ডাঙায় তুলে নিয়ে এল। গৌরীর মৃতদেহ।

ওদের বচসার মধ্যে গত রাত্রে কখন যেন এক ফাঁকে ওদের সবার অলক্ষ্যে গৌরী দীঘির জলে গিয়ে ডুবেছে।

শাড়ির আঁচলে দৃঢ়বদ্ধ ভাবে হাত পা বাঁধা।

বুঝতে কষ্ট হয় না, গৌরী আত্মহত্যা করেছে।

দু'চোখে জল ভরে আসে প্রাণকৃষ্ণর, এ তুমি কি করলে গৌরী—এ তুমি কি করলে—

সংবাদটা শুনে দুর্গা দেবীও শেষ পর্যন্ত বাগানে ছুটে আসেন।

তাঁরও দু'চোখের কোল জলে ভরে যায়।

মেয়েটাকে সত্যিই তিনি ভালবেসেছিলেন।

সুরেন্দ্র মল্লিক এক পাশে পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে দুর্গা দেবী বললেন, ওর সৎকারের একটা ব্যবস্থা কর—জবাব দিল প্রাণকৃষ্ণ।

সে বললে, না আমার সহধর্মিণীর শেষকৃত্য আমিই করব—ওর তো কোন সন্তান নেই—সে কাজটুকু যে আমাকেই করতে হবে—স্বামীর শেষ কর্তব্য স্ত্রীর প্রতি।

॥ ২ ॥

মৃন্ময়ী কাঁদছিল।

গৌরীর ঘরে—গৌরীরই শূন্য শয্যাটার উপর শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

এখানে এসে যে গৌরীকেই মনে হয়েছিল তার একমাত্র নির্ভরের জায়গা। মনে হয়েছিল গৌরীর কাছে হয়তো সে কোন পথের সন্ধান পেতে পারে।

কিন্তু সে আশাতরু তার নির্মম ভাগ্যের দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কারো কোন দোষ নেই, এ তারই ভাগ্য।

মনে মনে শিবনাথের ওপরেও কম অভিমান হয় না।

এখানে যদি এমনি করেই ফেলে রেখে যাবে মনে ছিল তার, তবে কেন সে সুন্দর সাহেবের আশ্রয় থেকে তাকে নিয়ে এল।

নিজেই যদি সে তার একটা কোন ব্যবস্থা না করতে পারবে, তবে এমনি করে তাকে পথের মাঝখানে টেনে নিয়ে আসবার প্রয়োজনটা কি ছিল।

সেই যে দুর্গা দেবীর হাতে তাকে তুলে দিয়ে গেল—আর দেখা নেই।

কোথায় গেল কবে আবার আসবে কিছুই বলে গেল না—যাবার আগে একটিবার দেখা পর্যন্ত করে গেল না।

ঠিক আছে, সেও আর জীবনে কখনো শিবনাথের নাম মনের মধ্যে উচ্চারণও করবে না। শিবনাথই যদি তাকে ভুলে থাকতে পারে তো সে-ই বা শিবনাথকে ভুলে থাকতে পারবে না কেন?

শুধু সেই দিনই নয়, তারপর আরো অনেকগুলো দিন একটার পর একটা চলে গেল, শিবনাথ এলো না।

দুর্গা দেবীর ভ্রাতা অনাদিনাথ কিন্তু সেদিনকার অপমানটা ভুলতে পারেন নি। সেদিন ভগ্নীর গৃহ হতে নিদারুণ ভাবে অপমানিত হয়ে রুদ্ধবিষ সর্পের মত ফুঁসতে ফুঁসতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেও মনে মনে সর্বক্ষণ তারপর সংকল্প আঁটছিলেন, কি করে দুর্গার অপমানের জবাব দেবেন তিনি।

শুধু দুর্গা নয়, সুরেন্দ্র মল্লিকও তাকে অপমান করেছে।

সুরেন্দ্র যে কেন তার স্ত্রীর মতে সায় দিয়েছে তাও তিনি জানতেন—নারী-দেহ-লোভী দুশ্চরিত্র সুরেন্দ্র মল্লিক নিজের ভগ্নীপতি হলেও খুব ভাল করেই চিনতেন তাকে অনাদিনাথ।

মনে মনে বহু চিন্তা করে অনাদিনাথ স্থির করেন প্রকাশ্য ভাবে সামাজিক ভাবে সুরেন্দ্র বা দুর্গাকে তিনি জব্দ করবেন না—তা তিনি পারেন না এবং শোভনও হবে না। কারণ যতই দূরে থাকুন না কেন তিনি, ওদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার জের ধরে সমাজ তাঁর গায়েও কালি ছিটোতে ইতস্তত করবে তো না-ই, সেই সঙ্গে ছি-ছিও করবে।

কালি তাঁর গায়েও এসে লাগবে।

কিন্তু সেটা তিনি চান না।

ওরা জব্দ হবে অথচ তাঁর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না এই তিনি চান।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব।

কোন্ পথে অগ্রসর হলে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধি হয়—ওরা বুঝতেও পারবে না অথচ অপমানের প্রতিশোধও নেওয়া হবে।

অপমানের জ্বালায় ফুঁসতে ফুঁসতে সেদিন সুরেন্দ্র মল্লিকের গৃহ হতে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করা অবধি সেই কথাটাই ভাবছিলেন অনাদিনাথ।

হঠাৎ এমন সময় সংবাদটা তাঁর কর্ণগোচর হলো।

গৌরী বলে একটি ব্রাহ্মণকন্যা আশ্রিতা ছিল সুরেন্দ্র মল্লিকের গৃহে, সে নাকি সুরেন্দ্র মল্লিকেরই উদ্যানমধ্যস্থিত দীঘিতে হাত পা পরিধেয় শাড়ির আঁচলে বেঁধে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

গৌরী ছিল স্বামী-পরিত্যক্তা কুলীনকন্যা। শুধু তাই নয় অপূর্ব সুশ্রী যুবতী নারী।

যে সংবাদটা এনেছিল তার দিকে তাকিয়ে আলবোলার নলটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে অনাদিনাথ প্রশ্ন করেন, কিন্তু রাধাকান্ত, এমনটা ঘটলো কেন কিছু শোন নি?

আজ্ঞে, কি সব কেলেঙ্কারি ব্যাপার আছে যেন সব জানতে পারি নি—

কুমোরটুলির অরিন্দম সরকার অনাদিনাথের বিশেষ বন্ধুমানুষ—সে এসেছিল ব্যবসা সংক্রান্তই একটা কাজের পরামর্শের জন্ম অনাদিনাথের গৃহে ঐ সময়। সে ঐখানেই ফরাসের উপর বসে অন্য একটি আলবোলায় তামাক সেবন করছিল।

সে বলে ওঠে, আরে তোমার ভগ্নপতিটিকে তো তুমি বিলক্ষণ চেন হে অনাদিনাথ—স্বামী-পরিত্যক্তা যুবতী কুলীনকন্যা তারই বাগানের মধ্যস্থিত জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে যখন, তখন তো স্পষ্টই ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারা যাচ্ছে হে—

কি বললে ? অনাদিনাথ চকিতে ফিরে তাকালেন অরিন্দম সরকারের দিকে।

কেন হে বোসজা, বক্তব্যটা আমার এতই জটিল নাকি—দুর্বোধ্য নাকি—ঘৃতকুম্ভ অগ্নির কাছে কতক্ষণ থাকে আর বলো।

না, না—

আরে না না—খোঁজ নিয়ে গিয়ে দেখ যা বলছি তাই।

অরিন্দম সরকারের মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনাদিনাথের মনের মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতই সেই সম্ভাবনাটা উদয় হয়েছিল।

অন্ধকারে তিনি আলো দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু যতই হোক নিজের ঘরের কেচ্ছা অরিন্দম সরকারের কাছে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে লজ্জা আছে বৈকি—তাইতেই অনাদিনাথ কথাটা আপাততঃ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। সরকার রাধানাথকে বলেন, তুমি যাও রাধানাথ—

রাধানাথ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে পুনরায় ডাকলেন অনাদিনাথ শোন, রাধানাথ—পাল্কীগাড়ি বের করতে বল আমি একবার বেরুব—

যে আজ্ঞে।

রাধানাথ ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমাকে এবারে একবার উঠতে হবে সরকার মশাই।

তাহলে আমাদের সেই কথাটা ?

কাল পরশু এক সময় হবে'খন—তাছাড়া মহেন্দ্র সাহাকেও একবার চাই যে—

সেও এখন একগলা জলে বোসজা।

অরিন্দম সরকার মুখে কিছু না বলে নিঃশব্দে উঠে চলে গেল বটে, তবে সে রীতিমত ঘুঘু লোক, তার ব্যাপারটা অতঃপর আঁচ করতে অসুবিধা হয় নি।

এত তড়িঘড়ি যে কেন বোসজা তাকে বিদায় করলেন সেটা স্পষ্ট করে সেই মুহূর্তে কিছু বুঝতে না পারলেও এটা বুঝেছিল অরিন্দম সরকার, রাধানাথ আনীত সংবাদটা তাকে বিচলিত করেছে।

কিন্তু সেটা কি !

অনাদিনাথের ভগ্নীপতি—সুরেন্দ্র মল্লিকের গৃহে আশ্রিত এক কুলীন ব্রাহ্মণ-

কন্তার জলে ডুবে আত্মহত্যার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অনাদিনাথকে অতটা বিচলিত করে নি, অতটা চঞ্চল করে তোলে নি।

অনাদিনাথের বিচলিত হওয়া বা চাঞ্চল্যের নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ ছিল।

কিন্তু সেটা কি!

নিজের গাড়ির মধ্যে বসে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে ঐ চিন্তাটাই অরিন্দম সরকারের মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল।

অনাদিনাথ লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি স্বার্থান্বেষী।

নিজের স্বার্থের জন্য করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই মানুষটার। সব পারে—নিকটতম আত্মীয়র গলায় ছুরি পর্যন্ত বসাতে পারে।

খোঁজ নিতে হবে ব্যাপারটার গোপনে, মনে মনে ভাবে সে।

আর ওদিকে অরিন্দম সরকারকে বিদায় দিয়ে অনাদিনাথ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

এখুনি একটিবার যাওয়া প্রয়োজন সুরেন্দ্র মল্লিকের গৃহে।

ভৃত্য এসে সংবাদ দিল গাড়ি প্রস্তুত।

কাছারি ঘর থেকে বের হয়ে অন্দরের দিকে অগ্রসর হলেন অনাদিনাথ—এবং নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে পরিষ্কার একটা ধুতি ও বেনিয়ান পরিধান করে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে কেশপ্রসাধন করছেন, ঐ সময় স্ত্রী কালীতারা কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কালীতারাকে বয়েসের তুলনায় যেন একটু অধিক বয়স্কাই মনে হতো। অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধির জন্য একদা যৌবনকালে যে রূপ ছিল তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আজ আর।

কালীতারার যৌবনকালে একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল, কন্যা-সন্তান। যথাকালে সেই কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে খুব হৈচৈ ও জাঁকজমক সহকারে পাত্রস্থ করেছিলেন অনাদিনাথ। এবং ধনীর ঘরেই কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন।

শ্যামপুকুর অঞ্চলে নীলের দালাল বিখ্যাত ধনী রামকান্ত দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

কন্যা শ্যামাসুন্দরী শ্বশুরালয়েই থাকে এবং চার-পাঁচটি সন্তানের জননী বর্তমানে।

ঐ শ্যামাসুন্দরী ছাড়া কালীতারার দ্বিতীয় আর কোন সন্তান হয় নি। সে কারণে কালীতারার যথেষ্ট আক্ষেপ থাকলেও অনাদিনাথের কিন্তু কোন আক্ষেপই ছিল না।

অনাদিনাথ বলতেন, তা না হয়েছে পুত্র সন্তান, আমাদের নাই হয়েছে। আজকাল পুত্র সন্তান হওয়া মানেই তো চারিদিকে যে সব অপদার্থ দেখি তেমনিই একটা হতো, এত কষ্টের উপার্জিত সম্পত্তি সব নয় ছয় করে দিত!

কালীতারা প্রতিবাদ করেছে, তোমার যত সব অনাসৃষ্টি কথাবার্তা—আজকাল ছেলেরা বুঝি সব অমানুষ হচ্ছে—

তা নয় তো কি! অনাদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গভরে বলে উঠেছেন, তুমি তো ঘরে থাক—চোখে পড়ে না তোমার। কিন্তু অহরহ আমার চোখে পড়ে—বয়েসের প্রতি শ্রদ্ধা নেই—সম্মান নেই, ইংরেজী শিক্ষা করে সব নায়েক—বড় বড় বুলি মুখে সর্বদা আর যত রকমের কুৎসিত ইয়ার্কি। ফিন্‌ফিনে কালোপাড় ফরাসডাঙার ধুতি পরনে, গায়ে মসলিন বা কেমেরিকের বেনিয়ান, বুট জুতো, বাঁকা সিঁথি, দাঁতে মিশি আর চরস গাঁজা মদ্যপান- যত রকমের নেশা—ছি ছি, দেখলে হাড় জ্বলে যায়।

সবাই বুঝি অমন—

সবাই গিন্নী—সবাই—এ যুগের হাওয়া—ইংরেজী শিক্ষার ফল—ঐ দেওয়ানজী রামমোহন—হেয়ার সাহেব আর ঐ ডিরোজিও তিন জনে মিলে দেশটাকে উচ্ছন্নে দিল। ধর্মাধর্ম নেই—আচার-বিচার নেই—পাপ পুণ্য নেই—ঠাকুর দেবতা—মন্দির নেই—হয়েছে সব একেশ্বর। সংস্কৃত—ফারসী সব শিকেয় উঠেছে, ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না হলে নাকি জাতির কোন মুক্তি নেই। হুঁ—মুক্তি নেই—এতদিন আমরা সব নরকে ছিলাম, ওনারা এসেছেন সব আমাদের উদ্ধার করতে!

তা যাই বলো বাপু—ইংরাজী শিক্ষা করাটা এমন খারাপ কি—ঐ তো নবে বলছিল—

নবে মানে ঐ আমার অকালকুষ্মাণ্ড নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রটি—

হ্যাঁ—ও তো বলছিল- খুড়ি—সাহেবরা কত ভাল ভাল কাজ করছে দেশের—কত শেখাচ্ছে।

মুণ্ডু শেখাচ্ছে—শ্রাদ্ধ শেখাচ্ছে—সেই জন্যই তো হতভাগাটাকে একটা আধলাও দিয়ে যাবো না।

তা কাকে দিয়ে যাবে শুনি?

গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব।

তাই যেও।

আমার এত কষ্টের টাকা ঐ অপদার্থ—বিধর্মী—নাস্তিকটাকে দিয়ে যাবো

মনে করেছো তুমি—কখনো না।

ঐ টাকা টাকা করেই গেলে—কিন্তু বলি ভেবেই যদি না কাউকে তো এখনো এত টাকা টাকা করে হেঁদিয়ে মরবার দরকারটাই বা কি?

দেখ গিন্নী, আমার সঞ্চিত অর্থে নজর দিও না বলছি।

আমার আর নজর দিতে হবে না—ঐ টাকাই একদিন তোমায় শেষ করবে দেখ, তখন বুঝতে পারবে।

আসলে নিজের সঞ্চিত অর্থের প্রতি অনাদিনাথের একটা অসম্ভব মমতা ও দুর্বলতা ছিল।

যক্ষের মত অনাদিনাথ সঞ্চিত অর্থের প্রতিটি পয়সা সর্বক্ষণ যেন আগলে আগলে বেড়াতেন এবং সেই সঞ্চিত অর্থ কি ভাবে আরো বেশী হবে সেই চিন্তাই ছিল তাঁর শয়নে স্বপনে জাগরণে বলতে গেলে একমাত্র চিন্তা।

নীল ও রেশমের রপ্তানি ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন অনাদিনাথ। লোকে বলত অনাদিনাথ টাকার কুমীর।

কিন্তু বাইরে থেকে সেটা অনাদিনাথকে দেখে বোঝবার সত্যিই উপায় ছিল না। পরনে সর্বদা হাঁটু পর্যন্ত মোটা খাটো ধুতি আর গায়ে একটা মোটা বেনিয়ান। পায়ে সাধারণ সস্তাদামের এক চর্মপাদুকা।

তাও বাইরে বেরুবার সময় পায়ে গলিয়ে নিতেন অনাদিনাথ পাদুকা জোড়া এবং বেনিয়ানটি গায়ে চড়িয়ে নিতেন।

নচেৎ গ্রীষ্মকালটা বাড়ির মধ্যে উদলা গায়েই থাকতেন এবং শীতকালে একটা মোটা চাদর গায়ে জড়ানো থাকত অধিকন্তু।

ক্ষৌরকারকে পয়সা দিতে হবে এই ভয়ে নিয়মিত ক্ষৌরকর্ম পর্যন্ত করতেন না।

আর কালীতারার স্বভাবটি ছিল স্বামী অনাদিনাথের ঠিক যাকে বলে একেবারে বিপরীত। দান ধ্যান পূজাআর্চায় তার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্বামীর জন্য পারতো না।

অনাদিনাথের মতে ও তো সব অপব্যয়।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে পূজা আর্চার প্রয়োজনটাই বা কি—মন্দিরে যাবার প্রয়োজনটাই বা কি।

ঘরে বসে ভগবানকে ডাক যত খুশি।

আর দান ধ্যান মানেই তো নেহাৎ অপব্যয়। ওতে নাকি মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হন।

প্রথম প্রথম কালীতারা প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিবাদের স্পৃহাটাই যেন তার চলে গিয়েছিল।

তাছাড়া অতিরিক্ত মেদবাহুল্যের জন্য বেশী নড়াচড়াও করতে পারতো না, হাঁপ ধরতো, কষ্ট হতো।

সংসারের এক ধারে চুপচাপ পড়ে থাকতো।

স্বামীর সব কথাই অবিশ্যি তার কানে আসত, সৌদামিনী নামে একটি দাসী ছিল কালীতারার। সে-ই সব সংবাদ যথাসময়ে কালীতারার কানে এনে তুলত।

সে রাত্রে ননদিনী—দুর্গা দেবীর তাদের গৃহে একটি অল্পবয়েসী মেয়েকে নিয়ে আসা ও ধুলো পায়েই ফিরে যাওয়ার কথাটা যথাসময়েই সৌদামিনী কালীতারার কানে তুলে দিয়েছিল।

তারপর সেদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অনাদিনাথ ভগ্নীর গৃহে ছুটে গিয়েছিলেন এবং গম্ভীর কালো মুখ করে ফিরে এসেছিলেন গৃহে, সে সংবাদও পেয়েছিল কালীতারা। এবং সংবাদটা পাওয়া অবধি মনের মধ্যে ছটফট্ করছিল কালীতারা।

স্বামীর চরিত্র তার অবিদিত নয়—কে জানে একমাত্র সহোদরা ভগ্নীর সঙ্গে কি অনর্থ ঘটিয়ে এসেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত মনের উদ্বেগ আর চেপে না রাখতে পেরে শুধিয়েছিল, হ্যাগা—ঠাকুরঝির ওখানে গিয়েছিলে শুনলাম। অনেকদিন ঠাকুরঝি এদিকে আসে না—কেমন আছে সব ?

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় নি। বারুদের মতই ফেটে পড়েছিলেন অনাদিনাথ, তাদের সঙ্গে আজ থেকে জেনো আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই—

সে আবার কেমন কথা ?

যা বলছি তাই মনে রেখো—তারা আমাদের কেউ নয়।

কেন, হলো কি যে হঠাৎ তারা আমাদের পর হয়ে গেল।

শুধু পর নয় গিন্নী, পর থেকেও পর—ওদের নামও আর উচ্চারণ করবে না কখনো মনে থাকে যেন।

আচ্ছা, তোমায় কি ভীমরতিতে ধরেছে এই বুড়ো বয়েসে, কালীতারা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, দুনিয়াসুদ্ধ কারো সঙ্গেই তো সদ্ভাব রাখ নি জীবনভোর,

একমাত্র মায়ের পেটের বোন তার সঙ্গেও—

মায়ের পেটের বোন নয় গিন্নী—শত্রু—

কালীতারা আর অতঃপর কথা বাড়ায় নি। ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেদিনকার রাধানাথের সঙ্গে অনাদিনাথের যে কথাগুলো হয়েছিল সেও সঙ্গে সঙ্গেই সৌদামিনী এসে কালীতারার কানে তুলে দেয়।

সৌদামিনী ঘটনাচক্রে ঐ সময় কাছারি ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল।

সৌদামিনী ছুটতে ছুটতে এসে কালীতারাকে সংবাদটা দেয়, মা ঠাকরুনগো শুনেছো—কত্তাবাবুর বোনের বাড়িতে সাংঘাতিক এক ঘটনা ঘটেছে—

কি—কি ঘটল আবার—

সেখানে যে গৌরী বলে মেয়েটি থাকত—সে জলে ডুবে নাকি মারা গেছে—

সেকি রে—কার কাছে শুনলি কথাটা—

ঐ যে সরকার মশাই, তিনিই বলছিলেন একটু আগে কথাটা কত্তাবাবুর কাছে—

ঐ রাধানাথ?

হ্যাঁ—

তারপর?

কত্তাবাবু শুনে তখুনি বললে গাড়ি বের করতে।

কেন?

তা তো জানি না মাঠাকরুন, দেখলাম কত্তাবাবু ঘরের পানে গেল—

সবে স্নান সেরে এসে কালীতারা ঠাকুরঘরের সামনে মালাটা হাতে নিয়ে বসেছিল—অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল।

স্বামীর শয়নকক্ষে এসে যখন কালীতারা প্রবেশ করল, অনাদিনাথ চর্ম-পাদুকাটা পায়ে গলিয়ে সবে ঘর থেকে বেরুতে যাবেন।

স্ত্রীকে ঐ সময় ঘরে প্রবেশ করতে দেখে অনাদিনাথ ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালেন।

স্পষ্ট বোঝা গেল ঐ সময় স্ত্রীকে সামনে দেখে বিরক্ত হয়েছেন।

হ্যাঁ গা—কালীতারাই প্রশ্ন করে।

কি?

ঠাকুরঝির ওখানে নাকি গৌরী—সেই বামুনের মেয়েটি জলে ডুবে মরেছে!

হ্যাঁ, কিন্তু ঐ সংবাদটি তুমি পেলে কোথায়?

শুনলাম—

তাই তো শুধাচ্ছি কোথায় শুনলে ?

শুনেছি—কিন্তু তুমি বেরুচ্ছো বুঝি কোথাও ?

হ্যাঁ।

কোথায় গো !

যমালয়ে।

বালাই ষাট—কি যে বল ! তা হ্যাঁ গা, বলছিলাম কি—

বলে ফেল।

একটা খবর নিলে হতো না—এই বিপদের সময়—

না।

না কি ! আত্মীয়-স্বজনের বিপদে-আপদে আত্মীয়-স্বজন খবর নেবে না তো কে নেবে—

তারা আমাদের কেউ নয়—কথাটা তোমাকে সেদিন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি না গিন্নী—

রুক্ষ কণ্ঠে কথাগুলো বলেন অনাদিনাথ।

ঠিক আছে, হঠাৎ কালীতারা বলে ওঠে, তুমি না যাও না যাবে, আমি যাবো।

গিন্নী—চিৎকার করে ওঠেন অনাদিনাথ।

কি ?

সেখানে তুমি যাবে না।

না, আমি যাবো।

আমি যেতে মানা করছি তবু তুমি যাবে ?

হ্যাঁ, যাবো !

ও, তবু যাবে ? কি জান তুমি সেখানকার ব্যাপার ?

ব্যাপার আবার কি !

ঐ সুরেন মল্লিক মেয়েটাকে খুন করে দীঘির জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

সেকি !

হ্যাঁ, মেয়েটা নিজে থেকে আত্মহত্যা করেছে সেটাই সকলকে বোঝাবার জন্য—

হ্যাঁ, সেই জন্যই আমি দারোগা সাহেবের কাছে যাচ্ছি—খবরটা দিতে হবে তো—একটা নিরপরাধী অবলা মেয়েকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল—

অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিল কালীতারা তার স্বামীর মুখের দিকে। অত্যন্ত স্বার্থপর—নীচ প্রকৃতির মানুষ তার স্বামী—জানত বরাবরই কালীতারা, কিন্তু মানুষটা যে এতখানি নীচে কখনো নামতে পারে, এমন জঘন্য মনের পরিচয় দিতে পারে—সত্যিই বুঝি ধারণারও অতীত ছিল তার কাছে ব্যাপারটা।

তাই বুঝি চেয়ে ছিল স্বামীর মুখের দিকে কালীতারা।

কথাটা বলে অনাদিনাথ বেরুবার জন্য কক্ষ থেকে দরজার দিকে অগ্রসর হন এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই বিরাট দেহ নিয়ে অকস্মাৎ যেন সচল হয়ে কালীতারা এগিয়ে এসে স্বামীর পথরোধ করে দাঁড়ায়।

কঠিন শান্ত কণ্ঠে বলে কালীতারা, না।

কি না!

অনাদিনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

যেতে দেবে না!

ভ্রূদুটো কুঁচকে যায় অনাদিনাথের, সমস্ত মুখের পেশীগুলো যেন সহসা কঠিন হয়ে যায়।

ঠাকুরজামাইয়ের ওখানে তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

কালীতারা!

বললাম তো, যতই তুমি চোখ রাঙাও না কেন যেতে তোমাকে আমি দেবো না—বিরাট দেহটা দিয়ে যেন নিশ্চল পাহাড়ের মত কালীতারা ঘরের দরজাটা আগলে কথাগুলো বলে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে।

সরে দাঁড়াও গিন্নী, পথ ছাড়ো—

না।

পথ ছাড়বে না?

না।

ছাড়বে না?

না।

মুহূর্তে যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠেন অনাদিনাথ। মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি অগ্নিগর্ভ ও স্থির। মুখে কোনও শব্দ নেই।

কালীতারা যেন দেখেও কিছু দেখে না।

সে বলে, না—এত বড় অন্যায় তোমাকে কিছুতেই আমি করতে দেবো না। জানি না কি অন্যায় কি পাপ গত জন্মে আমাদের ছিল—যে কারণে প্রেতলোকে

একবিন্দু জলের অধিকারীও আমরা হলাম না—একটি পুত্রসন্তান জন্মাল না ; এজন্মেও এত বড় অন্যায়—পাপ তোমাকে আমি করতে দেবো না—

মাগী, তোর স্পর্ধার সীমা নেই দেখছি—চাপা আক্রোশভরা কঠিন কণ্ঠে এতক্ষণে আবার কথা বলেন অনাদিনাথ।

আর কেন—যথেষ্ট তো করলে—এবারে বাকী কটা দিন নোংরা না ঘেঁটে একটু ধম্ম-কম্ম কর—ঠাকুর দেবতাকে ডাক।

মাগী এখনো বলছি পথ ছাড়, নচেৎ খুন করে ফেলব—

তাই—তাই কর গো, তাই কর। আমার গলায় পা দিয়ে আমাকে শেষ করে তোমার যেখানে খুশি যাও—

তাই যাবো—বলে সহসা হাত দুটো বাড়িয়ে ক্ষিপ্ত অনাদিনাথ স্ত্রীর গলাটা চেপে ধরেন এবং এক হেঁচকা টানে কালীতারাকে ঘরের মধ্যে টেনে এনে ঘরের দরজার ভিতর থেকে অর্গল তুলে দেন।

খুনই আজ তোকে করব হারামজাদী—

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কালীতারার কণ্ঠ দু'হাতের দশ আঙুলে নির্মমভাবে চেপে ধরেন অনাদিনাথ পাগলের মত।

কোন প্রতিবাদ করে না কালীতারা।

স্বামীর হিংস্র আক্রমণ থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। সে যেন স্বামীর নিষ্ঠুর হাতের পেষণে শেষবারের মতই নিজেকে সমর্পণ করে।

অনাদিনাথ তখন হিংস্র একটা জন্তু যেন।

আক্রোশে অন্ধ।

কালীতারার গলাটা চাপছেন তো চাপছেনই। জোরে আরো জোরে। এবং দেখতে দেখতে এক সময় কালীতারার বিরাট দেহটা এলিয়ে পড়ে। দুহাতের মধ্যে অনাদিনাথ কালীতারার দেহটা আর ধরে রাখতে পারেন না।

হাত ফস্কে পায়ের কাছে সশব্দে পড়ে যায়।

উন্মাদ একটা জিঘাংসায় তখনো ঠিক পায়ের সামনেই ভূপতিত অসাড় কালীতারার দেহটার দিকে তাকিয়ে আছেন অনাদিনাথ।

চোখের মণি দুটো যেন কালীতারার ঠেলে বের হয়ে আসছে।

ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা কালীতারার কষ বেয়ে নেমে এসেছে।

চেয়ে থাকেন অনাদিনাথ সেই বীভৎস যন্ত্রণাকাতর কালীতারার মুখখানার দিকে। নির্বাক ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকেন।

দাঁড়িয়ে থাকেন নিস্পন্দ ভাবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত।

তারপরই যেন সহসা অনাদিনাথের সম্বিৎ ফিরে এলো।

বিচারবুদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে এলো আবার। ভয়াবহ প্রচণ্ড আক্রোশটা তখন আর অবশিষ্ট মাত্র নেই।

কি হলো—কালীতারা কথা বলছে না কেন! কালীতারা তাঁর পায়ের কাছে অমন করে পড়ে কেন।

ঝুপ্ করে বসে পড়েন অনাদিনাথ ভূপতিত কালীতারার নিস্পন্দ দেহটার সামনে।

চোখ দুটো ঠেলে যেন বের হয়ে আসছে—আতংকে ও দুঃসহ যন্ত্রণায় তার কষ বেয়ে ক্ষীণ একটা রক্তের ধারা।

ধীরে অতি ধীরে যেন আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করলেন কালীতারার কপালটা অনাদিনাথ।

কালীতারা!

অতি সন্তর্পণে আঙুলের ডগা দিয়ে বিস্ফারিত চোখের পাতাদুটো টেনে নামিয়ে ঠেলে আসা রক্তাক্ত চোখের মণি দুটো ঢেকে দিলেন।

বুজে গেল সেই আতংক-বিস্ফারিত চোখের মণি দুটো।

অতি যত্নে—যেন অতি স্নেহে পরিধেয় বস্ত্রের খুঁট দিয়ে কষের রক্তধারাটা মুছে নেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না—লাল একটা দাগ থেকে গেল তবু।

প্রথম যৌবনে কালীতারা সত্যিই সুন্দরী ছিল। যেমন চাঁপার কলির মত গাত্রবর্ণ তেমনি চোখের-মুখের গড়ন। কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর জন্মের পর থেকেই মুটিয়ে যেতে আরম্ভ করলো—দেখতে দেখতে এমনি মুটিয়ে গেল যে চলতে ফিরতেও কষ্ট হতো—হাঁপ ধরত।

ইদানীং মোটা হয়ে গেলেও অস্বাভাবিক গাত্রবর্ণটা কিন্তু তেমনিই ছিল।

গৌরবর্ণ গলদেশে দশ আঙুলের নীল দাগ।

মনে হয় রক্ত জমে আছে যেন।

কিন্তু কি হলো কালীতারার—একেবারে নড়ছে না—যেন পাথরের মত

পড়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি কালীতারা?

ফিস ফিস করে ডাকলেন অনাদিনাথ, যেন কেউ না শুনতে পায়, ঘুমোলে নাকি—ওগো, শুনছো গিন্নী—

সাড়া তো দিল না কালীতারা, চোখও মেলল না। যেমন পড়েছিল তেমনিই পড়ে রইল।

কয়েকগাছি চুল কপালের উপর এসে পড়েছিল, পরম স্নেহে অতি সন্তর্পণে কপালের উপর থেকে সেই চুলগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলেন অনাদিনাথ।

ঠাণ্ডা কপালটা।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠেন ঠাণ্ডা কপালে আঙুলটা ঠেকাতেই অনাদিনাথ।

একি—এত ঠাণ্ডা কেন?

দুহাত দিয়ে কাঁধটা ধরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিলেন অনাদিনাথ। নেই—সাড়া নেই।

কালীতারা কি তাহলে মরে গেল নাকি!

কি সর্বনাশ! কালীতারা মরে গেল!

সভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন অর্গলবদ্ধ ঘরের মধ্যে। কেউ নেই তো কোথাও।

কালীতারাকে কি তাহলে তিনি গলা টিপে হত্যা করলেন।

হত্যা—খুন—

একি করলেন অনাদিনাথ। অন্ধ আক্রোশের বশবর্তী হয়ে ক্ষণিক উন্মাদনায় শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর স্ত্রী—সহধর্মিণী কালীতারাকে গলা টিপে নিজে হত্যা করলেন।

না, না—তা কি হয়—হত্যা করেনে নি তিনি কালীতারাকে। কালীতারা নিশ্চয়ই মরে নি। ঘুমিয়ে আছে।

গিন্নী শুনছো—গিন্নী—

না—সাড়া নেই তো। সাড়াও দিচ্ছে না কালীতারা।

সমস্ত কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে অনাদিনাথের। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে বুকের ভিতরটা যেন হিম-ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

হাত দুটো কাঁপছে কেন। সত্যিই তো—হাত দুটো সামনে মেলে ধরলেন অনাদিনাথ—কাঁপছেই তো হাত দুটো।

আর আঙুলে কিসের লাল দাগ। রক্ত—রক্ত। কালীতারার রক্ত। কালীতারাকে তিনি হত্যা করেছেন।

ভাঙা গলায় পাগলের মতই যেন অস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন দুহাতে মুখ ঢেকে অনাদিনাথ, না, না, না—না—

কালীতারা মরে নি—কালীতারাকে তিনি হত্যা করেন নি।

করিম বক্স থানার দারোগা অনাদিনাথের পরিচিত ব্যক্তি। তার কাছেই তো একটু আগে তিনি যাচ্ছিলেন সুরেন্দ্র মল্লিকের নামে নালিশ জানাতে।

চাপদাড়ি, বেঁটে খাটো লোকটা—গাঁট্টা-গোট্টা ঠিক যেন মা দুর্গার পায়ের তলার শূলবিদ্ধ অসুরটার মত দেখতে। কালো—মিশমিশে কালো গায়ের বর্ণ।

প্রচণ্ড মদ্যপান করে লোকটা—সর্বক্ষণই চোখ দুটো লাল।

সামনের দাঁত দুটো বড় বড়—যেন শুয়োরের দাঁতের মত—বরাহদন্ত।

কি খবর বোস মশাই, হাতে আপনার রক্ত কিসের?

তাড়াতাড়ি হাত দুটো ঘষে ঘষে কাপড়ে মুছতে শুরু করেন অনাদিনাথ, না, না—রক্ত হবে কেন! রক্ত কোথা থেকে আসবে—

হি হি করে হাসছে শয়তানটা।

লোকটার হাসি দেখলে গায়ের মধ্যে যেন কেমন সির সির করে ওঠে অনাদিনাথের।

সত্যি—সত্যিই কি মরে গিয়েছে কালীতারা?

দুহাতে মুখটা তুলে ধরলেন অনাদিনাথ।

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের জীবন-সঙ্গিনী।

জীবন-সঙ্গিনীই বটে—চিরটাকাল পায়ের তলায় চেপে রেখেছেন অনাদিনাথ।

গিন্নী, কথা বলো গিন্নী—কথা বলো—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বন্ধ দরজার কপাটের ওপরে করাঘাত শোনা গেল। সৌদামিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কত্তাবাবু—গাড়ি তৈরি হয়ে এসেছে।

তাড়াতাড়ি এক লাফে উঠে অনাদিনাথ একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে নিজেকে লেপটে দাঁড়াল। দুচোখে আতংক-বিহ্বল দৃষ্টি।

কত্তাবাবু—আবার সৌদামিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কে?

কত্তাবাবু—অ কত্তাবাবু—

কি হবে এখন! কেমন যেন ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে অনাদিনাথ এদিক ওদিক অসহায়ের মত তাকান।

কে যেন কানের একেবারে পাশটিতে ফিস্ ফিস্ করে বলে, পালাও—পালাও। অনাদিনাথ পালাও—তুমি খুনী, হত্যাকারী—

কোথায় যাবেন অনাদিনাথ? দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে দিয়ে কোথায় তিনি পালাবেন।

হঠাৎ মনে পড়ল অনাদিনাথের কথাটা।

ঐ ঘরের মধ্যেই যে পালঙ্ক আছে—যার ওপরে শয্যা বিছানো তারই তলায় পাথর-চাপা সুড়ঙ্গ আছে।

সেই সুড়ঙ্গ দিয়েও সোজা এখুনি চলে যেতে পারেন নীচের তলাকার সেই অন্ধকার ঘরটায়। যেখানে কলসীতে কলসীতে ভরা সারাটা জীবনের সঞ্চয় সোনা-দানা মোহর আর টাকাগুলো সকলের দৃষ্টির অন্তরালে সংগোপনে জমা করা আছে।

দরজায় আবার করাঘাত, আবার ডাক শোনা যায়, কত্তাবাবু—অ কত্তাবাবু—

॥ ২ ॥

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পালঙ্কের তলায় ঢুকলেন অনাদিনাথ।

কেউ জানে না ঐ ঘরের মধ্যে অবস্থিত—ঐ গোপন সুড়ঙ্গপথ ও তার নীচে অন্ধকার ছোট্ট কুঠরীটির সংবাদ।

এমন কি কালীতারাও জানত না।

শিলাখণ্ড সরিয়ে নেমে গেলেন অনাদিনাথ সুড়ঙ্গপথে, এবং হাত দিয়ে শিলাখণ্ডটা ঠেলে ঠেলে সুড়ঙ্গের মুখটা চাপা দিয়ে দিলেন।

যাক্—এবার তিনি নিশ্চিন্ত।

কেউ জানবে না। কেউ ধরতে তাকে আর পারবে না।

আট-দশটি ছোট ছোট ধাপ—তারপরই অন্ধকার ছোট্ট কক্ষটি।

অন্ধকার আর ঠাণ্ডা।

কুলঙ্গীতে ছিল প্রদীপদানে তেলের প্রদীপ ও চকমকি পাথর।

চকমকি পাথর ঠুকে প্রদীপটা জ্বালালেন অনাদিনাথ। কেমন একটা পাণ্ডুর আলোয় কক্ষটি মৃদু আলোকিত হয়ে উঠল।

রূপার কলসভর্তি সব সোনা-দানা মোহর ও টাকা।

সারাটা জীবনের সঞ্চয়। কেউ জানে না।

ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে পড়লেন অনাদিনাথ।

আর কেউ জানতে পারবে না কোথায় আছেন তিনি। একটা দিন অন্ততঃ এখান থেকে তিনি বেরুচ্ছেন না। কাল রাত্রে এক সময় উপরে উঠে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে যাবেন বাড়ি থেকে।

কিন্তু কালীতারার মৃতদেহটা ?

মৃতদেহটা যে ঘরের মেঝেতে এখনো পড়ে আছে, ওরা যদি বিলম্ব দেখে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে।

তাহলেই তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। সর্বনাশ—এ তিনি কি করেছেন !

মৃতদেহটাও সঙ্গে করে এই কক্ষে নিয়ে এলেন না কেন ?

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন অনাদিনাথ।

সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে সুড়ঙ্গর মুখের কাছে গিয়ে দু হাত দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ থেকে শিলাখণ্ডটি সরাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু একি—শিলাখণ্ড তো এক চুলও নড়ছে না !

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে শিলাখণ্ডটি ঠেলে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন যেন পাগলের মতই বারংবার অনাদিনাথ, কিন্তু শিলাখণ্ডটি এতটুকু নড়লো না।

অনড়—অচল—বিশ মণ ভার যেন।

আসলে শিলাখণ্ডটি উপর থেকে সংযুক্ত লোহার কড়া ধরে এক পাশ থেকে না টানলে সুড়ঙ্গমুখ থেকে সরান যেত না। এবং শিলাখণ্ডটি সরিয়ে নীচে নেমে কাজ শেষ করে উপরে উঠে গিয়ে বরাবর সেই কড়া ধরেই ঠেলে সুড়ঙ্গমুখে শিলাখণ্ডটি পুনঃস্থাপন করতেন অনাদিনাথ। কিন্তু আজ আর সে উপায় ছিল না।

নীচ থেকে সেটি সরাবার কোন উপায়ই ছিল না।

ততক্ষণে ঘামতে শুরু করেছেন অনাদিনাথ।

সুড়ঙ্গপথের বদ্ধ বায়ুতে শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করেছে।

এ কি হলো—একি সর্বনাশ হলো।

সমস্ত শক্তি দিয়েও তো এক চুল নড়াতে পারছেন না শিলাখণ্ডটি অনাদিনাথ।

উন্মাদের মতই যেন মাথা দিয়ে নীচ থেকে শিলাখণ্ডর গায়ে আঘাত করতে লাগলেন অনাদিনাথ। আঘাতের পর আঘাত।

মাথা কেটে রক্ত পড়তে থাকে।

তবু বিরাম নেই—তবু থামা নেই। আঘাত করছেন তো করছেনই।

ঠুকছেন তো ঠুকছেনই।

রক্তে এক সময় সমস্ত মুখটা ভেসে যায়, মাথাটা ঘুরতে থাকে—শরীরটা টলতে থাকে। কেমন যেন সব অন্ধকার হয়ে যায়।

টলতে টলতে সেই সিঁড়ির উপর ধুপ্ করে বসে পড়েন অনাদিনাথ এবং

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ঐ সিঁড়ির উপরেই লুটিয়ে পড়েন।

সৌদামিনী বন্ধ দরজার গায়ে বার বার ধাক্কা দিয়েও কারো কোন সাড়া পেল না।

কালীতারা বা অনাদিনাথ কারোরই কোন সাড়া পেল না। বন্ধ দরজাও খুলল না।

কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়।

কি করবে ভেবে পায় না। বুকটার মধ্যে কেবল অজ্ঞাত এক অমঙ্গল আশঙ্কায় ও ভয়ে কাঁপতে থাকে।

কি করবে সৌদামিনী, এখন কি করবে।

তারপরই আর কালবিলম্ব করে না সৌদামিনী, ছুটে সোজা একেবারে বহির্মহলে প্রৌঢ় সরকার রাধানাথের কাছে গিয়ে হাজির হয়।

রাধানাথ সবে হিসাবের লাল খেরো খাতাটা নিয়ে বসেছিল। সৌদামিনীকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসতে দেখে শুধায়, কি হয়েছে, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন রে—

সর্বনাশ হয়েছে সরকার মশাই—

সর্বনাশ। চমকে ওঠে রাধানাথ, কি হয়েছে—

তা তো জানি না তবে কত্তাবাবু গিন্নীমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকে সেই যে প্রায় মিনিট কুড়ি আগে দরজা আটকালেন—

তাতে হয়েছে কি—

কি বলছো গো সরকার মশাই, কত্তাবাবু আর দরজা খুলছেন না—অত ডাকাডাকি করলাম—অত ধাক্কা দিলাম দরজায়। দরজা খুলছেন না, কেউ সাড়াও দিলেন না—

সে কি রে—

ততক্ষণে রাধানাথ শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ—সরকার মশাই শিগ্‌গিরী চল গো। আমার বুকটার মধ্যে যেন কেমন কাঁপছে। গিন্নীমাকে এমন ভাবে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো—

চল তো দেখি—

সাধারণত রাধানাথ অন্দরে যায় না কখনও, কিন্তু তখন বুঝি সে কথা তার মনেও আসে না। দ্রুতপদে সৌদামিনীর সঙ্গে অন্দরে গিয়ে হাজির হয়।

সত্যিই ঘরের দরজা বন্ধ।

তখন আবার একপ্রস্থ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করল রাধানাথ, কিন্তু

পূর্ববৎ কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে একজন দুজন করে বাড়ির অন্যান্য দাসদাসীরাও সেই বন্ধ দরজার সামনে এসে ভিড় করেছে।

সবাই আতঙ্কে বিহ্বল, পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

কি হলো, দরজা খুলছে না কেন—সাড়া দিচ্ছে না কেন।

সৌদামিনী বলে, সরকার বাবুগো দরজা ভেঙে ফেলুন, আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে—

রাধানাথ খিঁচিয়ে ওঠে সৌদামিনীকে, তুই থাম তো মাগী—

থামবো কি গো—ওদিকে ঘরের মধ্যে কি হলো কে জানে!

এমন সময় দৈবক্রমে অনাদিনাথের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র নবীনচন্দ্র এসে উপস্থিত।

অনাদিনাথ যে একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র নবীনচন্দ্রকে একেবারে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না তার কারণ ছিল বৈকি।

নবীনচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন কিছুই ছিল না, তেমনি ছিল প্রচণ্ড গাঁজাখোর। সে বৌবাজারে পক্ষীর দলের যে বড় গাঁজার আড্ডাটি ছিল সেই আড্ডায় নিয়মিত যাতায়াত করত ও তাদের একজন বিশেষ সভ্য ছিল।

পক্ষীর গাঁজার আড্ডার নিয়ম ছিল ঐ দলে নাম লেখাবার সময় এক একজনকে এক একটা পক্ষীর নাম দেওয়া হতো এবং গাঁজাতে উন্নতিলাভ সহকারে উচ্চতর পক্ষীর সেই শ্রেণীতে উন্নীত হতো কালক্রমে।

নবীনচন্দ্রের পক্ষীর গাঁজার আড্ডার দলে ঢোকবার সময় নাম পেয়েছিল বা পদ পেয়েছিল কাঠঠোকরার। এবং সর্বক্ষণই তার দলের নিয়মানুযায়ী কাঠঠোকরা পক্ষীর মত "কড়ড় ঠক্" শব্দ করে কথা বলতো ও আশপাশে যে বা যারা থাকত তাদের ঠোকরাত।

নবীনচন্দ্র এসে হাত দিয়ে রাধানাথকে একটা ঠোকর দিয়ে বলে উঠ্‌লো, কড়ড় ঠক্—বলি ব্যাপারটা কি—

এই যে নবীন এসেছো—তোমার খুড়োমশাই আর তাঁর স্ত্রী মানে তোমার খুড়ি যে ঘরে ঢুকে অর্গল দিয়েছেন—দরজাও খুলছেন না সাড়াও নেই—

কড়ড় ঠক্, কেন!

সেই তো বুঝতে পারছি না—

কড়ড় ঠক্, কেন বুঝতে পারছো না রাধানাথ—বলেই আবার কড়ড় ঠক্—এক ঠোকর মারল নবীনচন্দ্র রাধানাথের গায়ে।

রাধানাথ বিরক্ত হয়ে ওঠে, আঃ গেঁজো নেশাখোর—হচ্ছে কি—

কড়ড় ঠক্—খুড়ি ঠাকরুনের কাছে যে আমার কিছু টাকার দরকার—গঞ্জিকার সাধনায় তাহলে আরো উচ্চমার্গে অর্থাৎ কোকিল মার্গে উঠতে পারব তখন আর কড়ড় ঠক্ নয়, কেবল কুহু কুহু কুহু……কুহু, কুহু, কুহু……

রাধানাথের ইচ্ছা হচ্ছিল গেঁজেল নেশাখোরটার গালে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে দূর করে দেয়, কিন্তু তা করে না।

করতে সাহস পায় না, কারণ গিন্নী ঠাকরুনের আবার বিশেষ আদরের ঐ জানোয়ারটি। গিন্নী ঠাকরুনের অত্যধিক প্রশ্রয়েই তো অমন করে বিগড়ে গিয়েছে।

বেশ একটু তিক্ত স্বরেই রাধাকান্ত বলে, শোন হে বাপু, ঐ নেশার ব্যাপারটা একটু ভোল তো—গিন্নী ঠাকরুনকে নিয়ে কত্তাবাবু ঘণ্টাখানেক হলো সেই যে ঘরে ঢুকে অর্গল দিয়েছেন, দরজায় ধাক্কা দিয়ে—গলা ফাটিয়ে ডেকে ডেকেও কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

কড়ড় ঠক্—পাওয়া যাচ্ছে না?

না।

তবে কি আমার চিল ভাইকে বৌবাজারের আড্ডা থেকে ডেকে আনব—সে চিলের মতন যেমন ঠোকর দেয় তেমনি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাতেও পারে। আমাদের দলের কাক ভাই বলে, ওই চিল ভাইয়ের চিঁ ডাকে নাকি মরা মানুষও সাড়া দেয়—যাই, আমি তাহলে তাকেই গিয়ে ডেকে আনি—বলে নবীনচন্দ্র সেখান থেকে প্রস্থান করে।

অপদার্থ! মনে মনে বলে রাধানাথ কিন্তু মুখে প্রকাশ পায় না কিছু। রাধানাথ আর অতঃপর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। শাবল কাটারি এনে দু-তিন জনে মিলে আঘাত দিয়ে গায়ের জোরে দরজা ভেঙে ফেলে। কিন্তু দরজা ভেঙে ভিতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ায়।

গিন্নী ঠাকরুনের নিশ্চল দেহটা মাটিতে পড়ে আছে, কিন্তু কত্তা ঘরের মধ্যে নেই।

॥ ৩ ॥

গৌরীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে মৃন্ময়ী যেন চারিদিক আবার অন্ধকার দেখে। দুর্গা দেবী তাকে তাঁর গৃহে স্থান দিলেও মৃন্ময়ী বুঝতে পেরেছিল দুর্গা দেবী অনেক দূরের মানুষ।

তার নাগালের বাইরে। আশ্রয় তার কাছে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সান্ত্বনা বা নির্ভয় তার কাছে পাওয়া যেতে পারে না।

দুর্গা দেবী আশ্রয়দাত্রী আর সে আশ্রিতা। একজনের অনুকম্পা অন্যজনের কৃতজ্ঞতা—সেখানে মনের স্পর্শ কোথায়।

দুর্ভাবনা গেলেও সেখানে সে নির্ভয় তো নয়।

কিন্তু সেই দুর্গা দেবী যখন গৌরীকে ডেকে তার হাতে মৃন্ময়ীকে তুলে দিয়েছিলেন এবং গৌরী সস্নেহে তার হাতটা ধরে বলেছিল, চল—তখন যেন সত্যিই নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ীর গৌরীর কণ্ঠস্বরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, এতক্ষণ যে সে জলের উপর ভাসছিল অসহায়ের মত সেই ভাসমান দেহটা যেন নিশ্চিন্ত একটা ঠাঁই পেল পায়ের নীচে শক্ত মাটির একটা স্পর্শ পেয়ে।

পরম নির্ভরতা ও নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই মৃন্ময়ী গৌরীর সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল।

তারপর গৌরী যখন বললে, তোর চোখ দেখে যেন মনে হচ্ছে কতদিন তুই ঘুমোস নি—

বড্ড ঘুম পাচ্ছে—মৃন্ময়ী বলেছিল।

সে তো বুঝতেই পারছি তোর চোখ মুখ দেখে। খিদে পায় নি? কিছু খাবি?

না।

কেন—কিছু খেয়ে তারপর ঘুমো—

না।

না কিরে, খালি পেটে ঘুম হয় না—দাঁড়া, বোস তুই, আমি আসছি—

কথাটা বলে গৌরী ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং একটু পরে ফিরে এলো এক বাটি দুধ নিয়ে।

নে—দুধটা খেয়ে নে—

না।

নে—খেয়ে নে—খেয়ে শুয়ে ঘুমো।

অনেক দিন আগেকার একটা মুখ যেন হঠাৎ ঐ সময় চোখের জলে ঝাপ্‌সা দৃষ্টিটা জুড়ে ভেসে উঠেছিল। যে মুখখানি আজো সে ভুলতে পারে নি—তার পিসিমা—সুলোচনার মুখখানা।

স্নেহকরুণ একখানি মুখ। সে মুখের ঠিক আদলটি যেন দেখতে পেয়েছিল

মৃন্ময়ী গৌরীর মুখের ওপরে।

গৌরী নয়। অনেক দিন পরে যেন পিসিমা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে। বলছে, নে, খেয়ে নে দুধটা।

আপত্তি আর করতে পারে নি মৃন্ময়ী—হাত বাড়িয়ে দুধের বাটিটা নিয়ে সাগ্রহে এক চুমুকে দুধটা শেষ করে দিয়েছিল।

সত্যিই ক্ষুধা পেয়েছিল, সে টের পায় নি। দুধটা পান করে শরীরের ক্ষুধার গ্লানিটা যেন পরিতৃপ্ত হলো।

তারপরই শুয়ে চোখ বুজেছিল।

দেখতে দেখতে ঘুমে চোখের পাতা যেন বুজে গিয়েছিল। একটানা তারপর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল।

ঘুম ভাঙল যখন তখন ঘরে গৌরী নেই—সে রন্ধনশালায়।

গৌরীর মুখখানাই মনে মনে ভাববার বুঝি চেষ্টা করছিল ঘুম-ঘুম চোখে শয্যার উপর বসে আর বার বার মনে পড়ছিল পিসিমার মুখখানা।

কতদিন পিসিমাকে দেখে নি।

আর কি এ জীবনে পিসিমার সঙ্গে দেখা হবে। হায় রে—দেখা হলেই বা কি—পিসিমা কি আর তাকে গ্রহণ করবেন!

বিধর্মীর আশ্রয়ে ছিল, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বিধর্মীর অন্ন মুখে তুলেছে, জাতধর্ম তো তার কিছুই নেই। সমাজচ্যুতা সে।

সুন্দরম্—ঐ দানবটাই তার সর্বনাশ করল।

হঠাৎ চমকে ওঠে মৃন্ময়ী—গৌরী টলতে টলতে ঘরে ঢুকছিল ঐ সময়। কিন্তু দরজা পার হয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারল না।

হঠাৎ কেমন যেন ঘুরে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটায় মৃন্ময়ী যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল, তারপরই অস্পষ্ট একটা চিৎকার করে ভূলুণ্ঠিতা গৌরীর সামনে ছুটে যায়।

দু চোখ বোজা।

গৌরীদি—গৌরীদি—চিৎকার করে ওঠে মৃন্ময়ী।

কোন সাড়া নেই গৌরীর।

মৃন্ময়ীর চিৎকারে প্রথমে মোক্ষদা ছুটে আসে ঘরে, কি হলো?

এই দেখ না গৌরীদি পড়ে গিয়ে আর কথা বলছে না—কি হবে?

মোক্ষদা তাড়াতাড়ি গিয়ে দুর্গা দেবীকে ডেকে নিয়ে আসে। দুর্গা দেবীর নির্দেশেই যেন আরো দুজন দাসী ধরাধরি করে গৌরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে

শয্যায় শুইয়ে দেয়।

সাড়া নেই গৌরীর।

মৃন্ময়ীর বুক ফেটে কান্না আসছিল।

গৌরীর চোখে মুখে জল দিয়ে মৃন্ময়ীকেই তার মাথায় বাতাস করতে বলে একসময় আবার দুর্গা দেবী চলে গেলেন।

অতিথিরা আহারে বসেছে—আহারপর্ব তাদের এখনো সমাপ্ত হয় নি।

গৌরীকে চোখ বুজে পড়ে থাকতে দেখে, শিয়রের ধারে বসে বাতাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী ভেবেছিল গৌরী বুঝি ঘুমোচ্ছে।

নিজে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে কখন যে গৌরী তার পাশ থেকে উঠে চলে গিয়েছে বাগানে, তারপর জলে ডুবেছে কিছুই জানতে পারে নি মৃন্ময়ী।

কিন্তু কেন, গৌরীদি জলে ডুবে অমন করে মরতে গেল কেন? কি দুঃখ ছিল গৌরীদির?

তবে কি গৌরীদিও তারই মত দুর্ভাগিনী ছিল।

মনে মনে বার বার বলতে থাকে মৃন্ময়ী, গৌরীদি তুমি এমন করে জলে ডুবে মরলে কেন!

গৌরীর মৃত্যুতে আবার যেন সব ফাঁকা হয়ে গেল মৃন্ময়ীর কাছে। মুহূর্তের জন্ত তার অন্ধকার জীবনে সত্যিকারের একটা আশ্রয়ের আলোর শিখা জ্বলে উঠেই যেন পরক্ষণেই আবার নির্বাপিত হয়ে গেল।

সমস্ত জগৎটাই যেন মৃন্ময়ীর কাছে আবার শূন্য হয়ে গিয়েছে।

এ সময়ে যদি একটিবার শিবনাথের সঙ্গে দেখা হতো, কিন্তু শিবনাথেরও আর দেখা নেই।

দিন কয়েক আগে সেই যে এক রাত্রে শিবনাথ এ বাড়িতে এসে দুর্গা দেবীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে কোথায় চলে গেল আর তার দেখা নেই।

সে মরল কি বাঁচল সে খবরটুকুও তো কই একটিবার শিবনাথ নিল না।

শিবনাথ কি তাহলে তাকে ভুলে গেল!

তাকে ত্যাগ করে গেল!

সবাই তাকে ত্যাগ করেছে যখন শিবনাথই বা ত্যাগ করল না কেন! কি সম্পর্ক শিবনাথের সঙ্গে তার।

কে শিবনাথ, তার কেউ তো নয়।

অন্ধকার দীঘির রানার উপর চুপটি করে বসে বসে কাঁদছিল মৃন্ময়ী। শিবনাথের কথা মনে হচ্ছিল আর অবাধ্য অশ্রু তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছিল নিঃশব্দে।

কত রাত হয়েছে কে জানে!

বকুল গাছের ফাঁক দিয়ে ত্রয়োদশীর যে চাঁদটা দেখা যাচ্ছিল এখন আর সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

একটা মৃদু বায়ুহিল্লোল গাছের পাতা কাঁপিয়ে কয়েকটা শুকনো পাতা দীঘির বুকে ছড়িয়ে দিল।

ক্ষীণ চাঁদের আলো ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দীঘির কালো জলের বুকে পড়ে যেন একটা আলোছায়ার আল্‌পনা এঁকে দিয়েছে।

দীঘির ঐ শান্ত শীতল জলের তলাতেই গৌরীদি সে রাত্রে ডুব দিয়েছিল।

সেও কেন ঐ দীঘির তলাতেই ডুব দিক না।

এ দুঃখের অবসান হোক।

আর পারছে না মৃন্ময়ী—আর পারছে না।

হঠাৎ ঐ সময় একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দে যেন চমকে ওঠে মৃন্ময়ী।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে নজরে পড়ে আবছায়া একটা মূর্তি দীঘির পাড়ে।

সহসা ভয়ে যেন মৃন্ময়ীর বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হিম হয়ে যায়।

ছায়ামূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

কি করবে মৃন্ময়ী ভেবে পায় না। দৌড়বে—পালাবে—চিৎকার করে উঠবে—কি করবে কিছুই যেন বুঝে পারে না।

ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মৃন্ময়ী তখন কাঁপতে শুরু করেছে থর থর করে।

হঠাৎ মনে হয় গৌরীর প্রেতাত্মা নয় তো? রাতের অন্ধকারে দীঘির শান্ত শীতল জলের তলা থেকে উঠে এসেছে?

মাথাটার মধ্যে যেন সহসা কেমন সব কিছু ঘুরে ওঠে। পায়ের তলাকার মাটিটা যেন সরে যাচ্ছে।

পড়ে যায় মৃন্ময়ী এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়ামূর্তিও ছুটে আসে মৃন্ময়ীর সামনে—স্থান-কাল-পাত্র সব কিছু ভুলে।

সে রাত্রে জীবনকৃষ্ণর মুখে তার রেবেকাকে ভালবাসার কাহিনী শুনে

বাকী রাতটুকু আর ঘুমোতে পারে নি শিবনাথ।

রেবেকাকে জীবনকৃষ্ণ ভালবাসে এবং সে কারণে ডুয়েল লড়ে সে রেবেকার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

রেবেকার প্রেমের কাছে তার জীবন তুচ্ছ। হাসতে হাসতে সে প্রাণ দেবে, সেজন্য সে প্রস্তুত।

সেও তো মৃন্ময়ীকে ভালবাসে।

তার মৃন্ময়ী।

আট নয় দিন প্রায় হয়ে গেল সেই যে মৃন্ময়ীকে নরেন্দ্রের মার হাতে তুলে দিয়ে চলে এসেছে আর সে মৃন্ময়ীর কোন খোঁজই নেয় নি।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল বটে নরেন্দ্রের গৃহের সদর দেউড়ি পর্যন্ত, কিন্তু তারপর আর ভিতরে প্রবেশ করতে সাহসে কুলোয় নি। শুধু সাহস নয়, লজ্জা ও সংকোচও সেই সঙ্গে ছিল।

চোরের মত তাই দেউড়ির সামনে থেকে ছুটে যেন পালিয়ে এসেছিল।

তারপর আর এ কয়দিন সেদিকে পাও বাড়ায় নি।

ছি ছি, মৃন্ময়ী কি ভাবছে কে জানে। হয়তো কাঁদছে—তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।...তা তো দেবেই। সেই যে ফেলে চলে এলো তারপর আর একটিবার খোঁজ নিল না।

সে রাত্রে শয্যায় শুয়ে কথাগুলো চিন্তা করতে করতে ও মৃন্ময়ীর কথা ভাবতে ভাবতে বার বার শিবনাথের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

একটা উত্তপ্ত প্রবাহ যেন শরীরের সমস্ত শিরায় উপশিরায় বইতে শুরু করে রক্তস্রোতের সঙ্গে। একটা কুঞ্চন যেন নাভিদেশ থেকে নিম্নে প্রসারিত হতে থাকে।

শিবনাথ আর শুয়ে থাকতে পারল না।

কি এক অন্ধ আকর্ষণে শয্যার ওপরে উঠে বসল। চোখ মুখ জ্বালা করছে—কান দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

চোখে মুখে মাথায় জল দিল বার বার, কিন্তু যন্ত্রণার প্রশমন হয় না। আর সেই সঙ্গে মনে হয় মৃন্ময়ীকে যেন কতদিন দেখে নি।

মৃন্ময়ীকে যে সে এতদিন ভালবেসেছে সে কথাও বুঝি এমনি করে ইতিপূর্বে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে নি শিবনাথ।

মৃন্ময়ীকে দেখবার জন্য, তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্য শিবনাথের সমস্ত মন যেন চঞ্চল অস্থির হয়ে ওঠে অকস্মাৎ।

একটা মুহূর্ত বিলম্ব যেন আর সহ্য হয় না। আর ভাবতে পারে না শিবনাথ। বের হয়ে পড়ল রাস্তায়।

মধ্যরাত্রি।

সমস্ত শহর সুপ্তিমগ্ন।

রাস্তায় জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কেবল দু'একটা কুকুর ওদিক ওদিক বেড়াচ্ছে আর মধ্যে মধ্যে কোন গৃহের আলোকিত কক্ষের ভিতর থেকে বাঈজীর সঙ্গীত ও নূপুরের ধ্বনি শোনা যায়, কিম্বা শোনা যায় সুমধুর বীণার ধ্বনি।

শিবনাথ হেঁটে চলে।

একবারও তার মনে হয় না—এই মধ্যরাত্রে সে-বাড়িতে গিয়ে সে কেমন করে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করলেও মৃন্ময়ীর সঙ্গে কি করে তার দেখা হবে—দেখা হতে পারে।

কেবল মৃন্ময়ীর মুখখানাই সে তখন ভাবছে।

মনের মধ্যে দ্বিতীয় কোন চিন্তা নেই।

মৃন্ময়ী আর মৃন্ময়ী।

সমস্ত চেতনা যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে মৃন্ময়ী।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

আচ্ছন্নের মত যখন মল্লিকবাড়ির দেউড়ির সামনে শিবনাথ এসে দাঁড়াল, দেখল দেউড়ি বন্ধ।

ভিতরে প্রবেশের কোন পথ নেই।

কিন্তু ফিরে গেল না শিবনাথ। অন্ধ আকর্ষণে বাড়িটার চারপাশে ঘুরতে লাগল এবং ঘুরতে ঘুরতেই হঠাৎ এক সময় বাড়ির পশ্চাৎ দিকে এসে মনে হলো—বাড়ির পশ্চাৎভাগে বাগানের যে সামান্য প্রাচীরবেষ্টনী অনায়াসেই তো সেই বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রপশ্চাৎ আর বিবেচনা না করে প্রাচীর-বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করল শিবনাথ।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগানটা।

নানা ধরনের গাছ—আম জাম কাঁটাল ফলসা—নানা ফলের গাছ।

কিন্তু এখানে কেন প্রবেশ করল শিবনাথ !

এখানে কি সে মৃন্ময়ীর দেখা পাবে নাকি। অন্দরের সঙ্গে হয়তো এ বাগানের যোগাযোগ আছে, কিন্তু তাতেই বা কি সুরাহা হবে।

অন্দরের কোথায় কোন্ কক্ষে মৃন্ময়ী আছে তার কিছুই তো শিবনাথের জানা নেই। তাছাড়া এই মুহূর্তে এখানে যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে—তাহলে হয়তো আর রক্ষা রাখবে না।

পিটিয়ে দেহের সব হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

তাছাড়া সে-ই বা কি বলবে তার বন্ধু নরেন্দ্রকে— নরেন্দ্রজননী দুর্গা দেবীকে সে কি বলতে পারবে যে মৃন্ময়ীকে দেখার জন্যই সে অত রাত্রে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে অন্দরে প্রবেশ করেছিল।

সত্যিই তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না।

কিন্তু তাঁরা যদি বলেন, সেজন্য এমনি করে চোরের মত আত্মগোপন করে মধ্যরাত্রে প্রাচীর ডিঙিয়ে কেন এলে !

সদর দিয়ে এলে না কেন ?

দিনের বেলায়ই বা এলে না কেন !

দুর্গা দেবী যদি শেষ পর্যন্ত তার অপরাধে মৃন্ময়ীকে পর্যন্ত গৃহে স্থান না দেন ? তাকেও গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দেন ?

এ সে কি করল !

তবে কি পালিয়ে যাবে ? যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যাবে ?

কিন্তু তাও পারে না শিবনাথ।

এত দূর এত কষ্ট করে এই মধ্যরাত্রে এসে তার মৃন্ময়ীকে একটিবার না দেখেই সে ফিরে যাবে।

না না—তা সে পারবে না।

এক অন্ধ নেশায় যেন বাগানের মধ্যেই সে ঘুরতে লাগল। কেন ঘুরছে কিছুই জানে না, তবু ঘুরতে লাগল। এবং ঘুরতে ঘুরতেই এক সময় দীঘির ধারে এসে উপস্থিত হয়েছিল বকুল গাছটার তলায়।

সেইখান থেকেই অকস্মাৎ সে দেখতে পায় আবছা আলো-আঁধারিতে মৃন্ময়ীকে এবং চিনতেও পারে না। মনে হয় অন্দরের কোন নারীই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সরে পড়বার জন্য কিন্তু তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

মৃন্ময়ী ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সব কিছু ভুলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় ভূপতিত মৃন্ময়ীর কাছে শিবনাথ। স্বপ্নেও তখনো সে ভাবতে পারে নি যে সে অন্য কেউ নয়—সে মৃন্ময়ীই।

যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মধ্যরাত্রে সে পাগলের মত ছুটে এসেছে ঐখানে—সেই মৃন্ময়ীই তার সামনে ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ভূমিতলে পড়ে আছে।

মৃন্ময়ীকে চিনতে পেরে সত্যিই বুঝি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল—বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা মুহূর্তের জন্য শিবনাথ।

আনন্দে উত্তেজনায় সে কেঁদে ফেলেছিল।

কিন্তু তার পরই মৃন্ময়ীর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ীকে বুকে করে নিয়ে এসে দীঘির রানার উপর সযত্নে শুইয়ে দেয়—দীঘি থেকে কোঁচার খুঁট ভিজিয়ে ঠাণ্ডা জল এনে চোখে মুখে বার বার দিতে থাকে মৃন্ময়ীর।

ধীরে ধীরে এক সময় চোখ মেলে মৃন্ময়ী।

মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে ডাকে শিবনাথ, মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ী!

কে?

মৃন্ময়ী তখন ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করে ভয়ে—উত্তেজনায়।

মৃন্ময়ী—আমি—আমি শিবনাথ।

কে?

আমি শিবনাথ। আবার বলে শিবনাথ।

মৃন্ময়ী কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, না তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি হলো!

মৃন্ময়ী—

তু—তুমি—অতি কষ্টে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে কথাটা উচ্চারণ করে মৃন্ময়ী।

হ্যাঁ, আমি। আমি শিবনাথ—

শিবনাথ তুমি—

মৃন্ময়ী যেন আনন্দে উত্তেজনায় এলিয়ে পড়ে আর ঠিক সেই মুহূর্তে সবল দু বাহু বাড়িয়ে শিবনাথ মৃন্ময়ীর টলটলায়মান দেহটা তার ব্যাকুল বক্ষের ওপরে টেনে নেয়।

মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ী!

শিবনাথ।

অধীর আবেগে শিবনাথ মৃন্ময়ীর চোখে মুখে কপালে কেশে বাহুমূলে চুম্বনে চুম্বনে যেন আচ্ছন্ন করে দেয়।

মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী দু চোখ বুজে শিবনাথের বক্ষের ওপরে এলিয়ে দিয়েছে তখন নিজেকে।

তার পর অনেকক্ষণ দুজনা দুজনার বক্ষলগ্ন—কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকে—অবিচ্ছিন্ন—কারো মুখে কোন কথা নেই।

কেবল দুজনা দুজনাকে যেন আপন আপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে।

এবং আরো পরে শিবনাথ ডাকে, মৃন্ময়ী—

শিবনাথ—

আশ্চর্য—তুমি তো জানতে না যে আমি এই সময়ে এখানে আসবো—অবিশ্যি আমি নিজেও জানতাম না যে আসতে পারি—শিবনাথ ফিস ফিস করে কথাগুলো বলে।

জানতাম—মৃন্ময়ী বলে।

জানতে ?

হুঁ।

কি জানতে ?

যে তুমি আসবে।

সত্যি ?

সত্যি।

কেমন করে জানলে মৃন্ময়ী।

আমার মন বলছিল, নচেৎ এমন করে এই রাত্রে একা একা এখানে এসে বসে থাকব কেন।

মৃন্ময়ী যেন আর কিশোরী নেই—রাতারাতি সে যেন এক প্রেমময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রেমে রসে আনন্দে উচ্ছলিত এক নারী যেন মৃন্ময়ী।

আমারও মনে হয়েছিল জান মৃন্ময়ী, শিবনাথ বলে, তোমার দেখা পাবই—কিন্তু আর বোধ হয় থাকা উচিত হবে না, এবারে আমি যাই।

আবার কবে দেখা হবে ?

দেখা হবে—আচ্ছা মৃন্ময়ী—

কি ?

আবার যদি কাল রাত্রেও এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করি !

আসবে—সত্যি আসবে ?

আসবো। তুমি থাকবে তো !

থাকবো।

ভুলো না যেন।

না।

যাই—

এসো।

শিবনাথ যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার ফিরে গেল।

॥ ২ ॥

কালীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

একটি মাত্র পুত্র তাঁর।…

হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন—ইংরাজী শিক্ষা দিয়েছেন, নতুন যুগের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিয়েছেন কিন্তু তাই বলে কিছু একমাত্র পুত্র—বংশধরকে হারাতে পারেন না।

সে যদি অন্যধর্মে আশ্রয় নেয় বা কোন ক্রেস্তানীকে বিবাহ করে সে তো তিনি কিছুতেই হতে দিতে পারেন না।

তাছাড়া গৃহিণী সত্যবতীও অত্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল।

কালীকৃষ্ণ মনে মনে স্থির করেন হরনাথ মিশ্রর কন্যাটি যেমন লাবণ্যবতী—সুশ্রী—পরম কুলীনও এবং গৃহিণীর যখন মনে ধরেছে কন্যাটিকে, তিনি সেখানেই পুত্রের বিবাহ স্থির করবেন অবিলম্বে।

আর দেরি করবেন না।

সত্যবতী ঠিকই বলেছেন—ছেলের বয়েস হয়েছে, এ সময় বিবাহ না দিলে মতিগতি অন্য রকম হয়ে যেতে পারে, তখন যে সবই যাবে।

তবু তো তিনি বলেন নি মিঃ মটের গৃহে পুত্রের যাতায়াতের কথাটা গৃহিণীর নিকট প্রকাশ করে এখনো। বলেন নি মিঃ মটের ভগিনীর ব্যাপারটা।

তাহলে হয়তো সত্যবতী আহারাদিই বন্ধ করে দেবে।

মনে মনে ঠিক করেই কথাটা গৃহিণীর নিকট ব্যক্ত করলেন কালীকৃষ্ণ। বললেন, তাহলে ঐ মিশ্রের কন্যাটির সঙ্গেই তোমার পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করি গিন্নী!

তাই করো—তবে তুমি একটিবার কন্যাটিকে দেখবে না?

তুমিই তো দেখেছো—আবার আমার দেখার কি প্রয়োজন আছে!

না না—তা কি হয়, তুমি একটিবার গিয়ে কন্যাটিকে দেখে এসো।

বেশ। তুমি যখন বলছো যাবো। দেখি যদি পছন্দ হয়—ভাবছি শুভ কাজটা সামনের মাঘেই সুসম্পন্ন করে ফেলব।

এত তাড়াতাড়ি যোগাড়যন্ত্র হবে!

কেন হবে না। খুব হবে।

তবে একটা কথা—

কি বল।

মিশ্র মশাইকে দেনাপাওনা সম্পর্কে কিছু বলো না। দেখে মনে হয়েছে খুব গরীব।

না, না—তুমি কি ক্ষেপেছো গিন্নী, দেনাপাওনা আবার কিসের, আমাদের ঐ একটি মাত্র সন্তান, তার বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূ—এ গৃহের লক্ষ্মীকে আনবো, তার মধ্যে আবার দেনাপাওনা আসবে কেন! শাঁখাসিঁদুর দিয়ে কন্যা-সম্প্রদান করলেই চলবে—

হ্যাঁ—দেবতার ইচ্ছায় আমাদের তো কোন অভাব নেই—

তবে কাল পরশুই যাই একবার, কি বল!

যাবে কেন—কাউকে দিয়ে মিশ্র মশাইকে ডেকে পাঠাও না।

তা মন্দ বল নি। সরকার মশাইকে বলি তাহলে খবর দিতে—

তাই বল।

হরনাথ মিশ্র সংবাদটা পেয়ে পরের দিনই সন্ধ্যার দিকে এসে হাজির কালী-কৃষ্ণের গৃহে।

কাছারি ঘরে কালীকৃষ্ণ সেদিন সন্ধ্যায় একাকীই ছিলেন।

অবিশ্যি ইচ্ছা করেই কালীকৃষ্ণ সেদিন ঘরে কাউকে রাখেন নি। নিত্য-নৈমিত্তিক আড্ডাটা জমতে দেন নি।

সরকার মশাই এসে জানালেন, মিশ্র মশাই এসেছেন।

যাও, যাও—এই ঘরে নিয়ে এসো—না না, শোন অমূল্য, আমি পাশের ঘরে গিয়ে বসছি তুমি তাঁকে সেই ঘরে নিয়ে এসো আর ভৃত্যদের কাউকে বল মিশ্র মশাইকে তামাকু দিতে।

যে আজ্ঞে—

অমূল্যচরণ বের হয়ে গেল।

কাছারি ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে কালীকৃষ্ণ সাধারণতঃ বসেন না।

কখনো কোন গোপন পরামর্শের প্রয়োজন হলে ঐ ঘরে গিয়ে বসেন।

বেশ নিরিবিলি ঘরটি, ঘরটির আরো একটি সুবিধা ছিল—একটি দ্বারপথে অন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

কাছারি ঘর থেকে উঠে কালীকৃষ্ণ পাশের সেই ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করে অন্দরের সেই দরজাপথে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কৈ গো গিন্নী, কোথায় গেলে ?

সত্যবতী ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপূজার সব ব্যবস্থা করছিল। স্বামীর ডাকে বাইরে এসে দাঁড়াল, ডাকছিলে ?

হ্যাঁ, মিশ্র মশাই যে এসেছেন—

বললে তাঁকে কথাটা ? সত্যবতী শুধায়।

না, এখনো বলি নি। তোমার সামনেই বলবো।

ওমা—সে কি গো, আমার সামনে বলবে কি গো। আমি তাঁর সামনে যাবো নাকি!

মৃদু হেসে রহস্য করে কালীকৃষ্ণ গৃহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, তা গেলেই বা ক্ষতি কি—হাজার হোক, হবু বেয়াই তো—

ছি ছি, কি যে বল, লজ্জায় যেন সত্যবতী লাল হয়ে ওঠে।

বলি আর কি। আজকালকার দিনে ওসব কেউ মানে নাকি—যেরকম দিনকাল আসছে কোনদিন দেখবো তোমরাও—ঘরের মেয়েরা বুট জুতো পায়ে দিয়ে কলেজে পড়তে চললে—রসিকতা করে বলেন স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো কালীকৃষ্ণ।

মরণ!

মরণ কি গো—চিরটাকাল ঘরের মধ্যে ঘোমটা টেনে থাকবে নাকি গিন্নী—জ্যাকেট জুতো পর—

আশীর্বাদ কর—যে কটা দিন বেঁচে আছি তাই যেন পারি। তারপর একদিন মাথার সিঁদুর হাতের নোয়া আর তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে হাসতে হাসতে চলে যেতে পারি।

কিন্তু সত্যিই সত্যবতী, লেখাপড়া শিখতে— দেশবিদেশের রাজনীতি বিজ্ঞান সব জানতে তোমার ইচ্ছা করে না ?

না।

করে না!

না। যে জ্ঞান মা-ঠাকুরমার কাছে পেয়েছি, তার পর এখানে এসে শাশুড়ী

ঠাকুরাণীর কাছে পেয়েছি, মেয়েমানুষের পক্ষে তার চাইতে বড় জ্ঞানের জানবার শিখবার আর কিছু আছে নাকি।

তাই বুঝি—তা তাদের কাছ থেকে কি শিক্ষা করেছো সত্যবতী?

কি শিক্ষা করেছি!

হ্যাঁ—

শিক্ষা করেছি তুমিই আমার সমস্ত ধ্যান, জ্ঞান—সমস্ত শিক্ষা—সমস্ত জ্ঞানের সার। তাই তো প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা হতে উঠে তোমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিই—তুমি আমায় আশীর্বাদ কর—

সত্যবতী!

বিস্ময়-বিমুগ্ধ কালীকৃষ্ণ যেন তাঁর দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কোন কথাই তাঁর মুখ ফুটে বের হয় না।

সত্যবতী বলতে থাকে। অপূর্ব—অনির্বচনীয়তায় মধুর কোমল সে কণ্ঠস্বর। আর সমস্ত মুখখানি জুড়ে তার যেন অপূর্ব এক জ্যোতি।

সত্যবতী বলে, সেই তো আমার সমস্ত পুণ্য—সমস্ত তীর্থের ফল। আমার সবার বড় আশীর্বাদ—আমার সমস্ত প্রাণ—সমস্ত ধ্যান—

সত্যবতীর কথাগুলো যেন মধুর এক সুরের মত তাঁর দু'কানের মধ্যে ঝঙ্কার তুলতে থাকে। চেয়ে থাকেন কালীকৃষ্ণ সত্যবতীর মুখের দিকে।

ঠাকুরঘরের প্রদীপের আলোর খানিকটা সত্যবতীর মুখের একাংশে এসে পড়েছিল—তাতে করে সত্যবতীর মুখখানি যেন কিছুটা স্পষ্ট—কিছুটা অস্পষ্ট মনে হয়।

বিস্ময়ের যেন অন্ত নেই।

এই কি তাঁর পরিচিতা স্ত্রী—তাঁর প্রাত্যহিক জীবনসঙ্গিনী।

এই কি সেই নারী যাকে প্রতিমুহূর্তে তাঁর সংসারের সর্বত্র তাকালেই চোখে পড়ে। এই কি সেই নিঃশব্দচারিণী যে সাড়া না দিয়েও প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দেয় সে আছে—তাঁর সমস্ত সংসার জুড়ে। এই বিরাট সংসারটাকে তার ছোট্ট ছুটো হাত দিয়ে—অপূর্ব স্নেহে-মমতায়-প্রীতিতে বিশ্বাসে ও পরম নিশ্চিন্ততায় আগলে রয়েছে সর্বক্ষণ।

এ সংসারের এতটুকু ব্যাপারও যার দৃষ্টিকে এড়াতে পারে না।

সত্যবতী এগিয়ে এসে স্বামীর পায়ের ধুলো নেয়।

কতবার আমাকে তোমার প্রণাম করতে হয় বল তো সত্যবতী—সকৌতুক প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে কালীকৃষ্ণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করেন।

সত্যবতী কোন জবাব দেয় না।

কালীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবেন সত্যি তিনি ধন্য। ভাগ্যবান তিনি—সত্যবতীর মত স্ত্রীরত্ন জীবনে লাভ করেছেন।

সত্যবতী—

বল।

শোন, যে কারণে তোমাকে ডাকতে এসেছিলাম—মিশ্রমশাই এসেছেন—

এসেছেন!

হ্যাঁ—কাছারি ঘরের পাশের ছোট ঘরটা একটু নিরালা সেইখানে অমূল্যকে বলেছি তাঁকে এনে বসাতে।

বেশ তো—

কিন্তু কেন কাছারি-ঘরে না বসিয়ে তাকে কথাবার্তা বলবার জন্য ঐ ঘরে এনে বসাতে বলেছি জান!

কেন?

আমাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হবে তুমি যাতে পাশের ঘরের দরজার আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে শুনতে পাও সেই জন্য—

আমি আবার কি শুনবো?

বাঃ, তা শুনবে বৈকি। ছেলে তো আমার একার নয় গো—তোমারও—তাছাড়া পুত্রবধূ নিয়ে সর্বদা ঘরের মধ্যে থাকবে তুমি—তোমাকেই থাকতে হবে—কুটুম্বকে সেই দিক থেকে তো তোমারই বেশী জানা দরকার—চল—

না, না—ছি।

ছি কি—তোমাকে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

না—লজ্জা করে আমার—

লজ্জার কি আছে আবার এতে—আমার ইচ্ছা নতুন কুটুম্বর সঙ্গে আড়াল থেকে তোমারও কিছুটা পরিচয় হোক।

না গো—

এর মধ্যে আর 'না গো'র কিছু নেই। শোন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বসে আছেন—আমি চললাম—তুমি পাশের ঘরে এসো।

আমাকে যেতেই হবে?

হ্যাঁ—এসো।

কালীকৃষ্ণ আর দাঁড়ালেন না—বহির্মহলের দিকে চলে গেলেন।

সত্যিই সত্যবতীর কথাটা ভাবতেও যেন লজ্জা করছিল। কিন্তু উপায়

নেই—স্বামীর আদেশ।

যেতেই হবে।

হরনাথ মিশ্র ঘরের মধ্যে বিস্তৃত ফরাশের উপর আরাম করে বসে তামাকু সেবন করছিলেন।

কালীকৃষ্ণ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালেন হরনাথ।

প্রণাম বাঁড়ুয্যে মশাই—

প্রণাম।

কালীকৃষ্ণ ফরাশের একপাশে বসতে বসতে বললেন, প্রণাম—তারপর সব কুশল তো মিশ্র মশাইয়ের?

আজ্ঞে—ভগবৎ কৃপায় একপ্রকার চলে যাচ্ছে। আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন—

হ্যাঁ—আপনার সেদিনকার সেই প্রস্তাবটি—

প্রস্তাব?

হ্যাঁ—আপনার একটি বিবাহযোগ্যা সুলক্ষণা কন্যা আছে বলেছিলেন না?

আপনি—

ব্যাপার ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারেন না হরনাথ মিশ্র—তাই শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে কালীকৃষ্ণর মুখের দিকে তাকান।

কালীকৃষ্ণ বলেন, সেই ব্যাপারেই কথাবার্তা কিছু বলবো বলে আমাদের সরকার মশাইকে আপনার গৃহে পাঠিয়েছিলাম।

হরনাথ তখনো চেয়ে আছেন কালীকৃষ্ণর মুখের দিকে।

কালীকৃষ্ণ বলেন, আপনি সে রাত্রে চলে যাবার পর পুত্রের মাতাকে কথাটা বলতে—

কী—কী বললেন তিনি!

তাঁর দেখলাম কোন আপত্তি নেই—মেয়েটি আপনার সুলক্ষণা—গৃহিণীর আমার নাকি পছন্দও হয়েছে—

আমি—আমি এখনো যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না—সত্যিই তাহলে আপনারা আমার মত এক দরিদ্রের কন্যাকে—

ওকথা কেন বলছেন মিশ্র মশাই—শাস্ত্রেই তো আছে স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—ওকথা যেতে দিন—পুত্রের এত শীঘ্র বিবাহ দেবার কথাটা অবিশ্যি ইতিপূর্বে

ভাবি নি—তবে সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান যখন পাওয়া গিয়েছে—তখন শুভকাজটা আমরা সেরেই ফেলবো ভেবেছি।

মহানুভব আপনি বাঁড়ুয্যে মশাই—কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো—

আপনার কন্যাটি যদি আমার ঘরে চাল দিয়ে থাকে তবে অবশ্যই সে এ গৃহে আমাদের পুত্রবধূ হয়ে আসবে। সেজন্য ধন্যবাদ আমার বা আপনার কারো প্রাপ্য নয়। সে কথা যাক—পাকা কথা দেবার পূর্বে আপনার কন্যাটিকে আমি একটিবার দেখতে চাই।

বিলক্ষণ—এ তো অতীব সুখের—আনন্দের কথা, কিন্তু বাঁড়ুয্যে মশাই আপনি রাজা ব্যক্তি আমার মত দীন-দরিদ্রের পর্ণকুটিরে কি যেতে পারবেন?

সে কি কথা। আমার মাকে যখন আপনার গৃহ থেকে আনবো বলে চিন্তা করছি সেক্ষেত্রে আপনার গৃহে আমি যেতে পারব না? নিশ্চয়ই যাবো। সানন্দে যাবো—

হরনাথ মিশ্রের দুচোখের কোলে জল এসে যায়—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

॥ ৩ ॥

ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য কিছু জলপান থালায় করে ঘরে নিয়ে এসে ঢুকল। এবং জলপানের থালাটা হরনাথ মিশ্রের সামনে নামিয়ে রাখল।

কালীকৃষ্ণ বলেন, নিন মিশ্রমশাই, একটু মিষ্টিমুখ করুন।

না, না—এখন আবার এসব কেন—

তা কি হয়—একটু মধুর সম্পর্কের সম্ভাবনা যখন দেখা দিতে চলেছে তখন তার প্রারম্ভ শুধু কি কথাতেই শেষ করা উচিত—ঐ সঙ্গে কিছু মিষ্টি—

ওকথা বলবেন না বাঁড়ুয্যেমশাই, আমার মত একজন দরিদ্রের প্রতি যে অসীম করুণার দৃষ্টি আপনি দিয়েছেন—দেবার আশ্বাস দিয়েছেন, তারপরও মিষ্টান্ন তো অতিরিক্ত—

না না, কি যে বলেন—নিন শুরু করুন—সন্ধ্যাহ্নিক নিশ্চয় শেষ করেই এসেছেন।

তা এসেছি—

তবে আর দেরি করবেন না—নিন শুরু করুন।

হরনাথ আর কি করে মিষ্টান্নের থালা হাতে তুলে নেন।

সাধারণ মিষ্টান্ন নয়, রাজকীয় মিষ্টান্ন।

ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যেরই ইঙ্গিত দেয়।

মিষ্টিমুখ করতে করতেই একসময় হরনাথ প্রশ্ন করেন, আপনি তাহলে কবে যাবেন বলুন?

কবে কি—এসব শুভকার্যে কি বিলম্ব বিধেয়—আগামী পরশুই ভাল দিন আছে—আমার ছুটিও আছে—সকালের দিকেই যাবো।

আগামী পরশু বুধবার—

হ্যাঁ—মঙ্গলের শেষ বুধের উষা—বুধবারই যাবো। গিন্নীর যখন পছন্দ কন্যা আপনার অপছন্দ হবার কিছু নয় তাও আমি জানি। পছন্দ হবেই—তাহলে কিন্তু আমরা আর বিলম্ব করতে চাই না—কটা দিন বাদে সামনের মাসেই কাজ শেষ করতে চাই।

কিন্তু—

ব্যাপারটা বুঝতে পারেন কালীকৃষ্ণ। বলেন, সেজন্য আপনি ভাববেন না মিশ্রমশাই—দাবী-দাওয়া আমাদের কিছু নেই।

তাহলেও—কথায় বলে কন্যা-সম্প্রদান—

হ্যাঁ—শাঁখা সিঁদুর দিয়েই মাকে আমার পুত্রের হাতে সম্প্রদান করবেন—তবে হ্যাঁ, একটা কথা আছে—

আজ্ঞা করুন।

কিছু না—বুঝতেই তো পারছেন—সমাজে—শহরে আমায় দশজনে চেনে জানে—আমার একমাত্র পুত্রের বিবাহ—অলঙ্কারাদি আমিই পাঠিয়ে দেবো—মাকে আমার সেই অলঙ্কারে সাজিয়ে দেবেন।

হরনাথ চুপ করে থাকেন।

কালীকৃষ্ণ বলেন, মনের মধ্যে কোন কিন্তু রাখবেন না মিশ্রমশাই—আপনার কন্যা কি আমারও কন্যা নয়—তাছাড়া সম্পর্ক যখন হতেই চলেছে—

বেশ—তাই হবে।

তবে সেই কথাই রইলো। আগামী বুধবার—

আমি প্রস্তুত থাকবো। তবে আজ উঠি?

আসুন।

আর একপ্রস্থ প্রণামাদির পর হরনাথ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মনটা যেন তাঁর আনন্দে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুনয়নার সত্যিই ভাগ্য আছে দেখা যাচ্ছে। নচেৎ এমন ঘরে সম্বন্ধ হয়।

সুনয়না অপছন্দের কিছু নয়।

সচরাচর অমন সুশ্রী ও সুলক্ষণা কন্যা যে বড় একটা চোখে পড়ে না তা কি হরনাথ জানেন না। তাছাড়া কালীকৃষ্ণ-গৃহিণীর যখন পছন্দ হয়ে গিয়েছে—কর্তারও পছন্দ হবে সে বিষয়ে হরনাথ নিঃসন্দেহ।

সুনয়নাকে অপছন্দ হবে না, হতে পারে না।

কাজেই এ বিবাহ হবে।

কালীকৃষ্ণর দাবি-দাওয়াও নেই যখন তখন সর্ব দিক দিয়েই মঙ্গল।

গৃহে এসে পৌঁছতেই সুলোচনা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায় সাগ্রহে।

কী হলো—ডেকে পাঠিয়েছিল কেন!

তোমার অনুমানই ঠিক বড়বৌ—নয়নাকে তাদের খুব পছন্দ হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ—সে রাত্রে তো সব জানত না—পরে হয়তো গিন্নীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তাই বলছিল—

কি—কি বলছিলো!

একবার সুনয়নাকে দেখতে চায়—যদি পছন্দ হয়ে যায় তো—

সত্যি বলছো!

হ্যাঁ গো।

মা কালী তাই করুন। হবে—নিশ্চয়ই হবে—আর দেখো, পছন্দও তাদের হয়ে যাবে।

তাই তো ভাবছি—

কিছু ভাবতে হবে না। দেখো না কি হয়—গিন্নীর যখন পছন্দ হয়েছে—ও আমি আর ভাবছি না—তবে—

আবার কি তবে!

বলছিলাম বিরাট ধনী—দাবি-দাওয়া—

সেটাই তো আশ্চর্য—কিছু দাবি-দাওয়া নেই তাদের। এমন কি বিবাহের অলঙ্কার পর্যন্ত তারা পাঠিয়ে দেবে—বিবাহের পূর্বে—

বল কি—

তবে আর বলছি কি—যাক শোন, আগামী পরশু বুধবার সকালেই বাঁড়ুয্যে মশাই আসছেন সুনয়নাকে দেখতে।

বুধবার!

হ্যাঁ—আর এও বললেন, পছন্দ হয়ে গেলে সামনের মাসেই শুভ কাজ হতে

পারবে।

আমি যাই—

কোথায়—এত রাত্রে আবার কোথায় যাবে!

মায়ের মন্দিরে যাবো।

মায়ের মন্দিরে?

হ্যাঁ—যা কিছু সব তো মা কালীরই দয়ায়। এখন একটু পরেই শয়ন-আরতি হবে—মাকে প্রণাম করে মানত করে আসি।

বেশ যাও—সুনয়না কোথায়?

সে রন্ধনশালায়—বিকেলের দিকে একটু মাথা ধরেছিল, কিছুতেই আমায় রন্ধনশালায় যেতে দিল না—নিজে গেল—

একটা চাদর গায়ে দিয়ে অবগুণ্ঠন টেনে সুলোচনা বের হয়ে পড়ল মায়ের মন্দিরের উদ্দেশে।

বেশ শীত পড়েছে।

পৌষের মাঝামাঝি সময় তো। এ সময়টা বেশ শীত পড়ে।

আর এই পৌষ মাস এলেই সুলোচনার বহুকাল আগেকার সেই অভিশপ্ত পৌষ মাসটার কথা কেন না-জানি মনে পড়ে যায়।

মনে পড়ে যায় যেন সেই কষ্টিপাথরে গড়া কালো বুক-জোড়া একটি শিশুর কথা।

তার প্রথম ও শেষ সন্তান।

তার গোপাল।

তার কত আরাধনা—কত সাধনায় ধন।

দেবতার পায়ে কত মাথা খোঁটা।

ক'বছর হয়ে গেল।

আজ যদি বেঁচে থাকত—কত বড়টি হতো।

বলিষ্ঠ এক যুবক হতো।

কিন্তু কোথা হতে কি হয়ে গেল।

কোথা থেকে এসে উদয় হলো সেই অভিশপ্ত মানুষটা—মিশ্র গোষ্ঠীর কুলগুরু সর্বেশ্বর পাঠক।

কি নিষ্ঠুর নিদান।

আচ্ছা এমন কি হয় না—

এমন আশ্চর্য কি ঘটতে পারে না। বেঁচেও তো থাকতে পারে সেই শিশু

আজো—হয়তো কোন দৈব উপায়ে সেদিন রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল—

কেউ হয়তো রক্ষা করেছিল সমুদ্রে ভাসমান অজ্ঞান অচৈতন্য তার বুক থেকে।

তারপর হয়তো কোন সহৃদয়া নারী সন্তানের মত তাকে বুকের দুধ দিয়ে মমতায় স্নেহে পালন করেছে।

আরতির ঘণ্টা কাঁসর ও ঢাকের বাদ্যধ্বনি কানে এসে বাজে সুলোচনার।

কখন ইতিমধ্যে মন্দিরের প্রধান প্রবেশ-দ্বারে পৌঁছে গিয়েছে বুঝতে পারে নি।

শীতের রাত, ইতিমধ্যেই মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রায় জনমানবহীন হয়ে গিয়েছে।

স্বল্প অন্ধকারে যেন খাঁ খাঁ করছে।

কেবল এদিক ওদিকে দু'চারজন তীর্থযাত্রীকে দেখা যায়।

মন্দিরাভ্যন্তরের আলো বহির্চত্বরে এসে পড়েছে।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙে সুলোচনার।

এসব সে কি ভাবছিল এতক্ষণ।

মাথামুণ্ডহীন কি সব ভাবছিল।

সে অগাধ অথৈ জলে কারো বাঁচা সম্ভব নাকি—কোথাও একটা নাও দূরে থাক, ক্ষীণতম কোন আলোর শিখাও তো তার চোখে পড়ে নি।

কবে তার সমস্ত কিছুর সলিলসমাধি হয়ে গিয়েছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়ে সে প্রবেশ করল।

দু'চোখে অজ্ঞাতেই বুঝি জলের ধারা নেমেছিল। আঁচল দিয়ে সে অশ্রু মুছে ফেলে সুলোচনা।

নাটমন্দিরের একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারে সুন্দরম্।

দেওয়ানজী রামমোহন তাকে যাই বলুক না কেন—মনের মধ্যে সে কোথায়ও যেন কোন শক্তি পাচ্ছিল না, শান্তি পাচ্ছিল না।

শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় কোন মাটি পাচ্ছিল না।

আমি ক্রিশ্চান নই—বিধর্মী নই—আমি হিন্দু—হিন্দুর পবিত্র রক্তধারা আমার দেহের প্রতি ধমনীতে ধমনীতে—কথাটা চিন্তা করবার মধ্যে যতই কল্পনা-বিলাসের সান্ত্বনা থাক নিজের কাছে নিজের—সমস্ত দুনিয়ার কাছে তার এক কড়াক্রান্তিও মূল্য নেই সেটা বুঝতে আর যারই বাকী থাক, সুন্দরমের ছিল না।

আর যতই সেটা সে বুঝতে পারছিল ততই যেন একটা নিরালম্ব শূন্যতা—

ব্যর্থতার একটা মর্মান্তিক হাহাকার তাকে চারিদিক থেকে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের মত গ্রাস করছিল।

মনের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করছিল।

হারস্বীকার সে করবে না—কিছুতেই না।

সমাজের ঐ মিথ্যা কুসংস্কারের বিধানকে সে কোনমতেই কিছুতেই মেনে নেবে না।

কারণ দেওয়ানজীই তো বলেছেন, ওটা একটা যুগযুগান্তের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের মূল্যের কাছে তার একটুকুও মূল্য নেই।

ঐ কুসংস্কারের ভূতটাকে প্রশ্রয় দিলে সে কাঁধেই চেপে বসবে—কাঁধ থেকে কিছুতেই নামবে না - নামান যাবে না।

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে—দলিত-পিষ্ট করবে।

মিথ্যা—ওর কোন মূল্য নেই।

কিন্তু তাই যদি হবে তো—রাধাকান্ত দেবের দল কথাটা মানতে চাইলেন না কেন—অমন করে ব্যঙ্গভরে হেসে উঠলেন কেন?

রাধাকান্ত - মতিলাল শীল—রামকমল সেন সব মহাশয়—সমাজের তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তো কেউই তাকে গ্রহণ করলেন না।

দেওয়ানজী বললেন. কুসংস্কারের ঐ অন্ধকার মানুষের মন থেকে আমাদেরই দূর করতে হবে—আর তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। অনেক ত্যাগের—অনেক নির্যাতনের, সতীদাহ প্রথার মত এসবও একে একে দেশ থেকে যাবে। দেশের মানুষ বুঝতে পারবে—এতে মানুষের মঙ্গল নেই—মনুষ্যত্বের অবমাননাই কেবল হচ্ছে—মানুষকে ছোটই করা হচ্ছে—

কিন্তু দেওয়ানজীও তো চলে যাচ্ছেন এদেশ থেকে বিলেতে।

তাঁর যাওয়ার সবই নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের অস্ফুট একটা আর্তনাদে চমকে ওঠে সুন্দরম্।

কে?

অন্ধকারে প্রথমটায় ভাল করে নজর পড়ে না সুন্দরমের, তারপরই একটু ভাল করে নজর করতে চোখে পড়ে ব্যাপারটা।

এক নারী তার অল্প দূরে মাটিতে বসে ডান হাতে পায়ের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করছেন।

নারী আর কেউ নয়, সুলোচনা।

মা কালীকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরুতে গিয়ে অন্ধকারে হয়তো

হোঁচট খেয়ে পায়ের আঙুলে ব্যথা পেয়েছে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, কী হলো ম্যাডাম—কী হয়েছে—ব্যথা পেয়েছেন ?

পুরুষের গলা এবং বিদেশী ভাষা একটা অদ্ভুত টানের সঙ্গে বলতে শুনে সুলোচনা বক্তা সুন্দরমের মুখের দিকে তাকায়।

কী হয়েছে ম্যাডাম ?

সুলোচনা কোন জবাব দেয় না।

কেমন যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে—একেবারে প্রায়-নির্জন মন্দিরচত্বরটা তখন তার উপরে অন্ধকার—সামনে দৈত্যের মত কে এক মানুষ—অপরিচিত—সুলোচনা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় বোধ করি সেখান থেকে চলে যাবার জন্যই—কিন্তু পারে না—উঠে দাঁড়িয়ে এগুতে পারে না। একে সেদিন কী একটা ব্যাপারে সুলোচনা উপবাস করেছিল - তখন পর্যন্ত জলটুকুও মুখে দেয় নি, তার উপরে অসহ্য যন্ত্রণায় মাথার মধ্যে তখনো কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল।

হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে যায়।

চারিদিকে যেন হঠাৎ কেমন অন্ধকার হয়ে যায়—জ্ঞান হারায় সুলোচনা।

জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল টলে, কিন্তু সহজ বিচারবুদ্ধিতে অগ্রপশ্চাৎ কোনরকম কিছু বিবেচনা না করেই সহসা বলিষ্ঠ দুবাহু বাড়িয়ে সুন্দরম্ সুলোচনার চেতনাহীন পতনোন্মুখ দেহটা ধরে ফেলে।

কী—কি হলো ম্যাডাম ?

সুলোচনার কোন সাড়া নেই। জ্ঞান হারিয়েছে তখন সে।

হালকা পাখীর পালকের মত সুলোচনার অচৈতন্য অসাড় দেহটা মন্দিরের সামনে চত্বরের ধুলো বালি কাদার মধ্যে পড়ে আছে এলিয়ে—সুন্দরম্ বুঝতে পারে না কি করবে সে অতঃপর।

কি সে করতে পারে। কি তার পক্ষে করা শোভন হবে।

একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দুর ঘরের অপরিচিত মহিলা—তাকে কি স্পর্শ করা তার উচিত হবে।

আশেপাশে অসহায় ভাবে তাকাল সুন্দরম্।

কেউ কোথাও নেই।

একেই শীতের রাত—মন্দিরে অত রাত্রে লোকসমাগম বড় একটা হয় না—সেদিন যারা এসেছিল ইতিমধ্যে তারাও সকলেই চলে গিয়েছে।

অথচ ওকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে যেতেও সুন্দরমের মন চাইছে না।

একদিকে তার এতকালের সংস্কার—একজন ক্রেস্তানের সংস্কার, অন্যদিকে একজন মানুষ হিসাবে—তার কর্তব্যের তাগিদ।

সংস্কারই বড়, না মানুষের মনুষ্যত্ব বড়!

ধর্ম বড়, না প্রাণ বড়!

জাত বড়, না প্রাণ বড়!

সুন্দরম্ যেন আর ভাবতে পারে না।

মনে মনে বলে, মাদার—মাই মাদার—আমার অফেন্স্—অপরাধ নিও না—আই অ্যাম জাস্ট লাইক ইয়োর সান—ক্রেস্তানের ঘরে মানুষ হলেও আমার দেহে হিন্দুর রক্ত, তোমাদেরই মত—আই অ্যাম এ হিন্দু—লাইক ইউ অল—

সুন্দরম্ পরম স্নেহে নীচু হয়ে সুলোচনার অচৈতন্য শিথিল দেহটা মন্দির-চত্বরের ধুলোবালি থেকে বুকের ওপরে তুলে নিল।

তারপর সোজা এগিয়ে চলে গঙ্গার ঘাটের দিকে।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, চোখে-মুখে সর্বাগ্রে একটু জল দেওয়া দরকার। চৈতন্য সম্পাদন করা সর্বাগ্রে দরকার এখন।

শীতের আকাশ সেদিন, কুয়াশার লেশমাত্রও যেন ছিল না।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ঝক্‌ঝকে তারায় ভরা আকাশ।

স্তিমিত তারার আলোয় পৃথিবী যেন চোখ বুজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নাতুরা।

সুলোচনাকে বক্ষে করে সুন্দরম্ গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়াল।

গঙ্গার ঘাটও নির্জন।

কেবল ঐ দূরে শ্মশানে বোধহয় একটা চিতা জ্বলছে। তারই আলোয় রাত্রির অন্ধকার কেমন যেন করুণ বিষণ্ণ মনে হয়।

কল কল ছল ছল গঙ্গা প্রবাহিতা। গঙ্গা বহে চলেছে।

অচৈতন্য সুলোচনাকে গঙ্গার ধারে শুইয়ে রেখে সুন্দরম্ জলের কিনারে এসে দাঁড়াল—ও হোলি গ্যাঞ্জেস—ও হোলি মাদার গ্যাঞ্জেস্—আমার যদি কোন পাপ হয় তো হোক—নরকে যেতেও আমি প্রস্তুত—কিন্তু আই মাস্ট সেভ্ হার—সেভ হার লাইফ্—পরনের ধুতি জলে ভিজিয়ে সুন্দরম্ ফিরে এলো।

জ্ঞান ফিরে আসে নি তখনো সুলোচনার।

চোখে মুখে জল দেয় বার বার সুলোচনার।

সুলোচনার দেহটা নড়ে ওঠে।

আবার জল দেয় সুন্দরম্।

ধীরে ধীরে এবারে সুলোচনা চোখ মেলে তাকায়, আঃ, আমি কোথায়—

মাদার—মাগো—

কে—কে ?

সন্থ ফিরে আসা চেতনায় যেন আচমকা একটা আলোড়ন জাগে সুলোচনার—বোঝা না-বোঝার মত একটা ঝাপসা ঝাপসা অনুভূতি—

কে—কে !

চকিতে মনে পড়ে যায় সুলোচনার, ঐ স্বর তার অপরিচিত নয়—শুনেছিল—কবে যেন কোথায় শুনেছিল।

মাদার—আমি গোপাল—

গো—পা—ল

আর ঠিক সেই সময় একটা দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়—এগিয়ে আসছে গঙ্গার ঘাটের দিকে আর এক পুরুষ-কণ্ঠে ব্যাকুল ডাক শোনা যায়—সুলোচনা—সুলোচনা—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হিন্দু কলেজের কমিটির হিন্দু সভ্যরা একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ডিরোজিওকে আর কলেজের অধ্যাপনার ব্যাপারে নাকি রাখা চলে না। তাহলে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের—বিশেষ করে হিন্দু ছাত্ররা আজ যারা দেশের ভবিষ্যৎ—তাদের একেবারে সর্বনাশ হবে।

সভা ডাকা হলো।

হিন্দু সভ্যদের মুখপাত্র হলেন রামকমল সেন মহাশয়।

মহামতি ডেভিড হেয়ার ও ডাঃ উইলসন ঐ সভায় ছিলেন—তাঁরা শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টাই করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোন যুক্তিই কেউ শুনলেন না—ডিরোজিওকে পদচ্যুত করাই স্থির হলো।

ডিরোজিও সানন্দেই যেন কমিটির নির্দেশ মেনে নিলেন।

ইতিমধ্যে দেওয়ানজী খ্রীষ্টীয় মিশনারী আলেকজেণ্ডার ডফ্‌কে তাঁর নিজের প্রতিভূ হিসাবে তাঁর যাবতীয় কাজের ভার মিঃ ডফের ওপরে ন্যস্ত করে বিলাত চলে গিয়েছিলেন। এবং সমাজের নেতৃস্থানীয়রা তাঁরও বিরুদ্ধে প্রচারকাজ শুরু করেছিলেন, কলেজের তরুণ ছাত্রেরা যাতে করে মিঃ ডফ্‌ ও ডিয়ালট্রির বক্তৃতা শুনতে না যায় সে বিষয়ে আদেশ প্রচার করতেও কসুর করেন না।

চারিদিক থেকে সবাই ছি ছি করতে লাগল অবিশ্যি, কিন্তু তাতে করে দেশের তরুণদের মনে ভাঙন ধরে নি সেদিন।

বরং তারা যেন এক নতুন আলো—নতুন দিশার সন্ধান পেয়েছিল।

পুরাতনকে ভেঙে তছনছ করে এক নতুন সমাজ—নতুন দৃষ্টিভঙ্গি—নতুন চেতনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

ডিরোজিও কিন্তু অলস ভাবে বসে থাকেন নি চাকরি ছেড়ে দিয়ে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া নামে একটা নতুন দৈনিক সংবাদপত্র বের করে নতুন উৎসাহে নতুন উদ্যমে দেশের তরুণ সমাজকে চেতনার পথে চালিত করতে লাগলেন।

তরুণের দল ডিরোজিওকে সত্যিই অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল।

সেই ভক্ত তরুণের দল তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে শহরের আকাশবাতাস মুখরিত করে তুলল। এবং সে দলে ছিল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি – পরবর্তীকালের চিরস্মরণীয়ের দল।

কিন্তু সে তো আরো পরের কথা। এবং শুধু যে সেদিন দেওয়ানজী রাজা রামমোহন, মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার ও ডিরোজিও প্রভৃতির সযত্ন প্রচেষ্টাতেই দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে নতুন একটা চেতনা ও শিক্ষার ঢেউ এসে লেগেছিল তাই নয়—স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আরো একটা চেতনার উদয় হয়েছিল—ছেলেদের মত মেয়েদেরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা।

প্রথমে অবিশ্যি মতভেদ দেখা দেয়।

পর্দানশীন অসূর্যম্পশ্যা কুললনাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনটাই বা কি—কেতাবী শিক্ষায় তাদের কি এমন উপকার হবে।

তারা ঘরের কাজ শিখুক—স্বামী-সেবা করুক—সংসার কেমন করে চালাতে হয়—সন্তান-সন্ততিদের কেমন করে পালন করতে হবে এই শিক্ষাই যদি তারা ঘরে বসে মা দিদিমা ঠাকুমাদের কাছ থেকে শিক্ষা করতে পারে তবেই তো যথেষ্ট—দু পাতা বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত লেখাপড়া করে কি এমন চতুর্বর্গ ফলটা লাভ হবে তাদের, কিন্তু সেদিন বিপক্ষ দলের মতকে খণ্ডন করেছিলেন নানা যুক্তি দিয়ে এমন একটি লোক যিনি রাজা রামমোহন প্রভৃতির দলের বিরুদ্ধতাই করে এসেছেন বরাবর, রাধাকান্ত দেব মহাশয়।

তিনি সোসাইটির অন্যতম ক্ষমতাশালী সভ্য ছিলেন—তিনিই সেদিন স্ত্রী-শিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

যার ফলে স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ কোন কোন পাঠশালাতে ছেলেদের সঙ্গে

মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এবং ক্রমশঃ দেশে মিঃ জোন্স ও পিয়ারসেস সেমিনারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহিলাদের প্রচেষ্টায় 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র পত্তন হয়।

পরে ইংলণ্ড থেকে ঐ ব্যাপারে মিস্ কুক্ এদেশে আসেন।

মিস্ কুক্ মিশনারী সাহেব মিঃ উইলসনকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর ও লেডি আমহার্স্টে'র প্রচেষ্টায় বেঙ্গল লেডিস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়।

শিবনাথ জীবনকৃষ্ণর মুখ থেকেই ঐ সব ব্যাপার জেনেছিল। এবং এও শুনেছিল জীবনের মিস্টার ও মিসেস্ উইলসনের সঙ্গে পরিচয় আছে।

মৃন্ময়ী সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ এক সময় শিবনাথের মনে হয়েছিল মৃন্ময়ীকে ঐভাবে বসিয়ে না রেখে যদি লেখাপড়া শেখানো যায় তো কেমন হয়।

দেশের এত বড় একটা চেতনার কোন সাড়াই মৃন্ময়ীকে স্পর্শ করে না, মৃন্ময়ীর মনটা সেই যুগযুগান্তের কুসংস্কারের অন্ধকারেই আবদ্ধ থেকে যাবে—তাই বা কেন।

তাই সেদিন সে মল্লিকবাড়ি থেকে গৃহে ফিরবার পথে মনঃস্থির করে ফেলে। আর নয়, কালই সে মিস্টার ও মিসেস্ উইলসনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে—বলবে মৃন্ময়ীর কথা তাদের।

পরের দিন প্রত্যুষেই শিবনাথ জীবনকৃষ্ণের একটা পরিচয়পত্র নিয়ে গিয়ে মিসেস্ উইলসনের সঙ্গে দেখা করল।

মিসেস্ উইলসন সব শুনে খুশিই হন।

নিশ্চয়ই—কালই নিয়ে এসো—আমাদের নতুন স্কুলে তাকে ভর্তি করে নেবো।

কিন্তু কোথায় সে থাকবে?

কেন ইচ্ছা করলে আমাদের কাছেই সে থাকতে পারে।

শিবনাথ সানন্দে রাজী হয়ে চলে গেল। এবং সেই রাত্রেই আবার মৃন্ময়ীর সঙ্গে শিবনাথ দেখা করল বাগানে দীঘির ধারে।

শিবনাথ, কেন যেন আমার মন বলছিল আজই আবার তুমি আসবে।

তোমার ব্যবস্থা আমি করেছি মৃন্ময়ী, তাই এলাম—শিবনাথ বলে।

ব্যবস্থা!

হ্যাঁ।

কী ব্যবস্থা?

তুমি লেখাপড়া করবে—

খুব ভাল—আমার লেখাপড়া করবার খুব ইচ্ছা।

সত্যি?

সত্যি।

তবে এখুনি চল।

কোথায়!

চলই না দেখবে।

কিন্তু—

দেরি করো না—চল।

কিন্তু দুর্গা মাকে না বলে—

না—কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। চল এখুনি বের হয়ে পড়ি আমরা।

শিবনাথ সে রাত্রে মৃন্ময়ীকে এতটুকু ভাববারও অবকাশ দেয় নি এবং পাঁচিল ডিঙিয়ে মৃন্ময়ীকে নিয়ে শিবনাথ রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে দুজনে গিয়ে হাজির হয় উইলসনের গৃহের দরজায়।

ডাকাডাকিতে উইলসন দম্পতির ঘুম ভেঙে যায়।

তাঁরা বাইরে আসেন।

শিবনাথ, What's the matter—উইলসন শুধান, কি ব্যাপার—এত রাত্রে এ সময়ে—

মৃন্ময়ীকে নিয়ে এসেছি।

Who is she—কে সে!

মিসেস্ উইলসনই তখন বলেন—ঐ যে গো—যে মেয়েটির কথা আজ শিবনাথ বলে গিয়েছিল।

I see—তা বাইরে কেন—এসো, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা—ভিতরে এসো—come inside।

ঘরের ভিতরে এসে বসবার পর মিসেস্ উইলসন বলেন, দেখ শিবনাথ, তখন তাড়াতাড়িতে একটা কথা তোমাকে বলি নি—বলারও সময় হয় নি, তোমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ—আমরা ক্রেস্তান—তোমরা আমাদের বাড়িতে থাকলে আমাদের দিক থেকে অবিশ্যি কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের—

শিবনাথ মৃন্ময়ী সম্পর্কে সব কথা বলেছিল, কেবল বলে নি বিধর্মী পর্তুগীজ

কর্তৃক সে লুণ্ঠিতা ও তার গৃহে সে ছিল। আজ আর তার কোন জাত-ধর্মই নেই। সমস্ত জাত ও ধর্মের বাইরে আজ সে।

মৃন্ময়ীকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে মিস্টার ও মিসেস্ উইলসন আজ সেই কথাটাই তুললেন, শিবনাথ, আনন্দের সঙ্গেই আমাদের এখানে মৃন্ময়ী থাকতে পারে—তার শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে কিন্তু তোমাদের হিন্দুসমাজে যদি সে কারণে—

শিবনাথ ধীরে ধীরে মাথা তুলল।

বললে, মৃন্ময়ী সম্পর্কে আপনাকে সব কথা বলি নি ফাদার—

কী বল তো!

আপনি যে ব্যাপারে আশঙ্কা করছেন সেদিক দিয়ে ওর চিন্তার কোন কারণ নেই।

কী রকম?

শিবনাথ তখন সুন্দরমের গৃহে থাকবার কথাটা সংক্ষেপে খুলে বলে।

আশ্চর্য তো!

সব শুনে উইলসন মন্তব্য করেন।

ঠিক আছে—মিসেস্ উইলসন এবারে বলেন, আমাদের আর আপত্তির কি আছে তাহলে। পুওর গার্ল—কাম এলংগ মাই ডিয়ার—

মিসেস্ উইলসন মৃন্ময়ীর হাত ধরে সস্নেহে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

এবারে উইলসন শিবনাথের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, শিবনাথ, you love her—ওকে তুমি খুব ভালবাস, না?

শিবনাথের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

সে মৃদুকণ্ঠে বলে, তাই মিঃ উইলসন—সত্যিই ওকে আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছি।

কিন্তু তুমি তো বলছো ও পর্তুগীজ কর্তৃক লুণ্ঠিতা, ওর জাত নেই ধর্ম নেই—আর তুমি গোঁড়া ব্রাহ্মণের ছেলে—

সাহেব তোমার কথা সত্যি—একদিন এমন ছিল যেদিন জাত ও ধর্মকেই জীবনের সবচাইতে বড় ব্যাপার বলে মনে করেছি—মনে করেছি জাতই যদি গেল—ধর্মই যদি গেল—হিন্দুত্ব আমার আর কি রইলো কিন্তু—

থামলে কেন, বল!

দেওয়ানজী ডিরোজিও এঁরা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন—

You mean Raja Rammohan—

হ্যাঁ।

Yes—he is a great man—a great Indian—he has gone to England—

হ্যাঁ—তাঁর কথাতেই বুঝেছি জাত-ধর্মের চাইতে মানুষ অনেক বড়—জাত ও ধর্ম দিয়ে মানুষকে বেঁধে ছোট করবার মত বিড়ম্বনা বুঝি আর নেই। শুধু বিড়ম্বনা কেন—জীবনকৃষ্ণ বলে—

Who is Jibankrishna?

আমার বন্ধু। সে বলে তার চাইতে বড় পাপ—crime আর নেই—হতে পারে না।

তাই যদি মনে করো, why don't you marry her my boy?

বিবাহ!

হ্যাঁ, ওকে বিবাহ কর না কেন—সেটাই হবে ওর জীবনের সব চাইতে বড় ও সত্যকারের আশ্রয়—তোমার মত একজন সহৃদয় যুবক যদি ওকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে—she will be really secured—she will be really happy—সত্যিকারের সুখী নিশ্চিন্ত হবে।

কিন্তু—

তাই কর যুবক। When you love her—ওকে যখন তুমি ভালবাস—

কিন্তু কোন হিন্দু পুরোহিত তো আমাদের বিবাহ দেবে না—সব কথা শোনার পর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিয়ে করব ওকে—

না—তা কেন করবে!

তবে?

ক্রিশ্চান মতে বিয়ে কর—আমি বিয়ে দেবো তোমাদের।

দেবে—তুমি দেবে ফাদার।

Why not—কেন দেবো না—নিশ্চয়ই দেবো।

আমাকে—আমাকে তুমি কটা দিন ভাবতে দাও ফাদার—

মিঃ উইলসন মৃদু হাসেন। বলেন, তাই হোক, you think over the matter—ভাল করে তুমি ভেবে দেখ—মনকে বোঝ—তারপর এসো।

তাই হবে।

তবে একটা কথা—

বল।

তোমাকে যে কথাটা আমি বলবো আশা করি সেজন্য কিছু তুমি মনে করবে না।

না, না—বল।

আমি বুঝতে পেরেছি শুধু তুমিই নও—সেও—মানে ঐ মেয়েটিও তোমায় সত্যি করে ভালবাসে—she really loves you—

শিবনাথ আবার মাথা নীচু করে।

তাই বলছিলাম—যতদিন না তুমি মতিস্থির করতে পারো এ ব্যাপারে—এখানে তুমি আর এসো না—ওর সামনে এসো না।

ফাদার—

Yes my child—ভালবাসা যেমন পবিত্র সুন্দর শান্তির ব্যাপার, তেমনি তার আর একটা দিকও আছে—যদি শেষ পর্যন্ত কোন কারণে তোমাদের বিবাহ সম্ভবই না হয় তাহলে দুজনেই তোমরা সারাটা জীবন কষ্ট পাবে। I hope you have understood me—আমার কথাটার সারমর্ম তুমি গ্রহণ করেছো।

শিবনাথ ক্ষণকাল অতঃপর চুপ করে থাকে, তারপর বলে, বেশ তাই হবে—আমি আসবো না।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

অনেক রাত্রে ফিরে এলো শিবনাথ বৌবাজারে।

মনের মধ্যে চিন্তার একটা উদ্বেলিত সাগর নিয়ে যেন ফিরে এলো।

কিন্তু ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে তখনো আলো জ্বলছে।

আর জীবনকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে বিনিদ্র একাকী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

কে—একি শিবনাথ! জীবনকৃষ্ণ শুধায়।

জীবন—তুমি এখনো জেগে—ঘুমোও নি!

জীবনকৃষ্ণ বলে, না—কিন্তু তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে, তোমার মুখটা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন—মনে হচ্ছে যেন একটা চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে তোমার মনে!

জীবন—

বল।

তুমি সেদিন বলছিলে না—

কী!

রেবেকার জন্ত তুমি প্রয়োজন হলে ক্রিশ্চান ধর্ম নিতে পারো—মানে

ধর্মান্তরও গ্রহণ করতে পারো ?

বলেছিই তো—আমি তাকে ভালবাসি—তার জন্ত—কর মাই রেবেকা—আই ক্যান স্যাক্রিফাইস এনিথিং—রেবেকার ভালবাসার জন্ত সব ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত শিবনাথ!

ঠিকই বলেছো তুমি জীবনকৃষ্ণ, ভালবাসার জন্য পৃথিবীতে সব কিছু ত্যাগ করা যায়।

তাই যায় শিবনাথ—তাই যায়—জীবনকৃষ্ণ বলে, ভালবাসা যে কি আমি তা জানি—মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।

জান জীবনকৃষ্ণ—

কী ?

আমি—আমিও ভালবেসেছি।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

কাকে—কে সে—who is she—কেমন দেখতে—নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ?

হ্যাঁ—জান জীবনকৃষ্ণ—তোমরা তার রূপের কি বর্ণনা দেবে জানি না—কিন্তু আমার কাছে সে অনন্যা—অতুলনীয়া।

জীবনকৃষ্ণ কোন জবাব দেয় না—চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তার পরই সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে, আর একটা রাত মাত্র শিবনাথ—

একটি রাত!

হ্যাঁ—পরশু সেই ওয়েডনেস্‌ডে—বুধবার—

বুধবার ?

হ্যাঁ—আমাকে আমার প্রেমের পরীক্ষা দিতে হবে—ডুয়েল লড়ে—

আমি বলছি তুমি জিতবে জীবনকৃষ্ণ—হঠাৎ শিবনাথ বলে ওঠে কণ্ঠে অদ্ভুত জোর দিয়ে।

জিতব ?

হ্যাঁ জিতবে—নিশ্চয়ই তুমি জিতবে ডুয়েলে—এত বড় ভালবাসা মিথ্যা হতে পারে না। তা যদি হয় জানবো ভগবান ভালবাসার মূল্য দেন না—দিতে জানেন না।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে করুণ হেসে জীবনকৃষ্ণ মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলে, জানি না তোমাদের ভগবানের কাছে ভালবাসার মূল্য কি ভাবে যাচাই হয়, কিন্তু একটা অনুরোধ শুধু তোমাকে ভাই—

বল!

আমার শেষকৃত্যটুকু তুমি করো।

জীবন—

এই তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ রইল।

কথাগুলো বলতে বলতে মুখটা ফিরিয়ে নিল জীবনকৃষ্ণ—শিবনাথের যেন মনে হলো অশ্রু গোপন করবার জন্যই জীবনকৃষ্ণ মুখটা তার দিক থেকে ফিরিয়ে নিল।

॥ ২ ॥

সুলোচনা—সুলোচনা।

সুন্দরম্ সে ডাকটা শুনে যেন চমকে ওঠে।

এ যে তার পরিচিত কণ্ঠস্বর—এ কণ্ঠস্বর যে ইতিপূর্বে শুনেছে সুন্দরম্।

সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ—যাকে কয়েকবার সে ইতিপূর্বে দেখেছে।

সুলোচনা ততক্ষণে উঠে বসেছে এবং স্বামী হরনাথের কণ্ঠস্বর তার কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দেয়, এই—এই যে আমি এখানে—

সুলোচনা!

এই যে।

সুলোচনা সেই যে মন্দির থেকে মাকে প্রণাম করে এখুনি ঘুরে আসছি বলে গেল, তারপর আর দেখা নেই।

একে জানে হরনাথ, তার স্ত্রী সারাটা দিন উপবাস করে আছে—শুধু আজকের দিনের বিশেষ উপবাসই নয় সুলোচনার স্বামী ও সন্তানের কল্যাণে অমন উপবাস মাসের মধ্যে অধিক দিনই থাকত। তাছাড়া ইদানীং সুলোচনার শরীরটাও ভাল যাচ্ছিল না।

সেই সব নানা কারণেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে হরনাথ সুলোচনার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছিল।

প্রথমেই যায় সে কালীর মন্দিরে।

কিন্তু মন্দিরে তখন জনমনিষ্যিও নেই।

পুরোহিত মন্দিরের দুয়ার বন্ধ করে চলে গিয়েছিল ইতিমধ্যে।

নাটমণ্ডপ ও মন্দিরচত্বরও জনশূন্য। সেখানেও কাউকে দেখতে পায় না হরনাথ।

কোথায় গেল সুলোচনা।

ইতিমধ্যে গৃহে ফিরে যায় নি তো। কিন্তু গেলেই বা সে কোন্ পথে যাবে। যে পথ দিয়ে সে মন্দিরে এসেছে সুলোচনা ফিরলে তো সেই পথ দিয়েই ফিরত।

পথে তো কাউকে দেখে নি হরনাথ।

তবে কি সুলোচনা অন্য কোথাও চলে গেল? তাই বা যাবে কেন!

গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হয় হরনাথ কি ভেবে যেন, সুলোচনা বলে ডাকতে ডাকতে।

সুলোচনা—সুলোচনা—

সুলোচনার সাড়া পেয়ে ঘাটের কাছাকাছি এসে দ্রুত এগিয়ে চলে হরনাথ।

সুলোচনা—

এই যে গো—এই যে আমি!

সুলোচনা আবার সাড়া দেয়।

কোথায় তুমি সুলোচনা?

এই যে ঘাটের কাছে—

ইতিমধ্যে কৃষ্ণাচতুর্দশীর এক ফালি চাঁদ আকাশের এক প্রান্তে দেখা দিয়েছে। তারই ম্লান আলোয় চারিদিক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখা যায় শীতের কুয়াশা-হীন রাত্রে।

সুন্দরম্ হতভম্ব—বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

ন যযৌ না তস্থৌ—অতঃপর যে সে কি করবে—সেটাও যেন তার আর মনে ছিল না।

সুলোচনাও তাকে চেনে—না চিনে থাকলেও নিশ্চয়ই এখুনি চিনতে পারবে একদা কৃষ্ণনগরে রায়বাড়ি থেকে গভীর রাত্রে মৃন্ময়ীর লুণ্ঠনকারী দস্যু বলে।

আর হরনাথ—হরনাথ তাকে দেখেছে সুধামাধবের চালের আড়তে—কানা কবিরাজের ওখানে—তার সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে।

অতএব তাকে হরনাথের না চিনতে পারার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণই নেই।

সুলোচনার সঙ্গে হরনাথের যে একটা কেবল পরিচয়ই নয় ঘনিষ্ঠতর একটা সম্পর্ক আছে তাও সে বুঝতে পেরেছে।

সে ক্ষেত্রে সুলোচনা যদি বলে দেয় এখুনি একদা রাত্রে এই দস্যু মৃন্ময়ীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিল, ব্যাপারটা খুব সুবিধার হবে না।

শেষ অবধি কোতোয়ালী পর্যন্ত গড়াবে।

সেখানকার দারোগার সঙ্গেও যে সুন্দরমের বিশেষ একটা প্রীতির সম্পর্ক তাও নয়। ইংরেজদের শাসনগুণে এখন শহরের চারিদিকে অত্যন্ত কড়াকড়ি—

চুরি-চামারি—ডাকাতি রাহাজানি খুব একটা যখন তখন যত্রতত্র ঘটছে না। আদালতে ধরে নিয়ে গিয়ে হাকিমের দ্বারা বিচার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত চিন্তাগুলো যেন পর পর সুন্দরমের মনের মধ্যে একটা প্রবল নাড়া দিয়ে যায়।

হরনাথ ঐখানে এসে পৌছাবার পূর্বেই সুন্দরম্ চকিতে স্থানত্যাগ করে অদূরে একটা গাছের আড়ালে আধা আলো আধা অন্ধকারে আত্মগোপন করে।

কিন্তু সেখান থেকে নড়ে না বা চলে যায় না—কিসের একটা অজ্ঞাত কৌতূহল যেন ঐখানে তাকে ধরে রাখে।

সুলোচনা!

এই যে গো।

হরনাথ শুধায় এবার, এই রাত্রে একা এই গঙ্গার ধারে কেন এসেছো।

সে সব পরে শুনো, কিন্তু—

কী?

সে কোথায় গেল!

কে—কে কোথায় গেল। কার কথা বলছো।

সুলোচনা যেন এদিক ওদিক ব্যাকুল অন্বেষণকারী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

সে—সে—

কে?

নাম বললে গোপাল।

গোপাল!

হ্যাঁ গো—নাম বললে গোপাল। কিন্তু আমার—আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—

গোলমাল? কিসের গোলমাল?

অন্ধকারে হলেও তাকে দেখে তার গলার স্বর শুনেই তাকে আমি চিনতে পেরেছিলাম—সুলোচনা বলে।

চিনতে পেরেছিলে—কাকে চিনতে পেরেছিলে?—হরনাথ ব্যাকুল কণ্ঠে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

তাকে গো—তাকে—সে বললে তার নাম গোপাল, কিন্তু সে কে জান ?

কে ?

সেই পর্তুগীজ দস্যুটা—

কোন্ পর্তুগীজ দস্যু– হরনাথের বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আঃ, কেন বুঝতে পারছো না যে মৃন্ময়ীকে চুরি করে এনেছিল।

বল কি!

হ্যাঁ—সরকার মশাই যার খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছিলেন সে এক দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ দস্যু—নাম সুন্দরম্ না কি—সবাই বলে সুন্দর সাহেব—

বল কি—কিন্তু তার সঙ্গে—

হঠাৎ মন্দিরের চত্বরে হোঁচট খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারাই—এখন মনে হচ্ছে সে বোধহয় ঐ সময় আশেপাশে কোথাও ছিল, আমাকে এখানে তারপরে সে-ই নিয়ে আসে—

কিন্তু কেন ? –এখানে সে তোমায় নিয়ে আসবে কেন ?

তাই তো বুঝতে পারছি না মাথামুণ্ডু, তবে যখন জ্ঞান হলো দেখি সে আমার চোখে মুখে জল দিচ্ছে—আর নাম জিজ্ঞাসা করতে বললে—তার নাম গোপাল—

গোপাল!

হ্যাঁ—

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না বড় বৌ—আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে—তাকে আমি চিনি—দেখেছি—পরিচয়ও হয়েছে—অন্তঃকরণও মানুষটার বিরাট—কিন্তু—

আরো একটা ব্যাপার কি লক্ষ্য করলাম জান!

কী ?

তার পরনে আগেকার মত সেই সব পাতলুন—কোর্তা নেই।

তবে!

ধুতি-পরা আর গায়ে একটা চাদর—

বল কি ?

হ্যাঁ—আর—আর সে যখন বললে তার নাম গোপাল আমার কি মনে হলো জান ?

কী ?

মনে হলো এ আমার সেই হারানো গোপাল।

বড় বৌ!

হ্যাঁ গো—ডাকটা কানে আসতেই—মা বলে আমায় ডাকল, হঠাৎ যেন সারা গায়ে আমার কেমন কাঁটা দিয়ে উঠলো। সমস্ত অঙ্গ যেন আমার শিউরে উঠলো।

হরনাথ অবাক বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে আর সুলোচনা যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে চলেছে তখনো : মনে হল যেন আমার সেই হারানো নিধি—যাকে একদিন সাগরের জলে কখন নিজের অজ্ঞাত বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম—আমার সেই গোপালই যেন এতকাল পরে ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মা বলে আমায় ডাকলো।

সুলোচনার গলার স্বর বুজে আসে বুঝি কান্নায়, আর হরনাথেরও চোখের কোল দুটি ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

সুলোচনা আবার বলে, প্রথম যেদিন সে আমার মৃন্ময়ীকে লুণ্ঠন করতে আসে সেদিনও তার মুখের দিকে চেয়ে বুকটা যেমন আমার কেমন করে উঠেছিল, ঠিক তেমনি চেতলার ঘাটেও দ্বিতীয়বার তাকে নৌকার ওপরে দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল ও যেন আমার চেনা—কতকালের চেনা। যেন আমার কত আপনার—

হরনাথ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বোধহয় এবারে বলে, হয়—এমন হয় বৈকি—কাউকে কাউকে দেখে হঠাৎ এমনিই মনে হয়—মনে হয় ও যেন কতকালের চেনা—কোথায় কবে যেন ওকে দেখেছি—তোমাকে এতদিন বলি নি কিন্তু ওকে প্রথম দেখে আমারও যেন ঠিক তাই মনে হয়েছিল—ও যেন আমার কত চেনা—কত আপনার।

তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হরনাথ বলে, তা যদি হতো—স্বপ্ন যদি সত্য হতো—কিন্তু সে তো হয় না বড় বৌ—স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। ঐটুকু এক অসহায় শিশু সেই অথৈ সাগরের জলে পড়ে কোথায় তলিয়ে গিয়েছে—আর ও ক্রেস্তান—একটা পর্তুগীজ দুর্ধর্ষ জলদস্যু—চল—অনেক রাত হলো—এবার বাড়ি চল—মেয়েটা একা বাড়িতে রয়েছে—

হ্যাঁ—চল—কিন্তু সে অমন করে পালিয়ে গেল কেন—কেন—

সুলোচনা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয় গৃহাভিমুখে।

ক্রমশঃ তাদের যুগল দেহ কৃষ্ণাচতুর্দশীর আবছা চাঁদের আলোয় মিলিয়ে যায়—দৃষ্টির বাইরে। আর ঠিক তখন আকাশ থেকে কুয়াশা নামছে।

কুয়াশা ক্রমশঃ তখন চারিদিক ঢেকে দিচ্ছে একটু একটু করে।

সুন্দরম্ যেন পাথরের মতই তখনো গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে।

সুলোচনা ডাকটা নামটা প্রথমটায় তার মনে কোন আঁচড়ই কাটে নি—কিন্তু তারপরই হঠাৎ যেন একসময়—মনে পড়ে যায় সেই জীর্ণ চিঠিটার কথা।

মাঝি এমামুল্লার দেওয়া সেই জীর্ণ চিঠিটার কথা।

তার নীচে নামের স্বাক্ষর—সুলোচনা।

সুলোচনা!

॥ ৩ ॥

সুলোচনা—সুলোচনা—

কে—কে ঐ সুলোচনা—কার নাম সুলোচনা—কে ঐ নারী?

পাথরের মতই যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে গাছটার আড়ালে সুন্দরম্। এবং তারপর সুলোচনা ও হরনাথের সমস্ত কথাই তার কানে আসে।

তাদের সমস্ত আলোচনা।

তবে—তবে কি এরাই তার সেই অপরিচিত মা-বাপ?

যে মা-বাপকে আজ সে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে—যে মাতৃ-পিতৃ পরিচয়ের জন্য আজ সে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত—

এরা তারাই!

তার এত কাছে—আর তাদের সে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাগলের মত সর্বত্র।

গোপাল—

সাগরের জলে হারিয়ে যাওয়া ছেলে তো সেও—

তারও নাম তো গোপাল।

সেই তবে ওদের গোপাল?

একবার ইচ্ছা হয় সুন্দরমের গলা ফাটিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে— ফাদার—মাদার—আই অ্যাম্ হিয়ার—মা—বাবা—আমি এখানে—তোমাদের সেই হারানো ছেলে গোপাল আমি এই যে এখানে—হিয়ার আই অ্যাম্—

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়— কী পাগলের মত সে ভাবছে— এখন তার কি পরিচয়—ঘৃণ্য এক জলদস্যু—ওদের বাড়ি থেকে এক কুমারী মেয়েকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছে এবং সেই যে নিয়ে এসেছে তাও সুলোচনা তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে—এখন ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যদি প্রথমেই ওরা তাকে সেই মৃন্ময়ীর কথা শুধায় তো কি জবাব দেবে সে?

কি জবাব দেবার তার আছে?

সে চোর—সে দস্যু—

তাছাড়া দেওয়ানজী যাই বলুন—সমাজের আর কেউ তো তাকে হিন্দু বলে স্বীকৃতি দিতে চায় নি—ঠিক তেমনি ঐ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তার মা-বাপ যদি তাকে না গ্রহণ করে? ধর্ম গিয়েছে—তার জাত গিয়েছে বলে তাকে ত্যাগ করে?

কোথায় সে তখন মুখ লুকোবে?

না, না—তা সে পারবে না—পারবে না—

হে মা—মাদার গডেস্ কালী—এ কি করলে!—আমার মা-বাবার সন্ধান পেয়েও তাদের সামনে গিয়ে আমাকে একবার দাঁড়াবার অধিকার দিলে না?

কখন চলে গেছে গঙ্গার ঘাট থেকে হরনাথ আর সুলোচনা।

কখন ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। এক হাতের মধ্যেও দৃষ্টি চলে না।

হঠাৎ কানে ভেসে আসে—কে যেন গাইছে—

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে—
তবে কি মা—তুমি এমন করে
লুকিয়ে থাকতে পারতে—
নাম জানি না
ডাক জানি না
আমি জানিনে মা কোন কথা বলতে—
মনে বসে মন দেখ মা—
তুমি দেখা দাও না ডাইতে—

সুন্দরম্, তুমি কাঁদছো?

You are crying সুন্দরম্—You are sheding tears—why—কেন তুমি কাঁদছো—কখনও তো জীবনে তুমি কাঁদ নি—You never cried—

তবে আজ কাঁদছো কেন?

তুমি তো একবার মাত্র তোমার মা-বাবার সন্ধান চেয়েছিলে, তাও তুমি পেয়েছো—তোমার মনোবাঞ্ছা তো ঈশ্বর—গডেস্ কালী—মাদার কালী ফুলফিল করেছেন—তবে—তবে আবার কান্না কেন—কাঁদছো কেন—হোয়াই ইউ আর ক্রায়িং?

পাবে না—তুমি কোন দিনই ওদের পাবে না—

ওদের ধারে-কাছেও তুমি যেতে পারবে না। ওদের জাত—ওদের নীতি—ওদের আচার—ওদের ধর্ম তার সঙ্গে জন্মাবধি কোন দিন কোন পরিচয় তোমার হয় নি।

কেমন করে তবে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের একজন বলে নিজেকে দাবী করবে আজ তুমি। এবং তার চাইতেও বড় কথা, দস্যুবৃত্তির যে কলঙ্ক-কালি তোমার সারা গায়ে আজ লেগে আছে তাই বা কেমন করে তুমি মুছে ফেলবে?

কোর্তা আর পাত্‌লুন খুলে ফেলে ধুতি পরলেই কি ওরা তোমাকে মেনে নেবে, না হাতের বন্দুক আর ছোরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আজ ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্র আওড়ালেই ওরা তোমাকে বুকে টেনে নেবে আপনার জন বলে?

নাই টেনে নিক—নাই বা ওরা তাকে সন্তান বলে—হিন্দু বলে মেনে নিক—ও হিন্দু—এক হিন্দু মাতা-পিতার সন্তান—

কুয়াশাচ্ছন্ন পূর্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে মনে মনে বার বার বলতে থাকে সুন্দরম্‌—আমি গোপাল—মা-বাবা—আমি তোমাদের সন্তান গোপাল। আর আজ জানলাম আমি শুধু হিন্দু নয়, মানুষ, মানুষের সন্তান।

মনে মনে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে আজ অকুণ্ঠ-চিত্তে গোপাল:

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ।
তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু ফোঁটার পর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আর ক্ষণে ক্ষণে পুলকে রোমাঞ্চিত হতে থাকে সারাটা দেহ।

সে পেয়েছে—তার মা-বাবার সন্ধান পেয়েছে—

পৃথিবীতে সে অজ্ঞাত—অপরিচিত নয়।

তারও একটা পরিচয় আছে।

নাম আছে, গোত্র আছে—

সে আর সুন্দরম্‌ নয়, আজ থেকে হরনাথ মিশ্রের পুত্র—গোপাল মিশ্র।

কিন্তু শুধু ঐটুকুতেই মাত্র সন্তুষ্ট হতে পারল না সুন্দরম্‌।

এমনই বিচিত্র বুঝি মানুষের মনটা।

অল্পেতে তুষ্ট হতে পারে না—দু হাত ভরে পেতে চায়।

এত দিন তো জানত না—কার সন্তান সে—কি গোত্র—কি পরিচয়—কে তার মা—কে তার বাপ—কি তার জাত—

আর আজ যখন ঘটনাচক্রে জানতে পারল সে হরনাথ মিশ্রের সন্তান—প্রথমেই সে ছুটে গেল পাগলের মত গৃহে—

সযত্নে রক্ষিত একটা পেটিকার মধ্য থেকে সেই জীর্ণ পত্রটা বের করল।

কম্পিত হস্তে চোখের সামনে পত্রটা খুলে মেলে ধরল—

এই তো—এই তো নীচে লেখা রয়েছে—সুলোচনা।

আর কোন সন্দেহ নেই—আর কোন সংশয় নেই।

সুলোচনা—ঐ সুলোচনাই তার মা—হরনাথ মিশ্রই তার বাপ।

মা—মা—মাগো—তার বাবা—ফাদার—

সমস্ত মন যেন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে সুন্দরমের—ইচ্ছা হয় ঐ মুহূর্তে ঐ চিঠি—ঐ লাল কুর্তাটা—আর ঐ রূপার মল জোড়া নিয়ে ছুটে যায় হরনাথ মিশ্রের গৃহে।

সে গৃহ তার অচেনা নয়।

সেখানে গিয়ে সে বলে, দেখ তো—দেখ তো—এই চিঠিটা পড়ে—এই লাল কুর্তা—এই মল দুটো দেখ—cannot you recognise, চিনতে পারছো না?

সুলোচনা আর হরনাথ নিশ্চয় বলবে, নিশ্চয়—নিশ্চয় পারছি—কিন্তু তুমি—তুমি কোথায় পেলে এসব—where you have got it—চুরি করেছো—

No—no—না—না—believe me—ঈশ্বরের দোহাই—চুরি করি নি—

তবে কোথায় পেলে এসব?

কোথায় পেয়েছি—

হ্যাঁ—কোথায় পেলে? নিশ্চয়ই চুরি করেছো?

চুরি—নিজের জিনিস বুঝি কেউ চুরি করে?

নিজের জিনিস—কি বলছো তুমি?

ঠিকই বলছি—it is as true as anything—পৃথিবীতে সূর্যের আলোর মতই এ সত্য—যা আমি বলছি তা সত্য—

সত্য?

হ্যাঁ!

তবে—তবে—কি—

Yes mother—yes father—মা—বাবা—আমি—আমিই তোমাদের সেই সন্তান—

কাপতান!

কে? চমকে ওঠে সুন্দরম্।

তার দিবাস্বপ্ন সে-ডাকে ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

বৃদ্ধ মাঝি এমাহুল্লা। সে কখন এসে দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়েছে।

কে ?

সাহেব—আমি এমানুল্লা—

মাঝি—কি চাই ?

চারদিন থেকে তোমাকে আমি খুঁজছি—এমানুল্লা বলে।

কেন ? ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকায় সুন্দরম্ মাঝির দিকে।

নৌকায় যে চাল এসেছে তার কি ব্যবস্থা হবে—আড়তে না তুলে ফেললে—

মাঝি—জান—জান, আমি পেয়েছি—তাদের খুঁজে পেয়েছি।

খুঁজে পেয়েছো—কাদের ?

My mother—my father—আমার আসল মা-বাপের সন্ধান আমি পেয়েছি—

সত্যি—কোথায়—কোথায় পেলে কাপতান ?

পেয়েছি—পেয়েছি।

কে—কে তারা ?

They are very good—very good—এত ভাল না—আমার মা, ঠিক যেন মা। Goddess কালার মত—কিন্তু ভয়ঙ্করী নয়—শান্ত—সুন্দর—মমতাময়ী—আর আমার father—a real ব্রাহ্মণ।

কিন্তু কেমন করে জানলে ?

জেনেছি বললাম তো—

তা তারা তোমায় চিনতে পেরেছে ?

না।

তবে—

চিনবে কি করে—তাদের সামনে গিয়ে তো আমি আমার কথা বলি নি—কে আমি—কে তারা। কি সম্পর্ক তাদের সঙ্গে আমার—

কেন—কেন বললে না সাহেব, এমানুল্লা বলে, যখন জানতে পারলে তারাই তোমার মা-বাবা—

না—তা হয় না।

কেন—কেন হয় না ?

আঃ, এমানুল্লা—এটা বুঝছো না কেন—when they will ask about that girl—সেই মেয়েটি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে—কি জবাব দেবো—কি বলবো—

কার কথা বলছো ?

সেই মেয়েটি—কৃষ্ণনগর থেকে যাকে লুঠ করে এনেছিলাম।

তার সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক—

আছে—আছে।

আছে?

হ্যাঁ—তাদেরই বাড়ির মেয়ে—মৃন্ময়ী—

বল কি!

হ্যাঁ—মৃন্ময়ী তাদেরই বাড়ির মেয়ে—তারা আমাকে চিনতে পারলে ক্ষমা করবে ভেবেছো—সন্তান বলে আর গ্রহণ করবে—একটা ডাকাতকে—একটা লুঠেরাকে?

হুঁ—তা বটে—তবে—

কী?

এক কাজ করো না কাপতান।

কী—

সেই মেয়েটা তো তোমার কাছেই আছে—সে যখন তোমার আত্মীয় হচ্ছে তাকে তো আর তুমি বিয়ে করতে পারছো না—তাকে তুমি ফিরিয়েই দাও না।

তাহলে তো সব ভাবনা মিটেই যেতো কিন্তু—

আবার কিন্তু কি!

কোথায় এখন তাকে পাবো! সে তো আমার কাছে নেই।

নেই!

না—শিবনাথের সঙ্গে কোথায় যেন এক রাত্রে পালিয়ে গিয়েছে।

বল কি সাহেব?

হ্যাঁ—জানি না তারা কোথায়—অথচ সেখানে যেতে হলে মৃন্ময়ীকে আমার সর্বাগ্রে খুঁজে বের করতে হবে—যেমন করেই হোক।

হঠাৎ ঐ সময় এমাদুল্লা বলে, তুমি ঠিক জান কাপতান—শিবনাথের সঙ্গেই সে গেছে?

হ্যাঁ—দাক্ষায়ণী তাই বলেছে।

আমি জানি শিবনাথ কোথায় এখন।

কোথায়—কোথায়—উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সুন্দরম্‌।

আমি তাকে দেখেছি বৌবাজারে—

বৌবাজারে—কোথায়?

সে কার বাড়ি তা তো জানি না—খোঁজও নিই নি—গতকালও তাকে

সেই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি—সেখানে গেলে হয়তো তার খবর পেতে পারো তুমি সাহেব।

চল আমি যাবো—

এখুনি যাবে সাহেব?

হ্যাঁ এখুনি যাবো—মৃন্ময়ীকে আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বেশ চল তাহলে—

চল।

তখুনি দুজনে বের হয়ে পড়ল।

মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ীকে যেমন করে যেখান থেকে হোক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে যে আজ।

হন হন করে হেঁটে চলে সুন্দরম্।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রেবেকার মনেও কিন্তু শান্তি ছিল না। এবং যত সেই ডুয়েলের দিনটি এগিয়ে আসতে লাগল তার মনের অস্থিরতাও যেন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ডুয়েলের ফলাফল যে শেষ পর্যন্ত কি হবে সেটা যেন রেবেকা দিব্যচক্ষে দেখতে পায়।

লেঃ আর্নল্ড দুর্ধর্ষ একজন আর্মী যোদ্ধা।

পিস্তল ও বন্দুক চালনায় সে যেমন দক্ষ তেমনি বিরাট লম্বা-চওড়া পুরুষ।

স্কটল্যাণ্ডে বাড়ি। আর্মীর চাকরি নিয়ে ইণ্ডিয়াতে এসেছে।

যেমন একরোখা তেমনি প্রচণ্ড বদ্‌রাগী।

একবার যখন সে বলেছে ডুয়েল সে লড়বে—এবং জীবনকৃষ্ণকে ডুয়েল লড়বার জন্য আহ্বান করেছে তখন সে তার মত পরিবর্তন করবে না কিছুতেই। এবং কারো কথাতেই করবে না।

আর জীবনকৃষ্ণ ডুয়েলের প্রতিযোগী হিসাবে তার কাছে একটা তো কীটের সামিল।

রোগা—ঢ্যাঙ্গা—

পশমের মত মাথার তৈলহীন চুলগুলো সর্বক্ষণ এলোমেলো—হাওয়ায় উড়ে চোখে-মুখে এসে পড়ছে।

প্রশস্ত কপাল। উন্নত নাসা। দৃঢ়বদ্ধ চিবুক—কোমল ছুটি চক্ষু।

দেখলেই মনে হয় যেন ভাবুক—কবি একজন।

জীবনকৃষ্ণও অবিশ্যি খুব বড়লোকের ছেলে—একমাত্র ছেলে এবং অত্যন্ত গোঁড়া নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে।

ডিরোজিওর ওখানেই তার ভগিনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রেবেকার—সেই-খানে ডিরোজিওর ভগিনীর সাহায্যেই প্রথম আলাপ ছুজনায়—

আর সে আলাপও তো মাত্র কয়েক মাস পূর্বে।

সেই আলাপই ক্রমশঃ গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়েছে।

পরস্পর পরস্পরের প্রতি অন্ধভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

কিন্তু আজও মনে পড়ে রেবেকার জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে আলাপের পূর্ব মুহূর্তটি। রেবেকা গিয়েছিল ডিরোজিওর ভগিনীর সঙ্গে দেখা করতে।

ঘরে ঢুকতে যাবে হঠাৎ তার উদাত্ত কণ্ঠস্বরে এক অপূর্ব কবিতা আবৃত্তি কানে এলো।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রেবেকা।

Why doth the breeze sigh ever thee in vain ?
Silence hath bound thee with her fatal chain.

কৌতূহল দমন করতে পারে নি—আবৃত্তিকারীকে দেখবার জন্য পাশের খোলা বাতায়ন-পথে উঁকি দিয়েছিল রেবেকা।

এক তরুণ—তরুণ তো নয় যেন একটি আগুনের শিখা—প্রদীপ্ত চক্ষু—ভাস্বর ললাট—স্ফীত নাসা—

আগুনের মতই দেহাবরণ—

উদাত্ত কণ্ঠে ডিরোজিও—তার পরম প্রিয় শিক্ষাগুরুরই একটি কবিতা—"The Harp of India" থেকে আবৃত্তি করে চলেছে—সামনে ডিরোজিও বসে—মুগ্ধ—বিস্মিত—

Neglected, mute and desolate art thou,
Like ruined monument on desert plain :—
...but if thy notes divine.
May be by mortal weakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain !

হে আমার স্বদেশী বীণা! তোমার ঐ বেসুরো ছেঁড়া তারে আমার সুরটি বাঁধতে দাও॥

সেই দিনই প্রথম আলাপ করিয়ে দেয় রেবেকার সঙ্গে ডিরোজিও ভগিনী জীবনকৃষ্ণর।

এ ভারতের নবযুগের মানুষ—নতুন মানুষ। বলেছিল জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে রেবেকাকে সে।

তারপর ডিরোজিওর গৃহে সেদিন সন্ধ্যায় বিতর্ক আলোচনা—

ঈশ্বর আছেন কি নেই—জাতিভেদ ভাল কি মন্দ—যুক্তিই বড় না মানুষের অন্ধ বিশ্বাসই বড়—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, না ক্ষুরধার বুদ্ধির আলোকে ও তর্কে, অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা না বাধ্য সমষ্টিবশ্যতা—কোনটা আজ মানুষের—বিশেষ করে ভারতের নব যুবকদের কাম্য।

তার পর যত আলাপ হয়েছে—যত মিশেছে রেবেকা জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে মনে হয়েছে—এই তো সেই মানুষ—এই তো সেই জীবনসাথী যার হাত পরম আশ্বাসে —পরম বিশ্বাসে মুঠো করে ধরা যায়।

তাই সে বুঝি অকুণ্ঠচিত্তে একদিন বলতে পেরেছিল, I love—I love you my darling—আমি তোমায় ভালবাসি—প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসি—

রেবেকা—সত্যি—সত্যি বলছো—

জীবনকৃষ্ণর বুকের ভিতরটা যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

Yes my darling—তুমি আমায় নাও—আমায় গ্রহণ কর প্রিয়তম। জীবনে মরণে আমি তোমার—একমাত্র তোমার—hold me—press me my love—kill me—

জীবনকৃষ্ণর বুকে মাথা রেখে কথাগুলো বলেছিল রেবেকা।

তাই তো—মিঃ মট বড় ভাই যখন তাকে বলেছিল, লেঃ আর্নল্ড—গ্যারিসন আর্মী অফিসার, সে তোমার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছে ভগিনী—he wants to marry you—সে তোমায় বিবাহ করতে চায়—

দাদা!

হ্যাঁ ভগিনী—আমি তো শুনে হাতে স্বর্গ পেয়েছি—একদিন সে—ক্যাপটেন —মেজর—কর্নেল সব হবে—হয় তো কম্যাণ্ডারও হবে—আমি রাজী হয়ে গেলাম—

সে কি দাদা—রাজী হয়ে গেলে—

হবো না—তাছাড়া সে তোমায় সত্যি ভালবাসে দেখলাম।

এবং পরের দিনই আর্নল্ড নিজে এসে তার হৃদয়ের কথা—প্রার্থনা জানাল রেবেকাকে—

I love you Rebeca—তোমায় আমি ভালবাসি রেবেকা—

সেদিন মিঃ মর্টের গৃহে ডিনারের পরে বলডান্সের সময় লেঃ আর্নল্ডয়ের নাচের সঙ্গিনী হতে হলো রেবেকাকেই এবং সর্বক্ষণ নাচের মধ্যে রেবেকার কানের কাছে ফিস ফিস করে আর্নল্ড বলতে লাগল, I love you—আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি my sweet angel—আমার প্রিয়তমা—আমার হৃদয়ের রানী—

হায় রে তখন যদি রেবেকা দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে দিত।

দাদাকে এবং আর্নল্ডকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিত, তা আর সম্ভব নয়—এ হতে পারে না—আমি জীবনকৃষ্ণকে ভালবাসি—সে আমায় ভালবাসে—আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছি—

কিন্তু পারে নি—কিছুই বলতে পারে নি রেবেকা।

বুকের মধ্যে রক্ত ঝরেছে তবু মুখ ফোটে নি।

কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে তবু গলা দিয়ে শব্দটুকু বের হয় নি।

নিরুপায় বেদনায় কেবল ছট্‌ফট করেছে।

কিন্তু এখন—এখন কি হবে—

শমন যে শিয়রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন সে কাকে কি বলবে—এবং আজ তার অবিমৃষ্যকারিতায় পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে করে একজনের মৃত্যু অবধারিত এবং শেষ মীমাংসা একজনের মৃত্যুতেই—

তা হোক তাতেও কোন ক্ষতি ছিল না।

যদি জানত রেবেকা জীবনকৃষ্ণর হাতেই আর্নল্ডের মৃত্যু হবে—কিন্তু তা তো হবে না—মরবে জীবনকৃষ্ণই। বন্দুক বা পিস্তল চালনা করা দূরের কথা—সে কখনো বন্দুক বা পিস্তল স্পর্শও যে করে নি। দুশ্চিন্তায় দুশ্চিতায় রেবেকার আহার নিদ্রা পর্যন্ত ঘুচে যায়।

আয়া মালিনী বড় ভালবাসে ঐ কিশোরীকে—রেবেকাকে।

তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিন্তু ব্যাপারটা এড়ায় না।

সে শুধায়, কি হয়েছে তোমার মেমসাহেব দিদি?

কিছু হয় নি মালিনী।

না—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে—বল—বল কি হয়েছে?

অবশেষে মালিনীর বারংবার পীড়াপীড়িতে সমস্ত কথা অকপটে রেবেকা তাকে না জানিয়ে পারে না। সব বলে।

মালিনী বলে, সর্বনাশ—এ কি করেছো মেমসাহেব দিদি!

জীবনকে যেমন করে হোক রোধ করতেই হবে মালিনী—নচেৎ সে মারা

পড়বে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? এ যে ভালবাসাবাসির ব্যাপার গো—

তাহলে কি হবে মালিনী?

দাঁড়াও মেমসাহেব দিদি, আমায় ভাবতে দাও—

ভাববার আর সময় কোথায় মালিনী।

এক কাজ কর মেমসাহেব দিদি।

কী?

তোমরা পালিয়ে যাও।

পালিয়ে যাবো?

হ্যাঁ—চন্দননগরে আমার এক বোন থাকে—তার বাড়িতে তোমরা দুজনে পালিয়ে গিয়ে আপাততঃ কিছুদিন লুকিয়ে থাক—

না—তা হবে না।

হবে না কেন শুনি?

জীবন রাজী হবে না—

কেন রাজী হবে না—বুঝিয়ে বল!

তবু রাজী হবে না—

কিন্তু মেমসাহেব দিদি একটা কথা বলবো কিছু মনে করো না—

কী বল—

তুমি ইংরেজ—ক্রেস্তান আর ও বামুনের ছেলে, হিন্দু—এ বিয়ে সুখের হবে না। ওর মা বাবা মেনে নেবে না কিছুতেই জেনো—তার চাইতে ঐ গোরা সাহেবকেই বিয়ে কর—

বিয়ের পরও আমরা আলাদা হয়ে থাকবো—ওদের বাড়িতে তো আমি যাবো না।

মালিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু হল না।

সে কোন পথই বাতলাতে পারল না।

তখন রেবেকা নিজেই মনে মনে একটা মতলব স্থির করে।

সে যদি শেষ পর্যন্ত কোনমতে ডুয়েলের ব্যাপারে বাধা দিতে পারে!

কিন্তু কেমন করে?

কেন সে যদি আর্নল্ডের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে!

দেখা করে বলে, আর্নল্ড, আমি জীবনকে ভালবাসি—I love him—

তাহলে—তাহলেও কি আর্নল্ড যুদ্ধ করবে?

ডুয়েল লড়বে?

নিশ্চয়ই না।

শেষ পর্যন্ত সেই স্থির করেই আগের দিন রেবেকা একটা চিঠি লেখে—লেঃ আর্নল্ডকে।

॥ ২ ॥

চিঠিতে সব কথাই স্পষ্ট করে লেখে রেবেকা। লেখে—

মিঃ আর্নল্ড,

এ ডুয়েল বন্ধ কর—আমি জীবনকৃষ্ণকে ভালবাসি—আমি তারই বাগ্‌দত্তা বধূ—অন্যের বাগ্‌দত্তা এক নারীকে নিশ্চয়ই তুমি গ্রহণ করতে চাও না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।—ইতি।

রেবেকা

মালিনীকে ডেকে চিঠিটা একটা খামে ভরে বলে, মালিনী, একটা কাজ করতে পারবি?

কি মেমসাহেব দিদি?

একটা জরুরী চিঠি আমার কেল্লায় পৌঁছে দিতে হবে।

কেল্লায়?

হ্যাঁ।

কেমন যেন ঢোঁক গেলে মালিনী। বলে, কিন্তু দিদিমণি—

কেন, তোর না কে খুব জানাশোনা লোক আছে, কতদিন তুই বলেছিস আমায় কেল্লায় সে বড় কাজ করে—

তা তো করে—

তবে তার হাত দিয়ে চিঠিটা তুই লেঃ আর্নল্ডকে পৌঁছে দিতে পারবি না?

তা—তা পারবো না কেন, খুব পারবো—

কেল্লার ঘোড়ার যে সব ঘেসেড়া ঘাস যোগায় নিত্য, রামলাল ছিল তাদেরই একজন—এবং মালিনী আয়ার দোস্তি ছিল তারই সঙ্গে। সেই কথাটাই সে বড়াই করে মধ্যে মধ্যে শোনাত তার মেমসাহেব দিদি রেবেকাকে।

আবার একটা বড় রকমের ঢোক গিলে মালিনী বলে, তাহলে সেই গোরা সাহেবকেই বিয়ে করবে তুমি ঠিক করলে মেমসাহেব দিদি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভেবে দেখলাম তোর যুক্তিই ঠিক।

মালিনী তেমন মেয়েছেলে নয় মেমসাহেব দিদি—যা বলে নেয্য বলে—খুব ভাল করলে—যার সঙ্গে যা—তুমি হলে মেমসাহেব—সাহেব ছাড়া তোমায় মানাবে কেন—

তাহলে এই চিঠিটা নে।

হাত বাড়িয়ে রেবেকার হাত থেকে চিঠিটা নেয় মালিনী।

পৌঁছে দিতে হবে এই চিঠিটা সাহেবকে তো?

হ্যাঁ।

সে খুব পারবে—কত বড় কাজ করে সেখানে—কত কদর তার—কত সম্মান, কত সেলাম দেয় গোরারা পর্যন্ত তাকে। তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না মেমসাহেব দিদি—এ চিঠি আজই পৌঁছে যাবে—

মালিনী আশ্বাস দিয়ে হেলে দুলে রেবেকার ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

রেবেকা এতক্ষণে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু রেবেকা জানতেও পারল না সে-চিঠি লেঃ আর্নল্ডয়ের হাতে আদৌ পৌঁছাল না।

পৌঁছাবে কি করে—রেবেকা তো জানত না ঘেসেড়া রামলালের কেল্লার আস্তাবল পর্যন্তই দৌড় ছিল এবং সেখানে যে ঘোড়াগুলোর খবরদারী করতো তার হাবিলদার পর্যন্তই তার যাতায়াত ছিল।

কেল্লার অফিসারদের কাছে যাওয়া দূরে থাক—তাদের কোয়ার্টারের ধারে কাছেও বাইরের কোন লোকের যাবার কোন অধিকার ছিল না, এমনি সেখানে আইনের কড়াকড়ি।

কাজেই রামলাল স্পষ্টই বললে তার প্রেয়সীকে, ক্ষেপেছিস, সেখানে যাবো কি করে—গুলি চালিয়ে দেবে না।

তবে কি হবে? মালিনী শুধায়।

কি আবার হবে—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দে।

বলিস কি, তারপর, যখন মেমসাহেব দিদি শুধাবে—

কি বোকা রে তুই—বলবি দিয়ে দিয়েছি—পৌঁছে গেছে।

তারপর যখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে—

জানাজানি হলেই বা, তুই বলবি—আমার মানুষের হাতে আমি দিয়েছি পৌঁছে দেবার জন্য—তার বেশী কি করে আমি জানব—বলব—

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুই হয়তো পারবি কাজটা।

পারতাম—পারতাম কি আর না—কিন্তু চিঠিতে কি আছে কে জানে।

না, না, কেবল ভালবাসাবাসির কথাই আছে আমি জানি।

হুঁ—ওদের আবার ভালবাসাবাসি—দেখিস না ঘরে যার বিবি আছে সেও যেমন এ দেশের একটা দুটো করে মেয়েমানুষ রেখেছে স্ফূর্তি করবার জন্য তেমনি যাদের নেই তারাও রেখেছে—সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে সব এসেছে টাকা লুটতে এ দেশে—টাকা লোটে দুহাতে আর মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করে—মেয়েমানুষ হলেই হলো—ওদের আবার ভালবাসাবাসি—মহা বিজ্ঞের মত একটানা একটা বক্তৃতা দিয়ে দেয় রামলাল ঘেসেড়া তার প্রণয়িনীকে।

আসলে কথাগুলো তার নিজের নয়। শোনা কথা।

বাবুমশাইদের মুখে শুনে শুনে কথাগুলো রপ্ত করেছিল রামলাল।

বুঝলি ভালবাসাবাসি নয়, হয়তো তোর মেমসাহেব দিদিটি জানতে পেয়েছে তার পেয়ারের ঐ গোরা সাহেবটি অন্য কোন মেয়েছেলের সঙ্গে নটঘট করছে, তাই গোঁসা করে চিঠি দিয়েছে—তোকে তো আর সে কথা বলতে পারে না—তাই অন্য কথা বলে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে—

রামলাল একটা বুঝ দিয়ে দেয় কোনমতে মালিনীকে।

বোকা সরল মেয়েমানুষ মালিনী তাই বুঝে চুপ করে যায়।

বাড়ি ফিরে এলে রেবেকা জিজ্ঞাসা করে, আয়া—দিয়ে এসেছিস চিঠিটা?

হ্যাঁ গো মেমসাহেব দিদি—আমার মানুষটা একেবারে তোমার সেই সাহেবের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

কি করে জানলি?

জানলাম আবার কি—স্বচক্ষে যে দেখলাম—

দেখলি?

তা দেখলাম না! তেমন মেয়েছেলে আমায় পাও নি যে কাঁচা কাজ করবে মালিনী—একেবারে পাকা কাজ করে এসেছি।

রেবেকা মনে মনে সত্যিই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস নেয়।

যা ভয় হয়েছিল—রগচটা মানুষ আর্নল্ড—যদি চিঠিটা তার হাতে না পৌঁছায়—সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এখন আর নিশ্চয়ই সে ডুয়েল লড়বে না।

ঐ কথা জানার পর কেউ কি ডুয়েল আর লড়ে নাকি।

কিন্তু এও ঠিক, অতঃপর কথা তার দাদা মিঃ মটের কানে যাবেই—লেঃ আর্নল্ডই তুলে দেবে—তখন আর হয়তো এ গৃহে তার স্থান হবে না।

মিঃ মটকে তো রেবেকা জানে।

ইংরাজ বলে তার প্রচণ্ড একটা গর্ব আছে—তাছাড়া তাদের কোথায় কে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় নাকি লর্ড—সে নিয়েও গর্ব ও অহংকারের সীমা নেই মিঃ মটের। কথায় কথায় বলে—we belong to Lord family—অতএব তারই ভগ্নী এবং ইংরাজ-কন্যা হয়ে সে একজন নেটিভ ইণ্ডিয়ানকে ভালবেসে বিবাহ করছে আর যাই করুক মিঃ মট ক্ষমার চক্ষে দেখবে না।...এবং এত সহজে সেটা মেনেও নিতে পারবে না। চাইবেও না।

ইণ্ডিয়ানদের সে প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

নেটিভ—আনকালচার্ড—ব্রুট তারা—তারা তাদের ভৃত্য—আর ওরা তাদের প্রভু।

নেটিভের সঙ্গে একজন ইংরেজের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক।

ওরা নাকি মানুষও নয়। হিদেন!

কিন্তু রেবেকা তা মনে করে না।

সবাই ঈশ্বরের সন্তান। ওদের চামড়া কালো বলে এবং ইংলিশম্যান নয় বলে ওদের শরীরের রক্ত ও তাদের সাদা চামড়ার শরীরের রক্তে যে কোন পার্থক্য আছে বা থাকতে পারে তা সে বিশ্বাস করে না—এবং সে বিশ্বাস করে ইণ্ডিয়ানরা মানুষ হিসাবে কারো চাইতে ছোট নয়।

তাদের কিছু কিছু সুবিধাবাদী লোকের ঘৃণিত দাস্য-মনোবৃত্তিই ইংরেজের চোখে তাদের ছোট করে দিয়েছে—কুকুরের মত তারা পা চাটে। তুমি প্রভু—আমি ভৃত্য এই মিথ্যা একটা দম্ভ তাদের মনে সৃষ্টি করেছে।

সেই কথাটাই সেদিন ডিনার-টেবিলে বসে তাদের বাড়িতে কয়েক মাস আগে এক রাত্রে ডিরোজিও বলায়—তার দাদা মিঃ মট্ অসন্তুষ্ট হয়েছিল ডিরোজিওর ওপরে—

ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

বলেছিল—হিদেন—আনকালচারড্ ব্রুট্স্—

না—তা তারা নয়—আনফরচুনেটলি তারা শুধু উপযুক্ত শিক্ষা পায় নি, পাচ্ছে না—যাতে করে তাদের মেরুদণ্ড কঠিন হবে—সোজা হবে—ডিরোজিও সমান দৃঢ়তায় পুনরায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

You think so!

নিশ্চয়ই—সেই সঙ্গে অবিশ্যি ধর্মের গোঁড়ামি—অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারও ওদের অন্তরায় হয়েছে—কিন্তু তারা—এদেশের যুবক সমাজ আজ জাগছে—তারা

আসবে—কারো সাধ্য নেই তাদের ঠেকিয়ে রাখে। এবং আজকের শহরের হিন্দু কলেজই সে কাজ করছে—The main channel by which real knowledge may be transferred from its European sources into the intellect of Hindusthan.

সেই কারণেই ক্রিশ্চান হওয়া সত্ত্বেও ডিরোজিও মিঃ মটের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

রেবেকা মধ্যে মধ্যে ধর্মতলার মৌলালীর দরগার কয়েক গজ দক্ষিণে সারকুলার রোডের ডিরোজিওর বাড়িতে তার ভগিনী আমেলিয়ার কাছে যে যাতায়াত করত এবং আমেলিয়াও মধ্যে মধ্যে তার চৌরঙ্গীর গৃহে আসা-যাওয়া করত সেটা একটুও পছন্দ করতেন না মিঃ মট্।

মুখে অবিশ্যি প্রকাশ করতেন না মিঃ মট্ সেটা।

অবিশ্যি কারণ তার একটা ছিল—তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর শহরে তরুণ ও শিক্ষিতের মহলে বিশেষ একটা প্রতিপত্তি ছিল।

বিশেষ একটা শ্রদ্ধার আসন ছিল তাঁর সকলের মনের মধ্যে। যদিও পর্তুগীজদের একজন হলেও বাংলাদেশে ঐ সময় বাঙ্গালীদের সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক-সম্পর্কটা যতটা ঘনিষ্ঠ ছিল—সাংস্কৃতিক সম্পর্কটা তার কিছুই ছিল না।

তাদের বৈদেশিক স্বাতন্ত্র্যও তখন প্রায় বাংলাদেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে। তথাপি পর্তুগীজদের সংখ্যা শহরে কম ছিল না নেহাৎ—কিন্তু তারা তখন যেন এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়ে এই দেশটাকে নিজেদের মাতৃভূমি জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের মধ্যেই শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে আচরণে নিজস্ব আভিজাত্যে ও প্রতিভায় ডিরোজিও যেন বিশেষ একজন হয়ে সকলের দৃষ্টিকে বিশেষভাবেই আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু মিঃ মট্ ছিলেন ভিন্ন গোত্রের।

পুরোপুরি একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান।

তাঁর রেবেকার মনের কথা বুঝবারও কোন ক্ষমতা ছিল না।

বোঝালেও সে বুঝত না—বুঝতে চাইত না।

রেবেকা তাই স্থির করে ওদিক দিয়েই সে যাবে না।

এ গৃহ—এ আশ্রয় সে ছেড়েই চলে যাবে।

থাকুক তার দাদা তার আভিজাত্য ও ইংরেজের গর্ব ও অহংকার নিয়ে।

সে মানুষকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে।

সব মানুষই তার কাছে ঈশ্বরের সন্তান।

জীবনকৃষ্ণ কারো চাইতে কোন অংশে কম নয়—তাকে সে যখন ভালবেসেছে তখন তার গলায় সে মালা দেবেই—

পৃথিবীতে কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

॥ ৩ ॥

সুলোচনা গৃহে ফিরে এলো সে রাত্রে স্বামীর সঙ্গে যেন একটা স্বপ্নের আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে।

কেমন করে কি ভাবে যে সে ফিরে এলো তা সে জানে না।

মনে হচ্ছিল কেবলই যেন তার ভিতরে একটা মহাপ্রলয় ঘটে গিয়েছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে একবার একটা প্রচণ্ড ঝড়ে তার ঘরবাড়ি সব ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, আবার পঁচিশ বছর পরে একটা ঝড় এসে নতুন করে যেন সব ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল। লোকটাকে যে সুলোচনা চিনতে পারে নি তা তো নয়।

সে তো মুহূর্তে ঝাপসা কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদের আলোতে বারেকের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে চিনতে পেরেছিল।

সেই দস্যুটা—সেই ভয়ানক দস্যুটা—যে সেদিন রাত্রে অসুস্থ মৃন্ময়ীকে তার বুক থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সরকার মশাই তো পরে তার যা সংবাদ এনেছিলেন—লোকটা একটা দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ।

তাই যদি হবে তো লোকটার নাম গোপাল বললে কেন?

গোপাল!

পরের দিন দ্বিপ্রহরে জানলার সামনে একাকী দাঁড়িয়ে সুলোচনা গত রাত্রের কথাটাই বুঝি ভাবছিল।

কিছুক্ষণ পূর্বে কালীকৃষ্ণ বৌবাজার থেকে এসেছিলেন এবং সুনয়নাকে দেখে তাঁর অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে—কথাটা বলে গিয়েছেন তিনি।

গোপন করেন নি বা বলেন নি পরে জানাব।

বলেছেন, দেখুন মিশ্র মশাই আমি সহজ সরল মানুষ—রেখে-ঢেকে কিছু করতেও পারি না বলতেও পারি না—কন্যাটি আপনার যেমনি সুশ্রী লাবণ্যময়ী তেমনি মনে হলো অতীব সুলক্ষণা!

আপনার তাহলে বাঁড়ুয্যে মশাই—কথাটা হরনাথ শেষ করতে পারে না।

তার কন্যা সুনয়না সুশ্রী নিঃসন্দেহে, তথাপি কেন যেন মনের মধ্যে কোথাও ঐ ব্যাপারে ভরসা পাচ্ছিল না—কোথায় কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর কোথায় সে—হরনাথ মিশ্র।

ধনে সম্পদে কৌলীন্যে আভিজাত্যে কোন প্রতিযোগিতাই তো হতে পারে না—তথাপি কালীকৃষ্ণর সুনয়নাকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল।

কালীকৃষ্ণ বললেন, বিলক্ষণ—পছন্দ হয়েছে কন্যা আমার—আর শুধু পছন্দ নয় পাকা কথাও দিয়ে গেলাম আমি—সামনের মাঘেই শুভকাজ হবে—

কিন্তু—

কোন চিন্তা করবেন না—মাকে আমার বরণ করে গৃহে নিয়ে যাবো—দায়-দায়িত্ব আমারও একটা আছে বৈকি—আপনি আগামী পরশুই আসুন—অন্যান্য কথাবার্তা ও দিনস্থির হবে—

কালীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়ে হরনাথ এসে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

বড় বৌ—

কে—ও তুমি—সুলোচনা ফিরে দাঁড়াল।

হরনাথের সমস্ত মুখে খুশি আর হাসি যেন উপচে পড়ছে।

বুড়োর সুনয়নাকে খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে।

বললে?

বললে মানে—একেবারে পাকা কথাও দিয়ে গেল।

পাকা কথা!

হ্যাঁ—বলে গেল মাঘেই শুভকার্য হবে—নাঃ, হতভাগীটার কপালজোর আছে—সত্যি—উঃ, কি যে চিন্তা ছিল—একটা জগদ্দল পাথর যেন বুক থেকে নেমে গেল।

খুশিতে আনন্দে যেন ডগমগ করতে থাকে হরনাথ মিশ্র।

বলে গেল আগামী পরশু যেতে—দিনস্থির হবে—

হঠাৎ ঐ সময় দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে সুলোচনা বলে, যাই, মায়ের মন্দিরে একটা প্রণাম করে আসি—

সুলোচনা আর দাঁড়ায় না—বের হয়ে যায়।

কিন্তু সত্যিই কি সুলোচনা মায়ের মন্দিরে সেই কারণেই প্রণাম করতে গিয়েছিল—না অন্য কোন একটা দুরাশা মনের মধ্যে অনবরত উঁকি দিচ্ছিল গত

রাত্রে গঙ্গার ঘাট থেকে গৃহে ফিরে আসবার পর থেকেই—তাইতেই সে গিয়েছিল।

সর্বস্ব হারাবার পরও ক্ষীণ আশার যে শিখাটি ভীরু কামনায় মানুষের বুকের—মনের নিভৃতে কাঁপতে থাকে দূর দিগন্তের অন্ধকারে আলেয়ার মত, সেই আলেয়ার হাতছানিতেই বুঝি ছুটে গিয়েছিল সুলোচনা মায়ের মন্দিরপ্রাঙ্গণে।

গতরাত্রে ঐ মায়ের মন্দিরপ্রাঙ্গণেই তো তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর।

আজও যদি সে আবার সেখানে আসে।

আজও যদি তার সঙ্গে আবার দেখা হয়—দেখা হয়ে যায়!

দেখা হলে কি বলবে – কি বলতে পারে সে?

কেন বলবে, তোমার নাম বুঝি গোপাল?

হুঁ—

তুমি তো শুনেছিলাম পর্তুগীজ—তাহলে তোমার নাম গোপাল হলো কি করে—

কেন—গোপাল নাম বুঝি হতে নেই?

না, না—তা আমি বলছি না—আচ্ছা গোপাল—

বলুন—

তোমার দেশ কোথায়? তোমার মা বাবা—কে তারা—কি তাদের নাম?

কিন্তু এ সব পাগলের মত সুলোচনা কি সব ভাবছে!

সত্যিই যদি ও তার গোপালই হয়—ওর কি করে সে সব কথা মনে থাকবে। মা—বাবা—দিদা—দাদু কটি কথা ছাড়া তো কিছুই তখন সে বলতে পারত না।

অজ্ঞান অসহায় এক শিশু।

তাছাড়া—সে তো জলের তলায় কবে তলিয়ে গিয়েছে।

কালী মায়ের মূর্তির মুখের দিকে অপলক চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুলোচনা আর তার দু'চোখের কোণ বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আর গোপাল—সুন্দরম্ মাঝি এমানুল্লাকে নিয়ে পাগলের মতই ছুটে গিয়েছিল বৌবাজারে—

শিবনাথ—শিবনাথকে খুঁজে বের করতে হবে—তা সে যেমন করেই হোক। শিবনাথই মৃন্ময়ীকে নিয়ে এসেছে।

শিবনাথ হয়তো ভয়ে বলতে চাইবে না—স্বীকার করতে চাইবে না কথাটা।

সত্য বলবে না—

কিন্তু সুন্দরম্ তাকে বলবে, ভয় নেই শিবনাথ—আমি সেজন্য আসি নি—আমি এসেছি কেবল আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে—

প্রায়শ্চিত্ত—কিসের প্রায়শ্চিত্ত!

মৃন্ময়ীকে আমি একদিন তার ঘর থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলাম—লুঠ করে নিয়ে এসেছিলাম—সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই তাকে তার আত্মীয়দের কাছে আবার ফিরিয়ে দিয়ে · বল শীঘ্র সে কোথায়—তাকে বলো কোন ভয় নেই—কোন চিন্তা নেই তার। তাকে তার আত্মীয়দের কাছেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসবো বলেই এসেছি আমি।

কিন্তু—

নচেৎ তারা আমাকে ক্ষমা করবে না—তারা আমায় গ্রহণ করবে না।

কী বলছেন আপনি সাহেব—হয়তো প্রশ্ন করবে শিবনাথ।

সুন্দরম্ বলবে, ঠিকই বলছি। আমি ক্রিশ্চান নই—পতুর্গীজ নই—তোমাদেরই মত ব্রাহ্মণসন্তান—হিন্দু হিন্দুর সন্তান—আমার শরীরে হিন্দুর ব্লাড—আমার ফাদার আমার মাদার হিন্দু—দয়া করো শিবনাথ—প্লীজ দয়া করো—

কিন্তু গিয়ে সেখানে জানতে পারল খোঁজ নিয়ে · ভৃত্যের মুখে, শিবনাথ সত্যি সত্যিই সেখানে থাকে বটে তবে এখন নেই—

নেই?

না—ভৃত্য পুনরায় বলে।

তুমি ঠিক জান বাবু—তোমাদের দাদাবাবুর বন্ধু এখন বাড়িতে নেই?

না—

কিন্তু এত সকালে কোথায় যাবে সে?

তা কি করে বলি বলুন—নেই তাই বললাম।

বেশ—তবে তোমার দাদাবাবুকেই না হয় একবার ডেকে দাও—

তিনিও নেই—

তোমার দাদাবাবুও নেই—জীবনকৃষ্ণবাবুও নেই?

না।

সেও বের হয়েছে?

তাই তো দেখছি—দুজনার একজনাও তাদের ঘরে নেই—গিন্নীমা ডাকতে এসে তাঁর ছেলেকে পেলেন না—

কি রকম?

তবে আর বলছি কি—তাতেই তো তার বন্ধুরও খোঁজ পড়ল—দেখা গেল স্বজনার একজনও নেই—

কোথায় গেল তারা?

তা কি করে বলি বলুন!

কোথায় গেলে এখন তাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে তাও বলতে পার না?

না বাবু—তারা বাবু—আমি চাকর—চাকরের অত খবর জানার কি প্রয়োজনটাই বা বলুন—

হঠাৎ যেন সুন্দরমের মাথায় একটা কথা উদয় হয়।

বলে, আচ্ছা বাপু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—রাগ করবে না তো—

কী কথা তাড়াতাড়ি যা বলবার বলুন আমার কাজ আছে—ভৃত্য বিরক্ত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

এখানে একজন থাকে—

কে—কার কথা বলছেন!

মানে একটি গার্ল—মেয়েছেলে—

মেয়েছেলে?—ভৃত্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় সুন্দরমের মুখের দিকে।

হ্যাঁ-এই বয়স ধর—চোদ্দ কি পনের—

না, না—সে রকম কেউ থাকে না।

হার নেম ইজ মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ী তার নাম—

না—কেউ নেই এখানে।

ভৃত্য আর দাঁড়ায় না। রূঢ় সন্দিগ্ধভাবে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে ভিতরে চলে যায়।

ওরা দাঁড়িয়ে থাকে।

মাঝি—

সাহেব—

এমানুল্লা সুন্দরমের মুখের দিকে তাকায়।

এখন কি করি মাঝি?

আবার একসময় আসা যাবে না হয়—এমানুল্লা বলে, খোঁজ যখন পাওয়া গেল এখানেই সে থাকে—

কিন্তু—বললে যে মৃন্ময়ী এখানে নেই—তাহলে মৃন্ময়ী কোথায়? কোথায় তাকে ও সরিয়ে ফেলল—হোয়ার—

একটা কথা বলছিলাম সাহেব—

কী ?

এমনও তো হতে পারে—মৃন্ময়ী তার সঙ্গে আসে নি—

তাহলে—

হয়তো সে একাই চলে এসেছে—দুজনে আলাদা আলাদা চলে এসেছে—

বলছো !

সন্দিগ্ধভাবে তাকায় এমামুল্লার মুখের দিকে সুন্দরম্।

দু'চোখে তার অসহায় করুণ দৃষ্টি।

সত্যি কথা বলতে কি, এমামুল্লার যেন মায়াই হয় ঐ মুহূর্তে সুন্দরমের বিষণ্ণ শুষ্ক মুখটার দিকে তাকিয়ে।

মুখ-ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি—রুক্ষ চুল—চোখের তারায় বিষণ্ণ দৃষ্টি।

চিরদিনের সেই পরিচ্ছদ গায়ে নেই—একটা ধুতি আর গায়ে একটা চাদর মাত্র—পায়ে চর্মপাদুকা নেই—খালি পা।

এই কি সেই দুর্ধর্ষ সুন্দরম্। কাপিতান রোজারিওর সন্তান সুন্দরম্।

সুন্দরম্ বলে, মৃন্ময়ীকে তাহলে কি আমি আর খুঁজে কোনদিনই পাবো না—

কেন পাবে না সাহেব—নিশ্চয়ই পাবে—কোথায় যাবে সে !

কিন্তু যদি—

কী ?

গঙ্গার জলে ডুবে সুইসাইড্ করে থাকে—আত্মহত্যা—

না, না—কি যে বল !

ওরা সব পারে এমামুল্লা—ওরা সব পারে—ধর্মের জন্য—হিন্দুত্বের জন্ম হিন্দু নারীরা সব পারে—you can't imagine—চিন্তা তো করতে পারবে না—how great they are—তারা কত মহৎ—কত পবিত্র—ওরা স্বামীর সঙ্গে হাসতে হাসতে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করতে পারে—জান মাঝি সেদিন গঙ্গার ঘাটে বসে একজন হিন্দু story-teller—কথকের গল্প—story-telling—গল্প বলা শুনছিলাম—মহাভারত না কি—তার থেকেই he was narrating a story—একটা গল্প বলছিল—

কী সে গল্প ?

Old daysয়ে পুরাকালে হস্তিনাপুরে নাকি একজন blind king—অন্ধ রাজা ছিল—ধৃতরাষ্ট্র না কি যেন তার name—তার wife—স্ত্রী কি করেছিল for her husband—স্বামীর জন্য জান ?

কি কাপ্তান—

Though she had her eyes—যদিও তার দুই চক্ষুই ছিল, সে till death—মৃত্যু পর্যন্ত তার চোখে কাপড় বেঁধে নিজের দুটো চোখকেও অন্ধ করে রেখেছিল—could you imagine such a devotion—such a love—এই পতিভক্তি এই পতিপ্রেম—একজন হিন্দু নারীর তার স্বামীর প্রতি—একমাত্র ভারতবর্ষের হিন্দু রমণী ছাড়া কোন দেশের কোন রমণী পারতো ঐ কাজ—পারতো তার স্বামীর জন্য অত বড় sacrifice—আত্মত্যাগ করতে ?—সেই হিন্দুর রক্তই তো মৃন্ময়ীরও দেহে—আমি যখন তার জাত ধর্ম সব ছিনিয়ে নিয়েছি—তখন সে যদি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যাই করে থাকে সেটা কি খুব আশ্চর্যের কিছু হবে—

না, না—সাহেব—তা সে করে নি—আমি বলছি সে করে নি।

এমাছুল্লা সুন্দরম্‌কে সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু সুন্দরম্‌ কি সান্ত্বনা পায় ?

তার বিশাল বুকখানা কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে।

চল সাহেব—

কোথায় ?

এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে—বাড়ি চল—

না—মাঝি তুমি যাও—আমি যাবো না—

যাবে না !

না—till he comes back—যতক্ষণ না সে ফিরে আসে ব্যানিয়ান্‌ ট্রি-টার নীচে বসে অপেক্ষা করব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

রাত থাকতেই দুজনে বের হয়ে পড়েছিল।

জীবনকৃষ্ণ শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে ডুয়েলের জন্য বেলভেডিয়ারের ময়দানের দিকে বের হয়ে পড়েছিল।

অনেকটা পথও—হেঁটে গেলে সময় লাগবে।

কথা যখন দিয়েছে সে ঠিক সময়েই তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে হবে।

ডুয়েলের ময়দান—যুদ্ধক্ষেত্র তো বটে।

যুদ্ধ করেই তো সেখানে তাদের পরস্পরের ভাগ্য নির্দিষ্ট হবে—স্থিরীকৃত হবে।

কার কণ্ঠে বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য দুলিয়ে দেবেন।

কে বিজয়ী হয়ে কণ্ঠে দোলাবে রাজকন্যার হাতের মালা।

চারিদিকে তখনো অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে আছে—যদিও রাত্রির শেষ যাম, ত্রিযামা রাত্রির শেষ প্রহর চলেছে।

রাস্তাঘাট যতদূর দৃষ্টি চলে জনহীন। একটি মানুষ পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

তার উপরে পৌষের পাতলা একটা কুয়াশা চারিদিকে থির থির করে যেন কাঁপছে—আবছায়া একটা রহস্যের মত।

শিবনাথ শেষ পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণকে বুঝিয়ে অনেক করে ডুয়েল লড়া থেকে নিবৃত্ত করতে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জীবনকৃষ্ণর সেই এক কথা।

তুমি বুঝতে পারছো না শিবনাথ, এ কেবল রেবেকার প্রেমই নয় বা আমার ভালবাসার মর্যাদাই নয়—এর মধ্যে আমার পৌরুষের প্রতি চ্যালেঞ্জও আছে—

কিন্তু—

না, না—ও ইংরেজ বলে কি মনে করেছে ও নিজেকে—আজ ভাগ্যদোষে আমাদের নিজেদেরই ভুল আর ত্রুটির সুযোগ নিয়ে কতকগুলো হীন দেশদ্রোহীর চক্রান্তের সুযোগ নিয়ে আমাদের দেশটা অধিকার করে আমাদেরই মাথার উপরে বসে ভাবছে—আমরা ওদের পায়ের নীচে থাকবার যোগ্য—এত দম্ভ—এত অহংকার—

আমি সে দিকটা যে ভাবি নি তা নয় ভাই—আমি বলতে চেয়েছিলাম—পিস্তল ছাড়া অন্য কোন ভাবে যদি ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করা যেত—তুমি যে কখনো পিস্তলই ছোঁড় নি—

নাই বা ছুঁড়লাম—শান্ত হাসি হেসে বলে জীবনকৃষ্ণ, আজই না হয় প্রথম ছুঁড়বো—জীবনে অনেক দুরূহ কাজই তো মানুষকে অনেক সময় প্রথম করতে হয়—

কথা বলতে বলতে একটা দৃঢ় সংকল্প যেন জীবনকৃষ্ণকে কঠিন করে তোলে। সে বলে, জান শিবনাথ—আর কিছু না—মরতে আমি ভয় পাই না—কিন্তু বাবা-মার আমি একমাত্র সন্তান—বাবা হয়তো একদিন ভুলতে পারবেন কিন্তু মা—আমার মা—কথাটা ভাবলেই মনে হচ্ছে এতবড় দুঃখটা মা যদি না সইতে পারেন—

তুমি ফিরে চল জীবন—

শোন শিবনাথ—পড়ার টেবিলের ওপরে একটা ছোট গীতা আছে দেখবে—

গীতা।

হ্যাঁ—সে গীতা কখনো কোন দিন আমি স্পর্শ পর্যন্ত করি নি—আর হাজতিতে সারাটা রাত জেগে সেই গীতা আমি দু'দুবার আগাগোড়া পড়েছি—

তুমি গীতা পড়েছো জীবন ?

শিবনাথের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

হ্যাঁ পড়েছি—আর পড়তে পড়তে কি মনে হয়েছে জান—এমন আশ্চর্য একটা বই বোধহয় পৃথিবীর কোথায়ও পৃথিবীর কোন ভাষাতেই আজ পর্যন্ত রচিত হয় নি—it is really unique—অপূর্ব—অতুলনীয়—এক জায়গায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানী দেহী। মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে, ঠিক তেমনি আমাদের আত্মাও পুরানো দেহ ছেড়ে নতুন দেহে আশ্রয় নেয়।

তুমি—তুমি বিশ্বাস কর গীতার ঐ কথা জীবন ?

প্রশ্নটা না করে যেন পারে না শিবনাথ। আজ জীবনকৃষ্ণর মত লোকের মুখে ঐ ধরনের নতুন কথা শুনে তার বিস্ময়ের অবধি নেই।

সে যেন জীবনকৃষ্ণকে আজ ঠিক চিনতে পারছে না।

এই কি তার সেই পরিচিত জীবনকৃষ্ণ।

ডিরোজিওর ছাত্র জীবনকৃষ্ণ।

যে ঈশ্বরকে পর্যন্ত বিচারবুদ্ধিতে গ্রহণ করতে চায়—এ কি সেই জীবনকৃষ্ণ ? না এ অন্য আর কেউ—এই কি সে রামমোহনের অনুসরণকারী ?

যিনি বলেন ঈশ্বর নিরাকার। এবং যিনি তার বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিংবা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্তর পঞ্চাশতধিক পাঁচ শত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের কিংবা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত, কিন্তু ঐ সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিংবা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।

যে জীবনকৃষ্ণ ঘোরতর রূপে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মতামত পোষণ করে এসেছে—এ কি সেই জীবনকৃষ্ণ ?

শিবনাথ প্রশ্ন না করে পারে না, তাহলে তুমি আমাদের ভগবান কৃষ্ণকে স্বীকার কর জীবন ?

করি—ভগবান নয়—কৃষ্ণকে স্বীকার করি।

সে আবার কি রকম ?

তাঁর তোমাদের মত দেবতা হিসাবে নয়।

তবে—

এক অতিমানব হিসাবে—এক যুগপ্রবর্তক—এক সত্যদ্রষ্টা মহযোগী হিসাবে—এক সত্যর প্রতীক হিসাবে।

কি জানি কেন শিবনাথ প্রসঙ্গটার জের আর টানতে চায় না।

চুপ করে যায় ঐখানেই—

কিন্তু জীবনকৃষ্ণ থামে না—যেন কি এক স্বপ্নের ঘোরে আবিষ্ট কণ্ঠে বলে চলে, মানুষের মনুষ্যত্ব—তার শুভবুদ্ধি—তার জীবনের সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করাতে তাকে পরম কল্যাণের পথ-প্রদর্শন করাতে মানুষের মধ্যে মধ্যে এমন এক-একজনকে প্রয়োজন হয় যিনি চরিত্রে বিচারে বুদ্ধিতে যুক্তিতে সমস্ত জাত সমস্ত ধর্ম সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে এক বিরাট মহিমায় আবির্ভূত হন। তাকেই আমরা বলি কৃষ্ণ—রাম—জান শিবনাথ—আজকের রামমোহন ঠিক তেমনি এক বিরাট চরিত্র—আজ রামমোহনকে কেউ বুঝতে পারছে না, তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পারছে না কিন্তু একদিন সমস্ত ভারত তাঁর পায়ে মাথা নত করে বার বার প্রণাম জানাবে—

কথাগুলো বলতে বলতে জীবনকৃষ্ণ দুই হাত তুলে প্রণাম জানায় রামমোহনের উদ্দেশে—রাত্রির শেষ প্রহর তখন উত্তীর্ণপ্রায়।

পূর্বাশার প্রান্তে মৃদু একটা আলোর আভাস যেন বিলীয়মান অন্ধকারের বুকে থির থির করে কাঁপছে।

আর কতদূর বেলভেডিয়ার?

শিবনাথ কোন দিন ঐ দিকে যায় নি—সে-ই প্রশ্নটা করে।

এসে গিয়েছি—আর দূর নেই—

আর্নল্ডকে চিঠিটা লিখেও কেন যেন রেবেকা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

একটা অনিশ্চয়তা—একটা সংশয়ের ব্যাকুলতা যেন তাকে মনের মধ্যে বিশ্রী ভাবে পীড়ন করতে থাকে কেবলই।

সে ছটফট করতে থাকে ভিতরে ভিতরে।

তার আয়া মালিনী এসে বলেছে বটে চিঠিটা সে যথাস্থানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে এসেছে, কিন্তু যদি কোন গোলমাল হয়?

শেষ পর্যন্ত চিঠিটা যদি আর্নল্ডয়ের হাতে গিয়ে না পৌঁছায়।

যদি শেষ পর্যন্ত কোন একটা গোলযোগ ঘটেই যায়—তবে তো চিঠিটা আর্নল্ড

পাবে না—তাছাড়া আরো একটা সন্দেহও মনের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে রেবেকার—

মিঃ মট্—তার ভাইয়ের মত ঐ আর্নল্ডও নেটিভকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে—তারা মানুষ নয় বলে—

সে যদি রেবেকার এই প্রত্যাখ্যানকে শেষ পর্যন্ত অপমান বলে বোধ করে—সে অপমানের জ্বালাটা কি এত সহজে সে ভুলতে পারবে!

এক পিউরিট্যান ইংলিশম্যানের ভ্যানিটি যে কি তা তো রেবেকার অজানা নেই—

তাছাড়া চিঠি পেয়ে সে কি এতক্ষণে একবার মিঃ মটের সঙ্গে দেখা করতে আসত না?

এসে নিশ্চয়ই বলতো দেখ—তোমার ভগিনী কি চিঠি আমায় লিখে পাঠিয়েছে—

সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হতে থাকে যত সময় গড়িয়ে চলে সেই ভয়ংকর মুহূর্তের দিকে।

সারাটা রাত রেবেকা একটিবারের জন্য চোখের পাতা বোজা দূরে থাক—শয্যাতেই যায় না। অস্থির অশান্ত ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

বাইরে পৌষের রাত্রির শীতার্ত অন্ধকার।

না—এমনি করে আর স্থির থাকা যায় না।

অন্ধকার তখনো বাইরে জমাট বেঁধে আছে।

একটা পশমের জামা গায়ে চাপিয়ে—মাথায় টুপিটা এঁটে—ঘরের আলোটা নিভিয়ে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল রেবেকা।

বাড়ির অন্যান্য সকলে তখন গভীর সুখনিদ্রায় মগ্ন।

বেলভেডিয়ার অজানা নয় রেবেকার।

পা টিপে টিপে রেবেকা আস্তাবলের দিকে যায়—

আস্তাবলে দুটি ঘোড়া ছিল।

মিঃ মট্ ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালবাসতেন। রেবেকা মধ্যে মধ্যে শখ হলে ময়দানে ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে যেত।

ঘোড়া দুটির মধ্যে একটি বাদামী রংয়ের, অন্যটি একেবারে ধবধবে সাদা। রেবেকার ঐ সাদা ঘোড়াটিই বেশী পছন্দ ছিল।

রেবেকা যতই চুপি চুপি আসুক—সহিস রহিমবক্স কিন্তু তার পদশব্দে জেগে ওঠে।

কে ?

রহিম আমি—

মেমসাব্‌!

হ্যাঁ, ঐ সাদা ঘোড়াটায় জিন দিয়ে দাও আমি একটু বেরুব হাওয়া খেতে।

কিন্তু মেমসাহেব এখনো তো বেশ রাত আছে—বাইরে বেশ অন্ধকার!

রহিম কথাটা বলে ইতস্ততঃ করতে থাকে।

তা হোক, তুমি দাও জিন চাপিয়ে ঘোড়ায়।

রহিম আর কি করে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে দিল।

রেবেকা অশ্বারূঢ় হয়ে বের হয়ে গেল।

সত্যিই তখনো বাইরে বেশ অন্ধকার আর অল্প অল্প কুয়াশা।

কিন্তু অশ্বচালনায় রেবেকা রীতিমত পারদর্শিনী। সে বেশ বেগেই অশ্বচালনা করে বেলভেডিয়ারের দিকে।

নেহাৎ কম পথ নয়—প্রায় মাইল তিনেক পথ তো হবেই।

॥ ২ ॥

আর্নল্ড আর্দালী নবাবকে বলে রেখেছিল একটু যেন তাড়াতাড়ি তুলে দেয় তাকে সেদিন ঘুম থেকে।

তার বিশেষ কাজ আছে।

আর সহিসকে বলে দিয়েছিল জিন চড়িয়ে একটা অশ্ব প্রস্তুত রাখতে।

আগের রাত্রে একটা বলডান্স ছিল—আর্নল্ড প্রচুর মদ্যপান করেছিল এবং রীতিমত মত্ত ও টলটলায়মান অবস্থায় কোয়ার্টারে ফিরে এসেছিল।

আর্দালী এসে যখন ডাকল আর্নল্ড তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে নাসিকা গর্জন চলেছে।

থমকে দাঁড়ায় আর্দালী মনসুর বেগ।

কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

যদিচ সাহেবের অর্ডার আছে তাকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে তুলে দেবার, কিন্তু লোকটা যেমন রগচটা ও অশান্ত প্রকৃতির যদি হঠাৎ ক্ষেপে যায়।

ইতস্ততঃ করে নবাব।

কী করবে—না করবে কিছুক্ষণ ভাবে।

বিরাট দশাসই চেহারা। বেবুনের মত লাল মুখ—আর দেখতেও অবিকল ঠিক তেমনি। গতরাত্রে মত্ত অবস্থায় অনেক রাত্রে ফিরেছে—ইউনিফর্মটা পর্যন্ত

গা থেকে ভাল করে খোলে নি। গায়ের কোটটা খুলেছে বটে তবে পাতলুনটা তখনো পরনে।

আর পায়ের ভারী বুট জুতোও তখনো পায়ে।

সেটা বোধ করি খোলবারও অবস্থা ছিল না।

অন্যান্য দিন নবাব সব বদলে দেয়, কিন্তু গতকাল মনসুরও এত বেশী সিদ্ধি টেনেছিল, সন্ধ্যাবেলায় সাহেব গৃহে না থাকায় যে তারও তখন অবস্থা খুলে দেবার মত ছিল না—যখন আর্নল্ড ফিরে আসে গ্যারিসনের কোয়ার্টারে।

পাশেই পড়ে আছে মোটা চামড়ার কোমরবন্ধটা—তার সঙ্গে খাপে ভরা পিস্তলটা।

পিস্তলটার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

একটা নয় খাপে ভরা আর একটা পিস্তলও পড়ে আছে প্রথমটার পাশে।

দুটো পিস্তল আবার কেন!

যাক গে, আদার ব্যাপারী সে – জাহাজের খোঁজে তার প্রয়োজনটাই বা কি।

নবাব শেষ পর্যন্ত তার প্রভুকে ডেকে তোলাই মনস্থ করল। এবং শুধু ডাকা নয় কয়েকবার ঠেলে ঠুলে ধাক্কা দেবার পর চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল আর্নল্ড—Whst's up!

আজ্ঞে সাহেব—সকাল সকাল তুলে দিতে বলেছিলে—কাঁচুমাচু হয়ে নবাব বলে।

'সোয়াইন' বলে একটা কুৎসিত গাল দিয়ে মারতে যাচ্ছিল আর্নল্ড নবাবকে কিন্তু হঠাৎ সামলে যায়।

মনে পড়ে যায় বোধহয় কথাটা।

বলে, হট্ ওয়াটার রেডি করেছিস্।

জী—

টী?

হ্যাঁ—

আর্নল্ড আর বাক্যব্যয় করে না, শয্যা হতে উঠে পড়ে।

গত রাত্রে মাত্রাহীন মদ্যপানের ফলে মাথাটার মধ্যে তখনো ঝিম ঝিম করছে—লোহার মত ভারী হয়ে আছে মাথাটা।

রাত শেষ হয়ে এলো প্রায়—আর বেশী দেরি নেই।

হাত মুখ ধুয়ে ক্ষৌরকর্ম করে পোশাক বদলে—গরম চা এক মগ পান করে আর্নল্ড প্রস্তুত হয়ে নিল।

কোমরে চামড়ার বেল্টটা এঁটে নিল। এবং দুপাশে দুটো পিস্তল ঝুলিয়ে দিল।

অন্য পিস্তলটা সে বন্ধু লেফটেনাণ্ট ব্যাটম্যানের কাছ থেকে চেয়ে রেখেছিল—এবং কথা আছে তারও সঙ্গে যাবার।

এবং কথা ছিল ব্যাটম্যানকেই ডেকে নিয়ে যাবার কিন্তু তা আর ডাকতে হলো না—ব্যাটম্যানই নিজে এসে হাজির হয়।

ব্যাটম্যানের ডাক শুনে আর্নল্ড ঘর থেকে বের হয়ে-আসে।

Good morning—ব্যাটম্যান বলে।

মর্ণিং—

তুমি রেডি?

হ্যাঁ।

তবে আর দেরি কেন, চল?

চল।

দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে বের হয়ে যায় কেল্লা থেকে।

কেল্লা থেকে বেলভেডিয়ারের দূরত্ব খুব কম নয়—মাইল আড়াই তো হবেই।

রাত্রিশেষের তরল অন্ধকার একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে—পুব দিগন্তে একটা চাপা রক্তিম আভাস।

কি জানি কেন আর্নল্ড একেবারে চুপচাপ।

নিঃশব্দে ঘোড়া মধ্যম গতিতে ছুটিয়ে চলেছে।

কী ব্যাপার—মিঃ ব্যাটম্যান শুধায়—একেবারে চুপচাপ কেন?

না ভাবছি—

কী—আরে একটা নেটিভ্‌ কালা আদমী - জীবনে কখনো পিস্তল ধরা দূরে থাক চোখেও হয়তো দেখে নি—একটা বুলেটেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে—ক্লাবে আমরা কি বলাবলি করছিলাম কাল জান?

কি—

কি অডাসিটি—কি স্পর্ধা—একটা নেটিভ্‌ সে কি না একটা ইংলিশম্যানের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে আসছে—what they think—ঐ হিদেনরা নিজেদের কি ভাবে?

আমারও তো লজ্জা সেইখানেই ব্যাটম্যান—আর্নল্ড বলে।

লজ্জা!

নয়—ডুয়েল লড়তে হচ্ছে কিনা শেষ পর্যন্ত একটা নেটিভের সঙ্গে—ব্যাপারটা

তো কিছু চাপা থাকবে না—যেমন করেই হোক সমাজে প্রকাশ হয়ে যাবেই তখন আমি মুখ দেখাব কি করে ?

দূর, তুমিও যেমন—এতে লজ্জার কি আছে—প্রেমিকার জন্য ডুয়েল লড়তে চলেছো—তোমার love-য়ের জন্য duel লড়তে চলেছো—তাছাড়া আমার কি মনে হচ্ছে জান ?

কি ?

শেষ পর্যন্ত ঐ নেটিভ্ বেটা হয়ত আসবেই না।

না, না—

দেখে নিও তুমি—প্রাণের ভয়ে হয়তো আসবেই না।

কিন্তু লেঃ আর্নল্ড ও ব্যাটম্যান বেলভেডিয়ারের ময়দানে এসে পৌঁছে দেখলো তাদের আগেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জীবনকৃষ্ণ এসে হাজির হয়েছে।

জীবনকৃষ্ণ ও তার বন্ধু শিবনাথ দুজনে একটা বড় শিমূল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওদের অপেক্ষা করছে।

আর্নল্ডই প্রথমে ওদের দেখতে পায়। বলে, Look ব্যাটম্যান—they have come already—ওরা এসে গিয়েছে !

আরে সত্যিই তো—বেটা নেটিভের বুকের পাটা আছে তো !

আর্নল্ড সোজা এসে ওদের সামনে দাঁড়ল, জীবনকৃষ্ণ—তাহলে তুমি প্রস্তুত ?

হ্যাঁ—

O. K.

অতঃপর ব্যাটম্যানই—ডুয়েলের নিয়ম মত বারো পা করে জমি মেপে দাগ দিয়ে দিল।

তারপর আর্নল্ড শুধায়, তোমার পিস্তল নেই তো—

না—তুমি তো বলেছিলে দেবে।

হ্যাঁ—এনেছি—here you are—কোমর থেকে দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করে এগিয়ে দেয় আর্নল্ড জীবনকৃষ্ণর দিকে।

হাত বাড়িয়ে জীবনকৃষ্ণ পিস্তলটা গ্রহণ করে আর্নল্ডয়ের কাছ থেকে।

ঠাণ্ডা ইস্পাত যেন একটা বিচিত্র শিহরণ তোলে মুহূর্তে জীবনকৃষ্ণর দেহের শিরায় শিরায়।

অল্প দূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শিবনাথ।

সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তখন চেয়ে আছে জীবনকৃষ্ণর মুখের দিকে। অদ্ভুত একটা

দৃঢ়তা—অদ্ভুত একটা প্রতিজ্ঞা যেন ওর চোখে-মুখে।

ওর দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে। এ যেন শিবনাথের পরিচিত জীবনকৃষ্ণ নয়—অন্য কেউ।

You know how to shoot—গুলি ছুঁড়তে হয় কেমন করে জান?

না।

এসো দেখিয়ে দিই—

আর্নল্ডই দেখিয়ে দিলে—একটা গুলি ছুঁড়লোও জীবনকৃষ্ণ।

তারপর দুটি পিস্তলেই মাত্র একটি করে গুলি ভরে দুজনে দুটি পিস্তল হাতে নিয়ে বারো পা ব্যবধানে গিয়ে পরস্পর থেকে দাঁড়াল।

॥ ৩ ॥

এখন প্রশ্ন—কে আগে ফায়ার করবে।

কে আগে গুলি ছুঁড়বে।

তখন মিঃ ব্যাটম্যানই একটা রূপার সিক্কা টাকা টস্ করে বললে—লেঃ আর্নল্ডই প্রথম ফায়ারের সুযোগ পেল।

হাতে একটা রুমাল নিয়ে ব্যাটম্যানই স্টার্ট দিল।

বললে, ফায়ার—

লেঃ আর্নল্ড পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করে পিস্তলের ট্রিগারে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের চাপ দিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল—প্রথম ভোরের আবছা আলোয় ঝড়ের বেগে একটা সাদা ঘোড়া ওদের দিকে—ওদের দুজনার মাঝ-বরাবর যেন ছুটে আসছে।

একটা নারীকণ্ঠে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যায়—Stop—stop—ঈশ্বরের দোহাই—for heaven's sake stop—বন্ধ কর—

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে।

অবশ্যম্ভাবীকে রোধ করা যায় নি।

আর্নল্ডয়ের বুড়ো আঙুলের চাপে ট্রিগার পিছনে হটে এসেছে এবং অব্যর্থ-লক্ষ্য গুলি পিস্তলের নল দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে—

কিন্তু সে গুলি জীবনকৃষ্ণকে স্পর্শ করে নি—তার আগেই অশ্বারূঢ় রেবেকা—ওদের মাঝখানে এসে পড়ায় গুলি গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে রেবেকার ডান দিককার বুকে।

একটা অস্ফুট চিৎকার করে রেবেকা ঘোড়ার উপরেই টলে পড়ে যায়।

তার সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র রক্তে মুহূর্তে লাল হয়ে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা চারজনই যেন বিমূঢ় হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

বোবা হয়ে গিয়েছিল।

পাথর হয়ে গিয়েছিল।

রেবেকা—আহত রেবেকা ততক্ষণে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছে।

পাগলের মতই যেন ছুটে আসে জীবনকৃষ্ণ।

রেবেকার আহত রক্তাক্ত দেহটা বুকের উপর তুলে নেয়—

এ তুমি কি করলে রেবেকা—why—এ তুমি কেন করলে?

কান্নায় জীবনকৃষ্ণর গলার স্বর বুজে আসে—

আর্নল্ডও তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—

মাথা নীচু করে—অনুতপ্ত অপরাধীর মত—বিষণ্ন ম্লান।

সেও ডাকে, রেবেকা—

Yes আর্নল্ড—ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে কোনমতে বলে রেবেকা।

I am very sorry—very sorry— আমি গভীর দুঃখিত—বলে আর্নল্ড।

না—না—সব—সব আমার দোষ—আগে যদি তোমাকে সব জানাতাম—Last momentয়ে—শেষ মুহূর্তে চিঠিতে সব না জানিয়ে—যে জীবনকে সত্যিই আমি ভালবাসি—আমি তাকে word দিয়েছি—

চিঠি—what are you saying—কি বলছো তুমি, কিসের চিঠি—আর্নল্ড বিস্ময়ের সঙ্গে শুধায়—

কেন—তুমি আমার কোন চিঠি পাও নি?

না—never—

আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল—

But we must not waste any. time. ব্যাটম্যান—Let us take her to the Hospital—ওকে এখুনি—

চল হাসপাতালে নিয়ে যাই—

তখন থেকে থেকে হিক্কা তুলছে রেবেকা। প্রচুর রক্তক্ষরণে ক্লান্ত—চোখ দুটো বুজে আসছে।

মুখের কথা জড়িয়ে আসছে।

বলে, না, না—আর নয়—আর টানাটানি করো না—let me die—let

me die peacefully—শান্তিতে আমায় মরতে দাও—

কেন—কেন তুমি আমায় বল নি রেবেকা—that you love him—জীবনকৃষ্ণকেই তুমি ভালবাস—

আর্নল্ড—

জড়িয়ে জড়িয়ে ক্লান্তকণ্ঠে ডাকে রেবেকা।

বল—

পরস্পর তোমরা বন্ধুর মত হাত মিলাও—let me see—that you are friends—তোমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু—

আর্নল্ড ও জীবনকৃষ্ণ পরস্পরের হাত মুঠো করে ধরে।

দুজনে দুজনার দিকে তাকায়।

আঃ—

রেবেকা চোখ বোজে।

চিৎকার করে ওঠে জীবনকৃষ্ণ, রেবেকা—রেবেকা—

উন্মুক্ত বেলভেডিয়ার প্রান্তরে সে ডাক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যায়।

প্রথম সূর্যের আলো উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘাসের শিশিরে শিশিরে ঝিল্‌মিল্ করে ওঠে।

শিমূল গাছটায় কোথা থেকে একটা ছোট্ট পাখী এসে বসেছে—কেবলই ডাকছে—

আমেন—

বুকের উপরে ক্রস করে ব্যাটম্যান ও আর্নল্ড।

জীবনকৃষ্ণ শুধু পাথরের মত রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ রেবেকার মৃতদেহটা বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

চোখে এক ফোঁটাও আর জল নেই।

আর ঠিক সেই সময় ওদের কানে এলো দূরাগত একটা অশ্বক্ষুর ধ্বনি—

কে যেন ঝড়ের বেগে একটা কালো ঘোড়ায় চেপে ঐ দিকেই ছুটে আসছে।

কে, মিঃ মট্ই তো!

ইয়েস—মিঃ মট্ না?

সহিসের কাছে খবর পেয়ে মিঃ মট্-ই ছুটে আসছে বোনের খোঁজে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘোড়ার রাশ টেনে গতিরোধ করে মিঃ মট্—তারপরই রেবেকার রক্তাক্ত নিশ্চল দেহটার দিকে তাকিয়ে অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার করে ওঠে।

রেবেকা—মাই ডিয়ার সিস্টার—

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামে মিঃ মট্।

এ দুর্ঘটনা কেমন করে ঘটলো আর্নল্ড—

আর্নল্ড তখন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে।

তারপর বলে, দোষী আমিই—প্রথমতঃ আমারই গুলিতে ও মরেছে—দ্বিতীয়তঃ আমার প্রতি রেবেকার বরাবরের কোল্ড্ ব্যবহার দেখে বোঝা উচিত ছিল she loves somebody else—সে অন্য কাউকে ভালবাসে—আমাকে নয়—আমাকে নয়—আমাকে তুমি ক্ষমা করো মিঃ মট্—এমনি একটা ফুলের মত প্রাণ অকালে আমি হিংসায় অন্ধ হয়ে নিজের হাতে নষ্ট করে দিলাম—এর জন্য যে আমি কি গভীর অনুতপ্ত—

তোমার আর দোষ কি আর্নল্ড—She was a fool—

না, না—এ কি বলছো—

নিশ্চয়ই, একটা fool—গর্দভ না হলে এত বড় ভুল করে—একটা নেটিভ্‌কে—could you imagine আর্নল্ড—তুমি কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পার একটা নেটিভ্—একটা ব্ল্যাক স্লেভ্—হিদেনকে একজন ইংলিশ হোয়াইট্ গার্ল ভালবেসেছে বা ভালবাসার কল্পনাও করেছে—unthinkable fantastic—

আরো কি বলতে যাচ্ছিল গড় গড় করে ক্রোধে ও আক্রোশের জ্বালায় ছটফট করতে করতে সিভিলিয়ান মিঃ মট্, কিন্তু অকস্মাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

রেবেকার মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে পাশেই আর্নল্ডয়ের দেওয়া এবং পড়ে থাকা গুলিভর্তি পিস্তলটা তুলে নিয়ে ক্রুদ্ধ হিংস্র একটা শার্দুলের মতই যেন রুখে দাঁড়াল জীবনকৃষ্ণ।

বললে, মিঃ মট্—you must withdraw—you must apologise—what you have just now said—তুমি যা এইমাত্র বললে সে কথা তোমাকে ফিরিয়ে নিতে হবে—ক্ষমা চাইতে হবে—

What—কী—কী বললে—মিঃ মট্‌ও রুখে দাঁড়াল, never—কখনো না—what is true I have said—যা সত্যি তাই আমি বলেছি—তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না—

মিঃ মটের কথা শেষ হলো না এবং ব্যাপারটা কেউ বোঝবার আগেই জীবনকৃষ্ণর হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠলো।

গুড়ুম—

অগ্নির একট চকিত ঝলক পিস্তলের নলমুখে নির্গত হয়ে এলো।

কিন্তু অনভ্যস্ততা ও উত্তেজনার দরুন লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো জীবনকৃষ্ণর হাতের পিস্তলের নিক্ষিপ্ত গুলি।

মিঃ মটের বাম বাহু মাত্র স্পর্শ করে গুলি চলে গেল।

একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে মিঃ মট্। এবং ক্ষত যত কমই হোক রক্তক্ষরণ হয়।

বিদ্যুৎবেগে আর্নল্ড ওদের দুজনার মধ্যে ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

Stop—stop—থাম—থাম—ঈশ্বরের দোহাই জীবন—মিঃ মট্—what are you doing—এ তোমরা কি করছো—থাম—থাম।

জীবনকৃষ্ণ ও মিঃ মট্ও ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—ঘটনার অভাবিত আকস্মিকতায়।

লেঃ আর্নল্ডই উভয়কে শান্ত করে।

দুজনার হাত পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়—মিঃ মট্ ও জীবনকৃষ্ণর।

হ্যাণ্ড শেক—করমর্দন করে তারা।

মিঃ মট্ বলেন, আমি—লজ্জিত—দুঃখিত—ক্ষমা করো আমাকে জীবনকৃষ্ণ—

জীবনও বলে, তুমিও আমাকে ক্ষমা করো।

এবারে আর্নল্ডই বলেন, এখন রেবেকার মৃতদেহ নিয়ে কি করা যায়—কি ব্যবস্থা হবে?

মিঃ মট্ বলেন, আমিই সব ব্যবস্থা করবো।

কিন্তু আইন?

ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—সেজন্য তোমাদের কারো ভাবতে হবে না।

কিন্তু মৃতদেহ কবর দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো! আর্নল্ড বলে।

তা তো করতেই হবে—মিঃ মট্ বলেন।

কোথায় গোর দেবে?—আর্নল্ড শুধায়।

দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের যে প্রাচীন গ্রেভ-ইয়ার্ড—গোরস্থান আছে সেখানেই রেবেকার গোর দেওয়া হবে—মিঃ মট্ বলেন।

রেবেকার মৃতদেহ তখন মিঃ মট্ই তাঁর ঘোড়ার উপর তুলে দিলেন সযত্নে। তারপর চারজনে হাঁটতে হাঁটতে শহরের দিকে এগিয়ে চলল।

ঘোড়াগুলো ওদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল।

প্রায় দ্বিপ্রহরে ওরা এসে গোরস্থানে পৌঁছাল।

গোর দিতে দিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ক্লান্ত ভগ্ন মনে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় দুজনে গৃহে ফিরে এলো—জীবনকৃষ্ণ ও শিবনাথ।

অদূরে অন্ধকারে সুন্দরম্ তখনো বটবৃক্ষের তলায় শিবনাথের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু অন্ধকারে ওদের দূর থেকে ঠিক দেখতে পেল না গৃহে প্রবেশের সময়।

সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল সুন্দরম্ সেদিন শিবনাথের অপেক্ষায় ঐখানে—কালীকৃষ্ণের বাড়ির সম্মুখে কিছু দূরে।

অবশেষে এমাদুল্লা এসে বললে, সাহেব, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে—এবারে ফিরে চল।

অস্নাত অভুক্ত সুন্দরম্ তখন সত্যিই আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

কিন্তু তবু বলে, না—ও আসুক—let him come back—ফিরে আসুক ও—

এখনো যখন এলো না—মাঝি বলে, সান্ত্বনা দেয়, আজ হয়তো ফিরবে না—কাল আবার না হয় আসা যাবে। ওর খোঁজ যখন একবার পাওয়া গিয়েছে—ও যাবে কোথায়।

অনেক করে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এমাদুল্লা সুন্দরম্‌কে নিয়ে কুলীর বাজারের গৃহে ফিরে গেল।

কিন্তু পরের দিন সুন্দরমের দুর্ভাগ্য, তার আর আসা হলো না।

ঈশ্বর বাদ সাধলেন।

কটা দিনের অনিয়ম অত্যাচারে অনিদ্রায় অনাহারে দুশ্চিন্তায়—শেষ রাত্রের দিকে প্রচণ্ড জ্বর এলো সুন্দরমের।

মাঝি পরের দিন সকালে ওর খোঁজ নিতে এসে দেখল প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে সুন্দরম্ অজ্ঞান—অচৈতন্য।

মধ্যে মধ্যে কেবল বিড় বিড় করে ভুল বকছে—

মা—মাই মাদার—মৃন্ময়ী—শিবনাথ—ফিরিয়ে দাও শিবনাথ—মৃন্ময়ীকে ফিরিয়ে দাও—নচেৎ এতকাল পরে আমার যে রিয়েল মাদারের খোঁজ পেলাম তার কাছে যে আমার ফিরে যাবার কোন উপায় নেই—প্লীজ—দয়া কর—হ্যাভ মার্সি—

বাড়িতে একা দাক্ষায়ণী।

সে বলে, কি হবে মাঝি ?—সাহেবের যে ভীষণ জ্বর !

তাই তো—কি করা যায় বল তো ?

মানুষটা হঠাৎ যেন বদলে গেল—এমন কেন হলো বলতে পার ?

এমাহুল্লা তখন বলে, দুঃখে – লজ্জায় ।

কেন গো ?

আসলে তো ও ক্রেস্তান নয়—পর্তুগীজও নয় ।

তবে—

ও যে হিন্দু ।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এপ্রিল মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে চুপচাপ বসে থাকেন নি । যে আগুনের শিখা তাঁর অন্তর জুড়ে অহরহ জ্বলছিল তা কিন্তু নিভল না ।

জ্বলতেই লাগল ।

আঠার শতকে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রবল বিপর্যয় ও বিক্ষোভের ঝড় বয়ে চলেছিল—বাংলার জনজীবন তা থেকে মুক্তি পায় নি ।

একদিকে শাস্ত্রকার ও স্মৃতিকারদের কঠোর নিয়মকানুনের লৌহনিগড় দিয়ে যত বজ্র আটনে বাঁধতে চাইছিল জগৎটাকে ততই সমাজের মধ্যে স্খলন—পতন—চ্যুতি ও অধোগতি ক্রমেই তাদের কলুষিত করে তুলছিল ।

কৌলীন্যপ্রথা—বহুবিবাহ—বাল্যবিবাহ—পৌত্তলিকতা—সহমরণ—সতীদাহ প্রভৃতি বীভৎস সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামি একদিকে, অন্যদিকে অশিক্ষা অজ্ঞানতা ও অযৌক্তিকতার গাঢ় অন্ধকার ।

সেই অন্ধকারেই এসে জন্মেছিলেন ডিরোজিও এবং তারও আগে রাজর্ষি রামমোহন—এবং কিশোর বয়স থেকেই বুকের মধ্যে জ্বলে উঠেছিল আগুন ডিরোজিওর ।

Yet tell me,—burns this vital spark,
Or is it quenched, and my soul all dark !

আর সেই আগুনেই পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ডিরোজিও সেদিনকার বাংলার যুবসমাজকে—সমাজের নবচেতনাকে অগ্নিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ।

যাবতীয় ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে—নৈতিক ভণ্ডামি—নোংরামি—কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্রবচন—প্রাণহীন চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ডিরোজিও।

জাতিভেদ—পৌত্তলিকতা—রাষ্ট্রিক—অর্থনৈতিক—মানসিক ও পঙ্গুত্ব নির্বিকার নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে সচেতন করতে চেয়েছিল সেদিনকার সমাজকে ডিরোজিও।

তাঁর শঙ্খনাদ ঘরে বাইরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কিন্তু কি হলো?

সে আগুনে যুবসমাজের অগ্নিশুদ্ধি হলো বটে কিন্তু ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে হলো। পদত্যাগ করবার সময় ডিরোজিও হিন্দু কলেজ কমিটির সহকারী সভাপতি এইচ্. এইচ্. উইলসনকে যে পত্র লিখেছিল তার শেষাংশে সে বলেছে:

মিথ্যা জনরবের ভয়ে অথবা কুৎসা-প্রচারকদের তোষণের জন্য আমাকে কলেজ থেকে কর্মচ্যুত করা কি গভর্নর বাহাদুর—চন্দ্রঠাকুর রাধাকান্ত দেব—রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—রামকমল সেন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পক্ষে সঙ্গত হয়েছে? কেবল জনরব শান্ত করবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষরা আমাকে কর্মচ্যুত করতে বাধ্য হয়েছেন, একথা মেনে নিতে আমি রাজী নই। আগে থেকেই তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন আমাকে তাড়াবার জন্য। তা যদি না হতো—তাহলে এরকম বিচিত্র কৌশলে—সমস্ত সৌজন্য ও শালীনতাবোধ বিসর্জন দিয়ে তাঁরা আমাকে একযোগে এভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতেন না—এর প্রতিবাদ অবিশ্যি আমি করতে পারতাম। কিন্তু প্রতিবাদ করলে পরোক্ষে তাদেরই মতামতের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সেটুকু মর্যাদাও তাদের প্রাপ্য বলে আমি মনে করি না—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

আপনাদের একান্ত অনুগত, এইচ্. এল্. ভি ডিরোজিও।

পদত্যাগের পরও বসে থাকে নি ডিরোজিও নিশ্চেষ্ট নিশ্চুপ হয়ে। সংস্কার ও চেতনার যে অনির্বাণ দীপশিখা তার অন্তরে জ্বলছিল—যে বিক্ষোভের প্রচণ্ড ঝড় তার বুকের মধ্যে অনুক্ষণ বইছিল তারই প্রকাশ পেতে লাগল তার প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় অগ্নিগর্ভ লেখার মধ্যে দিয়ে।

> My country! in thy day of glory past
> A beauteous halo circled round thy brow,

And worshipped as a deity thou wast.

Where is that glory, where that reverence now ?

কিন্তু অকরুণ বিধাতা সে অগ্নিশিখা অকস্মাৎ নির্মম এক ফুৎকারে নির্বাপিত করে দিলেন।

ডিসেম্বর—পৌষ মাস।

হঠাৎ ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষের কাছে সংবাদ এলো তাদের গুরু—তাদের নবচেতনার পথপ্রদর্শক ডিরোজিও ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছে সংবাদটা পৌঁছে গেল।

ছুটে এলো সঙ্গে সঙ্গে সবাই - মহেশ ঘোষ—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—রামগোপাল ঘোষ—দক্ষিণারঞ্জন।

সেটা একটা শনিবার।

আপ্রাণ চেষ্টা ও সেবা করা হলো কিন্তু যে থাকবে না তাকে কি রাখা যায়!

পরের শনিবার ডিরোজিও শেষ নিঃশ্বাস নিলেন।

নবযুগের প্রবর্তক—বিদ্রোহী—বিপ্লব এক যুবক মাত্র বাইশ বছর আট মাস বয়েসে বিধাতার ডাকে মৃত্যুর মধ্যে লীন হয়ে গেলেন, সেদিনকার বাংলার সমস্ত সমাজে অনির্বাণ এক আগুন জ্বেলে দিয়ে।

শেষ সময়ে একজন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি নিজেকে খৃষ্টান বলে স্বীকার করেন না ?

না।

ধর্ম—ঈশ্বর নেই তাহলে ?

ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে চূড়ান্ত সত্য কি আজো তা আমার কাছে অজ্ঞাত মহেশ—আজো আমি তা জানি না—শেষ নিঃশ্বাসের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সে অনুসন্ধানের শেষ হবে না।

Indian Register পত্রিকা ডিরোজিওর ধর্মমত সম্পর্কে লিখল : That he did not view Christianity as a communication from the divinity to fallen man is well-known ; but it is perhaps impossible to say in what manner he came to fall into such an opinion.

খৃষ্টধর্মের নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তার ঈশ্বর-মাহাত্ম্য বা অলৌকিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

কেবল খৃষ্টধর্ম নয়, সকল ধর্মের প্রতি তাঁর একই মনোভাব ছিল।

ধর্মের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও অলৌকিক ব্যাখ্যান যুক্তি দিয়ে তিনি ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেন নি।

তাই ডিরোজিওকে ঠিক খ্রীষ্টধর্মী না বলে, মানবধর্মী বলাই বোধহয় সঙ্গত।

কলকাতার নতুন যুবসমাজ যখন ডিরোজিওর অকালমৃত্যুতে মর্মাহত নির্বাক বিমূঢ়—

ঠিক সেই সময় শিবনাথ মনে মনে স্থির করল সে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ক্রিশ্চান হবে—ধর্মান্তর গ্রহণ করবে সে।

মৃন্ময়ীকে যখন হিন্দুসমাজ মেনে নেবেই না—তাকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করবার কোন আশাই আর নেই কোনদিন, তখন বাধ্য হয়েই তাকে মৃন্ময়ীর জন্য হিন্দুসমাজকে অস্বীকার করতে হবে।

কথাটা একদিন শিবনাথ জীবনকৃষ্ণকে বললে।

জীবনকৃষ্ণ তখন রেবেকার আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুতে কেমন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল—ইণ্ডিয়া গেজেট—বেঙ্গল হরকরা—সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি তখনকার পত্রিকাগুলোতে ওদের ডুয়েলের কাহিনী ও রেবেকার আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং কিছুদিন শহরের যুবকদের মুখে মুখে সেই বিচিত্র রোমাঞ্চকর সংবাদটা নানাভাবে রং চড়িয়ে বিবৃত হয়েছিল।

সে সময়ে যে ঐ ধরনের একটা ঘটনা ঘটতে পারে এ যেন শহরের লোকেরা সেদিন বিশ্বাসই করে উঠতে পারে নি।

কাজেই জনসাধারণের কাছে সংবাদটা মুখরোচক হয়েছিল বৈকি!

মুখরোচক—উত্তেজক সংবাদ।

একজন ইংরেজ আর্মি অফিসারের সঙ্গে এক ইংরেজ রমণীকে কেন্দ্র করে এক বাঙালী তরুণ যুবকের ডুয়েল লড়া।

নিঃসন্দেহে একটা অভাবিত ব্যাপার।

কিন্তু যাকে নিয়ে সারা শহরে এত উত্তেজনা সে যেন কেমন নিস্পন্দ বোবা হয়ে গিয়েছিল। সর্বদা কেমন যেন একটা উদাস অন্যমনস্কতা।

কোন কথাই যেন শুনছে না—কোন কিছুই যেন কানে যাচ্ছে না।

সর্ব ব্যাপারে যেন একটা নিস্পৃহতা!

আর কেউ না হলেও দুজনে জীবনকৃষ্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কেমন চিন্তিত হয়ে ওঠে।

একজন মা সত্যবতী।

অন্যজন বন্ধু শিবনাথ।

বেশী চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয় সত্যবতীই।

একদিন নিভৃতে ছেলেকে ডেকে শুধায়, হ্যাঁরে, কি হয়েছে রে তোর জীবু?

কিছু তো হয় নি মা আমার—

হয়েছে, তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস্—বল বাবা—কী হয়েছে—কিসের দুঃখ তোর? কী চাস তুই?

কিছু হয় নি মা—জীবনকৃষ্ণ বলে, কোন দুঃখই নেই—আর কিছু চাইও না আমি।

জীবু!

সত্যবতীর চোখে জল। ছেলের কণ্ঠস্বরেই সত্যবতী বুঝতে পারে কিছু না কিছু হয়েছে তার ছেলের। তাই আবার বলে, জীবু—আমার কাছে লুকোস নি বাবা—বল—বল তোর কি হয়েছে—

শোন মা—যা আমার হয়েছে তার আর কোন প্রতিকার নেই—মানুষ কেন—তোমাদের ভগবানেরও কোন ক্ষমতা নেই তার প্রতিকার করে—তুমি আমার জন্য কিছু ভেবো না মা—আমি ঠিক আছি—

ছেলেও ঠিক স্বামীর মতই জেদী।

কথাটা ভাল করেই জানে সত্যবতী—কিছুতেই সে কোন কথা বলবে না। অতএব মিথ্যে পীড়াপীড়ি করে কোন লাভ নেই। সেদিন আর সত্যবতী কোন কথা তোলে না—দু-চার দিন পরে আবার একদিন ছেলের ঘরে এসে হাজির হয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জীবনকৃষ্ণ চুপটি করে বসেছিল তার ঘরের মধ্যে।

চাকরে তখনো ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে যায় নি।

জীবু!

কে—মা—ফিরে তাকাল জীবনকৃষ্ণ।

হ্যাঁ, তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল জীবু—দাঁড়া আলোটা দিতে বলি আগে ঘরে—

না মা—আলো থাক, আলো দিতে এসেছিল আমিই বারণ করে দিয়েছি।

কেন রে?

আলো বড় চোখে লাগে মা।

সেকি রে—উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সত্যবতী ছেলের কথায়।

ভয় পেয়ো না মা—চোখে আমার কিছু হয় নি—তুমি কি বলতে এসেছিলে বল।

কর্তা তোর বিয়ের সবকিছু পাকাপাকি করেছেন—সত্যবতী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে কথাটা।

মা—

হ্যাঁ—খুব ভাল ঘরের মেয়ে—কৌলীন্যে বর্ণে একেবারে কোন খুঁত নেই—তাছাড়া দেখতে একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমাটির মত—

বিয়ে আমি করতে পারব না মা।

হঠাৎ যেন সত্যবতীর মাথায় বজ্রাঘাত হলো। বলে, সে কি কথা—

তাই মা—বাবাকে বলে দিও।

জীবনকৃষ্ণর কণ্ঠস্বর যেন কেমন অদ্ভুত শান্ত—কঠিন এবং কথাটা বলে জীবন মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

সত্যবতীর বুকের ভিতরটা ভয়ে তখন যেন কাঁপতে শুরু করেছে।

এ যে তার কল্পনাতীত ছিল।

জীবন—তার জীবু তার কথা মানতে চাইবে না—মুখের ওপরে অমন করে বলবে সে বিয়ে করতে পারবে না এ যে রীতিমত অবিশ্বাস্য ব্যাপার একটা।

জীবু!

সত্যবতী ছেলের দিকে তাকিয়ে আবার ডাকে।

মা—

এ তুই কি বলছিস বাবা—বিয়ে করবি না কি বলছিস।

বিয়ে করব না এই তো বলেছি মা—তার মধ্যে এমন কি থাকতে পারে যেটা তোমার বোধগম্য হচ্ছে না?

তুই আমার একটি মাত্র সন্তান—একটি মাত্র ছেলে—তুই বিয়ে করবি না—ছেলের বৌ নিয়ে আমি সাধ-আহ্লাদ করতে পারব না—

কেন মা—সাধ-আহ্লাদ করার জন্য তোমার ছেলেই কি যথেষ্ট নয়—তার জন্য একটা পরের বাড়ির মেয়েকে বৌ করে আনতে হবে!

জীবু—কী হয়েছে তোর বল—আমার যেন কেমন ভয় করছে বাবা।

এর মধ্যে ভয়েরও কিছু নেই—চিন্তারও কিছু নেই—বিয়ে করবো না আমি।

কিন্তু উনি যে কথা দিয়ে এসেছেন মেয়ে দেখে—

তা দিলেই বা।

বলছিস কি!

হ্যাঁ—বলে দাও তাদের ছেলে এখন বিয়ে করবে না—

মা, না—ওরে এ কথনো হয় না। হতে পারে না—সত্যবতী আর যেন কথা বলতে পারে না। কান্নায় গলার স্বরটা তার বুজে আসে।

তবে কি সেদিন উনি কি বলছিলেন যেন সেইরকমই কিছু—বলতে বলতে চেপে গেলেন।

জীবু—

মা—

সত্যি কথা বল বাবা—কি হয়েছে—কেন বিয়ে করবি না—কেন বিয়ে করতে চাচ্ছিস না?

মা—বিয়েটা তোমরা যতখানি একটা সহজ ব্যাপার ভাবো—আমি ঠিক তা ভাবি নি কোনদিন—ভাবতে পারবোও না কোনদিন—

ছেলের মুখের দিকে মা চেয়ে থাকে, কেমন যেন বোবা—অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে সত্যবতী।

এসব দুর্বোধ্য কি সব বলছে তার ছেলে!

জীবনকৃষ্ণ বলে, তোমাদের সেই মান্ধাতা আমলের যুগ আর নেই মা—যুগ পাল্টেছে অনেক—দ্রুত পাল্টাচ্ছে—বিয়ে একটা অত্যন্ত রেস্‌পনসিবিল—সেক্রেড্‌ ব্যাপার একটা—বিয়েটা একটা ছেলেখেলা নয়—

॥ ২ ॥

নির্বাক স্তম্ভিত সত্যবতী। এসব সে কি শুনছে তার ছেলের মুখ থেকে।

জীবনকৃষ্ণ তথনো বলে চলেছে, স্ত্রী—সারাটা জীবন—আমরণের সঙ্গিনী—তাকে কি অমনি হুট্‌ করে ঘরে নিয়ে এলেই হলো।

সত্যবতী আর সহ্য করতে পারে না।

বলে, ও—তাহলে কলেজে লেখাপড়া করে এই সব শিক্ষাই হয়েছে- হচ্ছে।

মা—

শোন জীবু—আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

হঠাৎ যেন সত্যবতীর কণ্ঠস্বরও পরিবর্তিত হয়ে যায়। কোমল কণ্ঠস্বর যেন একটা কঠিন ঋজুতায় শাণিত হয়ে ওঠে।

কণ্ঠের সমস্ত স্নেহ যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

সত্যবতী চিরদিন অত্যন্ত সরল—সাদাসিধে মাটির মানুষ চিরদিন—কোন দিন মুখ তুলে কোন প্রতিবাদ কথনো না জানালেও চরিত্রের মধ্যে তার একটা অদ্ভুত

দৃঢ়তা ছিল—এবং সেটা ছিল তার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভিতরে।

যেখানে সত্যবতী অনমনীয়া ছিল।

একমাত্র পুত্র সেইখানেই তাকে আঘাত দিতে সহসা সত্যবতী যেন চাপা গর্জনে ভেঙে পড়ে।

বলে, শোন জীবু—কত্তা যখন কথা দিয়ে এসেছেন—বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

মা—

হ্যাঁ—বিয়ে তোমাকে কত্তার মনোনীতা পাত্রীকেই করতে হবে।

কথাটা বলে সত্যবতী আর দাঁড়াল না।

শান্ত ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জীবনকৃষ্ণ অবাক বিস্ময়ে মায়ের গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে।

আজ পর্যন্ত মায়ের ঐ রূপ সে কখনো দেখে নি।

মাকে চিরদিন জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত সে একান্ত নিরীহ সরল—শান্ত ও ব্যক্তিত্ব-হীন বলেই দেখে এসেছে।

সংসারের একজন অথচ যেন সংসারের কেউ নয় বলেই জেনে এসেছে।

মার চরিত্রের মধ্যে কোথায়ও যে অমন ইস্পাতের মত কঠিন একটা দৃঢ়তা থাকতে পারে এ বুঝি কল্পনাও কখনো করতে পারে নি জীবনকৃষ্ণ।

এ মা যেন তার আদৌ চিরদিনের পরিচিত মা নয়।

কিন্তু জীবনকৃষ্ণের মনটাও সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে ওঠে।

নিষ্ঠুর একটা প্রতিজ্ঞায় মনটা যেন কঠিন হয়ে ওঠে।

রেবেকার স্মৃতি এখনো তার বুকের মধ্যে আগুনের মত জ্বলছে। যে স্মৃতি সে জানে কোন দিনই আর হয়তো বুক থেকে মুছে যাবে না। এবং সেই স্মৃতি নিয়ে সে আর একজনকে বিবাহ করবে—ভালবাসবে!

সে কি ভালবাসা না ভালবাসার অভিনয় মাত্র।

সে তো ব্যভিচার।

সে তো চরিত্রহীনতা—

না, না—সে তা পারবে না—মরে গেলেও না। না রেবেকা—না—তোমার শূন্য স্থান যতদিন বেঁচে থাকব শূন্যই থাকবে—সেখানে কারো স্থান হবে না।

উদ্‌ভ্রান্ত—পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় জীবনকৃষ্ণ।

কলেজে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়।

ভাল লাগে না—কিছুই ভাল লাগে না।

সব যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে—সব যেন মিথ্যে হয়ে গিয়েছে।

আর ঠিক এমনি সময়—

শিবনাথ এসে এক রাত্রে তার ঘরে ঢুকল।

একাকী জীবনকৃষ্ণ—ঘরের মধ্যে একটা বই খুলে বসেছিল।

জীবনকৃষ্ণ—

কে?

আমি শিবনাথ।

এসো শিবনাথ—কয়দিন তোমাকে দেখি না।

বরং বল তোমাকেই দেখতে পাই না—কলেজেও তো যাও না—পড়াশুনা কি ছেড়ে দিলে নাকি—

ভাল লাগে না।

রেবেকাকে ভুলতে পারছো না—তাই না—

ঠিক বলেছো শিবনাথ, কিছুতেই তাকে যেন আমি ভুলতে পারছি না—

এমনিই হয়—ভোলা যায় না। ভালবাসা এমনি জিনিস।

শিবনাথ—

বল।

আমি এখন কি করি বলতে পার—মা—

কি হয়েছে?

মা আমার বিয়ে দেবেন স্থির করেছেন—

সে তো খুব সুখের কথা।

একথা তুমি কেমন করে বলতে পারছ শিবনাথ—তুমি তো সব জান—

কিন্তু এ কথাটাও তো ভুললে চলবে না—তুমি তোমার মা-বাপের একমাত্র সন্তান—সন্তান হিসাবে তোমার তাদের প্রতি একটা কর্তব্য আছে—

তুমি আমায় ঠিক বোধহয় বুঝতে পারছো না শিবনাথ—আমি সে-কথা কোনদিনই অস্বীকার করি নি আর করবোও না—কিন্তু সবার উপরে আমি একজন মানুষ—আমার আশা আছে—আকাঙ্ক্ষা আছে—নিজস্ব একটা মতামত—ইচ্ছা-অনিচ্ছা—রুচি-প্রবৃত্তি—একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সেটা তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না—

না।

কিন্তু সেই সব কিছুর সঙ্গে যদি আমার পিতামাতার প্রতি সংঘর্ষ বাধে—আমি অনন্যোপায় শিবনাথ—

কিন্তু তোমার এই অবাধ্যতায় তাঁরা কতখানি দুঃখ পাবেন বুঝতে পারছো না?

পারছি বৈকি—কিন্তু বলতে পার দুঃখই বা কেন—আর কিসের জন্যই বা দুঃখ। ছেলে যদি বিয়ে নাই করে, তাতে করে এমন কি গুরুতর ব্যাপার ঘটলো যে মা বাপের দুঃখের অবধি থাকবে না।

না ভাই, তোমার ও-যুক্তি আমি মেনে নিতে পারলাম না।

তবু বলবো—আর একবার ব্যাপারটা তুমি ভেবে দেখলে পারতে সুস্থ মস্তিষ্কে—ধীরভাবে—

কোন কিছুই আমি না ভেবে করি না শিবনাথ। ভেবেছি আমি—অনেক ভেবেছি—আজ আর একজনকে বিয়ে করে তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব—চিন্তারও অতীত—যাকগে তোমার সঙ্গে অনেক তর্ক করলাম—মনে কিছু করো না। তুমি আমার ব্যাপার সব জান বলেই তোমাকে সব বোঝাবার চেষ্টা করছি—এত কথা বলছি। অন্য কেউ হলে বলতাম না—তুমি তোমার ঘরে যাও—আমি এখন একটু বেরুব।

এই অসময়ে—এই রাত্রে আবার কোথায় তুমি বেরুবে?

একটু যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্নটা করে শিবনাথ।

পার্ক স্ট্রীটের গ্রেভ্ ইয়ার্ড—গোরস্থানে একবার যাবো।

সেখানে এই রাত্রে কি ব্যাপার—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না জীবন।

আমি তো প্রতি রাত্রেই সেখানে যাই।

বল কি!

হ্যাঁ—কিছু ফুল রেখে আর একটা ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে দিয়ে আসি কবরের উপরে—জায়গাটা বড় অন্ধকার—অন্ধকারকে সে বরাবর বড় ভয় করত—আর সাদা ফুল ছিল তার প্রিয় ফুল।

অশ্রুতে গলাটা বুজে আসে জীবনকৃষ্ণর যেন—শেষের দিকে কথাগুলো জড়িয়ে যায়।

শিবনাথ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

জীবনকৃষ্ণ আর দাঁড়ায় না।

ঘর থেকে বের হয়ে যায় সামনের টেবিলের ওপরে রক্ষিত এক গোছা ফুল নিয়ে।

মাঘের মাঝামাঝি সে সময়টা।

প্রচণ্ড শীত।

একটা গরম চাদর মাত্র গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে যায় জীবনকৃষ্ণ।

জীবনকৃষ্ণ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে শিবনাথ—আজ যেন সে সত্যি সত্যি উপলব্ধি করতে পেরেছে রেবেকাকে জীবনকৃষ্ণ কতখানি ভালবাসত। তার ভালবাসার গভীরতা কতখানি ছিল।...

ঘরের মধ্যে হঠাৎ এসে ঢোকে সত্যবতী—জীবনকৃষ্ণর জননী।

শিবনাথ—

মা—সত্যবতীর ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকায় শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে।

শিবনাথ জীবনকৃষ্ণর জননী সত্যবতীকে মা বলেই ডাকত।

আমি সব শুনেছি বাবা।

মা—

হ্যাঁ বাবা—পাশের ঘরেই ছিলাম আমি—ও তোমাকে যা যা বলে গেল সব শুনেছি।

শুনেছেন ?

হ্যাঁ—রেবেকা কে বাবা—কার কথা ও বলছিল ?...রেবেকা কি কোন মেয়ের নাম ?

শিবনাথ কোন কথাই গোপন করে না তখন আর সত্যবতীর কাছে। উদ্বিগ্না জননীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে সত্য গোপন করা অতঃপর অন্যায় হবে। যত দুঃখের এবং যত মর্মান্তিকই হোক, রেবেকার কাহিনী সত্যবতীর এখন জানা একান্ত প্রয়োজন।

শিবনাথ ধীরে ধীরে রেবেকা-কাহিনী বিবৃত করে অতঃপর সত্যবতীর কাছে।

সব শুনে সত্যবতীও একেবারে যেন বোবা—নিস্পন্দ।

এত ব্যাপার তার অগোচরে ঘটে গিয়েছে। অথচ বিন্দুবিসর্গ সে মা হয়ে জানে না—জানতেও পারে নি।

এতদূর ঘটনা-প্রবাহ গড়িয়ে গিয়েছে তার অজ্ঞাতে। কেমন যেন বিমূঢ় নিশ্চল হয়ে পড়ে সত্যবতী।

মৃদুকণ্ঠে সত্যবতী ডাকে, শিবনাথ!

মা—

তবে কি হবে বাবা—ঐ যে আমাদের একটি মাত্র সন্তান—আমাদের সুখ-দুঃখের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বংশের কেউ কি ওর হাতের জলটুকুও

তাহলে পারে না?…

কান্নায় যেন গলার স্বরটা বুজে আসে সত্যবতীর।

চোখ দুটো ছল ছল করতে থাকে উপচীয়মান অশ্রুতে।

শিবনাথ কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

কিই বা সে বলতে পারে।

কি সান্ত্বনাই বা সে দিতে পারে।

সান্ত্বনা দেবার মত সত্যবতীকে ঐ মুহূর্তে তার কিই বা আছে।……

সত্যবতী আবার বলে, একি হলো—একি সর্বনাশ হলো শিবনাথ—

মা—অধীর হবেন না—অধীর হয়ে তো কোন ফল হবে না এখন! ওর মন রেবেকাকে হারিয়ে এখন অত্যন্ত চঞ্চল—দুঃখে ম্রিয়মাণ—এ সময় হঠাৎ কিছু করতে গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হবে—ও যদি বেঁকে বসে—

কিন্তু কত্তার কানে যখন একথা যাবে—

আমার মনে হয় মা—শিবনাথ বলে, এখন কিছুদিন বাঁড়ুয্যে মশাইকে এসব কোনক্রমে না জানতে দেওয়াই বোধহয় ভাল—

কি বলছো তুমি বাবা—এমন একটা ব্যাপার তার অগোচর রাখা কি যুক্তিযুক্ত কাজ হবে—ও ছেলে ছোটবেলা থেকে যেমন জেদী একগুঁয়ে তেমনি প্রচণ্ড অভিমানী—তাছাড়া একমাত্র সন্তান আমাদের চিরদিন অত্যধিক প্রশ্রয় পেয়ে—আদর পেয়ে এসেছে—ভয়ে আমার বুকটা যেন হিম হয়ে যাচ্ছে বাবা—এই রাত্রে একা একা গোরস্থানে গেল!

মা—আপনি ভাববেন না—ভিতরে যান—আমি এখুনি যাচ্ছি সেখানে।

হে মা মঙ্গলচণ্ডী—হে মা কালীঘাটের কালী—একি করলে মা—এ আমার কি হলো—আক্ষেপে যেন ভেঙে পড়ে সত্যবতী।

মা—আপনি এসময় এত বিচলিত হলে তো চলবে না—আপনি নিজে এ সময় শক্ত না থাকলে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে—যান মা—আপনি ভিতরে যান—আমি এখনি সেখানে যাচ্ছি।

সত্যবতীকে একপ্রকার যেন জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল শিবনাথ। এবং নিজে প্রস্তুত হয়ে তখুনি বের হয়ে পড়ল।

পার্ক স্ট্রীটের গ্রেভ্ ইয়ার্ড-গোরস্থান একেবারে নেহাৎ কম দূর নয় বৌবাজার থেকে।

তায় আবার শীতের রাত্রি।

রাস্তাঘাট ততক্ষণে অনেকটা নির্জন হয়ে এসেছে—

দোকানপাট একে একে প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন।

অন্ধকার পথ।

তবু সেই অন্ধকারেই হনহন করে হেঁটে চলে শিবনাথ পার্ক স্ট্রীটের গ্রেভ্ ইয়ার্ডের দিকে।

প্রায় আধঘন্টা পরে গ্রেভ্ ইয়ার্ডের সামনে এসে পৌঁছাল শিবনাথ।

উঃ, কি অসম্ভব নির্জন জায়গাটা।

চারিদিকে বড় বড় গাছ, তার মধ্যে একটা কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া ঘেরা জায়গা। ঘন অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না। চারিদিকে সব কবর।

গায়ের মধ্যে যেন ছম্ ছম্ করতে থাকে শিবনাথের।

মনে মনে সে গায়ত্রী আওড়ায়।

উঃ, কি অন্ধকার!

এদিক ওদিক তাকায় গোরস্থানের মধ্যে ঢুকে শিবনাথ।

কোথায় জীবনকৃষ্ণ?

ফিরে চলে যায় নি তো এতক্ষণে—

একটা বড় গাছের ডালে একটা পাখী ডানা ঝাপটায়—কতকগুলো শুকনো পাতা ঝরে পড়ে—শিবনাথ থমকে দাঁড়ায়।

বুকের ভিতরটা সত্যিই তখন কাঁপছে—একটা ভয়ের স্রোত যেন হিমপ্রবাহের মত মেরুদণ্ড দিয়ে নীচের দিকে সির সির করে বয়ে চলেছে।

শুকনো ঝরা পাতার উপর দিয়ে বোধ করি কোন জন্তু অন্ধকারে হেঁটে গেল—মৃদু একটা থস্ থস্ শব্দ অন্ধকারে শোনা যায়।

কি করবে—তবে কি ফিরে যাবে শিবনাথ? ভাবছে—ঐ সময় দূরে একটা মৃদু আলোর শিখা সহসা ওর নজরে পড়লো।

আলোর শিখাটা যেন মৃদু মৃদু কাঁপছে।

অন্ধকারে সেই দূরবর্তী কম্পমান আলোর শিখাটা যেন একটা মনের মধ্যে নিশ্চয়তা এনে দেয়, একটা আশ্বাস এনে দেয় শিবনাথের।

আঃ, সে যেন বাঁচল।

এতক্ষণে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছে শিবনাথ।

নিঃসীম অন্ধকারে সে এখানে একেবারে একা নয়—আছে, সামান্য হলেও একটা আলোর শিখা তার সঙ্গী আছে।

মনের সাহস ফিরে আসায় শিবনাথ অতঃপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সেই

আলোর শিখাটা লক্ষ্য করে। এবং আলোর শিখাটার কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়ে শিবনাথের আবছায়া একটা মনুষ্যমূর্তি—কম্পমান আলোর শিখাটাকে আড়াল করে বসে আছে পিছন ফিরে।

কম্পমান সেই আলোর শিখায় দূর থেকে দেখেও মানুষটাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না শিবনাথের।

জীবনকৃষ্ণ।

একটা কবরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে জীবনকৃষ্ণ।

আরো খানিকটা এগিয়ে যেতে শিবনাথের চোখে আরো স্পষ্ট হয়ে জীবনকৃষ্ণ ফুটে ওঠে।

কবরের উপরে একটা মোমবাতি জ্বলছে।

সামনে কিছু সাদা ফুল ছড়ানো।

কবরের উপরে একটা কাঠের 'ক্রস' বসানো—

তারই নীচে মোমবাতিটা বসান।

ছুটো হাত কোলের মধ্যে নিয়ে বসে আছে জীবনকৃষ্ণ। মোমবাতির আলো তার চোখে মুখে পড়ে কাঁপছে।

নিমীলিত ছুটি চোখ জীবনকৃষ্ণর।

নিস্পন্দ স্থির হয়ে বসে আছে জীবনকৃষ্ণ।

শিবনাথের চোখে সত্যিই জল এসে পড়ে। সে যেন কিছুতেই চোখের উপচে পড়া অশ্রুকে রোধ করতে পারে না।

বার বার মনে মনে বলে, ধন্য তুমি জীবনকৃষ্ণ—সত্যিই তুমি ধন্য—ধন্য তোমার প্রেম—ধন্য তোমার ভালবাসা—ভাগ্যবতী সত্যিই সেই বিদেশিনী রমণী রেবেকা। এ ভালবাসার তুলনা নেই—তুলনা নেই।

শিবনাথ কোন কথা বলে না।

সাড়া দেয় না এতটুকু।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল তদ্‌গত চিত্তে জীবনকৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে।

স্বর্গীয় ঐ মুহূর্তগুলো যেন।

অনির্বচনীয় এক ভালবাসার ঐ মুহূর্তগুলি যেন।

থাক—চারিদিক নিস্পন্দ হয়েই থাক ঐ অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি।

কোন শব্দ কোথাও যেন না জাগে।

ঐ ধ্যান যেন কেউ না ভাঙে।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে জীবনকৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল এবং উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে মুখ

ফেরাতেই চোখে পড়ল শিবনাথকে।

কে?

জীবনকৃষ্ণ—আমি—

শিবনাথ?

হ্যাঁ।

তুমি এখানে এ সময়ে?

এসেছিলাম তোমায় ডাকতে।

আমায় ডাকতে।

হ্যাঁ ডাকতে—কিন্তু—

কী?

এখন মনে হচ্ছে ডাকতে যদি না আসতাম তবে তো ঐ অনির্বচনীয় স্বর্গীয় এক দৃশ্য কোনকালেই আমার চোখে পড়ত না।

শিবনাথ—

চল—অনেক রাত হয়েছে—বাড়ি যাবে না জীবন?

হ্যাঁ, চলো।

॥ ৩ ॥

শিবনাথ আর জীবনকৃষ্ণ গোরস্থান থেকে বের হয়ে আসে।

তারপর সারকুলার রোড ধরে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

পথ একেবারে জনমানবহীন তখন।

একটি প্রাণী কোথাও চোখে পড়ে না।

কোন শব্দ নেই—নিস্তব্ধ চারিধার। কেবল ওদের দুজনার চর্মপাদুকার শব্দ সেই নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে যেন সাড়া জাগিয়ে চলে।

কথা বলে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় শিবনাথই।

ডাকে জীবনকৃষ্ণকে—জীবনকৃষ্ণ—

বল!

তোমার মা সব জানতে পেরে গিয়েছেন।

চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে যেন থমকে দাঁড়ায় জীবনকৃষ্ণ। বলে, কী—কী বললে?

তোমার মা সব জেনেছেন।

কী—কী জেনেছেন!

তোমার ও রেবেকার কথা।

কি করে জানল?

আমি বলেছি।

সেকি—তুমি—তুমি কেন বলতে গেলে মাকে ঐ সব কথা।

উপায় ছিল না ভাই, তুমি আজ বের হয়ে আসবার আগে তোমার সঙ্গে আমার ঘরের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল সবকিছুই তোমার মা শুনতে পেয়েছিলেন—

কেমন করে—

তিনি তখন পাশের ঘরেই ছিলেন।

তাহলে—

হ্যাঁ—তুমি ঘর থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তোমার ঘরে এসে ঢোকেন।

তারপর?

তখন সব কথাই তাঁকে আমায় বলতে হয়েছে—

জীবনকৃষ্ণ অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, বোধহয় ভালই হলো—মাকে সব কথা আমার জানাতেই হতো আজ না হয় কাল - আর জানাতে হবে বুঝেও ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করে আমার ভালবাসার কথাটা মার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করবো—যাক—আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

একটা কথা বলবো জীবন?

বল।

তুমি তো জান তুমি তোমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান—একমাত্র আশা—স্বপ্ন—তুমি বিহনে ওদের সব কিছুই শূন্য—মিথ্যা।

জানি—সব জানি ভাই।

মা তোমার সব কথা আমার মুখ থেকে শোনা অবধি কেবলই কাঁদছেন।

কিন্তু—

শোন ভাই—রেবেকাকে তুমি যে কতখানি ভালবেসেছিলে—আর সে ভালবাসা যে কী তা আর কেউ পৃথিবীতে কোন দিন না জানতে পারলেও আমি আজ জানতে পেরেছি।

শিবনাথ—

হ্যাঁ—আজ কিছুক্ষণ আগে স্বচক্ষে সেই ভালবাসার রূপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি—কাব্যে সাহিত্যে—গাথায় বর্ণিত ভালবাসার কাহিনীগুলো কেবলমাত্র কল্পনার উপরেই দাঁড়িয়ে নেই—তার মূলে একটি সত্য আছে, নিষ্ঠুর নির্মম সত্য—

সে সত্যকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি বোধ করি ভালবাসার অগ্নিদহনে না পুড়লে সেই সত্যকে সম্যক হৃদয় দিয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধিও করা যায় না। আর মানুষের রচিত যে সব কিছু মানুষ মানুষকে দেখেই তবে না রচনা করেছে। কিন্তু সে কথা তোমাকে আজ আমি বলতে চাই না—বলবোও না।

শিবনাথ—

আমি তোমার প্রেমকে—ভালবাসাকে অস্বীকার করতে যেমন চাই না জীবন-কৃষ্ণ, তেমনি তার এতটুকু অবমাননাও করতে দিতে চাই না, চাইবো না। কিন্তু ভাই সংসারে থাকতে গেলে সংসারের প্রতি প্রত্যেকেরই আমাদের একটি কর্তব্য আছে সে কর্তব্যকে তোমার আমার সংসারের প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য অস্বীকার করতে তুমি আমি কেউ পারি না—

বুঝেছি শিবনাথ, জীবনকৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলে, তুমি কি বলতে চাও বা চাইছো—মা-বাবার প্রতি আমার যতটুকু কর্তব্য নিশ্চয়ই তা আমি পালন করবো কিন্তু রেবেকা—সে আজ চোখের সামনে আর নেই বলেই কি তার স্মৃতির প্রতি পর্যন্ত কোন কর্তব্যই আর আমার নেই—

তা তো আমি বলি নি ভাই—কিন্তু যে আজ তোমার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে—যার সঙ্গে ইহজগতে আর কোন সম্পর্কই তোমার আজ আর নেই—তাকে সম্মান দেখাতে গিয়ে—যদি আজ তুমি তোমার জীবিত মা-বাপের অসম্মান করো তাতে করে জেনো দুঃখ তোমার বাড়বে বই কমবে না।—

কী আমি করতে পারি তুমিই তাহলে বল শিবনাথ—আমি কি করতে পারি—

শিবনাথ বুঝতে পারে জীবনকৃষ্ণর গলার স্বরটা যে কারণেই হোক অত্যন্ত নরম শোনাচ্ছে—অস্বীকারের সেই কঠিন ঔদ্ধত্য যেন ঐ মুহূর্তে নেই আর সেখানে।

জানি আজ তোমার পক্ষে অন্য কোন নারীকে চিন্তা করাও দুঃসাধ্য কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে—

শিবনাথের কথা শেষ হয় না। জীবনকৃষ্ণ বলে ওঠে, না, না, না।

না বললে তো চলবে না জীবন! সন্তান হিসাবে তোমার মা-বাবার প্রতি যতটুকু কর্তব্য তা আজ তোমাকে করতেই হবে এবং তাতে করে যদি তোমায় মর্মান্তিক বেদনাও স্বীকার করতে হয়ই তাও তোমায় করতে হবে।

শিবনাথ—

তোমার গুরু ডিরোজিও কি সেই শিক্ষাই তোমাদের দিয়ে যান নি? মা-বাবাকে অস্বীকার করবে—তাদের কথা মেনে নেবে না—তাদের অপমান করবে—

তাদের মনে কষ্ট দেবে—দুঃখ দেবে—এ শিক্ষা কি দিয়েছেন কখনো তোমাদের গুরু ভিরোজিও ?

না।

তবে ?

কিন্তু—তুমি বুঝতে পারছো না শিবনাথ—আমার এই মনের অবস্থায় অন্য কাউকে এখন বিবাহ করা শুধু নিজের প্রতিই অন্যায় হবে না—যাকে বিয়ে করবো তার প্রতিও অন্যায় করা হবে—নিদারুণ অবিচার করা হবে।

না হবে না—বরং জেনো রেবেকা যদি সত্যি সত্যি তোমায় ভালবেসে থাকে তো স্বর্গে বসে সেও খুশি হবে—তোমার কর্তব্যপালনের নিষ্ঠা দেখে—

কি বলছো তুমি ?

ভাই জীবনকৃষ্ণ—তা যদি না হতো তো সে তোমার এত বড় ভালবাসার অধিকারিণী কোন দিনই হতে পারত না।

শোন, শিবনাথ বলে, তুমি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ছেলে জীবন—একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পথ তুমি নিতে চলেছো—সে পথে তুমিও সুখী হবে না—তোমার মা-বাপও সুখী হবেন না—এমন কি রেবেকাও হয়তো হবে না স্বর্গে বসে—

ওরকম করে তুমি বলো না শিবনাথ, জীবনকৃষ্ণ বলে, আমাকে আর কটা দিন ভাবতে দাও—দয়া করো—এইটুকু দয়া করো।

ভাবতে চাও ভাবো, কিন্তু মনে রেখো এ পথ আত্মঘাতী পথ - এ পথে তুমি কোন কিছুরই মীমাংসায় পৌঁছাতে পারবে না।

পারবো না !

না—আমি বলছি শোন, তুমি তোমার মা-বাবার মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করো—দেখবে—হয়তো আজ যে মানসিক চাঞ্চল্যে—ব্যথায়—দুঃখে তুমি এমনি মুষড়ে পড়েছো তোমার জীবনে যে আসবে সে—

তুমি পাগল শিবনাথ, তুমি পাগল—তাই কখনো হয় না হতে পারে ?

নিশ্চয়ই পারে—তা না হলে এ দুনিয়াটাই হয়তো চলতো না—আজ সদ্য শোকের মধ্যে যেটা তোমার মনে হচ্ছে অসম্ভব—তুমি কোনদিন তাকে বুঝি ভুলতে পারবে না সেটা যদি সত্যই হতো তবে—স্বামী স্ত্রীকে হারিয়ে—স্ত্রী স্বামীকে হারিয়ে—মা তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়েও এ সংসারে—এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারত না। সময়ে একদিন সব সহনীয় হয়ে যাবে দেখো—সময়ের মত সান্ত্বনা কেউ দিতে পারে না—

হবে না—কোন দিন তা হবে না—রেবেকাকে আমি কোন দিন ভুলতে পারব না—সময়ের সাধ্য নেই তার মৃত্যুশোক আমায় ভুলিয়ে দেয়—পারব না—কোন দিন তাকে ভুলতে পারব না আর—

পারবে—পারতেই হবে—নচেৎ দুনিয়াটাই থেমে যেতো জেনো—তাছাড়া এমন কথা তো তোমাকে আমি বলছি না রেবেকাকে তোমায় ভুলতেই হবে—বা ভুলে যাবে—কেন যাবে—যে সর্বক্ষণ তোমার পাশে পাশে রয়েছে তাকে কি ভোলা যায় ? না কেউ তা পারে—

রেবেকা আমার পাশে পাশে রয়েছে সর্বক্ষণ ? শিবনাথ সত্যি বলছো ?

জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়ে।

শিবনাথ বলে, সত্যি বলছি বৈকি—মৃত্যুই তো মানুষের সব সমাপ্তি নয়—আর আত্মার যদি বিনাশ না থাকে এবং সে যদি তোমার মত করে সত্য তোমাকে ভালবেসে থাকে—সে কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারে ?

শিবনাথ—

বল।

পরলোক তুমি বিশ্বাস করো ?

করি বৈকি।

করো ?

নিশ্চয়ই—আমি বিশ্বাস করি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

আত্মা অবিনাশী—আত্মার মৃত্যু নেই—দেহটা তো মানুষের কিছুই না—বাসাংসি জীর্ণানি—জীর্ণ পুরাতন বস্ত্রের মত—

হয়তো সত্যিই তাই শিবনাথ—না হলে এসব মনে হয় কেন ?

কী মনে হয় ?

মনে হয়—she is always with me—রেবেকা যেন সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে—তার দেহটা চোখে পড়ে না বটে কিন্তু তার উপস্থিতি যেন বায়ুতে আমার সর্ব শরীরে—সমস্ত অনুভূতিতে সবক্ষণ সঞ্চারিত হয়।

তাই হয় জীবনকৃষ্ণ—তোমাদের যে সত্যিকারের ভালবাসা—কে বলতে পারে হয়তো তোমার নবপরিণীতা বধূর মধ্যেই সে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে আবার—তার মধ্যে লীন করে দিয়ে সে তোমাকে পাবে আর তুমিও তাকে পাবে।

গীতায় তুমি আমাকে পড়াবে শিবনাথ—আমি তো ভাল সংস্কৃত শিখি নি—বুঝতে পারবো না—সব শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো না—

বেশ তো পড়াবো—কিন্তু জেনো, ভাষার জন্ত তোমার গীতা বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না। তোমার মধ্যে আত্মোপলব্ধি এসেছে যখন কোন কিছুই আর তোমার কাছে অস্পষ্ট দুর্বোধ্য থাকবে না।

জীবনকৃষ্ণ মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করে ক্ষণপূর্বে শোনা শিবনাথের মুখ থেকে গীতার শ্লোকটি—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

কটা দিন শিবনাথ জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে সর্বদা এত ব্যস্ত ছিল যে বৌবাজারে ফাদার উইলসনের গৃহে একটিবারও গিয়ে মৃন্ময়ীর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে নি।

যদিও মিসেস কুক্ ও ফাদার উইলসনের আশ্রয়ে মৃন্ময়ীকে রেখে নিশ্চিন্ত ছিল তথাপি একটিবার মৃন্ময়ীর ওখানে যেতে পারছে না সর্বক্ষণ মনটা তার ছট্‌ফট্ করছিল।

একটিবার সেখানে যাওয়া দরকার।

মৃন্ময়ী হয়তো কত অভিমান করে বসে আছে কিন্তু জীবনকৃষ্ণর মনের ঐ অবস্থায় তাকে ফেলে যায়ই বা কি করে—

জীবনকৃষ্ণ একটু শান্ত হতে একদিন বৈকালের দিকে শিবনাথ ফাদার উইলসনের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।

বাইরের ঘরে ফাদার উইলসন বিলাত হতে সদ্য আগত একজন পাদ্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। শিবনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করতেই তার পদশব্দে তার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

কে?

আমি শিবনাথ ফাদার—

শিবনাথ—আইস—অনেক দিন পরে আসিলে—তোমার কোন রূপ অসুখ-বিসুখ হইয়াছিল কি?

না ফাদার—

তবে এতদিন আস নাই কেন ?

একটু কাজ ছিল—

তুমি কি মৃন্ময়ীর সঙ্গে দেখা করিটে অসিয়াছো—want to meet her.

হ্যাঁ—সে কেমন আছে ?

খুব ভাল—a nice pretty girl—অত্যন্ত সুবোধ বালিকা—তাহার তুলনা হয় না—She is really lovely—

কোথায় ?

She is inside—ভিতরে আছে—যাও—probably—সম্ভবত আমার সহধর্মিণীর নিকট পাঠ লইটেছে—you know—তুমি জান শিবনাথ ?

কী ফাদার ?

She is really wonderful—চমৎকার বুদ্ধিমতী বালিকা—ইতিমধ্যেই alphabets—বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া—fairy tales-এর একটি গল্প শেষ করিয়াছে।

সত্যি—এই এক মাসের মধ্যেই ?

হ্যাঁ।

শিবনাথ কথাটা শুনে সত্যিই চমৎকৃত হয়।

সেই মৃন্ময়ী যাহার অক্ষর পর্যন্ত জ্ঞান ছিল না সে এই এক মাসের অধ্যবসায়ে বর্ণমালা তো শিখেই নিয়েছে—fairy tales পড়ছে।

কথাটা অবিশ্বাস্য কিন্তু ফাদার উইলসন তো মিথ্যা বলতে পারেন না।

তাছাড়া তাঁর মত একজন সৌম্য শান্ত পাদ্রী—ঈশ্বরে বিশ্বাসী ক্রিশ্চান মিথ্যা কি বলতে পারেন কিম্বা উপহাস করেও কথাটা বলতে পারেন।

আর উপহাস করতেই বা যাবেন কেন উনি তার সঙ্গে—সে কি তার উপহাসের পাত্র, না যোগ্য ?

যাও—ভিতরে যাও—

শিবনাথ অন্দরের দিকে অগ্রসর হয়।

বাইরের ঘরের পরেই একটা বারান্দা—তার সামনে নাতিপ্রশস্ত একটি লন—সেই লনের মধ্যে এক পাশে মিসেস্ কুক্—উইলসনের স্ত্রী ও মৃন্ময়ী পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে।

মৃন্ময়ীর কোলে একখানি মোটা কিতাব, আর মিসেস্ উইলসনের হাতে সেলাই।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শিবনাথ।

শিবনাথকে মিসেস্ কুক্ বা মৃন্ময়ী কেউ দেখতে পায় না। দুজনেই ওর দিকে পিছন ফিরে বসে।

স্পষ্টাক্ষরে ইংরাজী উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে পড়ে চলেছে—Now the goddess touched the girl with the silver rod in her hand—দেবী তাহার হস্তধৃত সেই রৌপ্যনির্মিত দণ্ডটি দিয়া সেই কৃষককন্যাকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিয়া উঠিল—দু'চোখের ওপরে যেন একটা অন্ধকারের পর্দা ছিল—অজ্ঞানতার পর্দা, সেই পর্দাটি যেন উঠিয়া গেল—নূতন এক আলোয় তাহার দৃষ্টিশক্তি ঝলমল করিয়া উঠিল—সহসা যেন সে নিজেকে চিনিতে পারিল।

মৃন্ময়ী পড়ে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ কুক্ তাহার বাংলা অর্থ মৃন্ময়ীকে বলে দিচ্ছেন শান্ত কণ্ঠে।

অবাক বিস্ময়ে যেন চেয়ে থাকে অদূরে উপবিষ্ট মৃন্ময়ীর দিকে শিবনাথ—এ কোন্ মৃন্ময়ী—মাসাধিককাল আগে মাত্র এক রাত্রে যে মৃন্ময়ীকে দুর্গা দেবীর আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে এনে ফাদার উইলসন ও মিসেস্ কুকের আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিল এ কি সেই মৃন্ময়ী? এ কি সেই মৃন্ময়ী যাকে এক রাত্রে দস্যু পর্তুগীজ সুন্দরম্ অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল এবং যাকে আবার এক রাত্রে গোপনে সে তার আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে এনে দুর্গা দেবীর হাতে তুলে দিয়েছিল—না অন্য কেউ? অন্য কোন এক অজ্ঞাতা—অপরিচিতা মৃন্ময়ী?

কোন্ দেবীর কোন্ জাদুদণ্ডের স্পর্শে এমন অসাধ্যসাধন ঘটল?

কার হাতের রৌপ্যনির্মিত জাদুকাঠি এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটালো।

শুধু কি তার কণ্ঠে—উচ্চারণভঙ্গিতে এবং শিক্ষার পরিবর্তন—চেহারাও যেন এই এক মাস সময়ের মধ্যে অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে।

সেই রুগ্ন কৃশ—মলিন শুকনো মুখখানিতে গোলাপী ছোপ লেগেছে—পরনের শাড়ি ও জ্যাকেটে—পরবার কায়দায়—পরিচ্ছন্নতায়—এমন কি বক্ষো'পরে লম্বমান সবুজ দুটি বেণীতেও একটা বিস্ময়—একটা লালিত্য—সৌন্দর্য—ঝলমল করছে যেন।

শিবনাথ যেন ভুলে যায়।

ভুলে যায় সে নিজেকে—কেন এসেছে সে তাও যেন ভুলে যায়।

হঠাৎ তার চমক ভাঙে মিসেস্ কুকের কণ্ঠস্বরে—কে—কে ওখানে—শিবনাথ না?

আজ্ঞে—আমি শিবনাথই—

আইস—আইস my boy—why you are standing there—ওভাবে ওখানে দাঁড়াইয়া আছো কেন?

শিবনাথ এগিয়ে আসে।

Good evening, শিবনাথ

Good evening, Mrs. Cook।

তারপর কেমন আছো বলো—how are you my boy—সর্বপ্রকার মঙ্গল তো?

হ্যাঁ।

এতদিন আইস নাই কেন?

শিবনাথ সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে, মৃন্ময়ী ইংরাজী ভাষা পড়তে শিখেছে—

Oh yes—she is really wonderful—চমৎকার, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বালিকা—একবার কোন কিছু বলিয়া দিলে দ্বিতীয়বার আর তাহা বলিতে হয় না—এমন intelligent বালিকা জীবনে আমি সত্যিই ইতিপূর্বে দেখি নাই—জান শিবনাথ, উহাকে আমি রীতিমত শিক্ষিতা করিয়া তুলিব—

মিসেস্ কুক্ আপন মনে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে চলছিলেন আর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল শিবনাথ মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

আর মৃন্ময়ী তখন লজ্জারক্তিম মুখখানি নীচু করে বসেছিল।

হঠাৎ ব্যাপারটা মিসেস্ উইলসনের নজরে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু হাসির বিদ্যুৎ যেন খেলে যায় ওষ্ঠপ্রান্তে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন তিনি এবং শিবনাথকে সম্বোধন করে বলেন, শিবনাথ আইস—এখানে বোস—তোমরা গল্প কর, আমি আসিতেছি।

মিসেস্ উইলসন উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

ওরা কিন্তু তথাপি কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না।

সামান্য ব্যবধানে একজন বসে থাকে, অন্যজন দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর এক সময় শিবনাথই পায়ে পায়ে অতি সন্নিকটে মৃন্ময়ীর কাছে এসে দাঁড়ায়। মৃদুকণ্ঠে ডাকে, মৃন্ময়ী!

মৃন্ময়ী মুখ তোলে না—সাড়াও দেয় না।

মৃন্ময়ী—মুখ তোলো—আমার দিকে তাকাও।

ধীরে ধীরে মৃন্ময়ী মুখখানি তোলে। শান্ত দৃষ্টিতে তাকায় শিবনাথের দিকে।

চারি চক্ষুর মিলন হয়।

এ যে আমার কল্পনারও অতীত মৃন্ময়ী—তুমি কি সেই মৃন্ময়ী, না অন্য কেউ?

মৃন্ময়ী এতক্ষণে কথা বলে লজ্জা-জড়ানো কণ্ঠে, শিবনাথ—

বলো।

কেমন আছো?

ভাল—তুমি কেমন আছো?

ভাল।

এরা তোমায় খুব ভালবাসেন, না?

কন্যার মতই দেখেন এরা আমায়।

তুমি খুব সুখী এখানে, না?

হ্যাঁ—কিন্তু এতদিন আসো নি যে?

সময় পাই নি—কিন্তু আমার কথা কি তুমি ভাবতে?

তোমার কি মনে হয়?

আমার?

হ্যাঁ।

শিবনাথ সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আমি কিন্তু সর্বদাই তোমার কথা ভাবতাম মৃন্ময়ী।

আমিও তোমার কথা ভেবেছি।

সত্যি?

মৃন্ময়ী পুনরায় মুখখানা নত করে।

॥ ২ ॥

রাধানাথই ছুটতে ছুটতে এসে দুঃসংবাদটা দিয়েছিল সুরেন্দ্র মল্লিককে।

দ্বিপ্রহরের আহার শেষ করে সবে উঠেছেন সুরেন্দ্র মল্লিক এমন সময় অনাদিনাথের সরকার রাধানাথ ছুটতে ছুটতে শোভাবাজার থেকে এসে উপস্থিত।

পিসেমশাই!

রাধানাথ দুর্গা দেবীকে পিসিমা ও সুরেন্দ্র মল্লিককে পিসেমশাই বলে ডাকত।

অনেক দিনের পুরাতন লোক প্রৌঢ় রাধানাথ।

অন্দর পর্যন্ত তার গতিবিধি ছিল।

ভৃত্য পাত্রে করে হাতে জল ঢেলে দিচ্ছিল, আর আচমন করছিলেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

অন্দরের প্রাঙ্গণে পিসেমশাই ডাকটা শুনে চমকে ওঠেন—কে?

পিসেমশাই সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—

কি—কী হয়েছে!

দুর্গা দেবী অদূরেই ছিলেন তিনিও তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন—উদ্বেগাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কি—কি হয়েছে সরকার মশাই?

তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে রাধানাথ।

দীর্ঘপথ একপ্রকার সে দৌড়াতে দৌড়াতেই এসেছে—উর্ধ্বশ্বাসে।

মা ঠাকরুন—

কী—কী হয়েছে মা ঠাকরুনের?

প্রশ্ন করেন এবারে সুরেন্দ্র মল্লিকই—অনাদিনাথের স্ত্রী কালীতারাকে সত্যিই নিজের অগ্রজার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

আর অনাদিনাথের স্ত্রী কালীতারাও সুরেন্দ্র মল্লিককে ভাইয়ের মতই দেখতেন—স্নেহ করতেন।

বলতেন, আমার কোন সহোদর ভাই নেই ঠাকুর মশাই—তুমিই আমার সহোদর ভাই—আমার জ্যেষ্ঠ দাদা।

মধুর একটা সম্পর্ক দুজনার মধ্যে ছিল বরাবর।

তাই আবার তিনি প্রশ্ন করেন, কি—কি হয়েছে তার—সে সুস্থ আছে তো?

না পিসেমশাই, না—বলতে বলতে প্রৌঢ় রাধানাথ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে ছোট একটি বালকের মত যেন।

কি হয়েছে রাধানাথ—বল—বল—

সুরেন্দ্র মল্লিক প্রশ্ন করেন।

দুর্গা দেবীও প্রশ্ন করে—সরকার মশাই, কি হয়েছে বলুন।

কাঁদতে কাঁদতে বলে রাধানাথ, কি আর বলব পিসিমা—আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—আমাদের মা ঠাকরুন নেই।

কী—কী বললে—একটা আর্তনাদ, একটা চিৎকার করে ওঠেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

মা ঠাকরুন নেই—মারা গিয়েছেন।

সংবাদটা যেন তাঁকে একেবারে স্তব্ধ প্রস্তরীভূত করে দেয় মুহূর্তে।

শুধু অভাবনীয়ই নয়—সংবাদটা যেন অকল্পনীয়ও—স্বপ্নাতীত।

কয়েক মুহূর্ত যেন অতঃপর বাক্যস্ফূর্তি হয় না সুরেন্দ্র মল্লিকের—তারপর এক সময় আবার প্রশ্ন করেন, কি হয়েছিল ?

জানি না—সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার।

আশ্চর্য ব্যাপার ?

আজ্ঞে—কত্তাবাবু গিন্নী ঠাকরুনকে নিয়ে তাঁদের শয়নঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করেন—এখানে আসবেন বলে প্রস্তুত হতে গিয়েছিলেন কত্তাবাবু অন্দরে।

তারপর বল রাধানাথ, থামলে কেন ?

অনেকক্ষণ তারপর দরজা খুলছেন না দেখে দাসী সৌদামিনী ডাকাডাকি করে। দরজায় ধাক্কা দেয়—তবু সাড়া পায় না। তখন তারা ভীত হয়ে আমাকে এসে সংবাদ দেয়।

তারপর ?

তারপর আমি ভিতরে গিয়ে ঘরের বন্ধ দরজায় অনেকবার করাঘাত করি—অনেকবার ডাকি, কিন্তু সাড়া পাই না—তখন আমার কেমন যেন ভয় হয়—দরজা ভেঙে ফেলি—ভিতরে ঢুকে দেখি মা ঠাকরুন পালঙ্কের সামনে মেঝের ওপরে পড়ে আছেন—চক্ষু দুটি মুদ্রিত—মুখ হাঁ করা—কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে—উঃ সে কি বীভৎস ভয়ঙ্কর দৃশ্য—রাধানাথ চোখ বুজলো।

তখনো যেন তার চোখের ওপরে সেই বীভৎস দৃশ্য ভাসছে।

আর অনাদিনাথ—তোমার কত্তাবাবু ?

তিনি ঘরের মধ্যে নেই।

নেই—সে কি !

তা জানি না—তাকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

কি বলছো পাগলের মত রাধানাথ—শয়নঘরের মধ্যে থেকে সে কোথায় যাবে—সে ঘরের মধ্যে যাবার বা বের হবার দ্বিতীয় কোন দ্বার নেই আমি জানি—

সে তো আমরাও জানি পিসেমশাই—কিন্তু কত্তাবাবু ঘরে নেই।

সুরেন্দ্র মল্লিক আর একটি মুহূর্তও দেরি করলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে পাল্কিগাড়িতে ঘোড়া জুত্‌তে সহিসকে আদেশ পাঠালেন।

দুর্গা দেবীও গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ান।

তুমিও যাবে নাকি?

হ্যাঁ যাবো—দুর্গা দেবী শান্ত কণ্ঠে বলেন।

যাবে?

হ্যাঁ।

বেশ, চল।

একটু পরেই দুজনে পাল্কিগাড়িতে চেপে শোভাবাজারের দিকে রওনা হলেন।

সূর্য তখন মধ্যাহ্নগগন অতিক্রম করে পশ্চিমে যাত্রা করেছে।

ছায়া পশ্চাৎগামী।

গাড়ি চলেছে শোভাবাজারের দিকে।

দুজনাই চুপচাপ।

একে সকাল থেকে দুজনার মন বিক্ষিপ্ত, চিন্তাভারাক্রান্ত ছিল—ঐ দিনই প্রভাতে রমণীরঞ্জন ও গৌরীর ব্যাপারটা—বিশেষ করে গৌরীর আকস্মিক অপমৃত্যুটা যেন তাঁকে এক মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল। হতভাগিনী মেয়েটাকে সত্যিই দুর্গা দেবী ভালবেসেছিলেন।

নিজের কন্যার মতই ভালবেসেছিলেন।

অথচ সেই মেয়েটার বুকের মধ্যে যে এমন একটা দুঃখ বিঁধে ছিল তিনি কোন দিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি!

তিনি শুধু জেনেছিলেন—দেশের তখনকার দিনের আরো বহু কুলীন কন্যার মত বিবাহের পর থেকেই সে স্বামীর পরিচয়টুকু ব্যতীত আর কিছুই পায় নি।

মাথার সিন্দুরটুকু ছাড়া আর তার কিছুই সম্বল ছিল না ইহসংসারে স্বামীর পরিচয় স্ত্রী হয়ে দেবার মত।

স্ত্রী হয়েও স্ত্রী নয়।

স্বামী থেকেও যার স্বামী নেই এমনি এক চিরদুঃখিনী বঞ্চিতা নারী। যার নারীজীবনের কোন সাধই পূর্ণ হলো না—অভিশপ্ত অহল্যার মত যার সমস্ত অস্তিত্ব পাষাণই হয়ে রইল—তাকে গৃহকোণে একটু স্থানই মাত্র দিতে পেরেছিলেন দুর্গা দেবী, তার বেশী কিছুই নয়। তাই অভাগিনী মেয়েটা যখন নিজে আত্মহত্যা করে জীবনের সমস্ত দুঃখ ও লজ্জার অবসান ঘটিয়ে গেল দুর্গা দেবী যেন কিরকম স্তব্ধ-বিমূঢ় হয়ে যান।

বাড়ির সবাই ছুটে গিয়েছিল অভাগিনী মেয়েটার মৃতদেহটা দেখতে—

কেবল যান নি একমাত্র দুর্গা দেবী।

হতভাগিনী মেয়েটাকে কন্যার অধিক ভালবেসেছিলেন।

কেমন করে চেয়ে দেখবেন তারই মরা মুখটা।

পারেন নি—যেতে পারেন নি।

ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন আর অবিরল অশ্রুধারা নিঃশব্দে চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছিল।

ঘরের থেকে বেরও হন নি—দুপুর হয়ে গেল তবু কেউ তাঁকে ডাকতে সাহস পায় নি— সামনেও যেতে সাহস পায় নি।

হঠাৎ এলো—ঐ সময় রাধানাথ নিয়ে এলো নিদারুণ আর একটা দুঃসংবাদ।

বৌঠান—বৌঠান নেই!

এ তিনি কি শুনছেন—কি শুনলেন!

সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে নিজের অজ্ঞাতেই বের হয়ে এসেছিলেন।

নিজের কানে শুনলেন সেই মর্মান্তিক সংবাদ।

বৌঠান নেই!

অস্বাভাবিক একটা কণ্ঠরোধকারী স্তব্ধতায় অনাদিনাথের বিরাট গৃহখানি যেন থমথম করছিল। এবং থেকে থেকে সেই দুঃসহ স্তব্ধতা পীড়িত হচ্ছিল কার্নিসের উপরে উপবিষ্ট একজোড়া কূজনরত কপোত-কপোতীর একঘেয়ে কণ্ঠস্বরে।

দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন সব প্রশস্ত অলিন্দের দুপাশে পাষাণের মতো যেন দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সৌদামিনী কাঁদছিল নিঃশব্দে।

আর কারো মুখে একটি কথা নেই—একটি শব্দ পর্যন্ত নেই।

সুরেন্দ্র মল্লিক ও দুর্গা দেবী তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন অনাদিনাথের শয়নকক্ষের দিকে।

কক্ষের দরজার কপাট দুটো ভেজান ছিল। হাত দিয়ে ঠেলে প্রথমে কক্ষে পদার্পণ করলেন সুরেন্দ্র মল্লিক এবং তাঁর পশ্চাতে দুর্গা দেবী।

বীভৎস যেমন তেমনি করুণ বুঝি সে দৃশ্য।

মৃতদেহটা তখনো পড়ে আছে কক্ষের মেঝেতে।

এলোমেলো কেশরাশি—মাথাটা একপাশে ঈষৎ হেলে পড়েছে—মুদ্রিত চোখের দৃষ্টি তখনো।

আর হঠাৎ হাঁ করা মুখের কষ বেয়ে ক্ষীণ লালামিশ্রিত একটা রক্তের ধারা

নেমে এসেছে।

বিহ্বল হতভম্ব স্বামী-স্ত্রী নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেন পাশাপাশি সেই ভয়াবহ করুণ দৃশ্যের সামনে।

বৌঠান—একটা অস্ফুট কাতর আর্তনাদ যেন দুর্গা দেবী ও সেই সঙ্গে সুরেন্দ্র মল্লিকের কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এলো।

দুর্গা দেবী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না—মৃতদেহের সামনে ঘুরে পড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান।

॥ ৩ ॥

বড়বৌ—কি হলো বড়বৌ!

চিৎকার করে ওঠেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

ঐ সঙ্গে সৌদামিনী ছুটে আসে বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে সেই চিৎকারে।

দুর্গা দেবীর কোন সাড়া নেই—তিনি তখনো অজ্ঞান।

আরো দুজন দাসীর সাহায্যে তখন ধরাধরি করে কোনমতে পাশের ঘরে দুর্গা দেবীর অচৈতন্য দেহটা বহে নিয়ে গিয়ে একটা শয্যার উপরে শুইয়ে দেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

একজন দাসী চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে হাওয়া করতে থাকে পাখা নিয়ে জোরে জোরে।

সবই করতে হবে।

শোক ও দুঃখ মানুষকে তার কর্তব্য থেকে মুক্তি দেয় না।

সংসার এমনি বিচিত্র জায়গা—যেখানে হাসি-কান্না দুঃখ আশা-আনন্দ বেদনা যেমন মানুষকে একই সঙ্গে বহন করতে হয়, তেমনি এক হাতে শোকের অশ্রু মুছতে মুছতে অন্য হাতে প্রিয়জনের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হয়।

সংসার তার প্রাপ্যটুকু ষোলআনাই আদায় করে নেয়—বুঝে নেয়।

সুরেন্দ্র মল্লিক ছাড়া শহরে অনাদিনাথের আপনার জন বা আত্মীয় বলতেও কোন দ্বিতীয় আর পুরুষ ছিল না।

একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান নবীনচন্দ্র—সে অবিশ্যি পুরুষ ও আপনার জন, কিন্তু সে তখন মানুষের বাইরে চলে গিয়েছে।

বৌবাজারে পক্ষীর গাঁজার আড্ডার দলে দিবারাত্র সে পড়ে থাকে—কল্কে কল্কে গাঁজা উড়িয়ে সে কাঠঠোকরা থেকে কোকিলে উন্নীত হবার সাধনায় আত্মনিমগ্ন।

অতএব সে থেকেও নেই।

তথাপি সুরেন্দ্র মল্লিক রাধানাথকে বললেন, নবীনের কাছে একটা সংবাদ পাঠানো হয় নি?

সংবাদ পাঠাবো কি, সে তো এসেছিল।

এসেছিল—কোথায় সে?

তা জানি না—দরজায় যখন ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে—ঐ সময় বোধ হয় কিছু টাকার জন্য গিন্নীমার কাছে এসেছিল।

তারপর?

বললাম সব কথা—বললে চিল ভাইকে ডেকে আনি।

চিল ভাই?

আজ্ঞে তাই বলে বের হয়ে গেল তখুনি।

তাকে ডেকে পাঠান।

পাঠাচ্ছি।

রাধানাথ তখুনি একজন ভৃত্যকে জরুরী নির্দেশ দিয়ে বৌবাজারে পক্ষীর আড্ডায় পাঠিয়ে দিল।

আর একবার সন্ধান শুরু করলেন অনাদিনাথের সুরেন্দ্র মল্লিক।

বাড়ির সকলকে ডেকে জনে জনে প্রশ্ন করতে লাগলেন তাদের গৃহকর্তা সম্পর্কে এবং তন্ন তন্ন করে সকলে মিলে বাড়ির সর্বত্র অনাদিনাথকে খোঁজাও হলো পুনরায়।

কিন্তু তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সব বৃথা হলো—সকল প্রচেষ্টাই মিথ্যা হলো।

দেখেছিল স্বচক্ষে সৌদামিনীই। সেই বললে, কত্তাবাবু ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই গিন্নীমা ঘরে ঢোকেন।

তারপর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায় এবং কেউ কত্তা বা গিন্নী দুজনার একজন কাউকেই ঐ ঘর থেকে অতঃপর বেরুতে দেখে নি—সৌদামিনী আবার বলে।

রাধানাথ বললে, এবং দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশের পর গিন্নীমার মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হলো বটে কিন্তু অনাদিনাথ যেন কর্পূরের মতো বদ্ধঘরের ভিতর থেকে কেমন করে কোন জাদুমন্ত্রে উবে গিয়েছেন।

আশ্চর্য লোকটা গেল কোথায়।

ঐ ঘর থেকে তো বেরুবার দ্বিতীয় কোন দ্বার ও পথ নাই—তবে গেলই বা কোন্ পথে, অথচ সুরেন্দ্র মল্লিকের দৃঢ় বিশ্বাস হয় মৃতদেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পরে—বৌঠানকে অনাদিনাথই হত্যা করেছেন নিঃসন্দেহে।

এবং সম্ভবত গলা টিপে হত্যা করেছেন। হত্যা করে কোন এক ফাঁকে কোন না কোন পথ দিয়ে সকলের অজ্ঞাতে গৃহ থেকে সরে পড়েছেন অনাদিনাথ।

কিন্তু কেন?

এই নিষ্ঠুর হৃদয়বিদারক কাজ করলেন কেন অনাদিনাথ? কেন করলেন? কেন নিজের স্ত্রীকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলেন?

স্বামী-স্ত্রীর সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র হওয়ায় মতের অমিল ছিল উভয়ের মধ্যে বরাবরই—এবং জেদী আত্মম্ভরী একরোখা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনাদিনাথ—শান্ত নিরীহ নির্বিরোধী কালীতারা—তাকে কোন দিনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না অনাদিনাথ।

প্রথম প্রথম স্ত্রী কালীতারা তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অনাদিনাথ শোনেন নি কোন কথা তাঁর।

অবশেষে আর বাধা দিতেন না স্বামীকে কালীতারা তাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। সবই জানতেন।

স্বামীর পথ থেকে অতঃপর কালীতারা যেন সরে দাঁড়িয়েছিলেন—কোন কথাই যখন শুনবে না—শোনার মানুষও নয়—করুক ওর যা খুশি।

এবং প্রকৃতপক্ষে সেই থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। একই সংসারে থেকেও যেন ওরা পরস্পর থেকে দূরে চলে গিয়েছিল।

অনাদিনাথ তার সংস্কার ধর্ম গোঁড়ামির হৈ-চৈ নিয়ে বাইরে ব্যস্ত থাকেন আর তাঁর স্ত্রী কালীতারা সংসারের মধ্যে যেন আরো নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই স্ত্রীকে অনাদিনাথের হত্যা করবার এমন কি কারণ ঘটলো!

যত চিন্তা করেন ততই যেন সুরেন্দ্র মল্লিকের মনে হয় ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এক হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবং এও ধারণা হয় তাঁর, হত্যা করে অনাদিনাথ সরে পড়েছেন।

গা-ঢাকা দিয়েছেন। দারোগার ভয়ে—আদালতের ভয়ে। দারোগা করিম বক্স সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক।

ব্যাপারটা যখন একটা হত্যাকাণ্ড—এবং দারোগা কবির বক্সের কানে কথাটা উঠলে সহজে নিষ্কৃতি মিলবে না।

জল অনেক দূর গড়াবে।

কিন্তু কি করা যায়?

অনাদিনাথের স্ত্রী কালীতারার যে অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘটেছে কথাটা এখনো অবিশ্যি বাড়ির বাইরে আর দশজন জানতে পারে নি।

কথাটা এখনো দশকান হয় নি।

কিন্তু এ কি চাপা থাকবে—এ কথা কি চাপা থাকার? আগুন কি চাপা থাকে?

দাস-দাসীদের মুখ থেকেই হয়ত কোন এক ফাঁকে প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু তা হলে চলবে না। ব্যাপারটা যে একটা হত্যাকাণ্ড নয়—স্বাভাবিক মৃত্যু এটাই রটিয়ে দিতে হবে। সকলকে জানিয়ে দিতে হবে।

মতলবটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্র মল্লিক আর একটি মুহূর্তও সময়ক্ষেপ করেন না।

প্রথমেই অনাদিনাথের কন্যা জামাতা শ্যামাসুন্দরী ও পতিতপাবনকে—চিৎপুরে সংবাদটা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

সংবাদ পাঠান—তাদের মার আকস্মিক হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র যেন তারা আসে।

সৌভাগ্যক্রমে পক্ষীর আড্ডায় গিয়ে নবীনচন্দ্রের খোঁজ করতে তাকে কিছুটা সুস্থ অবস্থাতেই পাওয়া গেল।

নেশার ঝোঁকটা কমে এসেছে বলে সে তখন আর এক কল্কে সেজে নেশায় রং চড়ানোর ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় রাধানাথ-প্রেরিত লোক তার সামনে গিয়ে হাজির হয়ে কেঁদে উঠলো।

আরে মলো হতভাগা—কর়র-ঠক্—অমন করে কাঁদছো কেন—কর়র-ঠক্—ব্যাপারটা কী—বলি কাণ্ডটা কী?

ছোটদাদাবাবু গো, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

কর়র-ঠক—কি সর্বনাশ হলো বৎস—বল শ্রবণ করি।

গিন্নীমা ঠাকরুন নেই।

নেই—কর়র-ঠক্—নেই মানে কি রে হতভাগা?

আজ্ঞে নেই।

নেই?

না—মারা গেছেন গো—

হ্যাঁ—কস্যর-ঠক্—কি কহ?

কল্কেটা ফেলে সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ দিয়ে নবীনচন্দ্র উঠে দাঁড়ায়, খুড়িমা নেই—আমার দেবী খুল্লতাত জননী নেই!

না—শিগ্‌গিরি চলো গো ছোট দাদাবাবু—পিসেমশাই পিসিমা ঠাকরুন সবাই এসেছেন—আপনাকে এখুনি যেতে বললেন গো সরকার মশাই।

নেশা ততক্ষণে নবীনচন্দ্রের মাথায় চড়ে গিয়েছে।

খুল্লতাত জননী তার নেই, হতভাগাটা বলে কি—একটু আগেও যে গৃহে টাকা আনতে গিয়ে শুনে এসেছে তিনি খুড়োমশাইয়ের ঘরে—আর এর মধ্যেই নেই!

নবীনচন্দ্র আর দাঁড়ায় না।

দ্রুত গৃহাভিমুখে ছুটতে শুরু করে।

খুল্লতাত জননী কালীতারা দেবীকে নবীনচন্দ্র সত্যি সত্যিই ভালবাসত—ভক্তি করত—শ্রদ্ধা করত।

কারণ এ সংসারে আজও ঐ একটি মাত্র মানুষই সংসারে তাকে স্নেহ করত, ভালবাসত। তার সকল অন্যায় আবদার সহ্য করত।

যখনই হাত পেতে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, খুড়ি কিছু দাও—শূন্য হাতে ফিরতে হয় নি। কালীতারা কখনো তাকে প্রত্যাখ্যান করে নি।

স্বামী অনাদিনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র নবীনচন্দ্রকে একেবারে দুচক্ষে দেখতে পারে না—নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না তথাপি কালীতারা তাকে কখনো শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয় নি।

যখন যা পেরেছে দিয়েছে।

কালীতারা কতদিন বলেছে, ঐ গাঁজা-টাজাগুলো কেন খাস বাবা—ওগুলো আর খেও না সোনা।

খাই তো না খুড়ি—ধূমপান করি গঞ্জিকা দিয়ে।

না—তাও করো না—ও বিষ—ওগুলো ছেড়ে দাও।

না খুড়ি—ঐ অনুরোধটি করো না—ও এই শ্রীমানের দ্বারা এ জীবনে হবে না।

কিন্তু ও যে বিষ—

মূর্খেরা অজ্ঞেরা বলে বিষ—ও অমৃত খুড়ি—ও অমৃত।

কালীতারা মিথ্যা বুঝে আর ভাসুর-পুত্রকে ঘাঁটায় নি।

গৃহের দিকে যেতে যেতে সব মনে পড়ে আজ নবীনচন্দ্রর।

কালীতারা—তার খুল্লতাত জননী নেই—আর সে-গৃহে তার স্থানও নেই। খুড়োমশাই এতদিন মুখেই শুধু বলেছেন তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন গৃহ থেকে—এবারে সত্যি সত্যি সেটা কার্যে পরিণত করবেন।

শ্যামাসুন্দরী ও তার স্বামী পতিতপাবন ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে এসে হাজির হয়েছিল।

জননীর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে শ্যামাসুন্দরী প্রথমটায় বিহ্বল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা মুহূর্ত—তারপরই চিৎকার করে কেঁদে মৃতা জননীর বক্ষের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

গৃহে প্রবেশ করেই সেই উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি নবীনচন্দ্রের কানে যায়।

সে থমকে দাঁড়ায়।

শ্যামাসুন্দরী চেঁচিয়ে কাঁদছে।

ধীরে ধীরে গিয়ে নবীনচন্দ্র সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। এবং ভূতলে শায়িত প্রাণহীন খুল্লতাত জননীর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা যেন একটা কান্নার অসহ্য আবেগ তাকে মোচড় দিতে শুরু করে।

দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে—ফোঁটায় ফোঁটায়।

নবীনচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁদতে থাকে।

সুরেন্দ্র মল্লিক সমাজে এবং শহরে একজন ধনী ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত—কালীতারার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে রটিয়ে দিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করলেন এবং মৃতদেহ শ্মশানে পাঠিয়ে দিলেন।

পাড়ার এয়ো-স্ত্রীরা দলে দলে এলো।

বরণীয় মৃত্যু।

স্বামীকে জীবন্ত রেখে হাসতে হাসতে মাথায় সিন্দুর পায়ে আলতা নিয়ে সতীসাধ্বী চলে গেল।

কপালে সিন্দুর ঢেলে পায়ে আলতা ঢেলে পট্টবস্ত্রে ও ফুলে ফুলে যেন রাজেন্দ্রাণীর মতই পাড়ার এয়ো-স্ত্রীর দল কালীতারাকে সাজিয়ে দিল শেষ

যাত্রার পথে।

সতী নারী স্বর্গে চলে গেল।

একমাত্র সন্তান শ্যামাসুন্দরীই, কন্যাসন্তান—তাই কালীতারার মুখাগ্নি করল নবীনচন্দ্রই।

কিন্তু সত্যি সত্যি অনাদিনাথ গেল কোথায়?

কথাটা চিন্তা করতে করতেই সুরেন্দ্র মল্লিক গৃহে ফিরে গেলেন।

দুর্গা দেবী ভাইয়ের গৃহেই দুদিনের জন্য থেকে গেলেন।

দুর্গা দেবীও যেন তার জ্যেষ্ঠ অনাদিনাথের ব্যাপারটা হাজার চিন্তা করে মাথামুণ্ডু কোন সিদ্ধান্তেই পৌছাতে পারছিলেন না।

যতই দুর্ব্যবহার করুক সেদিন—তথাপি অনাদিনাথ দুর্গা দেবীকে সত্যি সত্যিই প্রাণাধিক ভালবাসতেন—স্নেহ করতেন।

ঐ একটি মাত্র সহোদরা অনাদিনাথের।

দুর্গা দেবীও তাঁর ঐ একটিমাত্র সহোদরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

সেদিনকার সেই আক্রোশের আর অবশিষ্টমাত্রও যেন ছিল না দুর্গা দেবীর মনের মধ্যে কোথায়ও।

বরং একটা প্রচণ্ড বেদনা ও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

কালীতারার ঐ রহস্যময় মৃত্যু—আর সেই সঙ্গে অনাদিনাথ বিচিত্রভাবে নিরুদ্দিষ্ট—দুর্গা দেবী শোকে ও মনোকষ্টে যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

পরের দিন রাত্রে।

শোকের বেগ বোধ করি তখন কিছুটা মন্দীভূত হয়েছে। তবে মন্দীভূত হলেও মধ্যে মধ্যে শ্যামাসুন্দরী মা'র জন্য কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

যে ঘরে মায়ের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই ঘরের মেঝেতেই সামান্য একটা মাদুর বিছিয়ে বিনা উপাধানে শুয়েছিল শ্যামাসুন্দরী হাতের ওপরে মাথাটা ন্যস্ত করে।

তার পাশে চুপচাপ বসে ছিল কাছা গলায় দিয়ে নবীনচন্দ্র।

সত্যিকারের শ্রাদ্ধের অধিকারী তারাসুন্দরী নয়—ঐ নবীনচন্দ্রই।

কালীতারার আকস্মিক মৃত্যুটা নবীনচন্দ্রকে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।

নবীনচন্দ্রের পিতামাতা—অনাদিনাথের জ্যেষ্ঠ ভবেন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী জাহ্নবী একঘণ্টার আড়াআড়িতে মাত্র নিদারুণ বিসূচিকা রোগে যখন চোখ বোজেন নবীনচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র সাত বছর।

বালক নবীনচন্দ্র অকস্মাৎ যেন অসহায় হয়ে পড়ল।

বোঝবার ব্যাপারটা ক্ষমতাতে তার ছিলই না, এমন কি আশেপাশে তখন তার এমন কোন আপনার জনও ছিল না যে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারে বা যেখানে একটু সান্ত্বনা পেতে পারে সে।

ভবেন্দ্রনাথকে তার পিতা রোষবশে ত্যাজ্যপুত্র করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

নিদারুণ অভিমানে ভবেন্দ্রনাথ পিতৃগৃহ ত্যাগ করে একদিন একবস্ত্রে চলে যান মুর্শিদাবাদ। সেখানেই নবাবের দরবারে মুন্সী রাইচরণ দত্তের একমাত্র কন্যা জাহ্নবীকে বিবাহ করে শ্বশুর মশাইয়ের চেষ্টাতেই নবাব দরবারে সামান্য একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়।

শোভাবাজারের বসু-গৃহের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

কালীতারা একদিন বসু-গৃহের বধূ হয়ে এলো।

সেও অনেকদিন ব্যাপারটা জানতে পারে নি।

জানতে সে প্রথম পারে ভবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর।

লোকমুখে ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদটা পেয়ে অনাদিনাথ যখন অশৌচপালন করবেন বলে গৃহে স্ত্রীকে বললেন—কালীতারা বিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কার জন্য অশৌচ?

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাল হয়েছে সেইজন্য অশৌচ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—তোমার আর কোন ভাই ছিল নাকি?

ছিল বৈকি।

সে কি—আমি তো কখনো শুনি নি।

এ সংসারের সব কথাই কি তুমি জান না শুনেছো?

না—তা কেন—তা কিরকম ভাই—জ্ঞাতিভাই বুঝি—কারণ ঠাকুর তো শুনেছি বাপের একমাত্র সন্তানই ছিলেন।

তাতে কি।

তবে ?

আমার আপন সহোদর ভাই।

এক মায়ের পেটের ভাই ?

হ্যাঁ—বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন—

কেন ?

তা শুনে তোমার কি হবে ?

কালীতারা শুধায়, সে ভাই মানে ভাসুর ঠাকুর কোথায় থাকতেন ?

মুকুন্দাবাদ—তার একটি পুত্রসন্তান আছে।

বয়স কত তার ?

বেশী বয়েসের সন্তান তার—বোধ হয় বছর সাতেক হবে।

আহা বল কি—তবে তো আমার শ্যামার চাইতেও ছোট—

তা বছর দুয়েকের ছোট হবে বৈকি।

তবে সে এখন কোথায় আছে—কে তাকে দেখাশোনা করছে ?

কে আবার করবে—পথে পথে হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বল কি গো !

তা—এ সংসারে যে যেমন ভাগ্য করে এসেছে।

আহা—কি যে বল—শিশু বালক—তার আবার ভাগ্য।

তা বাপের পাপের ফল সন্তানকেও ভোগ করতে হয় বৈকি।

না, না—তাকে তুমি এখানে নিয়ে এসো—কালীতারা বলে, আহা—মা-বাপ মরা বালক—

আমার তো কিছু আর মাথা খারাপ হয় নি—অনাদিনাথ বলেন।

বলছো কি গো—তুমি না তার আপন খুল্লতাত—এ বংশের একমাত্র বংশধর।

থামো তো, খিঁচিয়ে ওঠেন অনাদিনাথ স্ত্রীকে, একমাত্র বংশধর—কোন সম্পর্ক নেই—এ বংশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার।

তাই কি হয় নাকি—এ রক্তের সম্পর্ক—জলের দাগ তো নয় যে ধুলেই মুছে যাবে।

না, না—সে আমাদের কেউ নয়—

কিন্তু যতই অনাদিনাথ বলুন না কেন, কালীতারা নিরস্ত হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেছিলেন স্বামীকে নবীনচন্দ্রকে নিয়ে আসতে।

বালক নবীনচন্দ্র এসে দাঁড়াতেই কালীতারা তাকে দুহাতে বুকের মধ্যে

টেনে নেয়। বলতে গেলে মায়ের অভাব নবীনচন্দ্রকে বোধ করতেই হয় নি—কোন দিনই।

নবীনচন্দ্রও দু'হাতে কালীতারাকে আঁকড়ে ধরেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, নবীনচন্দ্র মানুষ হলো না।

অনাদিনাথের অতিরিক্ত শাসনে ও দিবারাত্র দূর দূর করায় এবং সেই সঙ্গে কালীতারার অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে বখে গেল ছেলেটা।

কালীতারা নবীনচন্দ্রকে প্রশ্রয়ই দিয়েছে—শাসন করে নি কোন দিনও—করতে পারে নি—আহা—মা-বাপ-মরা অভাগা—

কালীতারা যেমন নবীনচন্দ্রকে স্নেহ করত—নবীনচন্দ্রের কাছেও তেমনি ঐ কালীতারা ভিন্ন এ সংসারে দ্বিতীয় আপনার জন ছিল না এবং সে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসত—শ্রদ্ধা করত খুল্লতাত-জননীকে।

সেই কালীতারার আকস্মিক মৃত্যুটা তাই নবীনচন্দ্রকে যেন বিমূঢ় করে দিয়ে গিয়েছিল—এবং যে গঞ্জিকার নেশার জন্য এতকাল ধরে সে এত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে—কালীতারা নিজেও তাকে যে গঞ্জিকার নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে এত চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়েছে—কালীতারার মৃত্যুর আঘাতে নবীনচন্দ্রের এতদিনকার সেই নেশাটা যেন হঠাৎ কেটে গেল।

আঘাত যখন প্রচণ্ড হয়ে আসে—তখন বোধ হয় মনের গভীরে এমনি করেই নাড়া দেয়—নবীনচন্দ্র যেন রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে গেল।

কালীতারার ভূপতিত মৃতদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুবর্ষণের ভিতর দিয়ে যেন তার নতুন করে আবার জন্ম হলো।

গতকাল রাত্রে শ্মশান থেকে কালীতারার দাহকার্য শেষ করে সেই যে ঐ ঘরে এসে প্রবেশ করে নবীনচন্দ্র আর বের হয়নি ঘর থেকে।

একই ভাবে ঠায় বসে আছে।

শ্যামাসুন্দরী কোনদিনই নবীনচন্দ্রকে প্রীতির চোখে দেখে নি।

তার চরিত্র ও ব্যবহারের জন্য—বিশেষ করে গঞ্জিকা সেবনের জন্য ইদানীং তাকে ঘৃণাই করত। এবং মা নবীনচন্দ্রকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য মাকে অনুযোগও করত।

সেই নবীনচন্দ্রের এ যেন অন্য এক রূপ।

সম্পূর্ণ অপরিচিত—অজ্ঞাত।

সেই যে কাল রাত থেকে এসে বসে আছে শোয় নি পর্যন্ত।

গত রাত্রে এক গ্রাস খিচুরির মতবত খেয়েছে মাত্র—আর কিছু স্পর্শও

করে নি।

কি জানি কেন শ্যামাসুন্দরীর মনটাও হঠাৎ মানুষটার প্রতি মায়ায় আর্দ্র হয়ে ওঠে কেমন।

ডাকে, নবীন—

দিদি ?

সেই কাল থেকে ঠায় একভাবে বসে আছিস—একটু শো।

না দিদি—অনেক কষ্ট—অনেক দুঃখ দিয়েছি খুড়িকে—অনেক অবাধ্যতা করেছি।

নবীন—

হ্যাঁ দিদি, মাত্র সাত বছর বয়স, ভাল করে জ্ঞানও হয় নি যখন মাকে হারিয়েছি—কিন্তু মায়ের অভাব কোন দিন জানতে পারি নি—মাতৃহারা হয়েও মাকে হারাই নি—তোমার মায়ের বুকে আশ্রয় পেয়ে—আমার খুড়ি নয়—আমার মা—সত্যিকারের মা—কথাগুলো বলতে বলতে বার বার করে নবীনচন্দ্রের দু' চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

দাসী সৌদামিনী এসে ঘরে ঢোকে, দাদাবাবু—আজ দুদিন থেকে তো উপোসী আছো—একটু ও ঘরে চল—দুধ এনে রাখা হয়েছে, গরম করে খাবে।

নবীন বলে, না সদু—আজ আর কিছু খাবো না।

একে এই শোক—তার উপরে যদি অসুস্থ হয়ে পড় তো মায়ের কাজ করবে কেমন করে দাদাবাবু—

কিছু হবে না। তুমি যাও—

সৌদামিনী চলে গেল।

এবারে শ্যামাসুন্দরী বলে, দুধ একটু খেলেও পারতে নবীন—

না দিদি—কাল হবিষ্যি করব—

তবে আর বসে থেকো না অমন করে, গা-টা একটু ঢেলে দাও—

নবীন এবারে আর কোন প্রতিবাদ জানায় না—মেঝেতে গা ঢেলে দেয়।

মা যে তোমাকে কি ভালই বাসতেন—নিজের ছেলে ছিল না তো—

জানি দিদি—আমি তার অকৃতী অধম সন্তান—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়তো জীবন দিয়েও করতে পারব না—বলতে বলতে হঠাৎ নবীন থেমে যায়, দিদি—

কেন নবীন ?

নবীন তখন মেঝেতে কান দিয়ে যেন কি শোনবার চেষ্টা করছে—কোন সাড়া দেয় না।

কি হয়েছে নবীন? ব্যগ্র কণ্ঠে শ্যামাসুন্দরী শুধায়, কি শুনছো মেঝেতে কান পেতে অমন করে?

কিসের একটা শব্দ যেন মনে হচ্ছে ঘরের নীচে থেকে আসছে—মেঝেতে কান রেখে শোন—নবীন বলে—

শব্দ—কিসের শব্দ—বিস্মিত শ্যামাসুন্দরী শুধায়।

শোন না।

শ্যামাসুন্দরী তখন নবীনচন্দ্রের নির্দেশে মেঝেতে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে।

কই—কিসের শব্দ?

পাচ্ছ না দিদি কোন শব্দ শুনতে?

না তো—কই!

ভাল করে শোন—আমি স্পষ্ট শুনছি মেঝেতে মাথা দিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে—নবীন বলে।

এবারে শ্যামাসুন্দরী বলে, হ্যাঁ পাচ্ছি—পাচ্ছি শব্দ।

পাচ্ছ শুনতে?

হ্যাঁ—মনে হচ্ছে যেন—

কেউ হা-হা করে হাসছে, তাই না?

না তো—মনে হচ্ছে কে যেন কাঁদছে।

নবীন আবার কান পেতে শোনে—তারপর বলে, তাই—এখন যেন মনে হচ্ছে সে হাউ হাউ করে কাঁদছে—একটু আগে হাসছিল এখন কাঁদছে।

দুজনাই দুজনার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

সত্যিই মনে হচ্ছে ঘরের নীচে কেউ কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে।

দিদি—

কেন নবীন?

এই ঘরের নীচেতে কোন ঘর আছে কি জান?

না তো ভাই।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই মাটির নীচে কোন ঘর আছে।

কি বলছিস রে, মাটির নীচে ঘর!

হ্যাঁ।

তা হতে পারে—পাঁচ সাত বছর আগে, আমার এখন মনে পড়ছে—

কি দিদি?

কয়েকজন রাজমিস্ত্রী এনে বাবা মেরামত্তর কাজ করাতেন।

ঠিক মনে আছে তোমার ?

হ্যাঁ।

তাহলে নিশ্চয়ই মাটির নীচে খুড়োমশাই কোন ঘর তৈরী করেছিল সে-সময়।

বল কি !

আমার তাই মনে হচ্ছে দিদি—কারণ এ ধরনের বাড়ির মধ্যে পাতালকুঠরীর কথা আমি শুনেছি দু-একজনের মুখে—তাছাড়া—

কী ?

সবাই জানে—খুড়োমশাইয়ের অনেক টাকা—সোনা-দানা-হীরে-জহরৎ—কিন্তু সে-সব কেউ কখনো দেখে নি—ঘরে কোন সিন্দুক পর্যন্ত নেই।

কি বলতে চাও নবীন ?

হয় তো—

বল, থামলে কেন ?

হয় তো ঐ ঘরের নীচে কোন পাতাল-ঘরে সে সব জমানো আছে—তাছাড়া আরো একটা কথা এখন আমার মনে হচ্ছে।

কী ?

এই ঘরের মধ্যেই খুড়ি ও খুড়োমশাই ছিলেন—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল—দরজা ভাঙবার পর খুড়ির মৃতদেহটা পাওয়া গেল, কিন্তু খুড়োমশাইকে আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া গেল না।

নবীন—যেন চমকে ওঠে শ্যামাসুন্দরী।

এ ঘর থেকে ঐ দরজা ছাড়া বেরুবার আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না।

নবীন—আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করছে—কিছু কি তুমি সন্দেহ করছো—তাহলে স্পষ্ট করে বল।

নবীনচন্দ্র শ্যামাসুন্দরীর মুখের দিকে তাকাল।

তার দৃষ্টি বাঙ্ময়।

॥ ২ ॥

সত্যিই শ্যামাসুন্দরীর বুকের মধ্যে তখন কাঁপছিল।

থর থর করে কাঁপছিল।

যে অশুভ ইঙ্গিত নবীনচন্দ্রের কথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা যদি সত্য হয় তো—শ্যামাসুন্দরী সত্যই আর যেন ভাবতে পারে না।

মাথাটার মধ্যে তার ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

নবীনচন্দ্র এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ঘরের মধ্যে এক কোণে দীপাধারে তেলের প্রদীপ জ্বলছিল, তারই মৃদু আলোয় ঘরের মধ্যে সর্বত্র একটা আলো-আঁধারি।

সমস্ত ঘরটা যেন কি এক আলো-ছায়ার রহস্যে ছম্ ছম্ করছে।

নবীনচন্দ্র তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ঘরের সর্বত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে নিঃশব্দে এবং মধ্যে মধ্যে মেঝেতে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করে।

শ্যামাসুন্দরীর মনে হয়—এই ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল।

ঘরের মধ্যে ছিল তার মা আর বাবা।

দ্বিতীয় আর কোন প্রাণীই ছিল না।

অনেক ডাকাডাকি ও ধাক্কাধাক্কি করে সাড়া না পেয়ে সকলে দরজা ভেঙে ফেলে দেখলো—তার মা ঘরের মেঝেতে মরে পড়ে আছে।

দুটি চক্ষু মুদ্রিত।

মুখটা সামান্য হাঁ করা—কষ বেয়ে নেমে এসেছে ক্ষীণ লালা-মিশ্রিত একটা রক্তের ধারা এবং তার বাবা ঘরের মধ্যে কোথায়ও নেই। অথচ বাইরে যাবার দ্বিতীয় কোন রাস্তাও ছিল না।

ঘরের মধ্যে যে কি হয়েছে কেউ জানে না।

জানবার আর কোন উপায়ও নেই।

যাবার সময় পিসেমশাইয়ের মুখখানা যেন কেমন থম থম করছিল। ভাল করে তিনি তার সঙ্গে এবারে কথাও বলেন নি।

কিন্তু নবীনচন্দ্র যে ইঙ্গিতটা একটু আগে তাকে দিল, সেদিকটা তো একটি বারও ভাবে নি শ্যামাসুন্দরী। মনের মধ্যে চিন্তামাত্রও আসে নি তার।

সে বরাবরই ভেবেছে স্বাভাবিক ভাবেই তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

তার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে তার বাপের অমন করে নিরুদ্দিষ্ট হবার যে কোন রূপ সম্পর্ক থাকতে পারে তেমন কোন সন্দেহমাত্রও তো ইতিপূর্বে তার মনের কোথাও দেখা দেয় নি।

কিন্তু নবীনচন্দ্রের ইঙ্গিতটা ক্ষণপূর্বের অত্যন্ত স্পষ্ট।

তার মধ্যে কোন সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশও বুঝি নেই।

আর তাই যদি হয়ে থাকে—

বাবা যদি সেই কারণেই—তার মাকে হত্যা করেই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকে এই

ঘর থেকে সবার অলক্ষ্যে কোন উপায়ে—ভাবতে গিয়েও বুকের ভিতরটা যেন শ্যামাসুন্দরীর হিম হয়ে যায়।

তার গলা শুকিয়ে আসে।

আর ঠিক সেই সময় নজরে পড়ে, নবীন ঘরের মধ্যে পালঙ্কটা ছিল সেটা ঠেলে সরিয়ে ফেলেছে।

তারপর এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে দীপাধারের উপর হতে প্রদীপটা হাতে করে ফিরে আসে।

প্রদীপের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের মেঝেতে কি যেন দেখছে নবীন।

কি—কী হয়েছে ওখানে নবীন!

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে নবীনকে শ্যামাসুন্দরী।

নবীনের কোন সাড়া পাওয়া যায় না—সে যা করছিল তাই করতে থাকে আগের মতই।

হস্তধৃত প্রদীপের আলোয় ঝুঁকে পড়ে ঘরের মেঝেতে তার পায়ের সামনে কি যেন লক্ষ্য করছে একাগ্র চিত্তে।

নবীন!

উঠে এসে পাশে দাঁড়ায় নবীনের শ্যামাসুন্দরী।

চাপা ব্যগ্র কণ্ঠে শুধায়, কি—কী দেখছো নবীন?

নবীন জবাব দেয় না।

বসে পড়েছে তখন প্রদীপটা নিয়ে মেঝের ওপরে—প্রদীপটা এক পাশে নামিয়ে রাখে নবীন।

তারপর হাত দিয়ে মেঝে স্পর্শ করে।

তার চোখে-মুখে তখন একটা সুস্পষ্ট উত্তেজনার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেন।

নবীন—কী দেখছো অমন করে?

দিদি!

কী নবীন?

এই দেখো—পেয়েছি—বলতে বলতে একটা চৌকো পাথর যা মেঝের ওপরে বসানো পাথরের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছে তার মধ্যস্থলে পাথরের বুকে কেটে বসানো একটা আংটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবীন শ্যামাসুন্দরীর।

আঙুলের চাপ দিয়ে আংটাটা তুলে মুঠো করে ধরে।

থর থর করে কাঁপছে তখন সর্বাঙ্গ নবীনের।

শ্যামাসুন্দরীও বোবা।

স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে নবীনের মুঠোর মধ্যে ধৃত আংটাটার দিকে চেয়ে থাকে।

নবীন ইতিমধ্যে আংটাটা জোরে ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়েছে।

টানের সঙ্গে সঙ্গেই চৌকো একটা পাথর ঘরের মেঝেতে বসানো অন্যান্য পাথর থেকে আল্‌গা হয়ে উপরের দিকে উঠে আসে।

একটা অন্ধকার গহ্বর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত অট্টহাসি যেন সেই নীচের অন্ধকার গহ্বর থেকে ওদের শ্রবণপটাহে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসছে—কে যেন হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা দুজনেই যেন বোবা হয়ে যায়—সমস্ত চেতনা—বোধশক্তি যেন ঐ মুহূর্তে শিথিল বিবশ হয়ে যায়।

হাঃ হাঃ হাঃ—

হঠাৎ প্রথম শ্যামাসুন্দরীই আর্তনাদ করে ওঠে—নবীন—বাবা—বাবা—

খুড়োমশাই—

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই বাবা—ঐ বাবার গলা—বাবাই হাসছেন।

হাসির শব্দটা তখনো আসছে কিন্তু ক্রমশঃ যেন কেমন নিস্তেজ ঝিমোনো মনে হয়—

নবীনচন্দ্র কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

শ্যামাসুন্দরী আবার চিৎকার করে বলে, বাবা—বাবা নিশ্চয়ই নীচে আছেন। শিগ্‌গিরি দেখ তুমি নবীন—আর দেরি করো না—নবীন!

হ্যাঁ, যাই।

নবীন তাড়াতাড়ি প্রদীপটা পুনরায় মাটি থেকে তুলে অন্ধকার গহ্বরটার সামনে তুলে ধরে।

হাসির শব্দ থেমে গিয়েছে তখন।

কেবল যেন একটা চাপা কান্নার শব্দ।

গুমরে গুমরে কে বুঝি কাঁদছে নীচের অন্ধকারে।

প্রদীপের আলোতেই এবারে চোখে পড়ে নবীনের—পর পর কয়েকটা ধাপ নীচে নেমে গিয়েছে অন্ধকারে।

নবীন হাতে প্রদীপ নিয়ে পা বাড়ায় সেই সিঁড়িতে।

কয়েকটি মাত্র ধাপ।

তারপরই ওরা থমকে দাঁড়ালো—নবীনচন্দ্রের পিছনে পিছনে শ্যামাসুন্দরীও ভূগর্ভে নেমে এসেছিল।

হস্তধৃত প্রদীপের আলোয় ওদের দুজনার চোখের সামনে যে দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তা যেমনি করুণ তেমনি বুঝি হৃদয়বিদারক।

শ্যামাসুন্দরীর ধারণা মিথ্যা নয়।

সত্যিই তার পিতা অনাদিনাথ।

সমস্ত মাথার চুল এলোমেলো এবং প্রায় পেকে সাদা মাথার সমস্ত চুল—কিছু চুল চোখে মুখে কপালের ওপরে এসে পড়েছে।

দু চোখের মণি দুটো বিস্ফারিত—দৃষ্টিবিহ্বল—ভাষাহীন।

পরনের ধুতিটা শতছিন্ন—

প্রায় উলঙ্গ বললেও মানুষটা বুঝি অত্যুক্তি হয় না।

শ্যামাসুন্দরী চিৎকার করে ডেকে ওঠে, বাবা—

কিন্তু সে ডাক—সে চিৎকার যেন পৌঁছালও না অনাদিনাথের কানে। কোন রকম স্পন্দন বা এতটুকু কুঞ্চনও চোখে-মুখে কোথায়ও প্রকাশ পেল না মানুষটার।

যেমন লোকটা শূন্যদৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়েছিল তেমনি চেয়ে রইল।

আর ওদের নজরে পড়লো—ঘরময় সোনার মোহর—রূপোর টাকা—গহনা সব ইতস্ততঃ ছড়ানো।

কয়েকটা শূন্য কলস মেঝেতে গড়াচ্ছে—আর কতকগুলো কলস উল্টে রয়েছে।

নবীনচন্দ্র চিৎকার করে ওঠে, খুড়োমশাই!

অনাদিনাথ বসেছিলেন—হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন—তারপরই হোঃ হোঃ করে অট্টহাসি।

উঃ, সে কি প্রচণ্ড হাসি!

ক্ষুদ্র ঐ ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ যেন ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে।

খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে ঐ প্রচণ্ড অট্টহাসির ধাক্কায়।

অনাদিনাথ হাসছেন।

হোঃ হোঃ করে অট্টহাসি হাসছেন।

শ্যামাসুন্দরী ছুটে গিয়ে উলঙ্গপ্রায় পিতাকে জড়িয়ে ধরে দুহাতে চিৎকার করে ডাকে, বাবা—

অনাদিনাথ হাসছেন।

বাবা গো—

হঠাৎ অনাদিনাথ হাসি থামিয়ে প্রবল শক্তিতে নিজেকে একটা ঝটকা দিয়ে কন্যার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাকে একটা ধাক্কা দেয়।

শ্যামাসুন্দরী ঘরের দেওয়ালের উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

চিৎকার করে ওঠেন অসংলগ্ন ভাবে অনাদিনাথ, না, না, না।

চোখ দুটি স্থির।

কি এক আতঙ্কে যেন বিস্ফারিত—সামনের দিকে শূন্যে নিবদ্ধ।

ভীত বিহ্বল কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন আবার অনাদিনাথ, না, না—চেয়ো না—অমন করে চেয়ে থেকো না গিন্নী—কি—কি চাও?

বাবা!

শ্যামাসুন্দরী ভীত—বিহ্বল।

চিৎকার করে ডাকে অনাদিনাথকে।

হ্যাঁ—করেছি—অনাদিনাথ বলতে থাকেন, তোমার গলাটা এই দুই হাতে টিপে ধরেছিলাম—অনাদিনাথ তার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে হাতের দশটা আঙুল তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন।

কেমন যেন বুজে আসা কণ্ঠে বলতে থাকেন, মরে গেলে—তুমি মরে গেলে গিন্নী!

কেন মরলে—কেন—কেন—কেন—না, না— তুমি মর নি—গিন্নী—চিৎকার করে ডেকে উঠলেন অনাদিনাথ।

সেই তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দ ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে দেওয়ালে আঘাত খেয়ে যেন একটা বুকভাঙা আর্তনাদের মত ছড়িয়ে পড়লো।

তারপরই আবার সেই হো-হো হাসি।

খান খান হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে বুঝি সেই প্রচণ্ড হাসির শব্দে ভূগর্ভস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটা।

হাঃ হাঃ হাঃ।

অনাদিনাথ পাগল হয়ে গিয়েছেন।

সম্পূর্ণ উন্মাদ।

ঘোর উন্মাদ।

কখনো হাসছেন—কখনো কাঁদছেন।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন সুরেন্দ্র মল্লিক।

নবীনচন্দ্র রটনা করে দিয়েছিল অনাদিনাথ হঠাৎ ফিরে এসেছেন রাত্রে—বদ্ধ উন্মাদ।

তাঁকে যে ভূগর্ভস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে উন্মাদ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে সেটা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলো না নবীনচন্দ্র।

শ্যামাসুন্দরীকেও নিষেধ করে দিল কথাটা কারো কাছে না প্রকাশ করতে।

সুরেন্দ্র মল্লিক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন শ্যালকের দিকে।

উন্মাদ অনাদিনাথ।

কখনো হাসছে—কখনো কাঁদছে।

শোকের উপর আর এক শোকের ছায়া নেমে এলো।

॥ ৩ ॥

হঠাৎ সুলোচনা অসুস্থ হয়ে পড়লো।

একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো।

দীর্ঘদিন ধরে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় চলছিল—মনের দুঃখ যেটা বরাবর সযতনে চাপা দিয়ে গিয়েছে সুলোচনা—কাউকে কখনো ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি, মানসিক সেই যন্ত্রণাটাই নিশিদিন দেহ ও মনকে তার কুরে কুরে খাচ্ছিল—ক্ষয়ের সেটা যেমন একটা কারণ তেমনি ব্রতাদি পালন ও উপবাসও আরো একটা কারণ ছিল।

সেদিন যে মায়ের মন্দিরে মাথা ঘুরে সুলোচনা পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে সে পায়ে চোট লাগবার জন্য নয়—ভিতরে ভিতরে যে ক্ষয় চলছিল দীর্ঘদিন ধরে সেই ক্ষয়ের দরুনই।

জ্ঞান হবার পর বাড়িতে ফিরে এলো সুলোচনা স্বামীর সঙ্গে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারল না—দিন-দুই পরেই আবার একদিন ঘরের মধ্যে পড়ে গেল।

আবার জ্ঞান হারালো।

সুনয়না হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। হরনাথকে পাঠিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি কবিরাজ মশাইকে ডেকে আনতে। কানা কবিরাজ এলো। অনেকক্ষণ ধরে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করে চোখ বুজে রইলো।

তারপর কয়েকটি প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ালো।

সুনয়নার বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে ওঠে।

কানা কবিরাজ হরনাথকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

হরনাথ প্রশ্ন করে, কেমন দেখলেন কবিরাজ মশাই ?

মাথা নাড়ল কবিরাজ বিষণ্ণভাবে। বলে, না—ভাল না।

সুনয়না ওদের পশ্চাতে দরজার উপর এসে দাঁড়িয়েছিল। কবিরাজ কালীচরণ বা হরনাথ কেহই তা দেখতে পেলে না।

কালীচরণ মাথা নেড়ে বলে, সবই শেষ হয়ে এসেছে বলতে গেলে।

কি বলছেন কবিরাজ মশাই ?

ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে হরনাথ।

হ্যাঁ—মনে হচ্ছে ক্ষয় চলেছে দীর্ঘদিন ধরে।

কি হবে কবিরাজ মশাই ?

কি হবে তা কেমন করে বলবো! তবে আমাদের নিদানে এর বড় একটা কিছু সন্তোষজনক প্রতিকার নেই।

ঔষধপত্র!

দেবো—তবে ঔষধে কতটুকু কাজ হবে জানি না—একসময় গিয়ে ঔষধ নিয়ে আসবেন।

একটা কথা কবিরাজ মশাই—

কী ?

শেষ সময় কি একেবারে—

একেবারে সামনে না হলেও খুব বেশী বিলম্ব নেই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তনাদ সুনয়নার কণ্ঠ হতে নির্গত হয়। উভয়েই যুগপৎ—কবিরাজ কালীচরণ ও হরনাথ সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের দিকে ফিরে তাকায়।

সুনয়না দরজার উপর প্রস্তরপ্রতিমার মত যেন দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের বুঝতে বাকী থাকে না যে—সুনয়নার সব কিছুই কর্ণগোচর হয়েছে।

হরনাথ তাড়াতাড়ি করালীচরণকে চোখের ইঙ্গিত করে স্থানত্যাগ করতে বলে। করালীচরণ এগিয়ে যায়—হরনাথ তাকে অনুসরণ করে।

সুনয়না যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

পথে নেমে হরনাথ করালীচরণকে বলে, চলুন কবিরাজ মশাই—ঔষধটা নিয়েই আসি।

চলুন।

উভয়ে করালীচরণের গৃহের দিকে চলতে থাকে।

সুনয়নার বিবাহের সময়টা কি জানি কেন কালীকৃষ্ণ পিছিয়ে দিয়েছেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

কথা ছিল মাঘেই শুভকাজ সম্পন্ন হবে, কিন্তু মাঘ মাসে হয় নি।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নি হরনাথ।

বিবাহের ব্যাপারে কালীকৃষ্ণ ও তদীয় গৃহিণীর এত আগ্রহ ছিল—এমন কি মাঘেই কাজ সুসম্পন্ন করার ইচ্ছা ছিল—হঠাৎ কেন যে তাঁরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিবাহটা পিছিয়ে দিলেন বুঝতে পারে নি হরনাথ।

হরনাথ অবিশ্যি আপত্তি জানাতে পারে নি।

জানাবেই বা কি করে।

বরং বাধ্য হয়েই তাকে ব্যাপারটা মেনে নিতে হয়েছে।

ধনীর খেয়াল।

খেয়াল হয়েছিল যখন মেতে উঠেছিলেন—আবার খেয়ালের বশেই হয়তো ব্যাপারটা পিছিয়ে দিয়েছেন।

পথ চলতে চলতে ভাবে হরনাথ।

কবিরাজ যা বলছেন তাই যদি সত্য হয় তো সুনয়নার বিবাহটা শীঘ্র দেওয়া দরকার। সুলোচনার প্রচেষ্টাতেই অসম্ভব ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে—সে বেঁচে থাকতে থাকতে বিবাহটা হওয়াই মঙ্গল।

আর তারই তো এ ব্যাপারে বেশী আগ্রহ।

হরনাথ মনে মনে স্থির করে, একবার যাবে বৌবাজারে কালীকৃষ্ণের গৃহে আজই—সুলোচনার অসুস্থতার কথা বলে অনুরোধ জানাবে, যাতে শীঘ্র শুভ কাজটা সম্পন্ন হয়, সেদিকে যদি তিনি অনুগ্রহ করে একটু দৃষ্টি দেন—

মহাশয় ব্যক্তি কালীকৃষ্ণ।

সুলোচনার অসুস্থতার কথা শুনলে হয়তো অরাজী হবেন না।

হরনাথ ও করালীচরণ চলে যাবার পরও সুনয়না যেমন চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়েছিল, প্রস্তরমূর্তির মত তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

বড়মা শয্যা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন যেন অকস্মাৎ সুনয়নার বুকের ভিতরটা এক অজ্ঞাত ভয়ে কেঁপে উঠেছিল।

ঠিক এমনি করেই কেঁপে উঠেছিল এক অজ্ঞাত ভয়ে তার বুকের ভিতরটা তার নিজের গর্ভধারিণী জননী যেদিন শয্যা নিয়েছিলেন সেদিন।

কে যেন তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল, এই শোওয়াই শেষ

শোওয়া। সত্যিই তাই হয়েছিল। নয়নতারা, তার গর্ভধারিণী জননী, আর উঠলো না।

মায়ের মৃত্যুর পর বড়মাকে পেল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তার বড়মাও চললো।

কি দুর্ভাগ্য করেই না এ সংসারে সে এসেছে—যেখানে হাত বাড়ায় সেখানেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়।

বড়মাও তার ভাগ্যে টিকবে না। বড়মাও চললো।

সুনয়নার দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

ভগবান—কোন সুকৃতিই কি কোন জন্মে আমার ছিল না কিছুমাত্র, যে কেবল দুঃখই আমার প্রাপ্য? দুঃখের পর দুঃখই তুমি আমায় দিচ্ছ?

ঘরের ভিতর থেকে ঐ সময় সুলোচনার ডাক আসে মৃদু কণ্ঠে।

নয়ন—

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে সুনয়না সাড়া দেয়, বড়মা—

কোথায় তুই মা, একটু শুনে যা—

যাই বড়মা।

শয্যায় শায়িতা সুলোচনার পাশটিতে এসে দাঁড়ায় শান্ত পায়ে সুনয়না।

বড়মা—

আয়—আমার কাছে আয়।

সুনয়না সুলোচনার শয্যার পাশে এসে বসে।

সুলোচনা হাত বাড়িয়ে সুনয়নার একখানি হাত ধরে।

নয়ন!

বড়মা—

গলাটা অমন ভারী-ভারী মনে হচ্ছে, কি হয়েছে রে?

কিছু না বড়মা।

কাঁদছিলি?

না তো।

হ্যাঁ—গলা শুনেই বুঝতে পারছি—কবিরাজের কথায় ভয় পেয়েছিস?

বড়মা!

কান্নায় সুনয়নার গলার স্বর যেন বুজে আসে।

সুলোচনা বলে, প্রত্যেক মানুষকেই একদিন মরতে হবে—মরতে হয়—তাছাড়া দুজনকে তোদের সত্যিই যদি রেখে যেতে পারি সে আমার কত বড়

সৌভাগ্য বল তো।

না, না—ওকথা বলো না বড়মা—ও কথা বলো না—

নিজেকে আর রোধ করতে পারে না সুনয়না—কান্নায় সুলোচনার বুকের উপর ভেঙে পড়ে।

সুলোচনা পরম স্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে. ওরে কাঁদিস নে—

না, না।

কাঁদিস নে—তোর ব্যবস্থা না করেই কি আমি যাবো—তবে যে নিশ্চিন্তে যেতেও আমি পারব না—

সুনয়না ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সুলোচনার বুকের উপর পড়ে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

হরনাথই যে মনে মনে ব্যাপারটা স্থির করে তাই নয়—সুলোচনাও ঐ দিন স্বামীকে তাগিদ দেয়, বলে, দেখ, একটা কথা বলছিলাম—

কী?

নয়নার বিবাহের কথা।

বড়বৌ—

হ্যাঁ—তুমি বরং একবার যাও বৌবাজারে বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের ওখানে।

কিন্তু—

বাঁড়ুজ্জে মশাইকে গিয়ে বল যে আমি অসুস্থ—তিনি যদি শুভকাজটা আর বিলম্ব না করে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি—

আমিও তাই ভাবছিলাম বড়বৌ।

কালই একবার না-হয় তুমি যাও।

কাল নয় বড়বৌ—আজই যাবো।

কিন্তু যাবার ইচ্ছা থাকলেও হরনাথের ঐ দিনই যাওয়া হলো না।

নবদ্বীপ থেকে আকস্মিক এক দুঃসংবাদ এলো লোক-মারফৎ।

তার দ্বিতীয়া স্ত্রী দাক্ষায়ণীর কাল হয়েছে। বছরখানেক ধরেই নাকি সে নানা রোগে ভুগছিল—গত শনিবার অর্থাৎ দিনকয়েক পূর্বে তার কাল হয়েছে। সন্তানহীনা দাক্ষায়ণী।

কাজেই তার পারলৌকিক কাজটুকু হরনাথকেই সম্পন্ন করতে হবে।

সংবাদটা শুনে বহুকাল পরে যেন হরনাথের আর একটি মুখ মনে পড়ে যায়, তার দ্বিতীয়া স্ত্রী দাক্ষায়ণীর মুখখানা।

ছোটখাটো কৃশ তনু।

মুখখানি ভারী শান্ত।

আর চোখ দুটি দেখলে মনে হতো সদাই যেন অশ্রুতে ছলছল করছে।

বিবাহই করেছিল হরনাথ গৃহের সকলের ইচ্ছায় ও আগ্রহে এবং বিশেষ করে সুলোচনার সেদিনকার বিচিত্র জিদের জন্য। কিন্তু স্ত্রী বলে কি মনেপ্রাণে কখনও তাকে গ্রহণ করতে পেরেছিল ?

তার ও দাক্ষায়ণীর মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য একটা বাধার মতই বুঝি দাঁড়িয়েছিল সুলোচনা।

গঙ্গাসাগর থেকে গোপালকে বিসর্জন দিয়ে সুলোচনা গৃহে ফিরে এলো একদিন দুর্জয় এক অভিমান বুকের মধ্যে নিয়ে।

যেখানে এতকাল ছিল স্নেহ মমতা ভালবাসা, সেখানে কেবল এখন এক দুরন্ত অন্ধ অভিমান।

যে অভিমানের দরজায় মাথা খুঁটে খুঁটে হরনাথ রক্তাক্ত হয়ে গেল তবু সুলোচনার মন গলল না।

সুলোচনা স্বামীর দিকে ফিরেও তাকাল না।

সে সময় সুলোচনার প্রতি হরনাথেরও একটা অভিমান হওয়া একান্ত স্বাভাবিক—এবং সেই অভিমানের বশেই—সুলোচনার ঐ বিশ্রী জিদের কাছে নতিস্বীকার করেছিল হরনাথ।

দাক্ষায়ণীকে বিবাহ করতে সম্মত হয়ে গেল।

বিবাহ হয়েও গেল কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

দাক্ষায়ণীকে সে মন্ত্র পড়ে স্ত্রী রূপে মেনে নিল বটে কিন্তু সত্যিকারের যাকে বলে গ্রহণ, তা করতে পারল না।

সমস্ত মন তার সুলোচনাই আচ্ছন্ন করে রাখল।

শান্ত—একান্ত নির্বিরোধী মেয়ে দাক্ষায়ণী—তাই সহজ বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে স্বামীর কাছ থেকে গুটিয়ে নিল।

স্বামীর সান্নিধ্য থেকে নিঃশব্দে দূরে সরে এলো।

কোন অভিযোগ কোন নালিশ জানাল না কারো কাছে।

রাত্রে দুজনে এক ঘরের শয্যায় রাতের পর রাত শুয়ে পরস্পরকে স্পর্শ পর্যন্ত

করে নি কোনদিন। অথচ কথাটা কেউ জানতে পারলো না। জানবার কোন উপায়ও ছিল না।

এমনি করেই দিন কাটছিল, এমন সময় কলকাতা থেকে নবদ্বীপে মিশ্র-গৃহে বেড়াতে এলো হরনাথের দূর-সম্পর্কীয় ভাই সুধামাধব।

হরনাথ চলে এলো সুধামাধবের সঙ্গে কলকাতায় তার অনুরোধে। এবং কলকাতায় আসার দিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

দাক্ষায়ণী—

মাথা নীচু করে ধীর কণ্ঠে দাক্ষায়ণী বলে, আমায় কিছু বলছেন—

হ্যাঁ—শুনেছো বোধ হয় আমি কাল কলকাতায় যাচ্ছি।

শুনেছি—দিদি বলছিল।

কেন যাচ্ছি তাও শুনেছো বোধ হয়।

না।

ভাগ্যান্বেষণে—নতুন শহর কলকাতা—বহু লোক সেখানে—এবং সেখানে নাকি চেষ্টা করলে অনেক অর্থ উপার্জন করা যায়—তাই একবার দেখতে যাবো—

দাক্ষায়ণী চুপ করে থাকে—কোন কথা বলে না।

হরনাথ বলে, কিছু বললে না যে—

আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন—আমি অজ্ঞ মুখ্যু স্ত্রীলোক—কি বলবো, কি বুঝি।

তবু তো তুমি আমার স্ত্রী।

হরনাথের মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষায়ণী মুখ তুলে বুঝি তাকিয়েছিল। মনে হলো হরনাথের, যেন একটা বাঁকা হাসির ক্ষীণ বিদ্যুৎ দাক্ষায়ণীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

দাক্ষায়ণী পরক্ষণেই মাথাটা নীচু করে। পূর্ববৎ নিঃশব্দেই থাকে—কোন কথার জবাব দেয় না।

দাক্ষায়ণী—

বলুন—

তোমার কি কিছুই আমাকে বলবার নেই—কিছুই জিজ্ঞাসা করবার নেই।

আপনি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান—আমি কি প্রশ্ন করবো আপনাকে?

দাক্ষায়ণী, আমি হয়তো তোমাকে বিবাহ করে তোমার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছি।

দাক্ষায়ণী যেন সহসা আর্তনাদ করে ওঠে, না, না।

হরনাথ বলে, হ্যাঁ অন্যায় করেছি—এবং যার সংশোধনের কোন উপায়ই আজ আর নেই—তুমি আমায় পার তো ক্ষমা করো—

না, না—ওকথা বলবেন না—আপনি স্বামী—গুরু—দেবতার দেবতা—ও কথা শোনাও আমার মহাপাপ।

দাক্ষায়ণী গলবস্ত্র হয়ে স্বামীর পায়ের কাছে প্রণাম জানায়। তার দুচোখে দুটি ক্ষীণ জলের ধারা। এবারে দাক্ষায়ণী বলে, আবার কবে আসবেন ?

জানি না—ভাগ্যান্বেষণে চলেছি—কবে ফিরব কে জানে।

দিদিকে সঙ্গে নিয়ে গেলে পারতেন।

পাগল তুমি।

ওকথা কেন বলছেন ?

পাগল না হলে তুমি ওকথা বলতে ?

আমি কি কিছু অন্যায় করেছি—অপরাধ ?

না, না—কোন অন্যায় করো নি—অপরাধও নয়।

আর ফিরে যায় নি হরনাথ দেশে।

আর দেখা হয় নি দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তার। সেই শেষ। আশ্চর্য—মনেও কথনো পড়ে নি সেই মুখখানি—সেই শান্ত স্থির সুন্দর কোমল মুখখানি।

কিন্তু আজ মনে পড়ছে।

আজ মনে পড়ছে যেন বার বার সেই মুখখানি।

হতাদরে অবহেলায় যে চিরদিন তারই মঙ্গল কামনা করে তারই বঞ্চনার বোঝা মাথায় করে নিয়ে এতকাল নিঃশব্দে কাটিয়ে তারপর নিঃশব্দে একদিন চলে গেল—আজ যেন তার মুখখানা বার বার মনের পাতায় ভেসে উঠছে।

একবার ভেবেছিল হরনাথ, সুলোচনাকে কিছু বলবে না, সুলোচনাকে কিছু জানাবে না।

কিন্তু পরে কি ভেবে সব কথা সুলোচনার কাছে প্রকাশ করাই স্থির করে হরনাথ।

অবিশ্যি সুলোচনার দৃষ্টিকেও এড়াতে পারে নি হরনাথ।

তার রুক্ষ তৈলহীন চেহারাটাই সুলোচনার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। এবং সে-ই প্রথমে প্রশ্ন করে স্বামীকে।

কি হয়েছে তোমার ?

কেন!

হরনাথ সুলোচনার মুখের দিকে তাকাল।

অমন রুক্ষ বিষণ্ণ লাগছে কেন তোমায়—কি হয়েছে গো?

বড়বৌ!

কী?

নবদ্বীপ থেকে একটা দুঃখের সংবাদ এসেছে।

দুঃখের সংবাদ—কি—কি হয়েছে গো!

দাক্ষায়ণী—

কি—কি হয়েছে মেজর—ভাল আছে তো সে?

সে নেই।

নেই!

না।

সংবাদটা সুলোচনাকে যেন স্তব্ধ করে দেয়। কয়েকটা মুহূর্ত সে কোন কথা বলতে পারে না। কেবল দুচোখের কোল বেয়ে দুটি নিঃশব্দ অশ্রুধারা নেমে আসে।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শুধায় সুলোচনা কথাটা, কবে এমন হলো?

গত শনিবার।

তাহলে আজ পাঁচদিন?

হ্যাঁ।

কি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত?

দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিল শুনলাম।

আহা—আমিই বোধ হয় তার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

না—না—ওকথা বলো না—যদি কেউ দায়ী হয় তো আমিই—আমারই পাপের ফল। একটা কথা ভাবছিলাম বড়বৌ।

কী?

নয়না দাক্ষায়ণীর কথা বোধ হয় কিছুই জানে না—তাকে কথাটা জানানো—হাজার হলেও সম্পর্কে সে তো তার সন্তানই—

জানাতে হবে বৈকি—সেও যে ওর মা।

কিন্তু—

আমি বলবো।

বেশ—তবে যা বলবার তুমিই বলো।

সুলোচনাই সুনয়নাকে ডেকে পাশে বসিয়ে খবরটা দিল।

কিন্তু সুনয়না সব শুনে বললে, আমি তো জানি বড়মা—আমার আর একজন মা নবদ্বীপে ছিলেন—আমার মেজমা।

তুই জানতিস ?

হ্যাঁ—মা-ই একদিন আমাকে সব বলেছিল মরবার কিছুদিন আগে।

ছোট বৌ তোকে সব বলেছিল তাহলে ?

হ্যাঁ মা।

হরনাথই অশৌচ পালন করল এবং দশদিন পরে যথাবিহিত শ্রাদ্ধ করল পরলোকগতা স্ত্রীকে স্মরণ করে।

ঐ সব গোলমালে দশ-বারটা দিন কেটে গেল আরো।

হরনাথের বৌবাজারে কালীকৃষ্ণের সঙ্গে আর দেখা করা হলো না।

সুলোচনা আবার একদিন কথাটা স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

একটিবার এবারে তুমি যাও বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের কাছে।

হ্যাঁ যাবো।

পরের দিনই সন্ধ্যায় হরনাথ কালীকৃষ্ণের আলয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো।

কালীকৃষ্ণ সাদরে হরনাথকে আহ্বান জানালেন, আসুন—আসুন মিশ্র মশাই—আমিই ভাবছিলাম আপনার কাছে লোক পাঠাব—আপনিই এসে গেলেন।

॥ ২ ॥

শিবনাথ সেদিন অমন করে বলার পর জীবনকৃষ্ণ বিবাহে মত দিয়েছে।

সে বলেছে, ঠিক আছে, মা বাবা যা ভাল বুঝবেন তাই তবে হোক।

শিবনাথ কথাটা সত্যবতীর গোচরীভূত করতে এতটুকু কালবিলম্ব করে নি—সেই দিনই তাঁকে কথাটা জানিয়ে দেয়।

জীবন মত দিয়েছে মা।

সত্যি ?

সত্যবতীর সংবাদটা শুনে আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না। উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সত্যবতী আনন্দে।

ডাইনীটাকে তবে সে ভুলতে পেরেছে ?

শিবনাথ বলে, ওসব কথা থাক মা—ওসব কথা আর ভাববেন না—আপনি ওর বিবাহের ব্যবস্থা করুন।

সত্যবতী প্রাণভরে আশীর্বাদ করে শিবনাথকে।

তুমি যে আমাদের কি উপকার করলে বাবা—দীর্ঘায়ু হও—বেঁচে থাক।

সত্যবতী সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে জানান।

কালীকৃষ্ণ সব শুনে বলেন, আমি তো তখনি তোমাকে বলেছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে, গিন্নী। সত্যবতী কোন জবাব দেয় না।

কাঁচা বয়েসের দাগ মন থেকে মুছে যেতেও বেশী সময় লাগবে না।

তা হোক—তুমি আর দেরি করো না—

না—দেরি করবো না আর।

মিশ্র মশাইয়ের গৃহে সরকার মশাইকে একবার কালই পাঠাও—তাকে ডেকে আয়োজন করতে বল এবারে।

হ্যাঁ—বলবো।

কিন্তু সরকারকে আর পাঠাতে হলো না।

যেদিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা হয়, তার পরদিনই সন্ধ্যায় হরনাথ নিজে এসে তাঁর গৃহে হাজির হলো।

হরনাথ বলে, আপনি পাঠাচ্ছিলেন ?

হ্যাঁ।

কেন ?

যে কারণে সেদিন বিবাহটা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম সে কারণটা আর বর্তমানে নেই।

তবে—

আমি আগামীকালই আমাদের কুলপুরোহিতকে ডেকে পাঠাবো—একটা শুভদিন স্থির করবার জন্য—

হরনাথের চোখে জল এসে যায়।

মাঘও শেষ হয়ে গেল—ফাল্গুনেই যাতে শুভ কাজটা হয়।

আপনার অসীম দয়া।

আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো মিশ্র মশাই ?

না, না—কোন অসুবিধা হবে না—যেদিন আপনি বলবেন আমি সেই দিনই প্রস্তুত আছি।

বেশ—তবে সেই কথাই রইলো,—আপনি দুদিন বাদে একবার অনুগ্রহ করে যদি আসেন—

বিলক্ষণ, আসবো বৈকি।

সেদিনকার মত হরনাথ বিদায় নিল।

গৃহে প্রত্যাগমন করতেই সুলোচনা ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে স্বামীকে, কি হলো —কি বললেন ?

বিবাহের দিন দেখে রাখবেন বললেন—আমাকে দিন দুই বাদে আবার যেতে বলেছেন—তাঁদের ইচ্ছা সামনের ফাল্গুনেই বিবাহটা হয়ে যায়।

আঃ—

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় সুলোচনা বুকভরে।

নির্দিষ্ট দিনেই হরনাথ পুনরায় কালীকৃষ্ণের আলয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো।

কালীকৃষ্ণ জানালেন বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। বারো দিন পরে ২রা ফাল্গুন গোধূলি লগ্নে। শুভ সংবাদ নিয়ে প্রচুর মিষ্টান্ন মিষ্টিমুখ করে হরনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করে।

ওঠবার ক্ষমতা ছিল না সুলোচনার।

একেবারে সে শয্যাশায়ীই হয়ে পড়েছিল।

ক্রমশই দেহটা যেন শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়ছিল, তবু সেই রুগ্ন শীর্ণ অশক্ত দেহ নিয়েই কন্যার বিবাহের সব যোগাড়-যন্ত্র করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুলোচনা।

প্রতিবেশিনী কাত্যায়নী দেবীকে ডেকে আনে।

দিদি আমার তো শক্তি নেই—আপনি যদি একটু না দেখাশোনা করেন—আমার নয়নের বিয়ে—

ওমা—সে কি কথা—করব বৈকি—তোমার মেয়ে কি আমার মেয়ে নয় ভাই ?

তা কি আমি জানি না দিদি—আপনারা দশজন আছেন পাড়ায় সেই তো ভরসা এ বিদেশ-বিভুঁয়ে—

তা মেয়ের কোথায় বিয়ে স্থির করলে নয়নের মা ?

সেও মেয়েরই আমাদের নেহাত ভাগ্য বলতে হবে দিদি।

কি রকম ?

ছেলের মা—মায়ের মন্দিরে পূজো দিতে এসে আমাদের নয়নকে দেখেই পছন্দ করে।

ওমা—তাই নাকি ?

হ্যাঁ দিদি—রাজার ঐশ্বর্য—বিরাট ঘরবাড়ি গম গম করছে—বৌবাজারের কি এক সাহেব কোম্পানীর বেনিয়ান কালীকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্যে—তাঁরই একমাত্র

ছেলের সঙ্গে বিয়ে।

ওমা—এ যে গপ্পো কথা হলো গো—মেয়ে তোমার দেখছি ভাই সত্যিই পয়মন্ত—নচেৎ ঐ বাঁড়ুজ্জ্যেদের আমি জানি বিরাট ধনী ব্যক্তি—তবে হ্যাঁ—কর্তা গিন্নী মানুষ বড় ভাল—ঐ একটি মাত্র সন্তান।

আশীর্বাদ করুন দিদি মেয়ে যেন আমার সুখী হয়।

সুখী হবে বৈকি—নিশ্চয়ই সুখী হবে—তুমি কিছু ভেবো না নয়নের মা—এমন সৌভাগ্যবতী মেয়ে—সুখী হবে না—নিশ্চয়ই সুখী হবে।

কাত্যায়নী দেবী ও পাড়ার আর দু'চারজন মহিলা তারাই কোমর বেঁধে লেগে গেলেন।

সুলোচনা নিশ্চিন্ত হয়।

মনে মনে কেবল মা কালীকে স্মরণ করে, মাগো তুমিই ওর পাত্র জুটিয়ে দিয়েছো—তোমার মন্দিরচত্বরেই ওকে দেখে ঠাকরুণের পছন্দ হয়েছে—ভালয় ভালয় কাজটা যেন সুসম্পন্ন হয়ে যায় মা।

হরনাথেরও চিন্তার অন্ত ছিল না যেন।

কালীকৃষ্ণ বলেছেন বটে শাঁখা সিন্দুর দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করবেন—তাঁর কোন দাবি-দাওয়া নেই—তথাপি কন্যার বিবাহ বলে কথা।

যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান—সামাজিক রীতিনীতি কোনটাই তো বাদ দেওয়া যাবে না। এবং কিছু না হলেও শতাধিক টাকা খরচ হবেই—সে টাকাটাই বা কোথা থেকে আসবে—হাতে তো একটি কপর্দকও নেই।

দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে এক অজ্ঞাত আশংকায় হরনাথের বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে।

ইতিমধ্যে একদিন কালীকৃষ্ণের গৃহে বিবাহের ব্যাপারেই যেতে হয়েছিল, তখন সেখানকার আয়োজন দেখে হরনাথ হাঁ হয়ে গিয়েছে।

বাড়ির সামনে ইতিমধ্যেই মস্ত নহবতের মঞ্চ বাঁধা হয়েছে—সানাই বাজছে।

চারিদিক থেকে আত্মীয়-স্বজনরা সব এসেছে এবং প্রত্যহ আসছে—মানুষ-জনে বিরাট বাড়িটা যেন গম গম করছে। লক্ষাধিক মুদ্রা নাকি ব্যয় করবেন কালীকৃষ্ণ তাঁর একমাত্র পুত্রের বিবাহোৎসবে। মানুষ-জন খাবে—বাঈজীর নাচগান হবে—আতসবাজী পুড়বে—হৈ হৈ ব্যাপার।

সব দেখেশুনে হরনাথের বুক শুকিয়ে গিয়েছে।

এ সে কোথায় কন্যার বিবাহ দিতে চলেছে!

শেষকালে কি একটা বিশ্রী অপমানের ব্যাপার হবে—লোকে তার স্পর্ধাকে

ছি ছি করবে—থুৎকার দেবে—

বলবে, দেখছো আস্পর্ধাটা—বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার প্রয়াস।

কালীকৃষ্ণর ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে সুলোচনার সামনে বসে পড়ে হরনাথ।

কি হলো, অমন করে বসে পড়লে কেন?

আর কি হলো—এবারে বোধ হয় জাত কুল মান ধর্ম ইজ্জত সব যায়।

কেন গো, কি হলো?

উৎকণ্ঠার অবধি থাকে না সুলোচনার। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্নটা করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হরনাথ তখন একটু আগে কালীকৃষ্ণের গৃহে যে বিরাট আয়োজন দেখে এসেছে তার সাধ্যমত বর্ণনা দেয়।

সত্যি?

তবে কি মিথ্যা বলছি বড় বৌ—এখন তুমিই বল কি হবে উপায়—আমার তো ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

কিছু ভয় করো না—

কি বলছো তুমি—অবাক বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায় হরনাথ।

ভুলে যাচ্ছো কেন—মায়ের দয়াতেই সব হয়েছে—যা কিছু ঘটেছে আজ পর্যন্ত মায়ের দয়াতেই—মা-ই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

বড় বৌ—

বল।

তোমার মত বিশ্বাস যদি আমার থাকত!

না ও কথা বলো না—তোমার ওপরে নির্ভর করেই তো আমার যা কিছু বিশ্বাস—সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

কিন্তু কি করে হবে তাই ভাবছি—দেখো একটা কথা ভাবছিলাম।

কি—

সুধামাধবের কাছে একবার যাবো?

যাবে বৈকি—কেন যাবে না—তার শালীর মেয়েই তো ও—অন্তু সম্পর্ক ছেড়ে দিলেও।

কাল তাহলে একবার যাই—কি বল?

যাও।

কিন্তু যেতে হলো না হরনাথকে সুধামাধবের কাছে—সুধামাধবই পরের দিন

সস্ত্রীক এসে তার গৃহে হাজির হলো।

হরনাথ, আছো নাকি হে?

কে?

হরনাথ সুলোচনার পাশে বসে জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করছিল সকালের দিকে আহ্নিকাদির পর। সুধামাধবের ডাকে চমকে ওঠে, কে!

আমি—বের হয়ে এসো না—দেখোই না কে—অবিশ্যি আজ শহরের অন্যতম ধনীর ঘরে মেয়ের বিবাহ দিতে চলেছো—চিনতে পারবে কি না জানি না।

হরনাথ তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

কণ্ঠস্বরেই চিনতে পেরেছিল হরনাথ মানুষটাকে, সুধামাধবই।

তু—তুমি?

হ্যাঁ—সুধামাধব—তা চিনেছো?

ছি ছি, ও কি কথা ভাই—তাই তো কি সৌভাগ্য আমার, এসো—এসো—

সুধামাধব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি ভিতরে যাও না গিন্নী।

সুধামাধব-গৃহিণী সুলোচনার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

বসো ভাই—বসো—

শশব্যস্তে হরনাথ একটা আসন এনে বিছিয়ে দেয় বারান্দায়—তামাকের ব্যবস্থা করে।

তামাকু সেবন করতে করতে সুধামাধব বলে, তা হ্যাঁ হে হরনাথ—আমরা কি তোমার এতই পর যে মেয়ের এমন বিয়ে দিচ্ছ—বিশেষ করে আমাদের নয়নের মেয়ে—একটা খবর পর্যন্ত দাও নি—

অপরাধ হয়েছে ভাই—করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করছি—ক্ষমা করো—

॥ ৩ ॥

সুধামাধব বলে, ক্ষমা—ক্ষমা আবার কিসের হে—তুমি কি আমার পর—ভুল যদি একটা হয়েই থাকে—না হে না—কথায় কথায় বলেছি—তা এমন অঘটনটা ঘটালে কি করে বল তো ভায়া—

হরনাথ বলে, আমি ঘটাবার কে ভাই—যিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী সেই মায়ের ইচ্ছায় সব হয়েছে।

কি রকম- মায়ের ইচ্ছায়?

ব্যাপারটা তখন হরনাথ খুলে বলে, তা বৈকি—সব সেই মায়েরই ইচ্ছা—বলে ইতিবৃত্ত বিবৃত করে।

সব শুনে মাথা দোলাতে দোলাতে সুধামাধব বলে, আমাদের নয়নের মেয়েটার ভাগ্য তো আছে বলতে হবে হে—মা-মরা মেয়ে—

হ্যাঁ ভাই, এখন তোমরা আশীর্বাদ করো যেন ও সুখী হয়।

হবে বৈকি—হবে—তা হ্যাঁ হে—বাঁড়ুজ্যে মশাই যেন মহাশয় ব্যক্তি—অভাবও নেই তাঁর কিছু—কোন কিছুই দাবী নেই কিন্তু মায়ের বিয়ে বলে কথা—আমাদেরও একটা দায়-দায়িত্ব তো আছে হে—

তা তো আছেই—

শোন স্পষ্ট কথাই বলি, তোমার হাল তো জানতে আমার কিছু বাকী নেই—হাতে কিছু আছে, না—

তোমার তো অজানা কিছুই নেই ভাই সুধা—উপার্জন কোথায় আমার যে থাকবে—তারপর একটার পর একটা বিপদ—বড়বৌ দু'মাসের উপর শয্যাশায়ী।

কে—সুলোচনা?

হ্যাঁ।

কী হয়েছে তার?

অন্ত্রক্ষয় রোগ।

কে বললে?

ঐ কানা কবিরাজ।

করালীচরণ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা তারপর?

তারপর আর কি—

বললেই হলো তারপর আর কি—কেন আমরা দশজন আছি কি করতে?

বিস্ময়ের যেন অন্ত থাকে না হরনাথের। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে, সুধামাধব—

তুমি আমাদের পর-পর ভাবো আমি জানি হরনাথ—কিন্তু আমরা তোমাকে কখনো তা ভাবি নি—নয়ন আমার ছোট বোনের মতই ছিল—তার ঐ একটি মাত্র সন্তান আমাদের কত আদরের সুনয়না—

না, না ভাই—তা কেন ভাববো—বিপদে-আপদে তুমিই তো বরাবর আমাকে সাহায্য করেছো—তাছাড়া তোমাকে পর ভাববো তো আপনার জন আর কাকে ভাববো?

তা তো বটেই—গত আট নয় মাস বেঁচে আছি কি মরে আছি একটা খোঁজও নাও না।

ভাই জানই তো—পেটের অন্নের সংস্থানের জন্য সদাই ব্যস্ত থাকতে হয়।

অন্নচিন্তা কার না আছে ভাই—তাই বলে আত্মীয়-স্বজন লৌকিকতা সব বাদ দিতে হবে।

আজই ভাবছিলাম—তুমি বিশ্বাস করো—তোমার কাছে যাবো।

বড় দুঃখ পেয়েছি বুঝলে ভাই— জান তো আমারও কোন সন্তানাদি নেই—ঐ সুনয়নাই আমাদেরও সব।

কথাটা সুধামাধব মিথ্যা বলে নি।

সত্যিই তার কোন সন্তানাদি ছিল না—পর পর চারটি পুত্রসন্তান হয়ে সবাই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েছিল।

কিন্তু আসলে সেই স্নেহের ডাকে বা সুনয়নার প্রতি মমত্ববোধে ছুটে আসে নি সেদিন সস্ত্রীক সুধামাধব হরনাথের গৃহে।

সে পাত্রই ছিল না সুধামাধব।

যেমন কঞ্জুস তেমনি স্বার্থপর বরাবর মানুষটা।

নিজের স্বার্থটি ছাড়া এক পাও চলতো না সুধামাধব।

স্ত্রী হরকালী অবিশ্যি ভিন্ন প্রকৃতির এবং তার দয়া মায়া সব কিছুই ছিল, কিন্তু স্বামী সুধামাধবের জন্য তাকে মুখ বুজেই থাকতে হতো।

সুধামাধব লোকমুখে কলকাতা শহরের সে-সময়কার ধনী প্রতিষ্ঠাপন্ন বেনিয়ান কালীকৃষ্ণর একমাত্র ছেলের সঙ্গে সুনয়নার বিবাহের কথাটা শোনা মাত্রই ছুটে এসেছিল।

বেনিয়ান।

ওদের যে একটা বিশেষ পরিচয় ছিল।

উদয়—অস্ত।

ভাগীরথীর পশ্চিমে সরস্বতী নদীতীরে এক সূর্য অস্ত গেল—এবং অন্য এক নতুন সূর্যের উদয় হলো ঐ ভাগীরথীরই পূবে।

নতুন সূর্য—নবযুগের জ্যোতির কনকপদ্ম কলকাতা।

বন্দরকে কেন্দ্র করেই নগরসভ্যতা গড়ে ওঠে—এবং উঠছে।

একদিন এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত বন্দরকে কেন্দ্র করে—এবং সাগর শুকিয়ে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার সভ্যতা ও নগর স্তিমিত হয়ে এসেছিল এবং তাম্রলিপ্তের তাৎপর্য কমে গেল, ইতিহাসের পাতায় মৃত হলো তাম্রলিপ্ত।

সেই অন্তের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদীতীরে নতুন এক বন্দর ও সভ্যতার উদয় হচ্ছিল—সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম তখন পশ্চিম বাংলার প্রধান বন্দর—

বাণিজ্য ও বণিকদের প্রাধান্য।

প্রভু নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের বণিকদের ঘরে ঘরেই মহাপ্রভুর অমর মন্ত্র—কীর্তনের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সপ্তগ্রামের—যে নদীকে কেন্দ্র করে বন্দর—সেই সরস্বতী নদীই মজে শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পাতা থেকে সপ্তগ্রামও মুছে গেল।

এবারে ভাগীরথীর বুকে হুগলী, তারপর কলকাতা।

নতুন এক বন্দর শহর—নতুন এক সভ্যতার সূর্যোদয়ই ঐ কলকাতার হৃদি-কনকপদ্মে। এবং শুরু তার প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৮ পলাশীর যুদ্ধের পর—২৩শে জুন বৃহস্পতিবার নবাব সিরাজউদ্দৌলা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে নিঃশব্দে পলাশীর রণাঙ্গন থেকে পলায়নের পর।

১৭৫৮য় কলকাতা গোবিন্দপুর অঞ্চলের জঙ্গল হাসিল করে ইংরেজরা নতুন দুর্গের ভিত্তিস্থাপন করল।

১৭৬৫তে ক্লাইভ এ দেশের দেওয়ানী সনদ আদায় করেন।

ক্রমে বণিকের মানদণ্ড—রাজদণ্ড রূপে দেখা দিতে লাগল।

বাংলার গভর্ণর হয়ে এলো ১৭৭৪ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস।

কলকাতার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ভারতের রাজধানী হলো কলকাতা। শহর কলকাতা। আর সেই বছরই রাধানগর গ্রামে জন্ম নিলেন রামমোহন।

১৭৭৪।

এদিকে এক নবাবী আমলের শেষে সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক নবাবী আমলের শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইংরাজদের নবাবী আমল।

নবাব—নতুন নবাব।

It began to be applied in the eighteenth century, when the transactions of Clive made the epithet familiar in England, to Anglo-Indians who returned with fortunes from the East···

বাংলার শূন্য সিংহাসনে নকল নবাব বসিয়ে জমিদারী দেওয়ানী 'ইন্টারলোপারী' করে, উৎকোচ উপঢৌকন নিয়ে প্রচুর অঢেল অর্থের ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে, সামান্য রাইটার ফ্যাকটর, জুনিয়ার ও সিনিয়ার মার্চেন্টরা দেশে

ফিরে 'নবাব' উপাধি পেয়েছে ও নবাবী করেছে।

যাদের তদানীন্তন দেশের পত্রপত্রিকারা বলেছে: 'The plunderers of the East'. 'Robbers and Murderers', 'Execrable Bandits'.

ঐশ্বর্যও সোজা ঐশ্বর্য নয়।

Lacks and crores of Rupees, sacks of Diamonds.

লক্ষ কোটি টাকা আর বস্তা বস্তা হীরা।

হায় সোনার ভারত! স্বর্ণপ্রসূ ভারত।

আর ঐ নবাবদের—ইংরাজ নবাবদের 'গাইড ও ফিলজফার' ছিল সেদিন একজন একজন করে বাংগালী, যাদের বলা হতো দেওয়ান ও বেনিয়ান।'

এবং যে বেনিয়ানরা ছিলো—ঐ ইংরাজ নবাবদের—interpreter, head book-keeper, head secretary, head broker, supplier of cash and cash-keeper, and in general secret-keeper—

অর্থাৎ এক অর্থে আত্মীয় বন্ধু—সহায়—পরামর্শদাতা—রক্ষাকর্তা—অভয়-দাতা—

কি নয়—সব কিছু ছিল ঐ বেনিয়ানরাই ইংরাজ নবাবদের।

কাজেই এক অর্থে ঐ বেনিয়ানরা ছিল ছোট ছোট এক-একটি নবাব।

অর্থশালী—প্রতিপত্তিশালী সমাজের—শহরের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি—

সেই বেনিয়ান কালীকৃষ্ণ—যদিও আজ কিছুটা শক্তি ও প্রতিপত্তি তাদের কমেছে আগের চাইতে—তবু বেনিয়ান—আর সেই কালীকৃষ্ণের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে সুনয়নার বিবাহ দিচ্ছে হরনাথ।

কালীকৃষ্ণর মত লোকের আত্মীয়—এ কি কম সুযোগ-সুবিধা!

সুধামাধব তাই কালবিলম্ব না করে ছুটে এসেছিল।

সুধামাধব বলে, কিছু ভাবতে হবে না—আমরা আছি—সব হবে—তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখ কি করি—

কিন্তু ভাই—

'আরে থাম তো—আমাদের একমাত্র সন্তান সুনয়নার বিয়ে—আলো জলবে—বাজী পুড়বে—শানাই বাজবে—রসুনচৌকী—

উৎসাহে ডগমগ হয়ে বলতে থাকে সুধামাধব।

আর হরনাথের দুচক্ষু জলে ভরে যায়।

সত্যিই তো—তার নয়নার বিয়ে—

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সুন্দরম্ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এবং শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল নিদারুণ জ্বরবিকারে।

হাজার হলেও মানুষের শরীর-মন তো—অত সইবে কেন।

ডি'কুনহার মুখে জননী ভায়লার কথাটা শুনে তার ওখানে গিয়ে এবং তার মুখ থেকে সেই অকল্পনীয় সত্যটা জানবার পর থেকে একটা মাস যে কি ভাবে তার দিন ও রাত্রি কেটেছে তা একমাত্র সুন্দরমই জানে।

না স্নান—না আহার—না বিশ্রাম—অসম্ভব এক মানসিক যন্ত্রণায় সে পাগলের মতই যেন শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

অযত্নে অনিয়মে উপবাসে দিনের পর দিন শরীর যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—সেই সঙ্গে অহরহ—দিবারাত্র অকথিত একটা মানসিক যন্ত্রণা যেন কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

অবশেষে একদিন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে গৃহে কোনমতে টলতে টলতে ফিরে এল। এবং এসেই শয্যা নিল।

শুধু জ্বরই নয়—অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছিল।

দাক্ষায়ণী টেরও পায় নি যে সুন্দর সাহেব গৃহে প্রত্যাগমন করে শয্যা নিয়েছে। প্রথম প্রথম দাক্ষায়ণী সজাগ থাকত সর্বদা প্রভুর প্রত্যাগমনের আশায়।

কিন্তু ক্রমশঃ সেও ঝিমিয়ে পড়েছিল।

সুন্দর সাহেব যে কখন আসে কখন আবার চলে যায় ও টেরও পায় না।

আগে আগে নিয়মিত আহার্য প্রস্তুত করে রাখত—কিন্তু দিনের পর দিন রাতের পর রাত আহার্য বস্তু অস্পৃষ্টই থেকে যায়।

কেউ তা স্পর্শও করে না।

বাড়িটা যেন একটা ভূতের বাড়ি হয়ে উঠেছিল ক্রমশঃ

সেদিনও তাই সুন্দরম্ যে কখন এসে ঘরে শয্যা নিয়েছে টের পায় নি প্রথমটায়।

সন্ধ্যার দিকে ঘরে সন্ধ্যা দিতে এসে কানে তার একটা ক্ষীণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ প্রবেশ করে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে যেন গোঙাচ্ছে।

যন্ত্রণায় কে যেন কাতরাচ্ছে।

কে ?

ভাল করে দেখতে গিয়ে প্রদীপের আলোয় এবারে শয্যাশায়ী সুন্দরম্‌কে দেখতে পায় দাক্ষায়ণী।

প্রদীপ হাতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে সুন্দরমের শয্যার পাশে।

ছটফট করছে শয্যার ওপরে বিরাট দৈত্যের মত মানুষটা।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো।

থেকে থেকে মাথাটা উপাধানের ওপরে একবার এদিক একবার ওদিক করছে।

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে ঐ দিকে চেয়ে প্রথমটায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দাক্ষায়ণী।

ঠিক বুঝতে পারে না যে সুন্দরম্‌ অসুস্থ। এবং রীতিমত অসুস্থ।

সাহেব—

কিন্তু কোন সাড়া নেই।

সাহেব—ও সাহেব—চিৎকার করে মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে আবার ডাকে দাক্ষায়ণী।

দাক্ষায়ণীর ডাকেই বোধ হয় এবারে সুন্দরম্‌ চোখ মেলে তাকায়।

রক্তবর্ণ দুটি অক্ষিগোলক।

বিহ্বল—বিভ্রান্ত—শূন্য দৃষ্টি।

সাহেব—কি হয়েছে কথা বলছো না কেন—

সুন্দরম্‌ আবার ততক্ষণে চোখ বুজিয়ে নিয়েছে—যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে।

কি হয়েছে সাহেব—অমন করছো কেন গো। অসুখ বোধ করছো ?

আবার সেই রক্তচক্ষু মেলে তাকাল সুন্দরম্‌।

দাক্ষায়ণীর কিরকম এবারে যেন সন্দেহ হয়। একটু ইতস্তত করে সুন্দরমের কপালে হাতটা ছোঁয়াতে যেন সে চমকে ওঠে।

তপ্ত আগুনের খোলা যেন। পুড়ে যাচ্ছে।

উঃ মাগো—এ যে ভয়ানক জ্বর।

দাক্ষায়ণী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কি হবে—কি করবে এখন সে—একা মানুষ!

সে রাত্রিটা দাক্ষায়ণীর কিভাবে যে কাটে তা সেই জানে।

সারাটা রাত সে শিয়রের ধারে বসে থাকে অসুস্থ মানুষটার। কথনো

হাওয়া দেয়, কখনো মাথায় জল দেয়।

আর সুন্দরম্ একটানা জরবিকারে গোঙাতে থাকে।

ভাগ্যে পরের দিন সকালের দিকে ডি'কুনহা এসেছিল এমান্নুল্লা মাঝিকে নিয়ে, তারা আসতেই দাক্ষায়ণী হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

মানুষটা বোধ হয় মরে যাবে গো—দেখ তোমরা—

ভুল বকছে থেকে থেকে প্রচণ্ড জরের ঘোরে তখন সুন্দরম্।

আই এ্যাম্ নট এ পর্টু্গীজ ক্রেস্তান—আই এ্যাম্ এ হিন্দু—হিন্দু ফাদার—হিন্দু মাদার—হিন্দুর ব্লাড্ আমার শরীরে—আমি হিন্দু।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ডি'কুনহা সুন্দরমের মুখের দিকে।

এলোমেলো বকে যাচ্ছে থেকে থেকে সুন্দরম্।

ডি'কুনহা—একজন ভাল ব্রাহ্মণের খবর আমায় দিতে পার—আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো—এগেন আমি হিন্দু হবো।

কী ঐ সব বলছে গো সাহেব মাঝি! দাক্ষায়ণীই শুধায় এমান্নুল্লাকে।

সুন্দরম্ বলছে—রাজা রামমোহন বলেছে—কোন প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই—আমি হিন্দুই আছি—I am a Hindu—হিন্দু আমি—প্রায়শ্চিত্ত আবার কি—কোন পাপ তো আমি করি নি—ও গডেস কালী, হাভ মারসি—হাভ মারসি অন মি—

সুন্দরম্—সুন্দরম্—

ডি'কুনহা ডাকে।

কোন সাড়া নেই। সাড়া দেয় না সুন্দরম্।

সাড়া দেবে কি—কোন বোধশক্তি কি তখন তার আর আছে! জর-বিকারের ঘোরে সে আচ্ছন্ন অচেতন।

সুন্দরম্ বলে চলেছে, তাহলে কে আমার বাবা—কার সন্তান আমি—to whom I belong—জান ডি'কুন্হা—আমার নাম সুন্দরম্ নয়—গোপাল—গোপাল আমার নাম—আমি হিন্দু—হিন্দুর সন্তান—

এমান্নুল্লা ডি'কুন্হার মুখের দিকে ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকায়।

কি হবে সাহেব।

একজন অবিলম্বে চিকিৎসকের দরকার—দাঁড়াও, ডক্টর উইলসনকে আমি ডাকি—

ডি'কুন্হা তখুনি ডাঃ উইলসনকে আনবার জন্য বের হয়ে যায়।

কিন্তু তখনই এমান্নুল্লার মনে পড়ে কানা কবিরাজের কথা।

অসুখ-বিসুখ হলে সুন্দর সাহেব বরাবর কানা কবিরাজকেই ডেকে এনেছে—তার কাছেই ছুটে গিয়েছে।

এমাহুল্লাও তখনি ছোটে করালীচরণের সন্ধানে।

করালীচরণ গৃহেই ছিল।

কে—কি চাও?

কবিরাজ, তোমাকে একবার এখুনি যেতে হবে।

কোথায়?

কুলীর বাজারে।

সেখানে—

সুন্দর সাহেবের বড় অসুখ গো কবিরাজ।

কেন—সে বোম্বেটেটার আবার কি হলো—দশটা বাঘেও তো খেয়ে শেষ করতে পারবে না রে।

না, না—শিগ্গিরি তুমি একবার চলো কবিরাজ—সে খুব অসুস্থ।

বেশ—চল দেখি।

কানা কবিরাজের সুন্দরমের গৃহে এসে তাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে মুখটা গভীর হয়ে যায়।

হুঁ—জ্বরবিকার।

বাঁচবে তো কবিরাজ—

চলো ওষুধ দেবো।

কবিরাজকে নিয়ে বের হয়ে যাবার একটু পরেই ডি'কুন্হা এসে হাজির হলো—ডাঃ উইলসনকে নিয়ে।

ডাঃ উইলসনও অনেকক্ষণ ধরে নানা ভাবে রোগীকে পরীক্ষা করে বলেন, মস্তিষ্কের জ্বর—চিন্তার কারণ আছে।

তিনিও ঔষধের ব্যবস্থা করেন।

একই সঙ্গে দু'প্রস্থ চিকিৎসা চলে।

কবিরাজী—অ্যালোপ্যাথী।

ডি'কুন্হা বলে, ডাঃ উইলসনের চিকিৎসাই ভাল।

এমাহুল্লা বলে, কবিরাজের চিকিৎসাতেই সাহেব ঠিক ভাল হবে।

কেউ কারো দাবী ছাড়তে চায় না।

কটা দিন সে এক বিশ্রী চিকিৎসা-বিভ্রাট চলে।

এদিকে সুন্দরমের অবস্থা কিন্তু দিনের পর দিন খারাপের দিকেই যেতে থাকে। উত্তরোত্তর অবনতির পথেই যেতে থাকে অবস্থা।

অবশেষে দুজনার মধ্যে একটা আপস হয়।

ঠিক হয় কিছুদিন এখন ডাঃ উইলসনের চিকিৎসাই চলুক।

দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ দিন চিকিৎসা করবার পর—রোগীর জ্ঞান ফিরে এলো বটে কিন্তু দুর্বলতা যেন কিছুতেই আর যায় না মানুষটার।

দিন দিন মানুষটা দুর্বল—আরো দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

শয্যার সঙ্গে একবারে মিশে গিয়েছে যেন।

এখন ডি'কুন্হাই বলে নিজে থেকে, ঠিক আছে মাঝি—তুমি তাহলে বরং এবারে সেই ব্লাইণ্ড কবিরাজকেই ডেকে নিয়ে এসো—let him treat—তার চিকিৎসাই হোক এবারে—

এমানুল্লা ডাকতে গেল কবিরাজকে।

করালীচরণ তো সব শুনে এই মারে কি এই মারে—

বেরো—বেরো এখান থেকে বেজাতের বাচ্ছা অনামুখো হতচ্ছাড়া—আবার কেন এসেছিস এখন আমার কাছে।

দয়া করুন কবিরাজ—চলুন।

না—বেরো।

কানা কবিরাজও আসবে না, এমানুল্লাও ছাড়বার পাত্র নয়।

সমানে অনুরোধ করে চলে কাতর কণ্ঠে।

অবশেষে কানা কবিরাজের মন গলে—বলে, চল্।

এসে রোগীকে পরীক্ষা করে, তার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করে ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করে, ইস্—হাতুড়ে চিকিৎসা করে মানুষটাকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে গো।

কি হবে কবিরাজ—

কি আবার হবে—এসে পড়েছি যখন ঠিক বাঁচিয়ে তুলব—

॥ ২ ॥

সুন্দরম্ ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁচিঁ করে বলে, আমি আর বাঁচবো না কবিরাজ মশাই।

বাঁচবি না, কে বলেছে বাঁচবি না—ঐ লাল বান্দরমুখো' ডাক্তারটা তো? খিঁচিয়ে ওঠে করালীচরণ।

না, না—আমি বলছি—my end is near—আমার মৃত্যুর সময় এসে

গেছে—

বাজে বকিস না তো—মৃত্যুর সময়—ওর যেন আমার থেকে বেশী নাড়ীজ্ঞান আছে—থাম তো।

সুন্দরম্ বলে, সে আপনি যাই বলুন কবিরাজ মশাই—আমি জানি আমি আর বাঁচবো না—মরতে আমার দুঃখ ছিল না—I am ready to die—মরতে আমি প্রস্তুতই—শুধু যদি একটিবার আমার মা-বাপকে মরবার আগে দেখতে পেতাম—

সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজের এক মাস আগেকার সব কথা মনে পড়ে যায়। বলে, তোর মা-বাপের সন্ধান পাস নি ?

কই আর পেলাম কবিরাজ মশাই !

পাস নি ?

না—একটিবার যদি দেখা পেতাম তাদের—

কেমন করে পাবি, কিছুই তো তাদের সম্পর্কে তোর জানা নেই রে—কি জাত —কি গোত্র, কোন দেশে ঘর ?

তারা হিন্দু কবিরাজ মশাই।

ঐটুকুতে কি আর সংবাদ মেলে রে !

তাছাড়া আমার ছোটবেলাকার কুর্তা—মল—আর আমার মায়ের হাতের লেখা চিঠিটা আছে—কই—কই আমার চিঠি আমার পুঁটলিটা—ব্যস্ত হয়ে সুন্দরম্ খুঁজতে থাকে।

মাঝিই তখন শয্যার তলা থেকে ছোট পুঁটলিটা বের করে দেয়, এই যে সাহেব—

কেন আমাকে সাহেব বলিস বল তো মাঝি, তোকে না রিপিটেডলি—বার বার বলেছি আমি হিন্দু—I am a Hindu—আমার শরীরে হিন্দুর রক্ত—আমার নাম গোপাল—call me Gopal—

দীর্ঘ দিন ধরে রোগে ভুগে কণ্ঠস্বর মানুষটার ক্ষীণ—তথাপি সেই ক্ষীণ নিস্তব্ধ কণ্ঠস্বরের মধ্যেও এমন একটা কিছু ছিল যেটা সঙ্গে সঙ্গে করালীচরণের কর্ণে গিয়ে প্রবেশ করে তাকে যেন একটা ধাক্কা দেয়।

মনে হয় করালীচরণ কানা কবিরাজের এ তো কেবল কথার কথাই নয়—কথার ছলে কথা বলাই নয়—এ তার চাইতেও অনেক কিছু বেশী।

এ যেন একটা মনের বিশেষ অনুভূতি, একটা চূড়ান্ত বিশ্বাস।

কণ্ঠস্বরের মধ্যে কথাগুলোর মধ্যে যেন তারই অভিব্যক্তি—তারই প্রকাশ।

শীর্ণ মুখখানা কি এক দীপ্তিতে যেন উজ্জল—ভাস্বর।

চোখের তারা দুটো কি এক দ্যুতিতে যেন চিক্ চিক্ করছে।

এমন করে এমন প্রাণভরা বিশ্বাসে এমন দৃঢ় কণ্ঠে কেউ কি কখনো নিজের জাত—নিজের পরিচয়কে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করতে পেরেছে?

আশ্চর্য!

সত্যিই আশ্চর্য।

কানা কবিরাজ যেন অভিভূত হয়ে পড়ে।

আর দীর্ঘ দিনের চিকিৎসকের অভিজ্ঞতায় এও বুঝতে পারে, ঐ বিশ্বাসের মূলে এতটুকু আঘাত লাগলে—ঐ মানুষটাকে আর বাঁচান যাবে না।

ও একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়বে।

মৃদু কণ্ঠে করালীচরণ ডাকে, গোপাল—

করিবাজ মশাই—

সুন্দরম্ কানা কবিরাজের মুখের দিকে তাকাল।

দে ওগুলো—আমি তোর মা-বাপকে খুঁজে বের করে দেবো।

আশায় আনন্দে যেন সুন্দরমের সমস্ত মুখ-চোখ মুহূর্তে ঝলমল করে ওঠে—বলে, পারবেন—সত্যি বলছেন পারবেন—you will be able to find them out—my father—my mother—আমার মা—আমার বাবাকে—

পারবো—দে ওগুলো—

আঃ, what a pleasure—কি আনন্দ—নিন—কবিরাজ মশাই, hold it—ধরুন, তুলে ধরে ছোট পুঁটলিটা কানা কবিরাজের সামনে সুন্দরম্ বিশ্বাসে আশ্বাসে ভরপুর হয়ে।

হাত পেতে নেয় পরম শ্রদ্ধাভরে কানা কবিরাজ পুঁটলিটা সুন্দরমের শীর্ণ কম্পিত হাত থেকে।

কবিরাজ মশাই—

কী?

কবে তাদের খুঁজে পাবেন?

পাবো রে পাবো—তোকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে গোপাল।

নিশ্চয়ই বলুন—আমি আমার জীবন, life পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত—always ready—

শোন—তাড়াতাড়ি তোকে ভাল হয়ে উঠতে হবে।

কবিরাজ মশাই—

হ্যাঁ—আবার আগের মত শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে—উঠে চলে

বেড়াতে হবে—

নিশ্চয়ই দাঁড়াবো আমি—নিশ্চয়ই দাঁড়াবো—আমি বাঁচবো—বাঁচবো—

অপূর্ব যেন একটা জাদুমন্ত্রের কাজ করে কবিরাজের সেদিনকার কথাগুলো।

সত্যি সত্যিই সুন্দরম্ দেখতে দেখতে সুস্থ হয়ে ওঠে।

তার রুগ্ন জীর্ণ দেহটা আবার সুস্থ সবল হয়ে ওঠে এক মাসের মধ্যেই—এবং যত ভাল হয়ে উঠতে থাকে ততই সে যেন ব্যস্ত—অধীর হয়ে উঠতে থাকে।

উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে করালীচরণের আসার পথের দিকে চেয়ে।

কখন সে আসবে।

প্রত্যহ একবার করে করালীচরণকে সুন্দরমের বাসগৃহে আসতেই হয়—না এলে এমানুল্লাকে পাঠায় সুন্দরম্ কবিরাজকে ডেকে আনতে।

কবিরাজ এলেই শুধায়, কি হলো কবিরাজ, any news—কোন সংবাদ পেয়েছেন?

করালীচরণ বলে, পাবো রে পাবো।

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সুন্দরম্ যেন প্রবোধ মানে না। তার বুকের মধ্যে যে দিবারাত্র কি অস্থিরতা, কাকে সে তা বোঝাবে।

প্রতিদিনের অধীর প্রত্যাশার সেই একই উত্তর।

সুন্দরম্ বলে, কবে কবিরাজ মশাই—কবে তাদের সংবাদ আর আনবেন?

এ তো কিছু হুট্ করে পাবার ব্যাপার নয়—তবে পাবো বৈকি—পাবো—নিশ্চয়ই তুই তোর মা-বাবাকে পাবি—এমন করে তুই তাদের ডাকছিস দিবারাত্র—না ধরা দিয়ে কি পারে রে তারা!

পাবো কবিরাজ মশাই—তাই না?

নিশ্চয়ই—পাবি বৈকি।

আঃ, আমার মা—আমার বাবা—my mother—my father—সুন্দরমের দুচোখে যেন স্বপ্নের ঘোর নামে।

কেমন তারা দেখতে।

শোভাবাজারের রাজবাড়িতে যে দুর্গা প্রতিমাটি গতবার দেখেছিল—how sweet face—সেই প্রতিমার মতই সদাহাস্যময়ী স্নেহকরুণ মুখখানি কি তার মায়ের।

Oh my mother—my sweet mother—কোথায় তুমি মাগো—

কোথায় তুমি—এসো মা—তোমার ক্লান্ত সন্তানকে বুকে তুলে নাও তোমার।

কয়ালীচরণের যেন আজকাল স্থন্দরমের সামনে যেতে ভয় করে।

কতকাল আর মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দিয়ে মানুষটাকে ভোলাবে। ভোলানই বা যেতে পারে আর কতদিন এই ভাবে।

মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আর কি।

কয়ালীচরণ কি জানে না, বোঝে না—এর চাইতে মিথ্যা—অসম্ভব কিছু আর হতে পারে না।

গোপালের মা-বাবাকে ঐ সামান্ত সূত্রের সাহয্যে এতকাল পরে খুঁজে বার করা কেবল শুধু দুঃসাধ্যই নয়—অসম্ভবও বৈকি।

সত্যিই অসম্ভব।

ছোট একটা জীর্ণ বাচ্চার কুর্তা।

এক জোড়া রুপার মল।

একটা জীর্ণ—লাল হয়ে যাওয়া ঝাপ্সা পত্র।

সত্য যদি হয় ঐ তার একমাত্র পরিচয়—মধ্যখানে দীর্ঘ অনেকগুলো বৎসরের ঘন অন্ধকার—সে অন্ধকার কি দূর হবে কোন দিন।

সেই অন্ধকারে কি কোন ক্ষীণতম আকারে আলো দেখা দেবে।

কিন্তু সে কথাটা বলতে পারে না কয়ালীচরণ স্থন্দরমকে।

ঐ আশাটুকু বুকে নিয়েই বেচারী আবার আজ সুস্থ হয়ে উঠেছে—

ঐ আশাটুকু যেন হতভাগ্যের কাছে যাদুমন্ত্রের কাজ করেছে—

বিরাট আয়োজন করেছিল সুধামাধব।

নয়নতারার কন্যা সুনয়নার বিবাহের ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখে নি। এবং হরনাথের গৃহ ছোট বলে—পাশের বাড়ির একটা অংশও তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হয়েছিল। সুধামাধবও দুদিন আগে থাকতে সানাই বসিয়েছিল।

চতুর্দোলায় চড়ে আলো জেলে বাজনা বাজিয়ে রাজপুত্রের মত এলো বর জীবনকৃষ্ণ—এক গোধূলি বেলায়।

চার হাত এক হয়ে গেল।

সুনয়না ও জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হয়ে গেল।

কালীকৃষ্ণ কথা রেখেছিলেন। বিবাহের দিন প্রত্যুষেই রুপার থালিতে করে সুনয়নার জন্য স্বর্ণালংকার প্রেরণ করেছিলেন—সেই অলংকার দিয়েই রাজেন্দ্রাণীর

মত সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুনয়নাকে।

সুলোচনার দুচোখের কোল বেয়ে জল পড়ে।

আহা রে—এমন দিনে যদি হতভাগিনী মা-টা ওর বেঁচে থাকত—মেয়ে তার রাজার ঘরে গেল।

আর কি যাদু ছিল সুনয়নার লাবণ্যে ঢল ঢল কচি মুখখানিতে, শান্ত দুটি চোখের কালো তারায় কি মোহিনী শক্তি ছিল কে জানে—জীবনকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে যায়। সব দুঃখ—সব বেদনা যেন তার বুক থেকে মুছে যায়।

ফুলশয্যার রাত্রিতে—প্রদীপের আলোয় চন্দনকুঙ্কুম-চর্চিত সুনয়নার মুখখানির দিকে তাকিয়ে যেন জীবনকৃষ্ণর আশ্চর্য—হারানো রেবেকার মুখখানিই মনে পড়ে যায়।

চমকে ওঠে জীবনকৃষ্ণ।

রেবেকা—

ভীরু কম্পিত দৃষ্টি তুলে তাকায় সুনয়না স্বামীর মুখের দিকে, কে—কে তুমি ?

আমি—

কে ?

আমি সুনয়না—ভীরু চাপা গলায় জবাব দেয় সুনয়না।

সুনয়না—

ভয়ে সুনয়নার বুকের ভিতরটা তখন কাঁপতে শুরু করেছে ভীরু কপোতীর মত। দু চোখ ছল ছল করে ওঠে। অশ্রুভারে টলমল করে ওঠে।

নয়না—

সুনয়না মুখ তুলতে পারে না।

জীবনকৃষ্ণ সুনয়নার চিবুক স্পর্শ করে—সর্বাঙ্গ তার সঙ্গে সঙ্গে যেন শিহরিত হয়ে ওঠে।

অপূর্ব এক রোমাঞ্চেও যেন শিহরিত হয় সর্ব দেহ জীবনকৃষ্ণের।

একি অপূর্ব পুলক—আনন্দঘন রোমাঞ্চ।

সুনয়নার চক্ষু দুটি আপনা হতেই বুজে আসে।

প্রদীপের আলো সুনয়নার চন্দনকুঙ্কুম-চর্চিত মুখখানির ওপর কি এক যেন স্বপ্ন-মায়া রচনা করে।

আর ঠিক সেই দিনই—দ্বিপ্রহরে—

গির্জায় যিশুর ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ী ও শিবনাথ

ক্রিশ্চান ধর্মকে গ্রহণ করে।

অনেক ভেবেছে শিবনাথ।

মৃন্ময়ীকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। মৃন্ময়ীকে বাদ দিয়ে তার জীবন মিথ্যা—শূন্য। এবং হিন্দু সমাজে থেকে যখন মৃন্ময়ীকে সে কোন দিনই গ্রহণ করতে পারবে না তখন ক্রিশ্চান ধর্মের আশ্রয়ই সে নেবে।

মিসেস্ কুক্ ও তার স্বামী উইলসন বার বার বলেছিলেন, শিবনাথ—মৃন্ময়ী—তোমরা উভয়েই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ—চিন্তা করিয়া দেখ—ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ কিছু একটা করিও না, তাহা হইলে দুঃখের অবধি থাকিবে না।

শিবনাথ বলে, না মিঃ উইলসন, আমি অনেক ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি—তুমি আমাদের দীক্ষা দাও।

মৃন্ময়ী তুমি—

আমিও ভেবেই স্থির করেছি।

বেশ—তবে তাই হোক।

ধর্মান্তর গ্রহণের পর শিবনাথ বলে, আমাদের বিবাহ তোমাকে দিয়ে দিতে হবে মিঃ উইলসন!

খুব আনন্দের কথা—দিব।

॥ ৩ ॥

সুনয়না চলে গেল শ্বশুরালয়ে। হরনাথের গৃহ যেন খালি হয়ে গেল।

একেবারে খাঁ খাঁ করে।

আর সুলোচনা—এতদিন যেন ঐ সুনয়নার বিবাহের ব্যাপারটুকুর জন্যই অধীর অপেক্ষায় ছিল, সুনয়নার বিবাহের পর থেকেই তার অবস্থার যেন দ্রুত অবনতি হতে থাকে।

হরনাথ শঙ্কান্বিত হয়ে ওঠে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় তাই আবার যায় হরনাথ কবিরাজ করালীচরণের গৃহে।

আলোর সামনে বসে নিজের ঘরে করালীচরণ সুন্দরমের দেওয়া বস্তুগুলো—ছোট কুর্তাটা মল জোড়া ও পত্রখানি নিয়ে বসে ছিল।

আজ দ্বিপ্রহরে সুন্দরম্ নিজেই এসেছিল সংবাদ নিতে—দু'চারদিন হলো সে বাড়ির বাইরে বেরুচ্ছে।

করালীচরণ আশ্বাস দিয়েছে, মিথ্যা জেনেও—দু-চার দিনের মধ্যেই সে তার মা-বাপের সংবাদ পাবে।

আশ্বস্ত হয়ে চলে গেছে সুন্দরম্।

সেই কথাই ভাবছিল করালীচরণ।

বাইরে পদশব্দ—কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কবিরাজ মশাই—

কে?

চমকে ওঠে করালীচরণ।

আজ্ঞে আমি—

কে বাপু—এসো—ভিতরে এসো।

হরনাথ ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বলে—আমি হরনাথ—

হরনাথের মুখের দিকে কেমন যেন শূন্য অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকাল করালী-চরণ—হরনাথ—

আজ্ঞে—

কি সংবাদ?

একটিবার আমার গৃহে আপনাকে যেতে হবে।

কেন?

আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে যেন ভরসা পাচ্ছি না—আপনি একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন চলুন—

বলেছি তো সেদিন—দিন পনের-কুড়ির মধ্যে বোধ হয় কিছু ঘটবে না—তবে বাঁচবে যে না সে তো আপনাকে আমি বলেই দিয়েছি—শনৈঃ শনৈঃ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে মৃদু একটা হাওয়ার ঝাপটা খোলা দরজা-পথে ঘরের মধ্যে এসে সহসা প্রবেশ করে এবং সেই হাওয়ায় সুলোচনার পত্রটা করালীচরণের সামনে থেকে উড়ে হরনাথের হাঁটুর সামনে এসে পড়ে।

পত্রটা তুলে করালীচরণকে দিতে গিয়ে অকস্মাৎ আলোয় পত্রের শেষে স্বাক্ষরিত নামটা হরনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সুলোচনা!

সঙ্গে সঙ্গে পত্রের শেষ ছত্রটির ওপরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় হরনাথের।

হরনাথ যেন চমকে ওঠে।

অসীম কৌতূহলে হরনাথ চক্ষের পলকে যেন পত্রখানি আগাগোড়া পড়ে ফেলে—এবং অস্ফুট কণ্ঠে বলে, এ—এ কার পত্র—কার?

কি—কি হলো মিশ্র মশাই—করালীচরণ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

এ পত্র কার ?

কেন—কেন বলুন তো ?

এ পত্র মনে হচ্ছে—

কি—কি মনে হচ্ছে মিশ্র মশাই ?

আমার স্ত্রীর হাতের লেখা।

সত্যি বলছেন—

হ্যাঁ—আমার স্ত্রীরই লেখা—কিন্তু এ আপনি পেলেন কোথায় কবিরাজ মশাই ?

সে এক বিচিত্র কাহিনী।

কি ?

তাই—আপনি তো সুন্দর সাহেবকে চেনেন ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই পর্তুগীজ—

না, সে পর্তুগীজ নয়।

পর্তুগীজ নয় !

না।

তবে ?

সম্ভবত সে কোন সাগরসঙ্গমে পরিত্যক্ত হিন্দু-সন্তান—

কবিরাজ মশাই—অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ওঠে হরনাথ।

শুনুন মিশ্র মশাই—বলছিলাম না এক বিচিত্র কাহিনী—এই যে দেখছেন কুর্তাটি—এই এক জোড়া ছোট মল—এগুলো আমাকে ঐ সুন্দরমই দিয়েছে—

আমাকে অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন কবিরাজ মশাই—অধীর ব্যাকুলতায় যেন হরনাথ ভেঙে পড়ে।

এ সে কি শুনছে ?

সত্যিই যদি কানা কবিরাজের কথা সত্য হয়—

ভগবান—ভগবান দয়া করো—দয়া করো—

কানা কবিরাজ তখন সুন্দরমের কাছ থেকে শোনা কাহিনী বিবৃত করে হরনাথের কাছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে কাহিনী শুনে যায় হরনাথ।

কাহিনী শুনে হরনাথের আর কোন সংশয়—কোন সন্দেহই থাকে না। নিঃসংশয়ে সে বুঝতে পারে—ঐ মল—ঐ কুর্তা তাদের সেই হারানো গোপালেরই

—একমাত্র সন্তান গোপালেরই—আর ঐ সুন্দরমূই তাদের সেই একমাত্র সন্তান গোপাল।

গোপাল মরে নি।

আজো সে বেঁচে আছে—

ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন।

আনন্দে উত্তেজনায় হরনাথের দুচোখের কোল বেয়ে দরদরধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

গোপাল—তাদের গোপাল—

কবিরাজ মশাই—

বলুন—

সে—সে এখন কোথায় কবিরাজ মশাই—এই শহরেই আছে কি?

হ্যাঁ—কুলীর বাজারে আছে—

এগুলো কিছুক্ষণের জন্য আমি একবার নিয়ে যেতে পারি কবিরাজ মশাই?

কেন বলুন তো?

আমার স্ত্রীকে একবার দেখাবো—

স্ত্রীকে দেখাবেন—আপনার?

হ্যাঁ কবিরাজ মশাই—ও সত্যিই পর্তুগীজ নয়—সত্যিই ও হিন্দুর সন্তান—ব্রাহ্মণ-সন্তান—

আপনি—আপনি কি করে জানলেন মিশ্র মশাই?

জানতে পারলাম ঐ সব জিনিস—বিশেষ করে ঐ জীর্ণ পত্রখানি পড়ে—

ঐ পত্র!

হ্যাঁ—ঐ পত্র আমার স্ত্রীর লেখা।

অ্যাঁ, কি বলছেন মিশ্র মশাই!

হ্যাঁ কবিরাজ মশাই—ঐ পত্র আমার স্ত্রীর লেখা—আর ঐ কুর্তা ও মল আমাদের একমাত্র পুত্র-সন্তানের—গোপালের।

গোপালের—

গোপাল আমাদেরই হারান সন্তান।

কিন্তু—

আচ্ছা, কবিরাজ মশাই—

বলুন?

আপনি তো গোপালকে খুব ভাল করেই দেখেছেন—চেনেন?

হ্যাঁ—চিনি বৈকি—

আচ্ছা ওর কপালে একটা কালো জরুল চিহ্ন আছে কি দেখেছেন কখনো ?

দেখেছি আছে—একটা লম্বা জরুল চিহ্ন।

তবে ঐ আমাদের সেই সাগরজলে হারান সন্তান।

আপনি স্থিরনিশ্চিত।

আমার কোন সন্দেহ নেই আর—আশ্চর্য—আজ মনে পড়ছে আমার একটা কথা।

কী ?

প্রায় বৎসরখানেক পূর্বে ওকে যেদিন প্রথম আমি দেখি কেন যেন আমার মনটা—

কী ?

একটা বিচিত্র আকর্ষণে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

সত্যি ?

হ্যাঁ—আর আমার স্ত্রীরও।

কি রকম—

তখন হরনাথ মৃন্ময়ী-অপহরণের কাহিনী প্রথমে ও পরে মন্দিরের চত্বরে সে রাত্রের কাহিনী বর্ণনা করে।

আশ্চর্য !

তার চাইতেও আশ্চর্য কবিরাজ মশাই, কোনদিন ভাবতে পারি নি আবার ওকে একদিন এমনি করে ফিরে পাবো আমি যাই।

হরনাথ মিশ্র জিনিসগুলো নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। তার যেন আর তর সইছিল না। অধীর একটা উত্তেজনায় সে যেন কাঁপছিল।

দাঁড়ান মিশ্র মশাই।

কিছু বলছিলেন কবিরাজ মশাই ?

হ্যাঁ—আপনার স্ত্রীর যেরকম অবস্থা—হঠাৎ সংবাদটা পেলে—

তবে ?

কৌশলে ধীরে ধীরে সব কথা তার কাছে ব্যক্ত করবেন।

তাই করবো।

হরনাথ ত্বরিত পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

করালাচরণ আপন মনে বার বার বলতে থাকে, আশ্চর্য- আশ্চর্য—আশ্চর্য—

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে—

সুলোচনা একাকী ঘরের মধ্যে শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে ছিল। সুনয়না শ্বশুরালয়ে চলে যাবার পর থেকে সমস্ত বাড়িটা যেন অদ্ভুত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

হরনাথ মিথ্যা বলে নি।

সত্যিই সুলোচনা যেন শেষযাত্রার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু তার জন্য তার কোন দুঃখ বা আক্ষেপ ছিল না।

নয়নের মনোমত পাত্রে বিবাহ হয়েছে। ওটাই তার শেষ কর্তব্য ছিল বুঝি এ সংসারে। এখন স্বামীর পায়ে মাথা রেখে চোখ বুজতে পারলেই হয়।

ঘরের বাইরে মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল।

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সুলোচনা, কে?

হরনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করল।

বড় বৌ—

তুমি—কোথায় গিয়েছিলে?

স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসতে বসতে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে হরনাথ, কেমন আছো বড় বৌ?

ভাল।

বড় বৌ—

শোন—

বল।

একটু আগে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল—তন্দ্রার মধ্যে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখলাম।

কি বড় বৌ?

যেন এই স্থূল শরীরটা ত্যাগ করে আমি সূক্ষ্ম দেহ পেয়েছি—পৃথিবী থেকে উপরে চলে যাচ্ছি—যেতে যেতে কি দেখলাম জান?

কী?

আমার সেই ছোট্ট গোপাল—

গোপাল!

হ্যাঁ—সে যেন আজ আর ছোট্টটি নেই—শক্ত-সমর্থ এক যুবক—সে যেন আমাকে স্মরণ করে গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে আমারই বায়ুভূত আত্মার তৃপ্তির জন্য তিলাঞ্জলি দিচ্ছে—

বড় বৌ—

হরনাথের দু চোখে জল।

আচ্ছা স্বপ্ন কি সত্য হয় না—

হয়—

সত্যি বলছো হয়।

হয় বৈকি—তাছাড়া ও তো শুধু মাত্র স্বপ্ন নয়—তোমার মনের স্থির বিশ্বাস—সত্য—

কিন্তু—

সত্য চিরদিনই সত্য—নিশ্চয়ই তোমার গোপাল আজও বেঁচে আছে—

এ ধরনের কথা ঐ প্রথম শুনলে সুলোচনা তার স্বামীর মুখে—এতদিন যে বরাবর ঐ কথা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছে—

তুমি—তুমি বলছো?

হ্যাঁ—জান বড় বৌ—

কী?

আজ একটা খবর পেয়েছি—আর কতকগুলো জিনিস—যেগুলো দেখলে হয়তো তুমি চিনতে পারবে—

কি—কি জিনিস?

ব্যস্ত হয়ো না—শান্ত হও—সব তোমায় দেখাবো বলেই নিয়ে এসেছি—এই দেখ—

সেই কুর্তা—সেই মল—তুলে দেয় স্ত্রীর হাতে হরনাথ।

একি—একি—এ—এসব তুমি কোথায় পেলে—এ যে আমার গোপালের—

ঠিক বলছো—চিনতে পেরেছো—

পারবো না—কি বলছো তুমি—নাকের কাছে কুর্তাটা চেপে ধরে আঘ্রাণ নিয়ে সুলোচনা বলে, জামায় যে আজো তার গায়ের গন্ধ লেগে আছে—এ গন্ধ কি আমি ভুলতে পারি—আমার সন্তানের—আমার গোপালের গায়ের গন্ধ—আঃ—গোপাল—আমার গোপাল—

আনন্দে উত্তেজনায় সুলোচনা মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুন্দরমকে নিয়ে কানা কবিরাজ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। হরনাথ চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর তিলমাত্র দেরি করে নি কানা কবিরাজ, সে ছুটেছিল সুন্দরমের গৃহের উদ্দেশে।

সুন্দরম্ গৃহেই ছিল।

আনন্দে উত্তেজনায় করালীচরণ শিশুর মতই চিৎকার করে ওঠে, এই বেটা বোম্বেটে—

কে—কবিরাজ!

হ্যাঁ—বেটা বলেছি না—পাবি তুই তোর মা-বাপকে খুঁজে—

কবিরাজ!

একটা চিৎকার করে ওঠে আনন্দে উত্তেজনায় সুন্দরম্।

হ্যাঁ রে বেটা হ্যাঁ—তাদের সন্ধান আমি পেয়েছি—তোর মা—বাবা—

সত্যি—সত্যি কবিরাজ—is it a fact—you are telling the truth—সত্যি কথা বলছো?

সত্যি না তো কি মিথ্যে?

তারা বেঁচে আছে—my mother—my father—আমার মা—আমার বাবা—

হ্যাঁ, বেঁচে আছে।

কোথায়—কোথায় তারা কবিরাজ—tell me—where—কোথায় তারা?

এই শহরেই আছে।

এই শহরেই?

হ্যাঁ।

কোথায়—কে?

তুই তোর বাবাকে চিনিস।

চিনি—who is he!—কে সে?

মনে পড়ে বোম্বেটে তোর সেই হরনাথ মিশ্র ঠাকুরের কথা?

কে?

মনে পড়ে না—তার স্ত্রীর অসুখের জন্য আমায় ডাকতে এসেছিল এক রাত্রে—আর তুইও এসেছিলি আমায় ডাকতে—

Yes—yes—মনে পড়েছে—সে—

সে-ই তোর বাপ—

কি বলছো তুমি কবিরাজ?

হ্যাঁ রে সে-ই—আর তোর মা কে জানিস—মন্দিরে যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল—তুই শুশ্রূষা করেছিলি—সে-ই—সে-ই তোর মা—

No—no কবিরাজ—don't say that—না, না কবিরাজ—

কি হলো।

সেপ্টেম্বর—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে আর এক শিশু জন্ম নেয়।

ঈশ্বরচন্দ্র।

আর নবযুগের নতুন মহানগর কলকাতায় তার পদার্পণ—১৮২৮।

পায়ে হেঁটে আসেন ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায়—ভয়ে ভয়ে বাপ ঠাকুরদাসের সঙ্গে প্রাণ হাতে করে—কারণ সে সময় ডাকাতির উপদ্রব বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রবল।

পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করে নতুনের বিকাশ হয় না। নতুন যুগেরও নয়—নতুন সত্যেরও নয়। ধারাবাহিকতাই ইতিহাসের ধর্ম। উত্থান-পতন সেই ধারার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী।

ছন্দ তার একটানা একঘেয়ে নয়—তবু মূল ধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন অভাবনীয় নতুন ধারায় ইতিহাস এগিয়ে চলে না—চলেও নি কোন দিন।

॥ ২ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র কি সে কথা সেদিন জানতে পেয়েছিলেন?

পারেন নি। জানতেও সেদিন পারেন নি তিনি যে সেদিন তিনিই অন্যতম নতুন পথের পথিকৃৎ—প্রাচীন পথের উপর দিয়ে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীরে এগিয়ে চলেছেন নতুন এক ইতিহাসেব সম্ভাবনা নিয়ে—ভাগীরথী তীরে নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরে।

॥ ৩ ॥

যেমন এক যুগ অস্ত যায়—আর এক যুগ উদয় হয় ইতিহাসে—উদীয়মান যুগে অস্তমিত যুগের ঐতিহ্য ও স্মৃতি লুপ্ত হয়ে মুছে যায় না—বিগত কালের গর্ভেই আগামী কালের জন্ম—তেমনি বাংলাদেশেও আধুনিক কাল বা নবযুগের সূর্যোদয় হয়েছিল।

১৮৩৩ সনে ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিস্টল নগরে রামমোহন রা তিরোধান হলো—একটা যুগের অবসান।

তার ছ'বৎসর পূর্বেই ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার মাটিতে এসে পা দিয়েছেন।

নতুন যুগের শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভাগীরথী বহে ধীরে।

গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ করছিল গোপাল।

পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছিল—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুঃ ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।

ওঁ মধু—ওঁ মধু—ওঁ মধু—